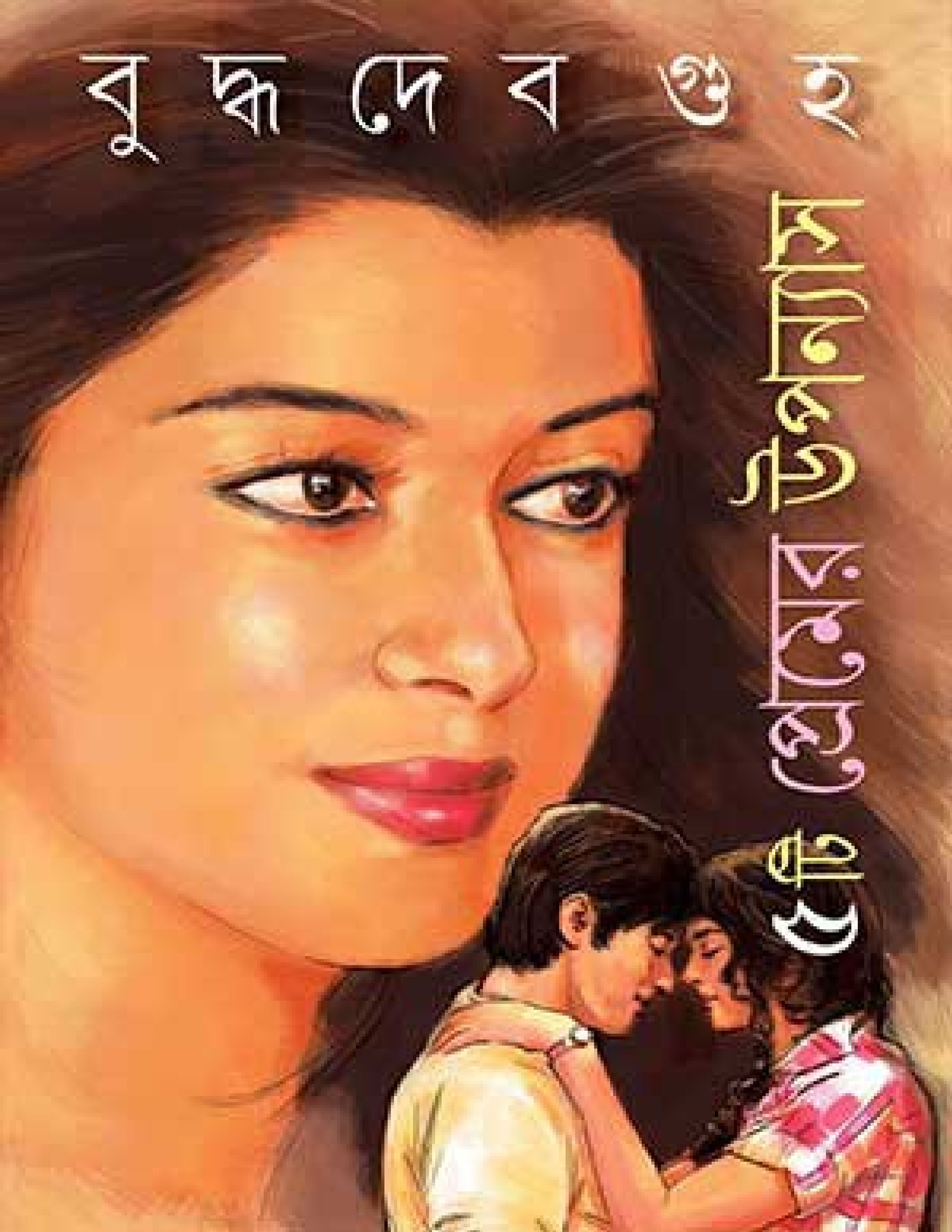
বুদ্ধদেব গুহ
৫টি প্রেমের উপন্যাস

পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস

বুদ্ধদেব গুহ

Made with □ by টেলি বই □□

@bongboi

এ ধরনের আরও বই পান □ এখানে।

generated from eBanglaLibrary

সূচীপত্র

1. পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস
    1. বুদ্ধদেব গুহ
    2. Recommended eBook Reader
2. আলোকঝারির দিনগুলি
    1. ১. রাঁধলা কী
    2. ২. সংকোশ নদী
    3. ৩. কালো-সবুজ ডুরে শাড়ি
    4. ৪. এখন শেষবিকেল
3. উঁচুমহল
    1. ১. বম্বের নারিমান পয়েন্ট
    2. ২-৪. মনীষার অফিসে
4. ঋক
    1. ১-৪. কীসের গন্ধ বেরোচ্ছে
    2. ৪-৮. রাত প্রায় ভোর
5. ঝাঁকি দর্শন
    1. ১-২. টিকলু
    2. ৩-৪. দুপুরের খাওয়া-দাওয়া

    3. ৫-৬. বিকেলের রোদ
    4. ৭. সুজানী গ্রামের দিকে
6. পরিযায়ী
    1. ১-৪. ঐশিকা
    2. ৫-৬. ওপেল অ্যাস্ট্রা
    3. ৭-৮. হুড-খোলা জিপে
    4. ৯-১০. লক্ষ্মীপুজো
7. শেষ পৃষ্ঠা

Recommended eBook Reader

Android

Lithum

Desktop

Calibre

Apple

iBooks

Acknowledgment

করোনা প্রকোপের লকডাউনে বসে পাইথন শেখার প্রক্রিয়ায় বানানো বইগুলি।

Inspired from Lorenzo Di Fuccia, eBanglaLibrary @ Github & many more @ StackOverflow.

For any ideas/suggestions on books, you would like to get implemented go to @bongboi or @boibongo_bot

This Book is scraped from public domain maintained by eBanglaLibrary. No intention for copyright infringement.

Contributor

This ebook is auto generated by using python. Some parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to telegram.

Disclaimer

⚠

Tele Boi Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976: allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, commenting, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

The content of the book is publically available all around in web .

Do Not redistribute in a commercial way.

Please buy the hardcopy of the books to support your favourite authors.

আলোকঝারির দিনগুলি

১. রাঁধলা কী

আলোকঝারির দিনগুলি – উপন্যাস – বুদ্ধদেব গুহ

রাঁধলা কী? ও বুড়ি?

শিলি বলল।

ফোকলা দাঁতে হাসি ফুটল কিরণশশীর।

–এখনও কিসু রাঁধি নাই। রাঁধবোনে। বুড়ির আবার রাঁধারাধির কী। দুইডা ভাত ফুটাইয়া লমুআনে। একটুক ঘি ফ্যালাইয়া, দুইডা আলু দিয়া দিমু ভাতে। আর কাঁচা মরিচ তো আছেই।

রোজ রোজ এতদেরি কইর‍্যা রান্ধো ক্যান। শরীলডা এক্কেরেই যাইব। তখন দেখবনে কে!

ক্যান? তুই-ই দেখবি। দেখবি না?

চুপ করে রইল শিলি। উত্তর দিল না।

–কীরে ছেমড়ি! কথা কস না ক্যান?

–কী কমু? কেডা কারে দ্যাহে? শরীল ভাইঙ্গা গ্যালে কেউই দেখব না কইয়া দিলাম।

–হে তো জানি। কিন্তু এ পোড়াকপাইল্যা শরীল একটাদিনের লগেও কি খারাপ হয়? পাথর দিয়্যা গইড়া থুইছিল আমারে ব্রহ্মা।

হাসল শিলি।

কিরণশশীর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে, শিলি হেসে বলল, বালাই-ষাট। খারাপ হইয়া কাম নাই। এই কইরাই য্যান পার হইয়া যাও বুড়ি।

–কইছস ঠিক ছেমড়ি। দেহিস তুই। আমি পড়ম আর মরুম।

–তা, তিনি আইতাছেন কবে?

শিলি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল।

–এহনে বুঝছি। তাই ক! তর এত ঘন ঘন আসন-যাওন আমার

ছাওয়ালের লইগ্যাই! কীরে? ভুল কইছি? ক?

বাড়ির চারপাশ থেকে নানারকম পাখি ডাকছিল। বড়ো বাঁশঝাড়ের মধ্যে বাদামি বড়োপাখিটা ধরে ধরে পোকা খাচ্ছিল। সকালের হাওয়াতে বাঁশে বাঁশে কটকট আওয়াজ হচ্ছিল। পাশের ডোবাতে, শাপলা যেখানে ঢেকে রাখেনি জল; সেখান থেকে সাতসকালের নরম সূর্যের আলো প্রতিসরিত হয়ে এসে, তেঁতুলগাছের পাতায় পড়ে, চারদিকে আলোর চিরুনির মতন তিরতির করে কাঁপছিল।

কিরণশশী, শেষচৈত্রর প্রথম সকালের রোদে, বড়োঘরের মাটির দাওয়াতে দু-টি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসেছিলেন।

তুমি একটা যাচ্ছেতাই। বুড়ি।

–তা তো কইবিই। আমারে ভালো কইর‍্যা স্যাবা-যত্ন কর। পুতন আইলে অইব কী? ছাওয়াল আমার বড্ডই মাতৃভক্ত। আমি যদি না কইরা দেই, অইবই না বিয়া। বুঝছস ছেমড়ি। আমার কথাই হইতাছে গিয়া শ্যাষকথা।

বিয়ের কথাতেই, শিলির চোখ-মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

হাসিমুখে বলল, হঃ। কী আমার ছাওয়াল। তারে বিয়া করনের লইগ্যা আমি তো কাইন্দা বেড়াই য্যান। তুমি নিজা নিজা ছাইভস্ম ভাইব্যাই ময়রা।

-তাই তো।

হাসলেন কিরণশশীও।

বললেন, আচ্ছা। দেহি তরে কোন রাজার পুত আইয়া বিয়া করে?

শিলি ভুরু নাচিয়ে, চোখে ঝিলিক তুলে বলল, হ। হ। দেইখ্যো অনে। আমারে তুমি ভাবতাছেটা কী? তোমার ছাওয়ালরে বিয়া কেডা করে?

–যা ভাবতাছি, ঠিক-ই ভাবতাছি।

একটু পরে শিলি বলল, দাও দেহি, তোমার চাউলডা ধুইয়া আনি ইন্দারা থিক্যা।

–লইয়া যা। কুলায় যাইর কইরা থুইছি। হবিষ্য-ঘরেই রাইখ্যা আইছি।

শিলি চলে গেল হবিষ্য-ঘরের দিকে।

কিরণশশী, চলে-যাওয়া শিলির দিকে চেয়ে একটা বড়ো দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বড়োভালো এই মেয়েটা। রায়দের বাড়ির ছোটোতরফের ছোটোছেলের মেয়ে। ছোটোতরফের রায়রা কোনোরকমে টিমটিম করে বেঁচে আছেন এখনও। পয়সা কোনোদিনও ছিল না। বংশ পরিচয় ছিল। মানুষ ওঁরা

ভালো। ভালো বলেও বটে এবং কুঁড়ে বলেও বটে; টাকা-পয়সার দিকে কোনোদিনও বিশেষ লোভ ছিল না। ঘরবাড়ি ছেড়ে উত্তরবঙ্গ থেকে উদবাস্তু হয়ে ওরা সকলেই নিম্ন-আসামের এই কুমারগঞ্জে এসে একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছেন। তাও চল্লিশ বছর হতে চলল।

এঁদের কারও দেশ ছিল বগুড়া, কারও নিলফামারি, গাইবান্ধা, ডিমলা, কারও পাবনা বা রাজশাহি। কিরণশশীদের দেশ ছিল বগুড়ায়। এখনও পেছনে তাকালে, ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয়, এই তো সেদিনের কথা। মনে পড়লেই মন খারাপ হয়ে যায়। এখনও কেন যে, মনে পড়ে! চেনাজানা মানুষজন আর নেই। অল্পবয়েসিরা চেনে না।

পুরানা পাড়া আর চেনন যায় না। বাড়িটার মধ্য দিয়া চওড়া পিচের রাস্তা চইল্যা গেছে। গিয়া। ঐশ্বনে নাকি এয়ারপোর্ট হইবে শুইন্যা আইছে হেরম্ববাবুর ছোটোপোলায়। স্যা গতবছর পূজায় গেছিল, বগুড়ায়। অনেক কথাই কইল। সেই তাগো হরিসভার পূজাও আর হয় না। মস্ত মসজিদ উঠছে। ইদের সময়ে উট বলি হয়। কোন শ্যাখেরা নাকি পাঠায় সেসব। মকবুল মিয়া, যে নাকি ঘরামির কাজ কইর্যা খাইত, এহনে মস্ত বড়লোক হইছে। ঢাউস গাড়ি চড়ে।

ভরসার কথা এই যে, পিছনের কথা মনে করার সময় তাঁর নেই-ই। হইলে হইছে। বদলাইয়া ত যাইবই। কুমারগঞ্জও কি আর সেই আগের কুমারগঞ্জ আছে নাকি। সব-ই বদলাইয়া গেছে। বদলাইয়া গেছে মানুষের

মন, মানুষের দৃষ্টি, সবকিছুই এই কয় বছরে বদলাইয়া গেছে। বড়ো মানুষ। বড়ো ধুলা। বড়ো আওয়াজ। বড় খাই খাই, নোংরামি, চাইরধারে। এরমধ্যে কিরণশশীর আর বেশিদিন বাঁচার ইচ্ছা নাই। এহনে, মানে মানে যাইতে পারলেই হয়–

ভাবেন তিনি।

টিনের ছাদে বইস্যা একটা দাঁড়কাক ডাকতাছিল। লালরঙা। মাইয়াগো অসভ্য জায়গার মতন লাল তার মুখের ভিতরখান। অসভ্য-অসভ্য দেখায়।

কুমারগঞ্জের সকলেই বলে, কিরণশশী বড়োই অভাগী। দেশ ছেড়ে আসার পর আসামের এই গোয়ালপাড়া জেলার ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাট, গোয়ালপাড়া, ডিঙ্গডিঙ্গা, গোলোকগঞ্জ, ফকিরাগ্রামে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন।

অনেকেই অবশ্য, যেমন কিরণশশীর শ্বশুরমশাই; চাষ-বাস, পাটের কারবারের কারণে এখানে অনেক আগে থেকেই ছিলেন। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে গঙ্গাধর নদী। তার মাথা গিয়ে পড়েছে ব্রহ্মপুত্রে আর ল্যাজ রয়েছে তিস্তায়। দেশ ভাগ হবার আগে পুববাংলা থেকে বড়ো বড়ো মহাজনি নৌকো করে পাট আসত এই নদী বেয়ে। পাটের বড়ো বড়ো আড়ত, গদিঘর, সব ছিল তখন প্রত্যেক বর্ধিষ্ণু বাড়িতেই। লাল আর সাদা, মিহি আর মোটা, নানারকম পাটের গন্ধে, শীতকালে পাট ওঠার পর, পুরো

এলাকাটা ম ম করত যেন। গেছে সেসব দিন।

অনেক ভেসে আসা পরিচিত পরিবার-ই এসে এখানে আবার নতুন করে শিকড় গেড়েছেন। ব্যাবসা, চাকরি ইত্যাদিতে কোচবিহার, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, মালদা, বালুরঘাট, বহরমপুর, কৃষ্ণনগর এবং কলকাতাতে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন। যদিও আগে আসা বা পরে আসা সকলের-মূল এখনও রয়ে গেছে এই ধুবড়ি, গৌরীপুর, কুমারগঞ্জ, তামাহাটেই।

সাত-সাতটি সুন্দর, কৃতী যুবক ছেলেকে এবং তাঁর স্বামীকেও হারিয়েছেন কিরণশশী। আছে এখন এই সবেধন পুতন, সবচেয়ে ছোটোছেলে। পুতনের সঙ্গে তাঁর বয়সের এতই তফাত যে, মনে হয় তিনি বুঝি মা নন, পুতনের ঠাকুমা।

পুতন, জলপাইগুড়ির এক চা-বাগানের অ্যাকাউন্ট্যান্ট। ধুবড়ি থেকে বি.কম. পাশ করে কলকাতায় গেছিল তাঁর ভাসুরের ভগ্নীপতির অডিট-অফিসে খাতা লেখার কাজ শিখতে। এম-কমও পাশ করে সেখান থেকেই। তারপর তাঁদের-ই সুপারিশে, তাঁদের মক্কেলের এই চা-বাগানে অ্যাকাউন্ট্যান্ট হয়ে যোগ দিয়েছে বছর তিনেক হল।

পুতনের কাছেই শুনেছিলেন কিরণশশী যে, একসময়ে বেশিরভাগ নামি চা-বাগান-ই ছিল বাঙালিদের। নয়তো সাহেবদের কোম্পানির। এখন সাহেবদের কোম্পানিগুলো কিনেছে বড়ো বড়ো মাড়োয়ারিরা আর

বাঙালিদেরগুলো তাদের চেয়ে ছোটো মাড়োয়ারিরা। হাতে বাঙালিদের মাত্র কয়েকটি বাগান-ই আছে এখন। হাতে গোনা যায়।

পুতন, বছরে একবার করে আসে কুমারগঞ্জে, একমাসের জন্যে। এবার আসবে বৈশাখের প্রথমে। চিঠি লিখেছিল যে, এবারে নববর্ষটা কুমারগঞ্জেই কাটাবে। আর সাত বোশেখির মেলা দেখতে যাবে অনেকদিন পর, আলোকঝারি পাহাড়ে।

শিলি এসে বলল, তোমার ভাত চড়াইয়া দিয়া আইলাম। একটু মটরের ডাইলও ধুইয়া ছড়াইয়া দিছি। দুইডা আলু আর দুই টুকরা কুমড়া। সময়মতো নামাইয়া লইও অনে। আমি যামু?

–আইসাই যামু যামু করস ক্যান রে ছেমড়ি? ঘোড়ায় জিন দিয়া আইছস নাকি?

–হেইরকম-ই পেরায়। বাবার যে, জ্বর হইছে, তাই-ই বুঝি কয় নাই তোমারে?

–কে?

হোন্দলের মায়ে?

না তো! হোন্দলের মায়ের কথা ছাড়ান দে। আয়, আর যায়। যার ঘরে

চাইর-চাইরটা পোলাপান, হেই মায়ে কি কোথাওই মন লাগাইয়া কাম কইরবার পারে? ক দেহি? ক্ষুধায় কান্দে সেগুলান। আর তার ভাতার তো দিনরাত মদ গিল্যা পইড়াই থাহে। হে বেচারিই বা করেডা কী?

-তুমিও তো একলা বুড়ি মানষি। তোমারে যদি নাই-ই দ্যাহে, তো ছাড়াইয়া দ্যাও না ক্যান? তোমারে দ্যাহে কেডায়?

–থাক। থাক। অমন কথা কইস না। ছাড়াইয়া দিলে, পোলাপানগুলানরে লইয়া এক্কেরে না-খাইয়া মরব।

–পোলাপান হয় ক্যান তাগো? যাগো খাওয়াইবার

–স্যা হোন্দলের মায়ের কী দোষ। পোলাপান হয় ক্যান তা জিগাইবার লাগে হোন্দলের বাপরে। এই পুরুষ জাতটার হক্কল-ই এক্কেরে বেআক্কাইল্যা।

শিলি আর কথা বাড়াল । ও ভুলেই গেছিল যে, পুতন কিরণশশীর নিজের আট নম্বর এবং শেষছেলে। মধ্যে তিনটি মেয়েও ছিল। দু-টি মারা গেছে কৈশোরে। একটির বিয়ে হয়েছে কোচবিহারে। তার স্বামী রেলের টিকিট কালেক্টর।

খুব সময়মতো মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল ও।

পুরুষমানুষগুলোর সত্যিই কি কোনো আক্কেল ছিল না? ছিল না শুধু নয়, এখনও নেই। নইলে হোন্দলের বাবায় এমনডা করে। ছিঃ ছিঃ।

–চলি বুড়ি।

–আরে। তর বাবার না জ্বর আইছে কইলি, তা এহনে বাবা আছে ক্যামন, তা তো কইয়া গেলি না রে ছেমড়ি। কী যে করস।

–ভালো নাই। জ্বর উইঠ্যা গেছিল পাঁচ। এখন নাইম্যা দুই হইছে।

–ঔষধ-টোষধ দিছস কিছু? না, ভালোবাসাতেই ছাইড়া যাইব গিয়া জ্বর?

–দিছি তো! শৈলেন ডাক্তারের ভাইরে আনাইছিলাম তামাহাট থিক্যা। কইয়া গ্যালেন, মাথার নীচায় কচুপাতা দিয়া কইষ্যা জল ঢাইল্যা যাও আর কুইনিন মিক্সচার চালাইয়া যাও!

-হইছেডা কী? ম্যালোরি নাকি? তাইলেই খাইছে।

–আঃ। বুড়ি, তোমারে লইয়া পারি না আর। তোমার ছাওয়াল হইল গিয়া ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির ফার্স্ট ক্লাস এম. কম, আর তুমি ম্যালেরিয়ারে কও ম্যালোরি? এক্কেরে হোন্দলের মা হইয়া গ্যালা দেহি।

-ওই হইল। বুঝছস তো তুই। বোঝন যাইলেই হইব। ইংলিশ-ফিংলিশ আমি জানুম কোক্কিা এত? দেহি, আজ বিকাল বিকাল যাইয়া একবার

দেইখ্যা আসুমনে নরেশরে।

-তোমারে কে দ্যাহে তার ঠিক নাই। তোমার কাম নাই যাওনের। তেমন যদি বুঝি তো, আমিই পাঠামু অনে ক্যাবলারে। তোমারে বইল্যা যাইব আইস্যা। খামোকা আইস্যা ভিড় বাড়াইও না তো!

-আমি তো ভিড়-ই বাড়াই শুদামুদা। এহন আর কোন কামে লাগি কার?

অভিমানের সুর লাগল গলায়, কিরণশশীর।

তারপর বললেন, তর কাকায় বাড়ি নাই বুঝি? ঘরে পুরুষমানুষ নাই একজনও?

-নাঃ। শিকারে গেছে গিয়া আবু ছাত্তাররে লইয়া। ধুবড়ি থিক্যা কোন সাহেব আইছে নাহি শুনি।

–পুরুষমানুষ লইয়া, কোন কাম আমাগো। বেকামের লোক সব। কামের মধ্যে এক কাম। সে কাম ত কুত্তায়ও করে। বাহাদুরিটা কীসের অত?

সবসময় শিকার-শিকার। কী যে, বাতিক হইছে পরেশের। কাম-ধান্দা নাই। ঘরে একটা কচি মাইয়ারে ফ্যালাইয়া।

একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন কিরণশশী, তর বাবার জ্বর দেইখ্যা যায় নাই নিশ্চয়? পরেশ?

-না তো কী! যখন চইল্যা গেল, তখন বাবায় তো বেহুঁশ।

–কস কী তুই? কী খিটক্যাল। এমন বেআক্কাইল্যাও হয়। ক তো দেহি।

–চলি আমি এহনে।

–যাওন নাই। আইসো।

তারপর গলা তুলে বললেন, আবার আসিস লো ছেমড়ি।

শিলি শুনতে পেল কি না বুঝতে পারলেন না উনি।

না শুনে থাকলে না শুনুক। ওঁর বলার, উনি বললেন।

চ্যাগারের দরজা পেরিয়ে রক্তজবা গাছটার পাশ দিয়ে জোড়া-রঙ্গনের পাশ কাটিয়ে, পেছনের বাঁশবনের মাঝের আলোছায়ার ডোরাকাটা পথে পুকুর থেকে সদ্য উঠে বাড়ির দিকে ফেরা হেলতে-দুলতে আসা, হিস-হিসানি তোলা, একপাল সাদা কালো বাদামি হাঁসেদের মধ্যে দিয়ে, তাদের দু-ভাগ করে নিয়ে; সাদা-কালো ডুরে-শাড়ি জড়ানো কালো ব্লাউজ-পরা শিলি; আলো-ছায়ার-ই মতো মিলিয়ে যাচ্ছে। ওর ডান বগলের কাছে ব্লাউজটা ছিঁড়ে গেছে একটু। নবীন যুবতীর সুগন্ধি ঘামে ভিজে গেছে বগলতলি। এ বাড়িতে কোনো পুরুষ নেই বলে, আঁচল দিয়ে ঢাকেনি শিলি, বগলতলি। পুরুষগুলোর চোখ দুপুরের কাকের মতন। কিরণশশী মুগ্ধ, স্নেহময়

দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ওর পথের দিকে, অনেকক্ষণ।

রঙ্গনের ডালে বুলবুলি হুটোপাটি করছিল। মৌটুসি পাখি ডাকছিল জবা আর যজ্ঞিডুমুরের পাতার আড়ালের ছায়া থেকে, প্রথম গ্রীষ্মের রোদের আঁচ বাঁচিয়ে। বাঁশবাগান থেকে ঘুরঘুর রঘু-ঘুঘুর-র-র-ঘুউ করে কচি দুপুরের বিষণ্ণতাকে ছিদ্রিত করছিল একজোড়া ঘুঘু। দমক দমক হাওয়ার, ধমকে ধমকে হলুদ ও লাল শুকনো কাঁঠাল-পাতারা ঝাঁট দিচ্ছিল উঠোন, বিনামাইনের মর্জিবাজ মুনিষের মতন, থমকে থমকে।

নেশা লেগে গেল কিরণশশীর। শেষচৈত্রর চড়া বেলায়ও চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল হঠাৎ-ই, শিলির চলে যাওয়া পথের দিকে চেয়ে। শোক এবং স্বপ্ন দুই-ই বোধ হয় চোখের দৃষ্টিকে সমান ঝাপসা করে।

ভাবলেন উনি। বয়স হলে, সঙ্গীহারা হলে বড়ো ঘন ঘন ঝাপসা হয় চোখ। কিরণশশী, বড়োঘরের দাওয়া থেকে উঠে চান করতে গেলেন বাথরুমে। ইন্দারার একপাশে কিছুটা জায়গা বাঁধানো এবং ঘেরা। দরজা-দেওয়া। মেয়েদের চান করার জন্যেই বানিয়েছিলেন গোপেনবাবু। যখন বেঁচেছিলেন।

তাও অনেকদিনের কথা হয়ে গেল।

চান করতে করতে কিরণশশী নিজেকে দেখেন আর বড়োকষ্ট হয় তাঁর। সুন্দরী নারীর যৌবন চলে যাওয়ার সময়ে অনেক কিছুই সঙ্গে টান মেরে

উপড়ে তুলে নিয়ে যায়। আর যৌবন যখন থাকে, সে মদমত্ত উদ্ধত থাকে বলে, কোনো সুন্দরী যুবতীই দুঃস্বপ্নেও ভাবে না, একমুহূর্তের জন্যেও যে, যৌবন বড়ো অল্পসময়ের জন্য আসে, থাকে; চাঁপার বনের গন্ধের মতন। তারপর সেই শূন্যগহ্বর, সুখ-স্মৃতির গূঢ় গভীর গোপন সব অস্পষ্ট ছায়া বুকে বেঁচে থাকে। দেওয়াল থেকে, অনেকদিন ধরে টাঙিয়ে রাখা ছবি বা ক্যালেণ্ডার হঠাৎ সরিয়ে নিলে যেমন চারদিকের অনুষঙ্গের মধ্যে সেই জায়গাটি বড়োই দৃষ্টিকটু লাগে; সুন্দরী নারীর বার্ধক্যও তেমন-ই। সহজে, সুখে বইতে পারা কঠিন।

এই চান করার সময়টাতে প্রত্যেকদিন-ই নিজেকে অভিশাপ দেন কিরণশশী। তাঁর এই একলা জীবনে আর কোনো মোহ নেই। আশা নেই। ভালোলাগা নেই। বেঁচে আছেন, রান্না করছেন, ভাত খাচ্ছেন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে রাখছেন, শুধু একটিমাত্র স্বপ্ন বুকে নিয়ে। পুতনের সঙ্গে শিলির দুটি হাত মিলিয়ে দিতে পারলেই তাঁর বেঁচে থাকার সব প্রয়োজন-ই ফুরিয়ে যাবে। একদিন এই পলেস্তারা খসে-যাওয়া ইন্দারার পাশের করমচা-রঙা চানঘরে তাঁর একমাত্র বেঁচে থাকা ছেলের বউ, সুন্দরী যুবতী শিলি চান করবে।

নিজে চান করতে করতে ভাবেন, কিরণশশী। সুগন্ধি সাবান আর তেলের গন্ধে ঢেকে যাবে এই করমচা-রঙা মেঝের ক্ষারের গন্ধভরা চানঘরখানি।

তাঁর পোলার বউ। রাতভর বরের সোহাগ খেয়ে, নতুন সিঁদুর-লেপটানো

কপাল আর লাল নাক নিয়ে, ব্রীড়ান সোহাগি বেড়ালের মতন আড়ামোড়া ভেঙে, যখন পরিচিত অথচ একেবারে নতুন শিলি; গড়ানো সকালের চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে প্রথম সোহাগের পরের চান করার জন্যে, তখন চান করতে করতে হাই তুলবে শিলি। সিঁদুরে-আমের ডালে-বসা বসন্ত বৌরি পাখি লোভীর মতো দেখবে সেই ছাদখোলা চানঘরের মধ্যের শিলির জলভেজা নগ্ন রূপ। তারপর কচিপাতা-ভরা চিকন ডালে শিহর তুলে আমের বোলের গন্ধ চাড়িয়ে দিয়ে উড়ে যাবে, তার সখার কাছে।

হলুদপাখিরা হলুদ ভাষায় কথা বলে। গিয়ে বলবে, আদর করো। আদর করো। আমার খুব আদর খেতে ইচ্ছে করছে গো।

তার হলুদ সখা তাকে বলবে, অনেক কাজ। সময় নেই, সময় নষ্ট করবার।

পুরুষগুলো পৃথিবীময়-ই সব একরকম। সে পাখিই হোক। কী মানুষ! মেয়েদের মনের কথা কেউই বোঝে না। ওদের সময় হলে, ইচ্ছে হলেই ওরা আদর করতে চায়। তখন না বললেই, ভারি গোসসা।

বেআক্কাইল্যা, এক্কেরেই বেআক্কাইল্যা এই পুরুষগুলান।

ভাবছিলেন নিজের মনেই, কিরণশশী।

কে জানে? পুতন, শিলির মতো মেয়ের যথার্থ দাম দেবে কি না! শিলিদের

অবস্থা পড়ে না গেলে, শিলির মতো মেয়েকে বউ করার স্বপ্নও দেখতে পারতেন না কখনো কিরণশশী।

.

জ্বরটা দুপুরের দিকে বাড়ে, বিকেলে ছেড়ে যায়। আবার বেশি রাতে আসে।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই, দাদা ডাক্তার এই সুবাদেই গাঁয়ের ডাক্তার। এল-এম-এফ-এর ডিগ্রিও নেই। কোয়াক।

ভাইয়ের ভিজিট দু-টাকা আর দাদার আটটাকা। ভাই সামলাতে না পারলে দাদাকে ডাকে। তবে নরেশবাবুর বাড়াবাড়ি হলেও শৈলেন ডাক্তারকে আটটাকা ভিজিট দিয়ে ডাকার সামর্থ্য শিলির নেই। রোজগেরে বলতে তার কাকা পরেশ একাই। কিন্তু শিকারের বাতিকেই তাকে খেল। মানুষটা ভালো। বিয়ে-থাও করেনি। জঙ্গল-ই তাকে পরির মতো জাদু করেছে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলের সঙ্গেই।

কী যে, ঘুরে বেড়ায় সারাবছর বনে-পাহাড়ে, নদী-নালায়, তা সেই জানে। আর সঙ্গী হয়েছে বটে একজন। আবু ছাত্তার। তার বাবাকেও বাঘে খেয়েছে। তাকেও দু-বার চিতাবাঘে ঠ্যাং কামড়ে আর ঘেঁটি কামড়ে ঘা করে দিয়েছিল। হাসপাতালে ছিল একবার দু-মাস, একবার তিনমাস। তাতেও কি মতিগতি কিছু বদলাল? না। কিছুমাত্রই না।

কিন্তু নরেশের ভাই পরেশ, সে মানুষ নয়, ডাকাত। ভদ্রলোকের বাড়ির ছেলে যে, কী করে এমন হয় গেল, কে জানে। ওর সর্বনাশ করেছে আসলে ওই চালচুলোহীন, মাথার ওপরে পঞ্চাশটা মামলা-ঝোলা আবু ছাত্তার। ওটা মানুষ নয়-ই! ওদের দোজখ-এর কোনো জীব-ই হবে।

আবু ছাত্তারের দুটি চোয়ালের দিকে তাকালেই শিলিরও ভয় করে খুব-ই। অথচ ছোটোখাটো মানুষটি। মুখে হাসি লেগেই আছে।

মানুষের মুখের ভাবে পুরো মানুষ হয়তো কখনোই থাকে না, থাকে তার এক ফালি মাত্র। ইদের চাঁদের মতো। কখন যে-তাদের অমাবস্যা আর কখন পূর্ণিমা, তা বোধ হয় এমন মানুষেরা নিজেরাও জানে না। বুঝতেও পারে না।

শৈলেন ডাক্তারের ভাই জ্বরের হিসেব রাখতে বলে গেছেন। ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হিকস-এর থার্মোমিটারের পারা নামিয়ে বাবার বগলতলায় দেয় শিলি। বার বার। ঘড়ি ধরে।

মা চলে গেছেন পাঁচবছর হল। তারপর থেকে বাবার দেখাশোনা সব শিলিই করে। ক্যাবলাই বাড়িতে একমাত্র কাজের লোক। বেশি কাজ থাকলে, মুনিষ ভাড়া করে নেয়। চালের খড় নিড়িয়ে নতুন করে ছাইতে, ঘরামিকে ডেকে নেয়।

জ্বরটা দেখে, স্নান করতে যাবে ও। বাবাকে বার্লি খাওয়াবে ফিরে এসে।

নীল রঙের পিউরিটি বার্লির কৌটোটায় বেশি আর নেই। আনতে দিতে হবে ক্যাবলাকে একটা। মধুর দোকান থেকে। সে যখন ছোটো ছিল, মা তাকেই পাঠাতেন মুদির দোকানে। যেখানে সেখানে। মেয়েরা বড় হলেই তাদের জগৎ সঙ্গে সঙ্গে ছোটো হয়ে যায়।

গঙ্গাধর নদী বয়ে গেছে বাড়ির পেছন দিয়ে। ছটো যখন ছিল, তখন নদীতে কত ঝাঁপাঝাঁপি করেছে বন্ধুদের সঙ্গে। তখন সমবয়সি ছেলেরাও বন্ধু ছিল। ছেলে আর মেয়েরা যে, আলাদা জাত, তা তখন অত বোঝেনি। উদবেড়ালের গর্ত ছিল নদীর উঁচু বালির পাড়ে। শুশুক ভেসে উঠত মাঝে মাঝেই। এই গঙ্গাধর-ই গিয়ে মিলেছে তিস্তাতে। একবার কাকার সঙ্গে শীতকালে গেছিল নৌকো চড়ে, তিস্তা পর্যন্ত। হাঁস মারতে গেছিল কাকা, মনা জেঠুর সঙ্গে। তামাহাটের মিত্তিরদের বাড়িতে এসে উঠতেন মনা জেঠু।

কী সুন্দর স্বচ্ছ জল গঙ্গাধরের। তিস্তার কাছাকাছি গেলে, আরও স্বচ্ছ। এতই স্বচ্ছ যে, জলের নীচে কমলা-গেরুয়ারঙা বালির ওপরের রংবেরঙের গোল গোল নুড়ি দেখা যায়। কত রং-বেরঙা হাঁস। বড়ো, ছোটো। ছাইরঙা রাজহাঁস। কোঁয়াক-কোঁয়াক-কোঁয়াক করে উড়ে যায়, মাথার উপর দিয়ে। সেবারে অনেক-ই ডিম-সেদ্ধ, পাউরুটি, আর কলকাতার কেক খেয়েছিল, মনে আছে।

দেশ ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত তামাহাট খুব বড়ো বন্দর ছিল। পাট

বেচাকেনা হত। পূর্বপাকিস্তানের পাট-চাষের সব জেলা থেকে বড়ো বড়ো মহাজনি নৌকো করে পাট আসত। জায়গাটা খুব-ই রমরম করত নাকি তখন। তামাহাটের জেঠিমার কাছে শুনেছে সেইসব সুখের, স্বচ্ছলতার দিনের গল্প। হাটের দিনে, গোরুর গাড়ি করে ব্রহ্মপুত্র আর তিস্তার মহাশোল মাছ আসত। মস্ত মস্ত। বড়ো বড়ো, লাল-রঙা তাদের আঁশ। পাথালি করে রাখলে, গোরুর গাড়ির শরীর ছাড়িয়ে যেত মাছগুলো। যেমন দেখতে, তেমন-ই স্বাদ।

ওরাও ছোটোবেলায় যে, কিছুমাত্র দেখেনি এমন নয়, কিছু কিছু দেখেছে। দিশি ঘোড়ায় চেপে মুসের মিয়া আসত বাঘডোরা গ্রাম থেকে হাটের দিনে। সাদা চুলের ওপরে কালো কাজকরা মুসলমানি টুপি বসান। তামাহাটের হাটের গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে শিলির। গুড়, চিনি, খোল, সরষের তেল, কেরোসিন তেল, পাট, ধুলো, তামাক পাতা আর গোরু মোষের গন্ধ মিলে এক আশ্চর্য মিশ্রগন্ধ উঠত হাট থেকে। সে-গন্ধ এখনও নাকে লেগে আছে। সময় চলে যায় ঠিকই, কিন্তু স্মৃতিতে সেইসব বর্ণোজ্জ্বল শব্দ-দৃশ্য-গন্ধ বড়ো অবিশ্বাস্যরকম জীবন্ত হয়ে থেকে যায়।

বারোবছর বয়সে শাড়ি ধরিয়ে ছিলেন মা। ও যখন হঠাৎ বড়ো হয়ে গেল একদিন, সেদিনের সেই ভয়, আনন্দ আর রহস্যের দিনের কথা এখনও মনে পড়ে। মা নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, মেয়েদের অনেক-ই বিপদ। এই পৃথিবীর কোনো

পুরুষমানুষকেই বিশ্বাস না করতে বলেছিলেন। কাউকেই । এক নিজের বর ছাড়া, যখন বিয়ে হবে।

শিলি জিজ্ঞেস করেছিল, বাবাকে?

-না। বাবাকে, কাকাকে, কাউকেই না।

বড়ো ভয় করেছিল শিলির। এ কেমন বড়ো-হওয়া যে, বাবাকেও পর করে দেয়? সুন্দর এক আশ্চর্য রস-গন্ধ-স্বাদে ভরা পৃথিবী ছিল তার। বাঁশবাগানের আলোছায়ার খেলা ছিল। নদীতে সাঁতার কাটা ছিল, আকাশ পরিষ্কার থাকলে, যখন ভুটানের পাহাড় দেখা যেত উত্তরের আকাশে; হিমালয়, কখনো-কখনো কাঞ্চনজঙ্ঘাও, সোনার মতো ঝলমল করে উঠত সেই পাহাড়শ্রেণির চুড়ো। শরতের মেঘের মধ্যে, আগুন লেগে গেছে বলে মনে হত তখন। দাঁড়িয়ে থাকত, খোলামাঠে তার খেলার সাথি কুমারের হাতে হাত রেখে। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে।

চলে গেল সেইসব দিন। কেমন হঠাৎ। বড়ো হঠাৎ-ই চলে গেল ছেলেবেলাটুকু। বৃষ্টি মাথায় করে কদমতলায় রাধাকৃষ্ণ খেলা। তাও চলে গেল।

মেয়েদের শরীর যে, মেয়েদের এতবড়ো শত্রু, তা মোটে বারোবছর বয়েসেই জানতে পেরে, বড়োই কষ্ট হয়েছিল শিলির। মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে, নিজেকে অভিশাপও দিয়েছিল বার বার। আশীর্বাদও মনে হয়,

মাঝে মাঝে এখন। অবিমিশ্র দুঃখ বা সুখ কোথাওই নেই, তা বুঝে।

এখন, এই ঘেরাটোপের জীবন-ই অভ্যেস হয়ে গেছে। মেনে নিয়েছে যে, মেয়েরা আলাদা সৃষ্টি বিধাতার। আলাদা জাত। ছোটোজাত। পুরুষের কৃপাধন্য তারা।

বাবার জ্বরটা লিখে রেখে দিল স্লেটে।

তারপর বাবাকে বলে চান করতে গেল, ইন্দারার পাড়ে।

ক্যাবলাটার বয়স হবে পনেরো-ষোলো। ও এই সময় থাকে না। একদিন চান করার সময় শিলি হঠাৎ-ই দেখেছিল যে, ইঁদারার পেছন দিকের মানকচুর ঝোঁপের মধ্যে লুকিয়ে, ক্যাবলা চান দেখছে শিলির। ভেজা কাপড় জড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে গিয়ে এক থাপ্পড় মেরেছিল ওকে।

বলেছিল, চোখ গেলে দেব। বুঝেছিস!

তারপর থেকে ও ভালো হয়ে গেছে। ক্যাবলা বলেই হয়তো হয়েছে। চালাক হলে হত না।

চান করতে করতে শিলি ভাবছিল, ক্যাবলা তার চান করা দেখেছিল বলে তাকে চড় মেরেছিল ও। অথচ এমনও কেউ আছে, যাকে সবকিছুই দেখানোর জন্য সে উন্মুখ। অথচ তার-ই কোনো সাড়া নেই।

কী আশ্চর্য! কেন যে, এমন হয়!

মনে আজকাল ভয়ও হয় শিলির। পুতনের ব্যবহারে। পুতনের বয়স হবে ছাব্বিশ-সাতাশ। শিলির বাইশ। এত বয়েসি কুমারী মেয়ে এখন আর এখানে নেই। না, একজনও নয়।

বিয়ে অবশ্যই কাল-ই হতে পারে।

গদাইদের অবস্থা ভালো, আলোকঝারি পাহাড়ের নীচে অনেক ধানজমি। কাঠের ব্যাবসা। ধুবড়িতে তার বাবার কয়লার দোকানও আছে। বড়োদাদা স্টিমার কোম্পানিতে সাপ্লায়ার। ধুবড়িতে। মেজদাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির। গদাই, ছোটোছেলে। চাষ-বাস দেখাশোনা করে। শরীর, স্বাস্থ্য ভালোই। নাক থ্যাবড়া। গা দিয়ে একটা অদ্ভুত গন্ধ। নাদু ময়রার গায়ে যেমন ছানাছানা, চিনির শিরাশিরা গন্ধ, তেমন-ই মাটি-মাটি গন্ধ।

বর হিসেবে ওকে ভাবাই যায় না। কখনোই না। লেখাপড়াও করেছে মাত্র পাঠশালা অবধি। অথচ শিলির বাবার খুব-ই ইচ্ছে। শুধুমাত্র গদাইদের অবস্থা ভালো বলেই। গলায় কলসি বেঁধে নদীতে ডুবে মরতে ইচ্ছে করে মাঝে মাঝে শিলির। বেঁচে আছে ও শুধুই তার পুতনদার-ই আশায়, পুতনদার-ই জন্যে।

আগে, সপ্তাহে অন্তত একটি করে চিঠি লিখত পুতনদা। ফটোও পাঠিয়েছিল গতবছরে। সাইকেলে হেলান দিয়ে কালোডোরা ফুলশার্ট আর

প্যান্ট পরে চা-বাগানে তার অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পুতনদা। ধবধবে রং। মুখটা গোলগাল। কিন্তু খুব মিষ্টি। কত সব খবর দিত সে তখন, প্রত্যেক চিঠিতে। বারো বছর বয়সে যে-জগৎকে হারিয়েছিল শিলি, পুতনের চিঠির মাধ্যমে সেই জগৎকেই ফিরে পেয়েছিল আবার।

পুতনকে শিলিগুড়িতেও যেতে হত মাঝে মাঝে। অন্য সব বাগানেও বকেয়া পাওনা উশুল করতে যেতে হত।

ও লিখত, আজ বাগরাকোটের সাহেব ম্যানেজার ডোনাল্ড ম্যাকেঞ্জি সাহেব আর তার বউ, বেটি ম্যাকেঞ্জিকে দেখলাম। আহা! দেখে মনে হয় যেন ইংরেজি বায়োস্কোপ দেখছি। কী সুন্দর যে, সাহেব-মেম! নিজে চোখে না দেখলে বিশ্বেস-ই হত না।

একদিন লিখল, তিস্তার চ্যাংমারীর চরে নতুন করে চাষের বন্দোবস্ত হচ্ছে। রিক্ল্যামেশন হচ্ছে চর। এই চরের ঘাস পরিষ্কার করে চাষাবাদ হবে ভবিষ্যতে। তিস্তার সব চরেই চা বাগানের ম্যানেজারেরা বাঘশিকারে যেতেন। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হাতি, পুলিশের হাতি সব এসে নাকি জমায়েত হত। উত্তর বাংলার কমিশনার আইভ্যান সুরিটা, ডি-আই-জি রঞ্জিত গুপ্ত, চিফ সেক্রেটারি রণজিৎ রায়, শিলিগুড়ির দুর্গা রায় আরও কত সব লোকের কথা লিখত পুতনদা। লিখত, জলপাইগুড়ির রানির কথা। রানি অশ্রুমতী দেবী-রায়কতদের রানি। তাঁর একমাত্র মেয়ে, রাজকুমারী প্রতিভা দেবী। তাঁর সঙ্গে নাকি বিয়ে হয়েছিল কমিউনিস্ট

নেতা জ্যোতি বসুর দাদা ডাক্তার কিরণ বসুর। জ্যোতি বসুর ডাকনাম যে, গণা, তাও পুতনদার চিঠিতেই ও তখন জানতে পারে।

জলপাইগুড়ির রাজবাড়িতে একজোড়া সাপ ছিল, বিখ্যাত। সে সাপেরা ছিল বাস্তুসাপ। কারওকে কিছু বলত না নাকি!

পুতনদা বছরখানেক হল চিঠি দেওয়া একেবারেই কমিয়ে দিয়েছে। মাসে একটা লিখত ছ মাস আগে। তারপর দু-মাসে একটা।

শেষ চিঠি পেয়েছে ছ-মাস আগে। এবারে হয়তো বছরে একটা লিখবে। তারপরে থেমে যাবে চিঠি আসা, একেবারেই।

মাসিমা কিরণশশীর কাছে শুনেছে শিলি যে, পুতনদার কুমারগঞ্জে আসার আর দেরি নেই। সঙ্গে করে নাকি বাগানের ম্যানেজারের কাছে বেড়াতে আসা ম্যানেজারের শালার ছেলেকে নিয়ে আসছে। কলকাতার ছেলে। গ্রাম নাকি দেখেনি সে আগে। তাই-ই আসছে পুতনদার সঙ্গে। ছেলেটি নাকি পুতনদার-ই সমবয়েসি, যেমন লিখেছে মাসিমাকে, পুতনদা। ভালো কাজ করে নাকি কোনো বিলিতি কোম্পানিতে। ভালো মানে, উঁচুদরের কেরানি। পুতনদা নাকি দুঃখ করে লিখেছে, ম্যানেজারের শালার ছেলে মানে, ম্যানেজার-ই। তাকে খাতির-যত্ন করে খুশি রাখতেই এবারের ছুটিটা কেটে যাবে। যদি-না সে আগেই ফিরে যেতে চায় কুমারগঞ্জ থেকে। তার চাকরিটা শখের। অঢেল পয়সা। বনেদি পরিবার।

তবে শিলিকে লেখেনি কিছুই। যা লেখার তা সব-ই মাসিমাকে লিখেছে। তাই খুব-ই অভিমান হয়েছে শিলির। ভয়ও যে হয়নি, তাও নয়। নানারকম ভয়েই বড়ো বিষণ্ণ হয়ে আছে। ও, ক-দিন হল। সবসময়ই বুক দুরদুর করে।

চা-বাগানে কি অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে ভাব হল পুতনদার? একটা চা-বাগানে নিশ্চয়ই অনেক বাঙালি কর্মচারী থাকেন। বিশেষ করে, বাগানের মালিক যখন বাঙালিই। তাঁদের সব বাড়িতে কি শিলির চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো একটি মেয়ে নেই? না থাকলেও, তাদের কত শালি-টালিরাও আসতে পারেন তো বেড়াতে। কে জানে, কী হল? কেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেল পুতনদা?

খুব-ই রাগ হয় শিলির, সেইসব অদেখা মেয়েদের ওপরে। তাদের তো কতই আছে বাছাবাছির। শিলি যে, ইন্দারার ব্যাং। ওর যে, পুতনদা ছাড়া আর কেউই নেই এই জগতে। সেই শিশুকালের সাথি। সুখ-দুঃখের মধ্যে বেড়ে উঠেছে দু-জনে। একসঙ্গে। একই ধরনের বোঝাবুঝি, সমঝোতাও গড়ে উঠেছে দু-জনের মধ্যে।

তবে, সত্যি কথা বলতে কী, এই পুতনদা যে, তার মনের আদর্শ পুরুষ, তা আদৌ নয়। তবে, পুতনদা ছাড়া আর অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগও তার আসেনি। বাছাবাছির সুযোগ না থাকাতে, যা হাতের কাছে থাকে, তাকেই ভালো লাগাতে হয়। দেখতে দেখতে,

একসময় ভালো লেগেই যায়। বার বার মনোযোগ দিয়ে কোনো গাছের দিকে তাকালেও তাকে ভালোবেসে ফেলে মানুষ; মানুষকে তো বাসতেই পারে। বাসেই!

আদর্শ পুরুষ বলতে সে নিজে যা বোঝে তেমন মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে কোনোদিনও হবে না। কোনো মেয়ের-ই জীবনের আদর্শ পুরুষের সঙ্গেই বিয়ে কখনোই হয় না তার, আর যা-কিছুই হোক-না-কেন। হয়তো, না হওয়াই ভালো। একঘরের মধ্যে খুব-ই কাছাকাছি থেকে, দিনের পর দিন দেখলে, সব আদর্শের-ই রং চটে যায়। জেল্লা ম্যাটম্যাট করে। আদর্শ ব্যাপারটার মধ্যেই বোধ হয় দূরত্বের আর যাত্রার গন্ধ আছে একটু। ওসব দূরে রাখাই ভালো। শিলির আদর্শ পুরুষের কাছাকাছি মাত্র একজনকেই দেখেছিল সে, তামাহাটে।

মিত্তিরদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল সেই ছেলেটি, কলকাতা থেকে। মাসখানেকের জন্যে। সেখানেই দেখা হত। সে বাড়িতে দেখা হত, যখন শিলি যেত তামাহাটে। আবার সাইকেল নিয়ে সেও এই কুমারগঞ্জে চলে আসত, তামাহাট থেকে। শিলি ভেবেই আনন্দ পেত যে, সে আসত, হয়তো শিলিকে শুধু একবার দেখতেই। হয়তো সত্যিই তাই আসত। কলকাতার কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ত সে। কলেজের নামটা ভুলে গেছে শিলি।

ছেলেটির গায়ের রং ছিল মাজা। কিন্তু খুব লম্বা। মাথা-ভরতি চুল, সুন্দর,

শক্ত চেহারা। ধবধবে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরত, নয়তো হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট। তাও সাদা। ছেলেটির মধ্যে শুধু শিক্ষাই ছিল না, সহবত সম্ভ্রান্ততা সব-ই ছিল। বড়োঘরের ছেলে বলতে শিলির মা চিরদিন যা বোঝাতেন, তার সবই ছিল সেই হিতেন বোস-এর মধ্যে। শিলির জ্ঞাতি সম্পর্কে কাকা হত তাই হিতুকাকু বলে সম্বোধন করত শিলি তাকে। একটা পুরো মাস, বর্ষায় চ্যাগারের পাশের গাছের গন্ধরাজ ফুলের গন্ধর-ই মতো তাকে আমোদিত, আনন্দিত, শিহরিত করে রেখে, হিতেন ফিরে গেছিল কলকাতায়।

যখন ছিল এখানে, তখন আলোকঝারি পাহাড়ে শিলি তার সঙ্গে সাতবোশেখির মেলায় গেছিল। শিকারের শখও ছিল ছেলেটির। ধুবড়ির পূর্ণবাবুর দোনলা বন্দুক চেয়ে নিয়ে এসেছিল সে। শিলির মারকুইট্টা কাকার সঙ্গে, পর্বতজুয়ারে চিতাবাঘ আর শুয়োরের খোঁজে যেত হিতেন। ওসব একদিনও পায়নি। ফিরে আসত প্রায়-ই সোনালি বনমোরগ সাইকেলে বেঁধে। অবশ্য লালচে কুটরা হরিণ মেরেছিল একদিন। কাকা আর হিতুকাকু দু-জনে মিলে কষ্টে-সৃষ্টে টুঙ বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে এনেছিল কুটরা হরিণটাকে।

রক্তারক্তি, মারামারি শিলি যে, পছন্দ করে না, একথা বলার পরদিন থেকেই হিতুকাকু বলেছিল, যে-ক-দিন এখানে আছি শিলি, আর কিছুই শিকার করব না; হিংস্র কিছু ছাড়া।

হিংস্র কিছু মানে? কী কী?

–বাঘ, ভাল্লুক, চিতাবাঘ, বিষাক্ত সাপ, আর এই ধরো তোমার মতন সুন্দরী মিষ্টি-হাসির কোনো মেয়ে!

-আহা!

বলেছিল, শিলি।

লজ্জাতে শিলির গাল লাল হয়ে গেছিল।

তারপরে হিতুকাকু চলে গেলে, দেওয়ালের আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল শিলি এসে। পড়ন্ত বেলায় নরম কমলা রোদ, কালোজাম গাছের পাতার ঝালরের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছিল। ঘরময়। শিলির চুলে, মুখে। কমলার সঙ্গে বেগুনি আভা মিশে গেছিল যেন সেই আলোয়।

কালোজামের পাতারাও কি বেগুনি হয়? আলোমাখা কালোজামের পাতাদের দিকে চেয়ে ভেবেছিল ও।

কী বা আছে তার? ভেবেছিল, শিলি। জোড়া ভুরু, কুচকুচে কালো রং। নাকটি অবশ্য বেশ টিকালো, চোখ দুটি বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো চোখের পাতা আর পল্লব। দাঁতগুলোও খুব

একটা খারাপ নয়। মন্দ কী?

নিজেকেই নিজে বলেছিল শিলি। শিলির মা বলতেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড়ো প্রসাধন হচ্ছে দুটি। একটা হল যৌবন। অন্যটি বুদ্ধি। যৌবন চলে গেলে, যতই সাজো লাভ নেই। যৌবনের দীপ্তিটাই আলাদা। আর বুদ্ধি না থাকলে, গায়ের ধবধবে রং, স্নো, পাউডার, রুজ কিছুতেই তার অভাব ঢাকা পড়ে না। প্রত্যেক মেয়েকেই যৌবন এক আলাদা শ্রী দেয়, দীপ্তি দেয়। যৌবনে কুকুরিকেও সুন্দরী দেখায়।

কে জানে! হিতুকাকু কী দেখেছিল তার মধ্যে।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে এই গেঁয়ো শিলির দু-চোখে তাকিয়ে থাকত। অসভ্যর মতন নয়। দারুণ এক দৃষ্টিতে, বোধ হয় কবি-টবিরা এমন চোখে তাকান, যাঁদের নিয়ে তাঁরা কবিতা লেখেন, তাঁদের দিকে। গা শিরশির করে উঠত শিলির। হিতুকাকুর সেই চাউনি যেন, তার আপাদমস্তক লেহন করত কিন্তু তাতে কোনো অশালীনতা ছিল না, নোংরামি ছিল না। হিতুকাকু মানুষটার মধ্যে কোনোরকম নোংরামিই দেখেনি শিলি। এমন পুরুষ জীবনে কম-ই দেখেছে।

চলে যাওয়ার সময় শিলির একটা ফোটো চেয়েছিল হিতুকাকু। সম্প্রতি তোলা ফোটো নেই শুনে, তামাহাটের পিন্টুদাদের বাড়ি থেকে ক্যামেরা ধার করে এনে, আদর করে শিলির ফোটো তুলেছিল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তাকে সেই ফোটো আর একটি সুন্দর চিঠি পাঠিয়েছিল হিতুকাকু। এমন সুন্দর কাগজে, এমন সুন্দর ভাষায়, অমন নরম, ভদ্র ভালোবাসার

চিঠি যে, কেউ লিখতে পারে তা ওই চিঠি না পেলে জানতেও পেত না। একটি চিঠি যে, রুখু মনের মধ্যেও সব ফুলগুলি কীভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারে, তা হিতুকাকুর চিঠি না পেলে সত্যিই জানত না কখনো শিলি।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিলি, ঘাড়ে আর পিঠে সাবান মাখতে মাখতে, স্নান করতে করতে।

মা চলে যাওয়ার পর, এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো মেয়ে নেই বলে, কতদিন যে, পিঠে ভালো করে সাবান দিতে পারে না। একদিন ও-বাড়িতে গিয়ে হোন্দলের মাকে দিয়ে পিঠ ঘষাবে ঠিক করল।

হিতুকাকু এখন বম্বেতে বড়ো চাকরি করে নাকি। বিয়েও করেছে গতবছর। ছেলে-মেয়ে নাকি হয়নি এখনও। হিতুকাকুর বউ-এর ছবি দেখতে খুব ইচ্ছে করে, শিলির। সে কি শিলির চেয়েও সুন্দরী? শুনেছে, খুব-ই সুন্দরী। শহরের সুন্দরী। বি. এ. পাশ। মোটরগাড়ি দিয়েছে নাকি মেয়ের বাবা হিতুকাকুকে, বিয়েতে। ছেলেগুলো বড়ো বোকা হয়। শিলিরও দেওয়ার অনেক কিছুই ছিল। বিয়ে করলে, তবেই না জানতে পেত হিতুকাকু। সেই শহুরে মেয়ে কি, তার মতো খেজুরে গুড়ের পায়েস রাঁধতে পারে? নতুন চালের পাগল-করা গন্ধের ফেনাভাত? বড়ো বড়ো কইমাছের হর-গৌরী? একপাশে–মিষ্টি, একপাশেঝাল? হিতুকাকুর বউ, বড়ো চিতল মাছের তেলঅলা পেটি কি রান্না করতে পারে শিলির মতো? কাঁচালঙ্কা, কালোজিরে ধনেপাতা দিয়ে? চিতলের মুইঠ্যা? মাঝারি শিঙি

মাছ দিয়ে কালোজিরে-কাঁচালঙ্কা-বেগুন আর পেঁয়াজ দিয়ে গা-মাখা চচ্চড়ি? ঝাল-ঝাল, ঝাঁঝ-ঝাঁঝ? গঙ্গাধর নদী ডুব-সাঁতারে এপার-ওপার করতে পারে কি? সেই বড়লোকের মেয়ে? গাছ কোমর করে শাড়ি পরে, সিঁদুরে-আমের গাছের মগডালে চড়ে আম পেড়ে খাওয়াতে পারে হিতুকাকুকে? চটের ওপর রঙিন মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধর নতুন পাট দিয়ে লিখতে পারে কি God is good অথবা Do not forget me? সে কি বিশ্বাস করে মনে-প্রাণে যে, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে? শিলিরও দেওয়ার অনেক কিছুই ছিল। সব দানের কথা আলোচনা করা যায় না। কিন্তু ছিল যে, তা শিলিই জানে। অনেক এবং অনেকরকম দান।

গা-মাথা মুছে ফেলল শিলি। বাবার বার্লিটা জ্বাল দিতে হবে। পিউরিটি বার্লি ছাড়া অন্য বার্লি আবার বাবার মুখে রোচে না। মা খেতে ভালোবাসতেন হান্টলি-পামারের বিস্কুট। দু একবার-ই খেয়েছিলেন অবশ্য। বাবা কাকে দিয়ে যেন আনিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে।

এসব ভেবে আর কী হবে? চলে-যাওয়া দিনের কথা। দূরে-থাকা আদর্শ পুরষের কথা ভেবে?

তবু, ভাবনা তো শুধু মানুষের-ই বিশেষ গুণ। ভগবানের বিশেষ দান। ভাবতে, সব জীব ই তো আর পারে না।

.

ম্যানেজারবাবুর বাংলোর বারান্দার সাদা রং-করা বেতের চেয়ারে বসে, কাঁচের টেবিলের ওপরে রাখা, সুন্দর দেখতে, বম্বের পেডার পটারির টি-পট থেকে ঢেলে চা দিচ্ছিল পুতনকে, ম্যানেজারবাবুর মেয়ে রুচি।

দার্জিলিং-এর লরেটো কলেজে পড়ে সে। কথায় কথায় কাঁধ-ঝাঁকিয়ে, ববকাট চুল উড়িয়ে, ইংরিজি বলে।

ঘোর লেগে যায় পুতনের। এ এক নতুন জগৎ!

উলটো দিকের চেয়ারে পুতন এবং রুচির কলকাতা থেকে আসা কাজিন, রাজেন বসে আছে।

কুমারগঞ্জ গ্রামের অতিসাধারণ অবস্থার ছেলে পুতন প্রথম প্রথম এমন পরিবেশে কুঁকড়েই থাকত। কী করবে, কী বলবে, বুঝে উঠতে পারত না। তার বাঙালত্ব নিয়ে বাগানের অনেকে তো বটেই এবং খাস কলকাতার ঘটি মানুষ ম্যানেজারবাবুও বেশ একটা ঠাট্টা-তামাশাও করতেন।

বাগানের মালিক এখন আর বাঙালি নেই। মাত্র তিনমাস আগে এক মারোয়াড়িকে দিয়েছেন আগের মালিক। সেই মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর ব্যাবসাও কলকাতাতেই। আগের মালিক কলকাতার বাঙালি ছিলেন বলেই কুলি-কামিনরা ছাড়া কলকাতার লোক-ই বেশি, এই বাগানে।

প্রথম প্রথম গেলুম, খেলুম, নুন, নঙ্কা, নুচি, নেবু এইসব শুনে ভিরমি খেত পুতন। কিন্তু বেশিদিন পতিত থাকার চরিত্র নিয়ে পুতন জন্মায়নি। কিছু মানুষ, পাটিগণিতের বইয়ের তৈলাক্ত বাঁশে-চড়া বাঁদরের মতো প্রচন্ড অধ্যবসায় নিয়েই জন্মায়। পুতন, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শ্রেণিতে পড়ে। যেহেতু ম্যানেজার এবং বাগানের অধিকাংশ অফিসার কলকাতার লোক, পুতন অচিরে শুধু তার বাঙালত্বই যে, বিসর্জন দিয়েছে তাই-ই নয়, তাদের সঙ্গে সমানে করলুম খেলুম, মলুম, শুলুমও করে যাচ্ছে। শেয়াল যেমন হালুম হুলুম ডাক ছাড়তে পেরে কখনো-সখনো শ্লাঘা বোধ করে যে, সে বাঘ হয়েছে; পুতনও তেমন খেলুম, শুলুম, নুন, নঙ্কা, নুচি-বলে বলে তার অকারণের হীনম্মন্যতাকে গলা টিপে মেরে ফেলে, খাস কলকাতার লোক হয়েছে ভাবতে লাগল।

এদিকে খাস কলকাতার লোকেরাও যে, আজকাল হুম হুম ছেড়ে, খেয়েছিলাম-এ ফিরে আসছেন গেসলুম ছেড়ে গেছিলাম-এ সেটা নকল করার মতো বিদ্যেবুদ্ধি পুতনের ছিল না। অনুকরণের বিদ্যে অনেক সহজ, ওরিজিনালিটির শিক্ষা তা নয়। প্রোটোটাইপ সহজে হওয়া যায়, ওরিজিনাল ওরিজিনাল হতে পারেন। তাকে নিয়ে খাস কলকাতার লোক এবং খাস পূর্ববাংলার মানুষেরা সকলেই যে, একইসঙ্গে সমানে হাসাহাসি করে, সে-কথা বোঝার মতন বুদ্ধি পুতনের ছিল না। বুদ্ধি পুতনের কোনোদিন-ই বিশেষ ছিল না। অধিকাংশ মানুষ দুর্বুদ্ধি আর সুবুদ্ধির মধ্যে যে-তফাত আছে, তা কোনোদিনও নিজেরা পুরোপুরি বোঝে না। তাদের

জাগতিক উন্নতির জন্যে, যেকোনো ফলপ্রসূ বুদ্ধিকেই তারা সুবুদ্ধি বলে মনে করে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পুতন সেই, গরিষ্ঠদের জনগণের দলে।

রুচির পোশাকআশাক, জামাকাপড়, হাসি, সব-ই ঘোর লাগায় পুতনের মনে। তবে ও বোঝে যে, রুচির দিকে হাত বাড়ালে তার হাতটাই যাবে কাটা। তা ছাড়া মালিকানা বদলের পর ম্যানেজারবাবুর মাথাটাও যে ধড়ের ওপরে বেশিদিন হয়তো নাও থাকতে পারে, এ জ্ঞানটাও পুতনের ছিল না। এই সময়ই কলেজের ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে রুচির এক মামাতো বোনও এসেছে এখানে বেড়াতে। ওদের বাড়ি বর্ধমানের কোনো গ্রামে। মেয়েটির মাজা রং, গালে একটি কাটা দাগ। গ্রামের মেয়ে হলেও বুদ্ধি যে, সে রাখে তীক্ষ্ণ, তা দেখলেই বোঝা যায়। কিন্তু তার পোশাক-আশাক এবং আড়ষ্টতা দেখে মনে হয় যে, তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, এবং রুচিদের কৃপাপ্রার্থী তারা। সবসময়েই সে, এই পরিবারের মন জুগিয়ে চলে। নানা ব্যাপারেই পুতন, রুচির সঙ্গে সেই মেয়েটির এই তারতম্য লক্ষ করে। খাওয়ার সময়ে খাওয়ার টেবিলে বসে ম্যানেজারবাবু এবং রুচি এবং রুচির ছোটোমামা রাজেন এমনকী রুচির মা এবং ছোটোভাইও একইসঙ্গে খেতেন। তাঁদের খাওয়া-দাওয়া দেখাশোনা করত, সেই মেয়েটিই। অলকা তার নাম।

রুচির মা একদিন বলেছিলেন, অলকাকেই; অলি আমাদের খুব-ই কাজের মেয়ে। এই ক-দিন একটু যত্ন-আত্তি করত মা আমাদের।

অলি খেতে বসত, বাড়িসুদ্ধ সকলের খাওয়ার পর বাবুর্চিখানার মেঝেতে। কোনোদিন বা একটা টুলের ওপর বসে, কোলের ওপরে অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে সে খেত। প্রায় বাবুর্চি-বেয়ারাদের মতো। লক্ষ করেছিল পুতন। অন্যরা খাওয়া-দাওয়ার পর খাটে শুয়ে বা চওড়া বারান্দায় বসে যখন নভেল পড়তেন বা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাতেন অথবা ছায়াচ্ছন্ন পাখিডাকা বাগানে দোলনা চড়তেন, তখন অলি আচার আর পাঁপড় বানিয়ে উবু হয়ে বসে, ঘুরে ঘুরে শুকোতে দিত বাগানের-ই এককোনায়।

অলিকে দেখে পুতনের দুটো জিনিস মনে হত। প্রথমত, অনেক-ই দিক দিয়ে অলকা পুতনের শ্রেণির। যদিও অমিলও ছিল অনেক। তাকে বিয়ে করতে যদি পারে পুতন, তাহলে পুতন এক নতুন জাতে উঠবে। এই চা-বাগানে বাঙাল বলে তার যে-হেনস্থা, তা ঘুচবে।

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়াকে বিয়ে করায় তার উন্নতি অনিবার্য। গরিব আত্মীয়দের সচরাচর বড়োলোকেরা এড়িয়েই চলেন। কিন্তু যে-আত্মীয় চোখের সামনে জলজ্যান্ত থাকে তাকে একটু মর্যাদা নিজেদের খাতিরেই দিতে হয়। অন্যকিছু না হলেও, লোকভয়ের-ই কারণে। তা ছাড়া, প্রায় মরে-যাওয়া বিবেকও হঠাৎ হঠাৎ জেগে উঠে মৃগী রোগীর মতো খিচুনি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়তে থাকে বলেও।

শিলির কথাও মনে যে, পড়ে না পুতনের তা নয়। কিন্তু তাকে সে বিয়ে আদৌ করবে না। করা সম্ভব নয়। বিয়ের সঙ্গে প্রত্যেক বুদ্ধিমান,

প্র্যাকটিক্যাল পুরুষ ও নারীর সমস্তটুকু ভবিষ্যৎ জড়িত। যে-মূর্খরা একথা না বোঝে তাদের কপালে দুঃখ অবধারিত। এবং তা খন্ডাতে পারে, এমন কেউই নেই। স্বয়ং ভগবানও না।

অনেক-ই ভেবে দেখেছে পুতন। শিলিকে বিয়ে করলে, শিলির বাবার দায়িত্বও পুতনকে নিতে হবে। তার নিজের মায়ের দায়িত্ব তো আছেই তার ওপরে।

রুচির ছোটোমামা রাজেন ছেলেটা যদিও তার সমবয়সি, কিন্তু একটু অদ্ভুত ধরনের। পুতনের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ হতেই এবং ওকে একা পেতেই বার বার বলেছে, কী গুরু! চা বাগানে এলুম, দু-টি পাতা একটি কুঁড়ির জায়গাতে, দু-একটি কুঁড়ি-ফুড়ি একটু দেখাও। কুঁড়ি ফুটিয়ে ফুল করি। যেমন শুকনো পাতা ফুটিয়ে চা করি। নানারকম আদিবাসী কামিন-টামিন...

প্রথম প্রথম বুঝতে পারেনি গাঁয়ের সরল ছেলে পুতন, কথাটা। কারণ পুতনের ওসব দিকে কোনো উৎসাহ-ই ছিল না। কুলি-লাইনের কোন কোন ঘরে, কেমন মেয়ে আছে এবং কোন কোন কামিনেরা পয়সার বিনিময়ে দেহ দেয়, তা সে জানত না। জানার কোনো ঔৎসুক্যও ছিল না। তবে, কেউ কেউ যে দেয়, তা সে অফিসের বাবুদের কানাঘুসোয় শুনতে পেত।

ম্যানেজারবাবুর বাড়িতেই একটি মেয়ে কাজ করে। সে মেয়েটি নাকি ম্যানেজারবাবুর-ই রক্ষিতা। দারুণ দেখতে কিন্তু মেয়েটি। বছর কুড়ি বয়স হবে। কাটা-কাটা চোখ-মুখ, তেমন-ই শরীর, বেশ লম্বা, কোমর অবধি চুল।

ম্যানেজার সাহেবের বউ, বর্ষার সময় যখন কলকাতায় যান বাপের বাড়ি, একেবারে পুজো কাটিয়ে আসবেন বলে, তখন সেই মেয়েটিই নাকি ম্যানেজারবাবুর স্ত্রী হয় রাতে।

পুতন অবশ্য সহজেই বাগানের অন্য কারও সাহায্যে কলকাতার রাজেনবাবুর জন্যে বন্দোবস্ত করতে পারত। কিন্তু তাহলে রাজেন যে, তার হাত ছেড়ে দিয়ে অন্যের খপ্পরে গিয়ে পড়ত। রাজেনকে হাতছাড়া করে এমন বোকা পুতন নয়। রাজেন-ই এখন ম্যানেজারবাবুর বাড়ির সঙ্গে পুতনের একমাত্র সেতু। সেতু ভেঙে যাক, তা সে চায় না।

কী ভেবে, পুতন হঠাৎ একদিন রাজেনকে আশ্বস্ত করে বলেই ফেলল যে, আজকাল নানারকম প্রবলেম বাগানে। পলিটিক্যাল পার্টি-ফার্টি আছে। তিলকে তাল করে এরা। কামিনদের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয়েছে। আগেকার দিনের মতন কোনো শালার জোতদারি নয় তারা। তা ছাড়া, কোনোরকমে জানাজানি হলে ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত বিপদে পড়বেন। সবচেয়ে আগে চাকরিটা যাবে তাঁর-ই। এখানে কিছু হবে না। তার চেয়ে চলো আমার সঙ্গে, আমাদের দেশের বাড়িতেই বরং। আমার হাতেই

আছে একটি। আমি যা বলব, তাই-ই সে করবে। আ বার্ড ইন হ্যাঁণ্ড ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু টু, ইন দ্যা বুশ।

–জিনিস কেমন?

রাজেন ভুরু তুলে, সিগারেটে টান দিয়ে, লাল-লাল চোখ নাচিয়ে বলেছিল।

–কেমন আর! গেঁয়ো জিনিস যেমন হয়। তেমন আর কী। তবে...ভালো।

–আনটাচড তো?

–এক্কেবারে। সেটুকু বলতে পারি। গ্যারান্টি।

–গুরু, তুমি নিজে? নিজেও কি দু-একটি পাঁপড়ি ছেঁড়োনি?

–ছিঃ?

বলেছিল, পুতন। হঠাৎ-বিবেকের কামড় খেয়ে। বিবেক হচ্ছে, বিছের মতন জিনিস। কোথায় যে, কোন চিপুতে লুকিয়ে থাকে, আর কখন যে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কামড় দেয় মানুষকে, তা যারা বিবেক অথবা বিছে এ দুয়ের একটিকেও জানে; তারাই জানে!

পুতনের দু-কান গরম, লাল হয়ে ঝাঁ ঝাঁ করছিল।

একথা ঠিক যে, পুতন ছেলেটার স্বচ্ছল জীবনের প্রতি বড়োলোভ। শিশুকাল থেকে। অর্থাভাবের জন্য বহুরকম কষ্ট ও অসম্মানকে সে জেনেছিল। তবু এখনও তেমন অন্যায় কিছু করেনি, সেই লোভের বশবর্তী হয়ে। খারাপ হয়নি এখনও। জানে না, কোনোদিনও খারাপ হবে কি না। তবে খারাপ হতেও যে, ভালো হওয়ার চেয়ে কম কষ্ট হয় না; এই খারাপ কথাটা রাজেনকে বলে ফেলেই ও বুঝতে পারল। বুঝল পুতন, বি-কম-এ ফাস্ট ক্লাস পাওয়াটা যেমন কষ্টের, শিলিকে তার নিজের উন্নতির জন্যে রাজেনের ভোগে লাগতে দেওয়াও তার চেয়েও অনেক-ই বেশি কষ্টের। এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই বড়োকষ্টের। যে, যেমন করেই বাঁচুক-না-কেন।

পুতনের ছি : শুনেই, খুব জোরে হেসে উঠেছিল রাজেন।

তারপর ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে ওর থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল মা-ন-তু।

–আমি ওসব লাইনেই নেই।

পুতন বলেছিল। রেগে।

আবারও বলেছিল, রাজেন।

-মা-ন-তু!

বলে, আবারও পুতনের থুতনি নেড়ে দিয়েছিল জোরে। বলেছিল, নেকুপুষুমুনু আমার।

পুতন মোটেই দুশ্চরিত্র নয়। কখনোই কোনো মেয়ের সঙ্গে ও কিছুমাত্রই করেনি। গতবার যখন দেশে গেছিল, তখন এক দুপুরবেলায় শিলিকে আমবাগানের ছায়ায় একটা চুমু খেয়েছিল শুধু। তাও, জোর করে, ওকে গাছে চেপে ধরে। উ-উ-উ-উমম করে আপত্তি জানিয়েছিল শিলি। কিন্তু পুতন বুঝেছিল যে, ভালো লেগেছিল শিলির। কোনো মেয়েকে আদর করতে গায়ের জোরের চেয়ে ভালোবাসাই যে, অনেক বেশি লাগে, তা সেই দুপুরেই প্রথম জেনেছিল ও। উত্তেজনা, পুতনেরও কম হয়নি। সমস্ত শরীরে কত যে, নাম-না-জানা অনুভূতি আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল ঝড়ের দোলালাগা ফুলের-ই মতন, তা কী বলবে। নারীশরীরের ওই অদেখা-অজানা-অসীম রহস্যের আভাস পেয়েই উত্তেজনায় কেঁপেছিল। ভেবেছিল, একটি চুমুতেই যদি এত উত্তেজনা, তবে আরও বেশিকিছু হলে হয়তো উত্তেজনাতে মরেই যাবে। ভালোলাগাটা এতই বেশিভালো যে, খারাপ লেগেছিল ওর। ভেবেছিল পুতন, সমস্ত ভালো জিনিস-ই, অথবা নেশার জিনিস-ই, প্রথম প্রথম বোধ হয় খারাপ লাগে। মদের-ই মতো।

চাকরিতে উন্নতি করতে হলে, একটু মদ-টদও নাকি খেতেই হয়। ম্যানেজারবাবু নিজেই বলেছিলেন একদিন।

বাগানের মালিক যদিও মারোয়াড়ি, তাঁর শখের অভাব নেই। সবরকম

সাহেবিয়ানাতেই তিনি পোক্ত হয়ে উঠেছেন। ইংরিজি উচ্চারণটা যদিও পুতনের চেয়েও খারাপ। তাতে কী এসে যায়? মালিকেরা খোদার সৃষ্ট অন্য গ্রহের জীব। তাঁদের কোনো গুনাহ নেই। তাঁরা যাই করুন-না-কেন, বেহেস্ত-এর দরজা তাঁদের জন্যে সবসময়ই খোলা। মালিকের কাজ করতে হল, উন্নতি করতে হলে, মালিকের গু-কেও সুগন্ধি বলতে হয়।

লোকে বলে, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে মালিকের বন্দোবস্ত আছে। ম্যানেজারবাবুর বাংলোর ওই মেয়েটিকে ডিরেক্টরস বাংলোতে ডিউটিতে যেতে হয়, মালিক এলেই।

ব্যবসাদার মাড়োয়ারিরা শুধু কাজ আর টাকা-পাগলা বলেই জানত এতদিন পুতন। এমন গুণী মাড়োয়ারির কথা, সে আগে শোনেনি। আজকাল নাকি গুণীদের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, বিশেষ করে কমবয়েসিদের মধ্যে। একথাও শুনতে পায় অনেকেরই কাছে।

পুতন ঠিক করেছে শিলিকে ও তুলে দেবে রাজেনের-ই হাতে। একদিনের জন্যে বই তো নয়, তুলে দেবে হুলোবেড়ালের মতন কলকাতার রাজেনের মুখে; অনভিজ্ঞ, বিন্দুমাত্র সন্দেহহীন শিলিকে, কালো, নরম কবুতরীর মতো। কালো কবুতরীরও ভেতরের দিকে তো সাদা পালক থাকেই। নরম, মসৃণ সেইসব পালক রাজেন ছিন্নভিন্ন করবে, একথা কল্পনা করেই পুতনের মনেই একধরনের তীব্র বিকৃত আনন্দ হচ্ছিল।

শিলির বাবা নরেশবাবু যদি জানতে পারেন? জানলেও কী? কিন্তু পরেশকাকু? সে জানলে, কী করবে কিছুই ঠিক নেই। অ্যালফাম্যাক্স এল. জি. দিয়ে, ধুনে দেবে হয়তো পুতন আর রাজেনকে। নরেশকাকু করতে পারে না, এমন কাজ নেই। ভালো কাজ। আর সঙ্গে আবু ছাত্তার থাকলে তো কথাই নেই। সোনায় সোহাগা।

রাজেন অবশ্য পুতনকে বলেছে, চিন্তার কিছু নেই গুরু; পেট করে দেব না। অমন কাঁচামাল আমি নই। সোনাগাছির রেগুলার খদ্দের আমি। তাইতো মাঝে মাঝে তামাগাছি, রুপোগাছি, পেতলগাছি, দেখতে একটু ভালো লাগে। আমার সঙ্গে কনট্রাসেপটিভ থাকে সবসময়ই। ডাক্তারের ব্যাগে, যেমন রুগির জন্যে কোরামিন ইঞ্জেকশন থাকে। কখন কোথায় যে, দরকার হয়, কে বলতে পারে? বলো, গুরু? সবসময় প্রিপেয়ার্ড থাকতে হয়। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন। কে বলেছিল জান কি?

কে?

–নাই বা জানলে।

–সীতার বাপের নাম জান কি?

পুতন চুপ করে থাকল। মানা করা সত্ত্বেও রাজেন কোয়ার্টারে বসে বেশি মাল খেয়ে ফেলেছে। ওটার নাম ভুটান অরেঞ্জ। ভুটানি হুইস্কি। এসব কি

আলু-পোস্ত খাওয়া উত্তর কলকাতার শৌখিন লিভারে নেয়? ঠেলাটা বোঝো এবার। ভুটান-অরেঞ্জ এসেছে ফুন্টসোলিং থেকে।

পুতন ভাবে, এসব গর্ভ-টর্ভর ঝামেলা না হলেই হল। চুরিবিদ্যা বড়ো বিদ্যা, যদি না পড়ো ধরা। রাজেন তাকে একদিনে অনেক-ই শিখিয়েছে। রোজ সন্ধেবেলা মংলুকে দিয়ে দিশি মদ আনিয়ে খাচ্ছে পুনের কোয়ার্টারে বসে, দু-জনে।

আজকের ভুটান অরেঞ্জ-ই গোলটা বাধাল।

সিগারেটে বড়ো বড়ো টান দিতে দিতে রাজেন বলেছিল, ছাড়ো তো গুরু। ছাড়ো, ছাড়ো! আমার হাতে নতুন পাখি পড়লে এমন বুলি শেখাব না, যে, বাকিজীবন শুধু এছাদ-ওছাদ, ওডাল-সেডাল করে উড়ে বেড়াবে, খুঁটে খাবে। সে পাখি আর কোনো ছা-পোষা কেরানির ঘরে পোষ-ই মানবে না।

খারাপ যে লাগে, তাও নয়। যদিও এক নিষিদ্ধ, অনাঘ্রাত, অদেখা-অজানা জগৎ তার চোখের সামনে দিয়ে শীতের দুপুরের মন্থরগতি দাঁরাশ সাপের মতোই যেন ধীরে ধীরে চলে যায়, জলপাই গাছের ছায়ায় ছায়ায়।

পুতন, ম্যানেজারবাবুর বাংলো থেকে নিজের কোয়ার্টারের দিকে ফিরে যেতে যেতে ভাবছিল এতসব কথা। বাগানের চা-গাছে ছায়া-দেওয়া, বড়ো বড়ো রেইনট্রির মতন গাছগুলোর ছায়া নেমেছে, ঘন হয়ে। কী নাম গাছগুলোর? কে জানে! দূরে, তিস্তার ফিকে গেরুয়া চর দেখা যাচ্ছে। তার

ওপাশে তরাই-এর জঙ্গলের রোমশ বাইসনদের প্রকান্ড এক দলের মতো হিমালয় পর্বতশ্রেণি কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে আদিগন্ত ছড়িয়ে আছে। বেলা পড়ে আসছে। পাখিরা ঘরে ফিরছে। দু-টি বড়ো ধনেশ হাওয়ায় ডানা-ভাসিয়ে দিয়ে সূর্যের দিকে চলেছে, নিষ্কম্প। গ্লাইডিং করে।

ভালো যেমন লাগে, আবার মনটা খারাপও যে, লাগে না, তাও নয়।

শিলি মেয়েটা পুতনকে সত্যিই ভালোবাসত। সবচেয়ে বড়োকথা, পুতনের মা কিরণশশী, শিলিকে খুবই ভালোবাসেন। মায়ের খুব-ই ইচ্ছে যে, সে বিয়ে করে শিলিকে।

কিন্তু মা কী জানেন? কী জানেন মা? কতটুকু জানেন এই পৃথিবীর? এই ব্যাবসার জগতের ক্রিয়াকান্ডর? উন্নতির সিঁড়ির কথা?

তা ছাড়া, মা আর কতদিন-ই বা বাঁচবেন? অলকাকে বিয়ে করলে ম্যানেজারবাবুর আত্মীয়া সে, তাকে নিয়ে গিয়ে কুমারগঞ্জ-এর ভাঙাবাড়িতে রাখা যে, আদৌ যায় না, একথা মাকে সহজেই বোঝানো যাবে। কানাঘুসো শুনছে এখানে যে, আরও একটি বাগান নাকি নিচ্ছেন ওদের মালিক, ভুটানের বর্ডারে। মালিকের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি মানে, তাদেরও সমৃদ্ধি। এসব কথা জেনে, মালিকের কুৎসিত, বদমাইশ-বদমাইশ মুখখানিকেও বড়ো সুন্দর, অপাপবিদ্ধ বলে মনে হয় তার দু-চোখে।

সংসারে টাকার মতো সুগন্ধি, এমন সুন্দর মুখোশ আর কিছুই নেই বোধ

হয়।

নতুন বাগান নেওয়া হলে, পুতনকে নাকি সেই বাগানে প্রমোশন দিয়ে পাঠানো হবে। বেশি মাইনে, ভালো কোয়ার্টার, স্কুটার।

একটা জিনিস-ই শুধু খারাপ। বুনোহাতির বড়ো অত্যাচারের কথা শোনে ভুটানের কাছে। তা, পয়সা রোজগার করতে হলে, মালিকের লাথির মতো হাতির লাথিও খেতে হবে বই কী। শিলিকেও তুলে দিতে হবে রাজেনের হাতে। বেড়ালকে কবুতর সাপ্লাই করতে হবে। পয়সা রোজগার আর অর্ডার-সাপ্লাই ব্যাপারগুলো একেবারেই জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে। পুতনের নিজের চরিত্রটা অবশ্য ফাস্ট-ক্লাস। অকলঙ্ক সে। থাকবেও তা।

পুতন বোঝে যে, সে বদলে গেছে। প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে। গ্রাম থেকে কাশফুলের গন্ধে নাক আর ঘুঘুর ডাকে কান ভরে নিয়ে যে-সরল, অল্পে-সন্তুষ্ট, সৎ, গ্রাম্য ছেলেটি একদিন কলকাতা গেছিল, সে আর বেঁচে নেই। সে অনেকদিন আগেই মরে গেছে।

যে-ছেলেটি একদিন এই চা-বাগানে এসেছিল, এম.কম পরীক্ষায় ফাস্ট-ক্লাস পেয়ে, ভবিষ্যৎ-এর অনেক সোজা-সরল সুখের স্বপ্ন বুকে করে, সেও বদলে গেছে অনেক-ই।

পুতন এতদিনে বুঝেছে যে, দু-রকমভাবে বেঁচে থাকা যায় জীবনে। এক, ম্যাদামারা, ল্যাজে-গোবরে; থিতু হয়ে বাঁচা। অন্য; উচ্চাশা, চাহিদা এবং

নিত্যনতুন প্রাপ্তি নিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে ক্রমাগত নিজেকে বদলাতে বদলাতে বাঁচা। ও ম্যাদামারা জীবন চায় না। যেহেতু চায় না, তাই স্বাভাবিক কারণে প্রত্যেকদিন-ই সেই পুরোনো পুতনের মনের চেহারাটা একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে—

বুঝতে পারে ও।

বাগানের কাজে একবার শিলিগুড়ি যেতে হয়েছিল ছুটি থেকে ফিরেই। নর্থবেঙ্গল ট্র্যাক্টর অ্যাণ্ড ফার্ম মেশিনারি থেকে তারা এবং আশপাশের অনেক বাগানেই ম্যাসি-ফার্গুসন ট্র্যাক্টর কিনেছিল। ট্র্যাক্টর রিপেয়ার করার জন্যে শিলিগুড়ি থেকে মিস্ত্রি আনতে পাঠিয়ে ছিলেন ম্যানেজারবাবু।

ট্র্যাক্টর কোম্পানি এবং নর্থবেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির মালিকের সঙ্গে সেভক রোডের কনস্ট্রাকশন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সকালে দেখাই হল না। ওঁদের হিলকার্ট রোডের দোকান থেকে পুতনকে ওঁদের মোটাসোটা কর্মচারী রতনবাবু বললেন যে, বিকেলে আসতে। সেই নেপালি ভদ্রলোকও ছিলেন না। থাপা, না কী যেন নাম।

জিপের ড্রাইভার ঘুঘা বলল, চলেন যাই পুতনবাবু, ধুলাবাড়ি থিক্যা ঘুইরা আসি। ট্র্যাক্টর এখানেই আনন লাগব, যদি তাগো মেকানিক শ্যাষপর্যন্ত যাইতে না-ই পারে।

-ধুলাবাড়ি? সেখানে কী?

অবাক হয়ে বলেছিল, পুতন।

-আরে! ধুলাবাড়ির নাম শোনেন নাই? আপনারে নিয়া হত্যই চলে না। ন্যাপালের বর্ডার। পৃথিবীর সব জিনিস পাইবেন সেইখানে। একবার দেইখ্যা আইলে এক্কেরে চক্ষু সার্থক। লাইফ কারে কয়, চলেন, দেখাইমুনানে আপনারে।

ধুলাবাড়িতে যেতে হয় নকশালবাড়ির ওপর দিয়ে।

দারুণ অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।

এক জায়গার নামের সঙ্গে কিছু আদর্শবাদী বিপ্লবীর নাম জ্বলজ্বল করে, আর অন্য জায়গায়, চোরাচালানের মোচ্ছব। প্রয়োজনীয় এবং একেবারেই অপ্রয়োজনীয় সব বিলাসের ই মোচ্ছব সেখানে।

তবে, গিয়ে চক্ষু সার্থক হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু তারসঙ্গে প্রচন্ড এক জ্বালা অনুভব করেছিল চোখে, গলায়, শরীরের সর্বত্র। টাগরা শুকিয়ে উঠেছিল। এত্ত জিনিস? একজন মানুষের সুখী হয়ে বাঁচতে এত্ত লাগে? এত জামা, গেঞ্জি, ট্রানজিস্টার হেয়ার-ড্রায়ার; রেকর্ড প্লেয়ার, টি.ভি. ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো, রঙিন; বাজনা, ক্যালকুলেটর, কার্পেট-ক্লিনার, পারফিউম, নানা দেশের নানারকম কায়দার দাড়ি-কামানোর সরঞ্জাম।

শালার দাড়িকামানোরও যে, এত কায়দা ছিল তা ভাবনারও বাইরে ছিল।

মেয়েদের বডিস। প্যান্টি না কী বলে, কতরকম সাইজের।

কত-রঙা বোতলে বিলাইতি মদ। টাইপ-রাইটার। মায় কম্পিউটার পর্যন্ত।

জীবনে একজন মানুষের বেঁচে থাকতে হলে যে, এত জিনিসের প্রয়োজন হয় বা আদৌ হতে পারে, সেকথা কি হালার পুতন সরকার বাপের জন্মে কোনোদিনও ভাইব্যাছিল? এমন কইরা বাঁচনের নাম-ই বোধ হয় বাঁইচ্যা থাকা। এইসব দ্যাখনের পর সকাল-বিকাল দুগা ডাইল-ভাইত খাইয়া লুঙ্গি পইরা চৌকির উপর পাটি-বিছাইয়া শুইয়া থাইক্যা আর শিলির মতো একডা মাইয়ারে বউ কইরা আদর-টাদর, হুম-হাম দু-চারখানা চুমু-চামা খাইয়া খাওয়াইয়া, ছাওয়াল-পাওয়াল লইয়া ল্যাজেগোবরে বাঁইচ্যা থাকনের কথা আর ভাবন-ই যায় না। পিসারে পিসা! এ কী বাঁচনের আয়োজন কও তো দেহি। দুস শালা।

ড্রাইভার ঘুঘা আর পুতনকে দোকানি চা খাওয়াল।

সার-সার দোকান ধুলাবাড়িতে। সব-ই মাড়োয়ারিদের।

বাঙালি রিফিউজি মাইয়াগুলান, নানা বয়সি, খাড়াইয়া আছে। ওরাই নাকি জঙ্গলের মধ্য দিয়া নদী পারাইয়া স্মাগল-কইর্য়া ন্যাপাল থিক্যা মাল লইয়া গিয়া শিলিগুড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসে। দামের উপর ক্যারিং চার্জ একটা লইয়া লয় দুকানিরা। মাইয়াগুলান নাকি রাতে রাতেই আসে। চেকপোস্টে ঘুসঘাস তো দ্যাওন-ই লাগে। আরও যে, কী কী দ্যাওন

লাগে, তা জানে কেডায়? সব হালার গরমেন্ট-ই সমান। জ্যোতিবাবুদের অনেক-ই আশা কইরা ভোট দিছিল এই মাইয়াগুলানও। তা হইলডা কী? যে তিমিরে, হেই তিমিরেই। বাঙালি বইল্যা যে-একটা জাত আছে, ছিল কখনো; তাই-ই কইলকাতা বা শিলিগুড়ি দেইখ্যা বোঝনের উপায় পর্যন্ত নাই। ছ্যা:। বড় দুঃখে বুক ফাটে পুতনের। দুঃখ যখন হয়।

শোনলা কি তোমরা? পুতনেরও দুঃখ হয়।

মৃগেন কইতাছিল, আসানসোল, দুর্গাপুর, রানিগঞ্জেরও নাকি হেইরকম-ই হাল।

যাউকগা। পুতন তো আর ব্যাঙ্গলে স্যাটল করে নাই। বাঙালির প্রবলেম ব্যাঙ্গলের গভর্নমেন্টে বুঝুকানে। তারা তো এহনে আসামের মানুষ। যতদিন না খেদাইতাছে। বাঙালির না আছে জায়গা ব্যাঙ্গলে, না ব্যাঙ্গলের আউটসাইডে। পার্টিশন আর দিল্লির কর্তারা মিল্যা ব্যাঙ্গলিদের এক্কেরে মাইরা থুইছে না হালায়।

কী খিটক্যাল কী খিটক্যাল।

.

পুতন কী আর কিনবে?

একখানা চাইনিজ কলম, একবোতল রাশিয়ার সস্তা মদ। সাদা জলের মতো। তাই কিনল। এ হালায় আবার কী মদ কেডায় জানে? পেরছাপ না মদ, বোঝাই যায় না। আর একটা আমেরিকান লাল ব্যাঙ্গলনের গেঞ্জি, মাইনা পাছিল গতকাল। তার উপরে ঘুঘার কাছ থিক্যা ধারও নিল। হালার ধুলাবাড়িতে আইস্যা তো লাভের মধ্যে এই হইল। দুস শালা।

ঘুঘা জিপটা ইণ্ডিয়ার দিকে ঘুরিয়ে বলল, ক্যামন দ্যাখলেন, তাই কয়েন পুতনবাবু?

-কইস নারে। তুই আমার হকল হব্বোনাশ কইরা ফ্যালাইলি। আর ক্যা?

ঘুঘা, একটা বিলিতি সিগারেটে অমিতাভ বচ্চনের মতো দেশলাই ঠুকে বলল, ইটারেই লাইফ কয়। বোঝলেন, পুতনবাবু? লাইফ ইটারেই কয়। লাইফ ইনজয় করতে ব্যাশি কিছুর পেয়োজন নাই, বোঝলেন না, অনলি মানি। স-ই চাই। বাই হুক্কো অর বাই কুরোক্কো।

পুতন বুঝল যে, কথাটা বাই হুক আর বাই ক্রুক।

.

বাবার জ্বরটা দুপুরের দিকে কমেছে একটু।

তিনটে নাগাদ বাবা বললেন, পরেশ কি আইছে রে শিলি?

-না, এহনে কী? তার আইতে আইতে পরশু হইয়া যাইব গিয়া।

–পরশু! কইস কী তুই? গেছে কোনদিকে?

–কইয়া তো গেল, যমদুয়ার। সে কি ইখানে। হইব না পরশু?

শিলি বলল।

-যমদুয়ার?

হ।

নরেশবাবু কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

কাল রাতে গভীর জ্বরের মধ্যে একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি যমের বাড়ি যাচ্ছেন। মস্ত একটা তোরণ। কোনো ফুল-টুল দিয়ে সাজানো নয়, রঙিন কাগজ বা কাপড়ের টুকরো দিয়ে সাজানোও হয়নি তা। জায়গাটাও ন্যাড়া শুনশান। একটা গাছ পর্যন্ত নেই। নদী নেই, ফুল নেই; শিশু নেই কোন, সেই দেশে। সেই মস্ত তোরণটা করা হয়েছে বাজে পোড়া একটা মস্ত শিমুলগাছ দিয়ে। সেই তোরণের কাছে কোনো পাহারাও নেই। ভেতরে একরকম ই দেখতে, এক-ই ডিজাইনের সার সার একতলা কালো-রঙা বাড়ি আছে। তাদের দরজা জানালা ছাই-রঙা। এবং প্রতিটি দরজা-জানালা হাট করে খোলা। সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইছে

বাড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে সমুদ্রপারের মতন অথচ দরজা-জানালাগুলোতে একটুও শব্দ উঠছে না। উঠছে না তা নয়, উঠছে মাঝে মাঝে, রোগীর শেষনিশ্বাসের মতন। আর মনে হচ্ছে কানের কাছে, ঘাড়ের কাছে, কে যেন ডাকছে, ক্রমাগত; ডেকেই যাচ্ছে, আয়! আয়! আয়! কিন্তু কোনো মানুষ নেই। কালো কালো বাড়ি।

গা ছম ছম করে উঠল নরেশবাবুর।

স্বগতোক্তির মতো আবারও শিলিকে বললেন, যমদুয়ার! সে তো মেলাই দূর রে। কী রে শিলি?

–হ! দূর-ই তো! তবে ঠিক কতখানি দূর-তা আমি জানুম কেমনে? মাইয়ারা ত আর শিকারে যায় না।

–তা ঠিক-ই কইছস! কিন্তু মহারানি, রাজকুমারী, ম্যামেরা যায়।

পরেশবাবু বললেন।

অনেক-ই পুরানো কথা মনে পড়ে নরেশবাবুর। দমকে দমকে, বমির মতন অনেক পুরানো কথা বাইরে আসতে লাগল। কত রঙা সব জিনিস তারসঙ্গে। কোথায় যে ছিল তারা এতদিন স্মৃতির কোন কুঠুরির কোন কোণে, ভেবে অবাক হয়ে গেলেন জ্বরক্লিষ্ট নরেশবাবু। শিলি, তার বাবার মুখের দিকে চেয়ে উৎকণ্ঠিত গলাতে বলল, বমি করবা নাকি?

নরেশবাবু বললেন না, না।

মনে মনে বললেন, এই বমি অন্য বমি। তুই বুঝবি না রে ছেমড়ি।

অনেকদিন আগে, পার্টিশনের পরপর-ই একবার তিনিও গেছিলেন যমদুয়ারে শিকারে। হ্যাঁ। তিনিও।

মনে পড়ে গেল।

তবে শিকারি হিসেবে নয়। সঙ্গেই পাউরুটি মাখন আর কলা নিয়ে। ডিমসেদ্ধও। ওই ডিমেই নাকি বিপদ ডেকে এনেছিল। ডিম আর কলা নিয়ে শিকারে গেলেই যাত্রা পন্ড।

কোকরাঝাড়ের গনা ঘোষের একটা বেবি-অস্টিন গাড়ি ছিল। কারখানাও ছিল তাঁর। বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী ধবধবে ফর্সা সাহেবের মতন মানুষ। নীল-রঙা লুঙ্গি পরে, লাল হাফহাতা শার্ট গায়ে দিয়ে একটা মোড়ায় বসে কারখানার তদারকি করতেন। তাঁর কাজে তাঁকে সাহায্য করত তার বড়ো চার ছেলে। ছোটোছেলেও ছিল। আরও পাঁচটি। আর পাঁচমিশেলি বয়সের আটটি মেয়েও। ওঁরা উদবাস্তু নন। কলকাতার হাওড়া জেলার লোক। অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতেন। উঠোনকে বলতেন বাকুল। নীচোকে বলতেন নাবো। এইরকম। কত কথাই যে, মনে পড়ে শুয়ে শুয়ে নরেশবাবুর আজকাল। এসব কথা মানুষ যতদিন কর্মঠ থাকে, কাজের মধ্যে থাকে, ততদিন মনে আসে না, নিষ্কর্মা হয়ে গেলেই চৌকির অগণ্য ছারপোকার

মতো কুটুস কুটুস কামড়াতে থাকে স্মৃতি, অনুক্ষণ।

সেই গনাবাবু, কলকাতার মনাবাবু, বৈদ্য, আর কে কে যেন ছিল। মনাবাবুর এক বন্ধুও ছিলেন। অজিত সিং। একটা রাইফেল নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

মনাবাবুরা কলকাতা থেকে গৌরীপুরে এসেছিলেন। সেখানে সকলে জমায়েত হয়ে এই পথ দিয়েই যমদুয়ারে যাওয়ার সময়ে নরেশবাবুকে তুলে নিয়ে গেছিলেন। শীতকাল ছিল। মনে আছে। আর শীত কী শীত!

জীবনে সেই প্রথম রাইফেল দেখেন নরেশবাবু।

তামাহাট থেকে বড়োবাধা, গুমা রেঞ্জ হয়ে, কচুগাঁও রাইমানা হয়ে যমদুয়ার। যমদুয়ারে পৌঁছোবার আগেই সন্ধে হয়ে গেল আর হাতির পালে ঘিরে ফেলল সেই বেবি-অস্টিন গাড়ি। কী খিটক্যাল! কী খিটক্যাল! যমদুয়ার, সে তত ভারি গহন জঙ্গল। একপাশে বাংলার ডুয়ার্স, অন্যপাশে ভুটান। মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে সংকোশ নদী। বড়োবাঘ, হাতি, বাইসন, চিতা, কোন জানোয়ার নেই সেখানে?

সংবিৎ ফিরে পেয়ে যেন বললেন পরেশবাবু, কইস কী রে শিলি? যমদুয়ারে গ্যাছে পরেশ?

-হ্যাঁ।

সঙ্গে গেল কেডায় কেডায়?

–ধুবড়ি থিক্যা আইছিল, শিকারিরা। বড়ড়া শিকারি। ভয় নাই তোমার। ছাত্তার চাচায়ও সঙ্গে গেছে। এক সাহেবও আছে নাহি কইতাছিল কাকায়।

-ভয় নাই? কস কী? ভয় তো হের লইগ্যাই। ছাত্তারটা না করতি পারে এমন কাম-ই নাই। তার বাবারেও বাঘে খাইছে। অরেও খাইব। পরেশরে ক্যান যে, এই মরণের নেশায় পাইল! কত নেশাই ত মানষে করে। কিন্তু এ কি গরিবগো ন্যাশা? রাজারাজড়া, জমিদার; যাগো অন্নচিন্তা নাই, তাগো হাই সব মানায়। না করে রোজগার, না করল বিয়া, ইটা কী?

একটু পর-ই বাবা বললেন, দুগা মুড়ি ভাইজা দে দেহি। তেল দিবার লাগব না। আর এট্টু পিয়াজ। কাঁঠালের বিচি ভাইজা দিবি নাহি এটু?

-না না। কাঁঠালের বিচি খাইয়া কাম নাই। এত জ্বর। প্যাটের গোলমাল বাধাইবা আবার জ্বরের উপরে। আমি পড়ম বিপদে।

–যা ভালো বোঝস তুই। তবে, কাল আমার জ্বর ছাইড়া যাইব। মন কইতাছে। এতক্ষণ তো আবারও কম্প দিয়া জ্বর আসনের কথা ছিল। আইল না যহন, তহন, ছাইড়্যাই যাইব গিয়া। এই শৈলেনের ভাই, আমাগো ডাক্তার খুব ভালো। গদাই-এর বাপে তারে যাই-ই কউক না ক্যান!

বাবাকে একটু আদার রস দিয়ে গরম চা আর মুড়ি-ভাজা খাইয়ে, জ্বরটা আর একবার দেখে ক্যাবলাকে বাবার কাছে রেখে, গা ধুয়ে নিল শিলি। তারপর চলল পুতনদাদের বাড়ি। ভাবছে, রাতে একটু সুজির খিচুড়ি বেঁধে দেবে। অথবা সাবুর। কয়েকটা আলু আর পটল ফেলে। আদা-কাঁচালঙ্কা দিয়ে। মসুর ডালের। বাবাকেও দেবে একটু। বুধাই গাইয়ের ঘি তো আছেই। অনেক ঘি খেয়েছে, দুধ খেয়েছে ছোটোবেলা থেকে শিলি। কিন্তু বুধাই-এর দুধের যেমন গন্ধ, তেমনি ঘি-এর। এমন লক্ষ্মী আর মিষ্টি গাই কখনো দেখেনি। তেমন মিষ্টি হয়েছে বাছুরটা।

–পুঁচকি।

নামটা দিয়েছে, শিলিই।

পুতনদাদের বাড়ি বড়োরাস্তা দিয়ে গেল না। সেনদের বাড়ির পাশ দিয়ে আলোকঝারি পাহাড়ের দিকে মুখ করা পথটা ধরল ও।

এই শেষ বিকেলের এই সময়টা বড়োপ্রিয় সময় শিলির। পৃথিবী কেমন যেন, নরম বিবাগি হয়ে যায় এই সময়টাতে। দিনের অন্য সময়ে যা-কিছুই সে নামঞ্জুর করে, গররাজি নারীর মতন, এই সময়ে সেইসব আর্জিও সহজে মঞ্জুর করে দেয়। মৈজুদ্দিন চাচার সন্ধ্যার নামাজের মতো এক বিষণ্ণ সুর বাজে এই শেষ বিকেলের আলোয়। সজনে গাছের ফিনফিনে পাতাদের গায়ে শিহর তুলে উড়ে যায় দুর্গা-টুনটুনি। বাঁশঝাড়ের

ছায়ায় ছায়ায় নেংচে হেঁটে যায় মস্ত লম্বা ল্যাজ নিয়ে, ছায়াচ্ছন্ন বনের ছায়া ঝাট দিয়ে; সেই একলা, মস্ত বড়ো বাদামি-কালো পাখিটা।

পরেশকাকু একদিন বলেছিল এর ইংরিজি নাম, ক্রো-ফ্রেজেন্ট। গতবছর। হিতুকাকু আসত প্রায়-ই তামাহাট থেকে। অনেক পাখি আর ফুল চিনত সে। পুতনদাটা চিরদিনই কাঠকাঠ। যেসব ছেলেরা আই-কম-বি-কম পড়ে, তারা বেশিরভাগ-ই ওরকম হয়। কেন, কে জানে? আর যারা খাতা-টাতা লেখে, মুহুরি আর অ্যাকাউন্ট্যান্ট; তারা তো যাচ্ছেতাই। নস্যি নেয়। গোমড়ামুখো। নাকে একটা নিকেলের ফ্রেমের চশমা থাকবেই। কথাবার্তা কারও সঙ্গেই নেই। খালি বলবে; জাবদা, খতিয়ান, হরজাই খাতে, নাজাই খাতে; এইসব।

শিলি এইসব জানে, কারণ শিলির ছোটোমামা মুহুরি ছিলেন। এখন ধুবড়ির এক মহাজনের কাছে কাজ করেন। টাউন স্টোর্স-এর শচীন রায়দের কাছেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ধুবড়ি শহরে।

শিলি যখন গিয়ে পৌঁছোল, তখন কিরণশশী রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে চালতা মাখছিলেন। শিলিকে দেখেই বললেন, আইছস? তর লইগ্যাই মাখতাছিলাম। তর বাবায় কেমন?

–বাবা এহনে ভালো। মনে হইতাছে জ্বর এক্কেরেই ছাইড়া যাইব গিয়া কাইল-ই সকাল নাগাদ।

–যা তো! রান্নাঘর থিক্যা দুইটা রেকাবি লইয়া আয় ত শিলি।

শিলি, রেকাবি এনে বলল, পিতলের উপর টক গুইব্যা? খারাপ হইয়া যাইব না?

–তুইও য্যামন। তরে পিতলের রেকাবি আনতে কইল কেডায়! পাথরেরডা আন। শিলি, ঘরের ভেতর থেকে বলল, শ্বেতপাথরের, না লালপাথরের না কালাপাথরের? কোন পাথরের? কোন পাথরের আনুম তা ত কইবা?

-নছল্লা থো তো তোর ছেমড়ি! পলকে লইয়া আয়।

শিলি একটু চালতা-মাখা মুখে দিয়েই চোখ-মুখ নাচিয়ে জিভটা টাগরাতে ঠেকিয়ে বলল, উ-উ-উ-উ-ম-ম-ম! বুড়ি তোমার মতন ত কাউরেই দ্যাখলাম না আইজ অবধি। সত্যই কই। চালতা, কাঁচালঙ্কা, এটু লবণ, এটু কাঁচা মরিচ, এটু চিনি আর বেশি কইরা ধইনাপাতা। আহা স্বোয়াদখান কী? য্যান, হাতে চাঁদ পাইছি। এমন স্বোয়াদ পৃথিবীর আর কিছুতেই নাই। কী ভালোই যে, লাগে-না বুড়ি।

কিরণশশী, শিলির অপাপবিদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বললেন, চালতা-মাখার চেয়েও অনেক স্বাদু জিনিস এই পৃথিবীতে আছে। কত কী পাগল-করা অনুভূতি! এমন এমন মুহূর্ত, যখন মনে হয় জীবনের সব শত্রুকে নিঃশর্তে ক্ষমা করে দিই। ও তো জানে না সেসব! জানবে, বিয়ের জল গায়ে পড়লে।

তারপর নিজের মনেই না-বলে বললেন, জীবনভর তো আনন্দই। দুঃখ কতটুকু? এই চালতা-মাখার স্বাদের-ই মতো টক-টক, মিষ্টি-মিষ্টি, ঝাল-ঝাল এই জীবন। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত।

লোকে জানে, বিধবা, একা, কিরণশশীর অনেক-ই দুঃখ। যারা তা জানে, তারা কিছুই জানে না। সুখ তাঁর চারধারেই ছড়ানো আছে। ঝরাপাতার মতো, মিষ্টি ধুলোর মতো; বাড়ি ফেরা গাইয়ের গায়ের মিষ্টি গন্ধর-ই মতো সুখ ভেসে বেড়াচ্ছে চারপাশে। শুধু তাকে চিনে নেওয়া চাই। মুহূর্তগুলোকে শুধু হারিয়ে যেতে দিতে নেই।

এসব গভীর কথা শিলি কী করে বুঝবে? ও তো ধুলোর মধ্যে ঘর-বানানোর খেলায় মেতে-থাকা চঞ্চল ছটফটে দুরন্ত চড়াই। যে ঘর বানায়নি, ঘরে থাকেনি কখনো, সেই মেয়েই কল্পনার ধুলোয় ঘর বানিয়ে এমন ছটফট করে। ধুলাবাড়ি। বাড়ি নয়। বেচারি জানবেই বা কী করে! এক-একটি করে বছর হারিয়ে, শৈশব-কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে পায়ে পায়ে হেঁটে এসে বার্ধক্যে পৌঁছে, জীবনের পেছনে ফেলে-আসা পথের ধুলোয়। মানুষ যা-কিছুই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসে, হারিয়ে আসে, নিয়েও আসে; তার নাম-ই তো জীবন। অভিজ্ঞতার আর এক নাম-ই জীবন। যা বয়স হারিয়ে পাওয়া যায়, তা কি বয়স না-হারিয়ে কখনোই পাওয়া যায়?

শিলিকে বসিয়ে, রান্নাঘরের দাওয়ায় পা-ঝুলিয়ে বসে চালতা-মাখা খাওয়া

শিলির খুশিমুখের দিয়ে চেয়ে, ক্ষণিকের জন্যে নিজের প্রথম যৌবনে ফিরে যান কিরণশশী। শিলির বয়সে। তাঁর ফোকলা মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কুঁচকে-যাওয়া, কালিপড়া চোখ দু-খানিতে এক প্রসন্ন কৌতুক ভোরের প্রথম আলো-পড়া শিশিরবিন্দুর মতো ঝিকমিক করে ওঠে।

শিলি মুখ ঘুরিয়ে, কনে-দেখা আলোয় কিরণশশীর মুখের হাসি দেখে। প্রথমে অবাক হয়। তারপর গম্ভীর হয়ে যায়। পরক্ষণেই নিজেও হেসে ফেলে।

বলে, মরণ। হাসো ক্যান মিটমিটাইয়া? ও বুড়ি?

বুড়ি আবারও হাসেন।

–আরে! কইবা তো! এত হাসনের হইলডা কী?

–তরে দেহি আর হাসি।

–না। হাসবা না। কইয়া দিলাম।

–ক্যান? হাসির উপরও ট্যাক্সো চাপছে নাকি?

তারপর দু-জনেই আবার হেসে ওঠে।

হাসতে হাসতে, শিলির আঁচল লুটিয়ে পড়ে বারান্দার দাওয়ায়।

এমন করে আগল খুলে, নিভৃতে দু-জন নারীই শুধু হাসতে পারে।

উঠোনের কোনা অবধি এগিয়ে-আসা একটা কাঠবেড়ালি হাসির শব্দে ভয় পেয়ে তরতরিয়ে সুপুরি গাছের ওপরে উঠে যায়। গাছের অনেকখানি ওপরে উঠে, ল্যাজ তুলে তুলে শিহরভরে ডাকে, চিহর-চিহর-চিরিপ-চিরিপ-চিরিপ। আর ঠিক সেই সময়ই গৌরীপুর থেকে আসা বিকেলের বাসটা তামাহাটের দিকে চলে যায় পক পক করে বালব-হর্ন বাজিয়ে।

সন্ধে হল।

পুতনদাদাদের বাড়ির মোতি গাই ডাকে গোয়ালঘর থেকে, হাম্বা-আ-আ-আ। লিচু গাছের ডাল ছেড়ে বাদুড়েরা পা-আলগা করে ভেসে যায়। অন্ধকারে মিশে যায় তাদের ডানার সপ সপ সপ সপ শব্দ।

রমজান মিয়ার ছোটো ছাওয়ালটা সারাদিন শুকিয়ে-যাওয়া চৈত্রের পুকুরে পোলো দিয়ে দিয়ে কই-শিঙি মাছ ধরে। দিনশেষে আব্বাসউদ্দিনের গান গাইতে গাইতে পুতনদের বাড়ির দিকে আসতে থাকে। গলা ছেড়ে গান গায় সে: বগা কান্দেরে, তোরসানদীর পারে পারে, ফানদে পইড়্যা বগা কান্দেরে...

চৈত্রশেষের সন্ধ্যার কাঁসা-রঙা আলোয়, শ্যাওড়া গাছের গন্ধ, বাছুরের গায়ের গন্ধ, হাসনুহানার গন্ধ, সদ্য-চেরাই-করা হরজাই কাঠের মিষ্টি গন্ধের মধ্যে, গা-মাথাময় পুকুরের পুরোনো কাদা আর শামুক-গুগলির,

কই-শিঙির আর গুঁড়িগুঁড়ি শ্যাওলার গন্ধ গায়ে মেখে আলিমুদ্দিন এসে দাঁড়ায় উঠোনে।

বলে, ফুফা, একখান সানকি দাও দেহি। শিলিদিদিরে মাছ দিয়া যাই কয়খান।

শিলি হাসে।

বলে, খুব যে পেরেম দেহি রে ছ্যামড়া। কাইলকা হক্কালে আইস্যা, টাহা কয়ডা চাইবি তা ক দেহি আগে?

আলিমুদ্দিন হাসে।

মিষ্টি ছেলেটা। বলে, টাহাই কি দুনিয়ায় সব শিলিদিদি? তুমি একবার হাইস্যা দিয়ে তাইলেই হইব। দাম নিমু না। পেরেমটা চিনলা না, টাহাই চিনলা শুধু! তোমার কপালে পেরেম লাই।

-তবে রে ছ্যামড়া।

কপট-ক্রোধে শিলি তেড়ে যায় আলিমুদ্দিনের দিকে।

হাসতে হাসতে, কপট ভয়ে, আলিমুদ্দিন পিছিয়ে যায়।

মাছ ঢেলে দিতে দিতে বলে, দাম নিমু না। হত্যই কইতাছি শিলিদিদি।

একদিন আইমু অনে পুতনদা আইলে পর। গান শুনাইও দিদি একখান, পূর্ণিমার রাতে, বারান্দায় বইস্যা। আহা! গান তো গাও না তুমি, মনে হয় গঙ্গাধারে পূর্ণিমার রাইতে পাল তুইল্যা নৌকা ভাইস্যা যাইতাছে গিয়া। পরাণের মধ্যেটা কেমন কেমন করে য্যান।

শিলি আর কিরণশশী বলেন, যাত্রায় পার্ট করস না ক্যান তুই? গান তুইও তো খারাপ গাস না রে ছ্যামড়া।

আলিমুদ্দিন হাসে। বলে, মোক নেয় কেডায়, তাই কও। আলিমুদ্দিন তোমাদের গান শুনাইতে পারলেই সুখী। আর কিসুর লোভ নাই।

তারপরে বলে, গান তো গায় ফুফা সব পাখিতেই। কোকিল কি সবাই হইতে পারে? কও দেহি? আমাগো শিলিদিদি হইতাছে কুমারগঞ্জের কোকিল।

-হইছে। ফাইজলামি রাইখ্যা এহন বাড়ি যাইয়া ধোয়াপাকলা কইরা চান কইর‍্যা ফ্যালা। রাত হইয়া গেল। এতক্ষণ, কী মাছ ধরতাছিলি তুই?

–হঃ। হুদাই মাছ? এক-একবার পোলো ফ্যালাই, পোলোর মধ্যে হাতাটরে ফেরাই আর কত কী ভাবি! ভাবি, আমার বেহেস্ত আর দোজখ দুই-ই আছে এই পোলোর মধ্যেই। কোনটারে ফ্যালাই আর কোনটারে উঠাই? বাস এই করতা করতাই দিল এক ব্যাটা সাপে কামড় দিয়া।

–সাপ?

শিলি চমকে উঠল।

-তারপর?

কিরণশশী বললেন।

–কী সাপ?

শিলি উৎকণ্ঠিত হয়ে শুধোল।

কিরণশশী আবার বললেন, তারপর?

-তারপর আর কী? দোজখে যে, হাত দিছি বোঝাই গেল তা। বলেই, ফুলে-যাওয়া হাতটা তুলে দেখিয়ে বলল, ত্যামন সাপ হইলে তো কাম-ই সারত যাইত গিয়া এতক্ষণে।

তারপর স্বগতোক্তির মতন বলল, জল-ঢোঁড়াই হইব।

বলেই বলল, মাছগুলান লইয়া লও ফুফা। যামু এবার। কাদায় চিড়বিড় করতাছে গা।

সাবধানে যাইসানে ভাইডি। বাঁশবাগানের তলায়ও একজোড়া গোখরার

বাসা আছে। জানস তো?

-জানি জানি। বুকের মধ্যে কত গোখরার ছোবল খাই, গোখরারে আমি ডরাই না।

–বুকের মধ্যে ছোবল? হেডা আবার কী?

শিলি বলল, অবাক হয়ে।

–ক্যান। তোমার হাসি।

আলিমুদ্দিন বলল।

–এইবার আমি তরে মারুম। পালা। যাইবি কি না ক তুই।

–যাইতাছি। এই পলাইলাম।

বলেই, আলিমুদ্দিন আধো-অন্ধকারে কাদা-মাখা একটি মস্ত ভোঁদড়ের মতো দু-পায়ে থপথপ করে চলে গেল।

শিলি গলা তুলে বলল, যাওন নাই রে, আসিস আলিম ভাই আবার।

–আ-সুম।

গলা তুলে বলল, আলিমুদ্দিন দূর থেকে।

তার গলার আওয়াজকে, লটকাগাছের ঝুপরি পাতাগুলো অন্ধকারে কপাৎ করে গিলে ফেলল।

ওদের চালতা খাওয়া হয়ে গেছে। হোন্দলের মা এতক্ষণ হ্যারিকেন আর রান্নাঘরের লক্ষ পরিষ্কার করছিল। সব ঘরের বারান্দায়, ছাই দিয়ে কাচ মেজে, ঝকঝকে করে, হ্যারিকেন রেখে গেল।

শিলি বলল, গাছের ছায়াঘেরা মিটমিটে আলোতে ঘন হয়ে ওঠে উঠোনভরতি অন্ধকারে, লজ্জা লজ্জা গলায়; পুতনদার চিঠি কি আইছে? বুড়ি?

–নাঃ

কিরণশশীর দীর্ঘশ্বাস চাপা এই না-টা অন্ধকার তারাভরা আকাশের দিকে দু-টি নারীর চারটি উঁচু-করা প্রতিবাদের হাতের মতো বলে উঠল না, না, না।

দু-জনের মনেই কু-ডাক দিল। নীরবেই মনে মনে দু-জনে বলল, দু-জনের মতো করে, ও আসবে–না, ও আর আসবে না ফিরে। তাই-ই চিঠি লেখে না ও!

কিরণশশী বললেন, শিলিকে কাকুতি করে, তুই লিখছিলি কি অরে?

-হ।

কবে?

–গতমাসে।

–গতমাসে। তারপর আর একবার লিখতে কী হইছিল? আঙুলে কি বাত ধরছে তর?

–তা না। তোমার পোলারে তুমিই লিখবা। আমি ক্যান বারে বারে লিখুম? জবাব যে, দ্যায় না, তারে লিখুম-ই বা ক্যান? স্যা আমার কেডা?

কিরণশশী কিছু না বলে, চুপ করে বাড়ির পশ্চিমে চেয়ে রইলেন।

আকাশে তখনও ফিকে গোলাপি আভা ছিল সামান্য। একঝাঁক সল্লিহাঁস কোনাকুনি উড়ে গেল। অন্ধকার নেমে এল ঝুপ করে। আলোর সামান্যতম আভাসও আর রইল না।

শিলি উঠল। বলল, যাই বুড়ি।

কিরণশশী বিড় বিড় করে, শীতের দীর্ঘরাতের আগুনের মতন বলল, যাওন নাই মাইয়া। আইস্যো।

২. সংকোশ নদী

সংকোশ নদীটা তার বরফ-গলা স্বচ্ছ জল বুকে করে দু-পাশের নিবিড়, ভয়াবহ অরণ্যের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে। নদী পার হলেই ভুটান। ভুটানের মহারাজা প্রতিবছর-ই এক দু-বার হেলিকপ্টারে করে থিম্পু থেকে যমদুয়ারে চলে আসেন শিকারের জন্যে। ভারতবর্ষে পাওয়া যায়, অথচ যমদুয়ারে পাওয়া যায় না, এমন প্রাণী খুব কমই আছে। হাতি, বাঘ, বাইসন, (গাউর), বুনো মোষ, চিতা, শম্বর, চিতল হরিণ, কোটরা, নানারকম সাপ, নদীর জলে দ্রুত সাঁতরে যাওয়া কালো ও লাল মাছের মস্ত মস্ত ঝাঁক, কী যে নেই এই গহন, ভয়াবহ বনে, তা খোদাই জানেন। ভাবে, আবু ছাত্তার। পাখি, নানারকম প্রজাপতি।

যমদুয়ার বাংলো থেকে মাইল দুয়েক দূরে পরেশ আর ছাত্তার সংকোশ নদীর পাশে একটি মোষের বাথানে বসেছিল।

নেপালিদের বাথান। প্রায় শ-খানেক মোষ আছে। ঘি তৈরি করে, তারা

পৌঁছে দেয় ভুটানে। সংকোশের একপারে ভুটান। আর অন্য পারে আসাম এবং পশ্চিমবাংলা।

নদীতে চান করে উঠেছে ওরা। তারপর দুপুরে ময়ূরের ঝোল আর ভাত দিয়ে ভরপেট খাওয়া-দাওয়ার পর কষে ঘুম লাগিয়েছিল। রাতের বেলাতে বাথানের নেপালিদের সঙ্গেই খেয়ে নেবে। নেমন্তন্ন করেছে ওদের, নেপালি গোয়ালারা। আজ-ই সকালে একটা কুটরা হরিণও মেরে ওদের দিয়েছিল। তার-ই ঝোল, মেটে-চচ্চড়ি আর ভাত খাবে রাতে। খিদেটাও বেশ চনমনে হয়েছে।

ক্যামেরন সাহেব যমদুয়ারের দোতলা বন-বাংলোতে আছেন। কলকাতা থেকে একটি পাঞ্জাবি মেয়েকে সঙ্গে করে এনেছেন উনি। বড়োঘরের মেয়ে। মহামূল্য বেশ্যা। রূপ ফেটে পড়ছে। বয়সও ত্রিশের নীচে। কিন্তু হলে কী হয়, বেশ্যারা বেশ্যাই। তাদের রকম-সকম চলন-বলন, তারা যতই সম্ভ্রান্ততা দিয়ে ঢেকে রাখুক-না-কেন; ঘরের বউ আর টানামালে তফাত থাকেই।

চোখের সামনে ক্যামেরন সাহেবের ওই বেলেল্লাপনা সহ্য করতে পারে না পরেশ। জন্মেছিল বিত্তশালী পরিবারে কিন্তু ছেলেবেলাতে ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে এসেছিল জন্মভূমি ছেড়ে, একবস্ত্রে। ইজ্জত-এর জন্যে। যে-ইজ্জতের জন্যে অনেক মূল্য দিয়েছে তারা সকলে, সেই ইজ্জত-ই কেনা-বেচা করছে এরা চোখের সামনে। যে-দৃঢ়মূল, রক্ষণশীল মানসিকতাতে তারা

মানুষ হয়েছে তাতে এইসব বড়ো চোখে লাগে। সহ্য করা মুশকিল হয়। অথচ প্রতিবাদও করতে পারে না। সে-ক্ষমতা নেই। ফলে মনের মধ্যে সবসময়েই একটা চাপা উত্তেজনা গুমোট মেরে থাকে। দমবন্ধ লাগে। অমন উদার খোলামেলা পরিবেশেও নিশ্বাস নিতে পারে না যেন।

আবু ছাত্তার বড়ো স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষ। বড়োবাঘ তাকে পেড়ে ফেললেও, সে যেমন নিরুত্তাপ থাকে, চোখের সামনে দোতলার খোলা বারান্দায় দিনের বেলাই প্রায় ন্যাংটো মেয়েকে নিয়ে ক্যামেরন সাহেবের রমদা-রমদি দেখেও ও তেমন-ই নিরুত্তাপ। তবে, ছাত্তারের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে ওঠে। দেখতে পায়, বুঝতে পারে পরেশ। আর চোয়াল শক্ত হলেই ভয় পায়।

বেশ কয়েকবছর পরে, এইরকম চোয়াল শক্ত করেই ছাত্তার তার বন্দুক তুলে নিয়ে তার এগারোজন রক্তের আত্মীয়কে একই দিনে গুলিতে শেষ করে দিয়েছিল।

মানুষটা বাঘের সঙ্গে কারবার করত। সাহসের কোনো খামতি ছিল না। কিন্তু নোংরামি, নীচতা এসব সহ্য করতে পারত না। পারত না ভন্ডামি।

ছাত্তারের ব্যক্তিগত আইন নিষ্ঠুর ছিল। ভয়াবহ ছিল, কিন্তু তা অন্যায় ছিল না, নীচ ছিল না।

এই ক্যামেরন সাহেবদের হাব-ভাব দেখে পরেশেরও একধরনের ঘৃণা

জন্মে গেছে। মুখ ফিরিয়ে থুথু ফেলে ও, সংকোশের বহমান স্বচ্ছ জলে। ওর থুথু ভেসে যায় দ্রুত। ঘুরপাক খেতে খেতে হারিয়ে যায়। জলের নীচে নানা-রঙা নুড়ি দেখা যায়। মহাশোল মাছের ঝাঁক, কালো ছায়া ফেলে সাঁতরে যায় গভীরে গভীরে। জলের গভীরে আষাঢ়ের মেঘের মতো মনে হয় সে চলমান মাছের ঝাঁককে।

কাল বিকেলের আগেই ভুটানের দিকে একটা ল্যাংড়া, বাঁজা মোষকে বেঁধেছিল পরেশরা বাঘের জন্যে। যে-মোষ দুধ দেয় না, তার কোনোই প্রয়োজন নেই বাথানের গোয়ালাদের কাছে। গোস্ত করবে বলে কিনতে চায়, মুসলমান যাযাবর ব্যবসায়ীরা। কিন্তু নেপালিরা কট্টর হিন্দু। যদিও দুর্গাপুজোর সময় মোষ বলি দেয় তারা, কেউ জবাই করে খাবে তা জেনে ল্যাংড়া, বাঁজা, অকর্মণ্য দামহীন মোষও বেচে না।

টাকা যাদের খুবই দরকার, তাদের-ই দেখা যায় যে, টাকার জন্যে হাহাকার না করতে। টাকার জন্যে নিজেদের নিজস্বতা বিকিয়ে না দিতেও। সেই লোভ আছে শহরের মানুষদের। পরেশ ভাবে, একদিন শহরের মানুষেরা পুরো পৃথিবীটাকে নষ্ট-ভ্রষ্ট করে দেবে। এই গাছ থাকবে না, এই ফুল, এই বাঘ, এই শান্তি এবং এই মানসিকতাও। পেনশন এবং পুঁজিহীন রিটায়ার্ড পুরুষদের যেমন অবস্থা সংসারে, অনেকটা তেমন-ই অবস্থা ওই মোষটার। তবু ওকে কেউই অসম্মান করে না। না গোয়ালারা, না অন্য মোষেরা।

প্রায় প্রতিরাতেই বড়োবাঘ এসে বাথানে হামলা করে, যদিও বাথানের শক্ত কাঠের বেড়ার মধ্যে ঢুকে মোষ নেওয়ার সাহস কোনো বাঘের-ই নেই। একসঙ্গে বাঘিনি এবং বাচ্চারা। থাকলেও নয়। তবুও হম্বি-তম্বি করে। মোষগুলোও বোঁ-বোঁ-ও করে প্রচন্ড চিৎকার করে ওঠে। দাপাদাপি, ঝাঁপাঝাঁপি হয় অনেকক্ষণ। ঘুমের দফা-রফা। মশাল হাতে করে গোয়ালারা ঘেরার মধ্যে থেকেই লম্ফ-ঝম্ফ করে। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ভয় দেখায় বাঘকে। ঘেরার বাইরে অবশ্য বেরোয় না। মোষদের রক্ষাকবচ ছাড়ে না।

একে বড়োবাঘ, তায় রাত বলে কথা।

সচরাচর বাথানের মধ্যে রাতের বেলা বাঘে কিছু করতেও পারে না। অনেক মোয যে, থাকে একসঙ্গে শিং উচিয়ে। মোঘ ধরে বাঘে, দিনের বেলাতেই, যখন কোনো মোষ চরতে চরতে একলা হয়ে যায়, তখন। তবু রাতে এসে ভয় না-দেখালেও যেন চলে না তাদের।

ল্যাংড়া, বাঁজা মোষটাকে মেরেছিল বাঘ গতকাল-ই শেষরাতের দিকে। মড়িটাকে বেঁধে ছিল অবশ্য বুদ্ধি করে বাঘের চলাচলের পথেই কাল। খেয়েছে সামান্যই। তাই আজ রাতে যে, মড়িতে আসবেই বাঘ, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই।

ছাত্তার আর পরেশ বাঘের পায়ের দাগ দেখে বুঝেছে যে, মস্ত বাঘ।

নেপালিরাও বলেছিল যে, অত বড়োবাঘ সারাজীবন বনে বনে ঘুরেও দেখেনি ওরা। মোযটা ভালো করে বাঁধা না থাকলে ওই বাঘের পক্ষে অতবড়ো মোষকে বয়ে নিয়ে ভুটান হিমালয়ের খাড়া পাহাড়ে উঠে চলে যাওয়াও অসুবিধের ছিল না। একটি বড়োবাঘ তার শরীরে যে, কতখানি শক্তি ধরে তা যারা বাঘকে জেনেছে, তারাই জানে।

খুব ভালো করে, শক্ত করে মাচা বেঁধেছে ওরা, সারাসকাল ধরে। চারজন লোককে নিয়ে। ক্যামেরন সাহেব বাঘ মারবেন বলেই এখানে এসেছেন। এখন মানে মানে মারতে পারলেই ভালো। যদি না মারতে পেরে, আহত করেন তবে সেই বাঘকে পিছা করে মারার কাজ হবে পরেশ আর ছাত্তারের-ই। পেশাদার শিকারি ওরা।

ক্যামেরন সাহেব নিজেই বাঘ মারতে পারলে দু-শো টাকা দেবেন বলেছেন আর আহত করার পর সেই বাঘকে যদি ছাত্তারদেরই পিছা করে রক্তের দাগ দেখে দেখে খুঁজে বের করে শেষ করতে হয়, তবে তিন-শো টাকা। সাহসী শিকারিদের কোনো সম্মান দেয় না এইসব মিথ্যাচারী, জালি মানুষেরা। সম্মানটা নিজে নিয়ে, টাকাটা হাতে ধরিয়ে দেন।

পরেশ ভাবে, ওই পাঞ্জাবি মেয়েটার সঙ্গে আসলে হয়তো ওদের নিজেদের বিশেষ তফাত নেই। ওরা বেচে, ওদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা, দুর্জয় সাহস; আর মেয়েটা বেচে অন্য কিছু। ওরা সবাই অসহায়।

তবে, ওদের, অসহায়তার রকমটা আলাদা।

ভাবে পরেশ কে জানে! হয়তো ক্যামেরন সাহেবও অসহায়। তার অসহায়তার রকমের খোঁজ হয়তো তারা রাখে না। প্রাণ বিপন্ন করেও বাঘের চামড়া, বাইসনের বা বুনোমোষের মাথা, হাতির দাঁত তারা এনে দেয় শৌখিন, আত্মসম্মান-জ্ঞানহীন শিকারিদের পায়ের কাছে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে।

টাকার বড়ো দরকার পরেশের। ছাত্তারেরও টাকার দরকার কম নয়। তাই-ই ওরা চাইছিল ক্যামেরন সাহেব কোনোক্রমে গুলি ছোঁয়াক একবার বাঘের গায়ে। তারপর ওরাই দেখবে। মাথাপিছু পঞ্চাশটা করে টাকা বেশি পাওয়া সোজা কথা নয়। যা বাজার!

বাঘ শিকারের ওই নিয়ম। যে-আগে রক্ত ঝরাতে পারবে, বাঘ তার। সেই প্রথম গুলি, ল্যাজেই লাগুক, কী কানের পাতাতে। রক্ত ঝরলেই হল।

তবে ক্যামেরন সাহেবকে পাঠিয়েছে গৌহাটির ল্যাম্পুন সাহেব। ল্যাম্পুন সাহেব কিন্তু ভালো শিকারি। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে-না ওদের যে, এই ক্যামেরন সাহেব শিকারের কিছু জানেন বলে। শিকারে তাঁর মনও নেই। শিশু যেমন সুন্দর খেলনা পেয়ে পৃথিবী ভুলে মত্ত হয়ে যায়, ক্যামেরন সাহেবও পাঞ্জাবি মেয়েটাকে নিয়ে তেমন-ই মত্ত। মেয়েটা যেন দুর্মূল্য আইসক্রিম। এখুনি চেটে-পুটে শেষ আদ্রতাটুকুও না খেলে যেন,

গলে গিয়ে আঁজলা গলে গড়িয়ে যাবে সব রস, মিষ্টত্ব!

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর ভালো করে ঘুম দিয়ে উঠল ওরা দু-জনে। রাতে জাগতে হবে। কে জানে, সারারাত-ই জাগতে হবে কি না। বাঘের মতিগতির কথা কি বলা যায়? মড়িতে এসে হয়তো হাজির হল একেবারে শেষরাতে।

ঘুম থেকে উঠেই পরেশ বলল, আমি একটু ঘুরে আসছি।

ছাত্তার ভালো করে জানে, কোথায় ঘুরতে গেল পরেশ। ওই একটিই কমজোরি পরেশের। পৃথিবীর সমস্ত বাহাদুর মানুষদের-ই কোনো-না-কোনো কমজোরি থাকেই। থাকাটা অবধারিত।

ভুটানের দিকেই পাহাড়ের নীচে খড়ের ঘরে মদ পাওয়া যায়। ভুটানে তৈরি হুইস্কি। পাঁইটের বোতল। কমলালেবুর ছবি আঁকা। কমলা-রঙা। সাদা লেবেলের ওপর। নাম, ভুটান অরেঞ্জ।

ছাত্তার মদ ছোঁয় না। ওর নেশার মধ্যে গুয়া-পান। শুধুই গুয়া-পান।

কেউ মদ খাক, তাও পছন্দ নয় ছাত্তারের।

পরেশ যাওয়ার সময়ে, ছাত্তার বলল, ক্যামেরন তো মাতাল হইবই, তুই বেশি খাস না। অত বড়োবাঘ! মাতলামি যদি করিস, আমি কিন্তু তোক

গুলি করুম।

থোও, থোও! পরেশরে কোনোদিন মাতাল হইতে দ্যাখছ তুমি! যত্ত ফাঁকসা কথা!

–তাড়াতাড়ি আসস কিন্তু। দেরি যদি করস, তো খারাপ হইব। ভুটানি ছুকরিও তো আছে ওই দোকানে। কী হয় না হয়; আমি সব-ই জানি।

-মুখ সামলাইয়া কথা কইও মিয়ার পুত। তোমার জিভখান কাইট্যা ফেলাউম। ওইসব মাইয়া-ফাইয়ার ধান্দা আমার লাই। মদ খাই; মদ খাই।

-না থাকন-ই ত ভালো।

অবিশ্বাসী স্বগতোক্তি করল ছাত্তার।

পরেশ, একা একা চৈত্রর নদী পেরিয়ে ভুটানের দিকে যাচ্ছিল। মন্থর পায়ে। চৈত্রদিনের বিকেলের মধ্যেই একটা মন্থরতা আছে। সবকিছু শ্লথ হয়ে যায়, ভিতর-বাহির।

ঘন, গহিন বন, পাহাড়ের গায়ে। পেছনে। সামনে, ডাইনে, বাঁয়ে। যমদুয়ারের সেগুন আর শালগাছের কান্ডর বেড় দশজন মানুষের দু-হাতেও দেওয়া যায় না। এই বনে, গা ছমছম করে দিনের বেলাতেও। ছায়াচ্ছন্ন সবুজ অন্ধকারে ঢাকা থাকে দুপুরের রোদও, অনেক-ই

জায়গাতে। যেখানে জঙ্গল ঘন।

এই ছমছমানির প্রেমেই পড়েছে আসলে পরেশ। চাকরি করল না, থিতু হল না। বিয়ে করল না কোনো দায়-দায়িত্বই নিল না জীবনে, শুধু এই ছমছমানির-ই প্রেমে পড়ে। তার বিয়ে হয়েছে জঙ্গলের-ই সঙ্গে। কী ভালো যে লাগে, এমন গহন জঙ্গলে এল! মদ খায় মাঝেমধ্যে। নেশা করার জন্যে নয়। নেশা, তার জঙ্গলে এলে; এমনিতেই হয়। সেই নেশাকে জমাট করে তোলার জন্যেই মাঝে মাঝে একটু-আধটু খায়। জঙ্গলে বসে মাল খাওয়ার আনন্দই আলাদা। প্রকৃতির প্রভাবের-ই মতো, হুইস্কির প্রভাবও আস্তে আস্তে চাড়িয়ে যায় নিজের ভেতরে। ধীরে ধীরে। বেলাশেষের বুনো হাঁস, যেমন করে ম্লান রক্তিম আলোয়, সারারাতের স্থির জলজ শীতের জন্যে তৈরি হয়ে যায়।

ছাত্তার মিয়া, এই মদ-ফদ কোনোদিন জিভেও দেয়নি। ও কী করে জানবে, ভুটান অরেঞ্জের স্বাদ।

কুমারগঞ্জ থেকে বেরোবার সময় দাদার জ্বর ছিল অনেক। শিলিটা একা ছিল বাড়িতে। পরেশের এমন করে চলে আসাটা ঠিক হয়নি।

খড়ের চালাটার বারান্দার এককোণে বসে লালচে, মোটা কাঁচের গেলাসে, জল-মেশানো ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে ভাবছিল, পরেশ। ভাবছিল, এই জীবনে খুব কম কিছুই ও করেছে, যা, ওর করা উচিত ছিল। ছেলেবেলায়

উদবাস্তু হয়ে চলে এসেছিল আসামে, উত্তরবঙ্গ থেকে। তারপর এখানে এসেই এই বন-জঙ্গলের প্রেমে পড়ে গেল। শিকারের এক গুরুও পেয়েছিল, সে কাসেম মিয়া। এই নেশাটাই ধরে নিল তাকে কিশোর বয়সে। সেই যে, ধরল হাত, বজ্রমুঠি আর ছাড়ল না। রাঙামাটি, পর্বতজুয়ার, গঙ্গাধর নদী, রাইমানা, কচুগাঁও, বরবাধা, যমদুয়ার।

এই নেশা যাকে একবার ধরেছে, তার ইহকাল পরকাল সব-ই গেল।

ভুটানি মেয়েটার গাল দু-টি কমলা লেবুর-ই মতন। বুকদু-টি পাকা টুকটুকে মাকাল ফলের মতো দেখতে। ইচ্ছে করেই বুকের পর্দা একটুখানি খুলে রেখেছে। মাকাল ফল নিগুণ হয়, কিন্তু এই ফলের অনেক-ই গুণ। আর রূপ তো আছেই।

এখানে সব গন্ডার-মারা, হাতি-মারা চোরাশিকারিরা আসে। স্মাগলাররা আসে। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব চরিত্র। ভারতের দু-টি রাজ্য এবং ভুটানের বর্ডার বলে নানারকম খারাপ কাজ-ই হয় এখানে। মদ, আফিম, চরস, মেয়ে চালান যায়। মাঝে খুন-খারাপিও হয় দু চারটে। রুক্ষ, দুর্দান্ত সব মানুষের গায়ের গন্ধ ভাসে এখানের বাতাসে এবং ভাসে বলেই এত ভালো লাগে পরেশের।

এক ঘণ্টার জন্যে ঘর বন্ধ করে কারও সঙ্গে বাঁশের মাচানে শুতে দু-টাকা নেয় মেয়েটা। বাইরে যারা বসে মদ খায়, তারা দু-টি সলিড-শরীরের,

কখনো মৃদু, কখনো জোর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনতে পায়। হাঁসফাঁস নিশ্বাসের শব্দ, বাঁশের মাচার মচমচানি শব্দের সঙ্গে। সময় পেরোলে, জরায়ু ভিজলে, মেয়েটা ঘরের পেছনের জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে মস্ত মাটির জালাতে জল রাখা থাকে, একটা প্রাচীন শিমুলগাছের নীচে।

ধোওয়া-পাকা করে নিয়ে, পরের রাউণ্ড কুস্তির জন্যে তৈরি হয় সেই পাহাড়ি মেয়ে। রতি-ক্রীড়ায় ক্লান্তিহীন এরা। যেমন, পাহাড় চড়ায়। চড়াই-উতরাই সহজে পেরোতে জানে। তবে, কাজ কারবার যা হওয়ার, তা সন্ধে-রাতেই শেষ হয়ে যায়। কখনো-বা ভর দুপুরেও। যমদুয়ার, যমের-ই দুয়ার। এখানে অন্ধকার নামার পর যম নিজেও ঘরের বাইরে বেরোতে ভয় পায়। এ বড়ো ভীষণ বন। এই বনে যম নানারকম ভেক ধরে আসে। কখনো বাঘ, কখনো হাতি, কখনো দানো, কখনো বার্গম্যানের ছবি দ্যা সেভেন্থ্ সিল-এর দাবাড় মৃত্যুর মতো কালো পোশাক পরে।

খড়ের ঘরের বারান্দায় বসে, ভুটান-অরেঞ্জ খেতে খেতে, পরেশ সংকোশ নদীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে, বন-বাংলোটা দেখা যায়। সূর্য ডুবতে আর ঘণ্টাখানেক বাকি। একটু পরেই মাচায় গিয়ে বসতে হবে ওদের। এই-ই ওদের জীবিকা। পেশা। ইচ্ছে করেই দু-টি মাচা বেঁধেছে। একটি বড়ো, একটি ছোটো। বড়োমাচাতে বসবে ছাত্তার আর ক্যামেরন। আর অন্য গাছে, ছোটোমাচাটিতে বসবে পরেশ একা।

বাঘ কিন্তু মারতে হবে ওই ক্যামেরনকে দিয়েই। পরেশ কিংবা ছাত্তারের

মতো শিকারির কাছে, বাঘ মারা কিছুই নয়। কিন্তু অন্য শিকারিকে দিয়ে বাঘ-মারানো বড়ো কঠিন কাজ। হাতে দামি বন্দুক-রাইফেল থাকলেই তো আর শিকারি হয় না কেউ। কতরকম, কত দিশি বিদেশি, আর কত্ত জাতের শিকারিই যে, দেখল ওরা আজ অবধি।

পটাপট চারটে খেয়ে উঠল পরেশ। মেয়েটা খল-বল করছিল। মেয়েমানুষের দু-ঊরুর মাঝের আনন্দর স্বাদ পেতে তাকে কিশোর বয়েসে একবার বাধ্য করেছিল পাড়াতুতো এক দশ বছরের বড়োদিদি। ধর্ষিতা নারীদের-ই মতন, সেও ধর্ষিত হওয়ার পর থেকে ব্যাপারটাকে কোনোদিনও স্বাদু বলে মনে করতে পারেনি। প্রচন্ড শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট হয়েছিল ওর। তারপর থেকে এ-ব্যাপারটার প্রতিই এক অসূয়া জন্মে গেছে পরেশের। পরেশ অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রচন্ড নারী-বিদ্বেষীও। নারীসঙ্গর চেয়ে অনেক-ই বেশি আনন্দ পায়, পরেশ উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে এসে থেকে।

মেয়েদের প্রতি ওর এই অনাসক্তি দেখে অনেকে ভাবে যে, ও নপুংসক। কিন্তু পরেশ নিজে জানে ও কী। কৈশোরের ওই দুর্ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের প্রতি ওর এক তীব্র বিদ্বেষ জন্মে গেছে। তা ছাড়া, ওর ধারণা হয়েছে যে, মেয়েরা পুরুষকে পুরুষ হতে বাধাই দিয়েছে চিরটাকাল। শালা আদম যা করেছিল, তা করেছিল, আদম মূর্খ ছিল বলে পরেশ কেন মূর্খ হতে যাবে? যতটুকু দাম মেয়েদের প্রাপ্য ঠিক ততখানি দাম-ই দেয়

তাদের।

সেটুকুর এককণাও বেশি দাম দিতে রাজি নয় ও।

ভুটানি মেয়েটা পরেশের ঔদাসীন্যে ব্যথিত হয়। গতবছরও এসেছিল ওরা। তখনও হয়েছিল। মদ আর মেয়েমানুষ একসঙ্গে থাকলে, শুধু মদ নিয়ে সন্তুষ্ট কম পুরুষ-ই থাকতে চায়। এমন-ই জেনে এসেছে মেয়েটি রুপোপজীবিনী হওয়ার দিন থেকে।

পরেশ অন্যরকম। পরেশ, কড়ায় গন্ডায় নিজের ফেরত পয়সা বুঝে নিয়ে, মরা বিকেলের হলুদ আলোয় কমলা-রঙা মুখ ও বুকের ভুটানি মেয়েটির দিকে একবারও না তাকিয়ে মাচার দিকে ধীরপায়ে এগোতে থাকে। ওর বন্দুক ও সঙ্গে করেই এনেছিল। যমদুয়ারে এসে একমুহূর্তও বন্দুকটা হাতছাড়া করাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বন্দুকটা কাঁধের ওপর ফেলে, দু টি হাত লাঠির মতো করে শুইয়ে-রাখা বন্দুকের ওপর রেখে দিয়ে হাঁটে সে, ফিরে চলে বাথানের দিকে।

বেলা পড়ে এসেছে। ছায়ারা ঝুপড়ি হয়েছে। নিবাত নিষ্কম্প বন, ভরে উঠেছে নানারকম মিষ্ট-কটু-কষায় গন্ধে।

মাচার দিকে এগোতে দেখতে পেল পরেশ যে, ছাত্তার বন-বাংলো থেকে জিপে করে ক্যামেরন সাহেব আর সেই পাঞ্জাবি মেয়েটিকে নিয়ে মাচার দিকেই আসছে।

মাচা অবধি এলে জিপের শব্দে বাঘ যেখানেই থাকুক হুশিয়ার হয়ে যাবে। মাচা অবধি আসার মতো বোকামি ছাত্তার করবে না যে, তা পরেশ জানত। পরেশ ভেবে পেল না যে, বড়োবাঘ মারবে ক্যামেরন সাহেব, সঙ্গে ওই রিঙ্কি নামের মেয়েটি কী করতে আসছে?

বাঘ-শিকার খেলা নয়। এমনকী মাচায় বসে, বাঘ-শিকার দেখাটাও খেলা নয়। অনভিজ্ঞ বাক্যবাগীশেরা অর্বাচীনের মতন যা-খুশি বলতে পারেন। মাচাতে হেগে-মুতে দিতে দেখেছে। কত বড়ো বড়ো শিকারিকে, শুধু বাঘ দেখেই! বাঘ তো শুধু একটা জানোয়ার মাত্র নয়। বহু শতাব্দীর রূপকথা, লোকগাথা, কুসংস্কার আর ভয়ের জীবন্ত প্রতীক। প্রকৃত বুনো-বাঘ যখন প্রতিবারেই সামনে এসে দাঁড়ায়, স্যাংচুয়ারির বসে-খাওয়া, ঘাড়ে-গর্দানে-হওয়া বাঘেদের, কুলাঙ্গারদের কথা বলছে না পরেশ, তখন বুকের মধ্যে, পেটের মধ্যে যে, কী হয়, তা পরেশ-ই জানে।

যেসব আরামকেদারা-বাসী, কিতাব-দুরস্ত, সাহসী সমালোচক, মাচায় বসে বাঘমারা শিকারের মধ্যেই পড়ে না, একথা ঠেটি বেঁকিয়ে বলেন, তাঁরা বনের বাঘকে তার স্বাভাবিকতায় কোনোদিনও দেখেননি। স্যাংচুয়ারির বা চিড়িয়াখানার পোষা বাঘ নয়। জঙ্গলের আসল বাঘ। লজ্জাহীন মেয়েদের সব সৌন্দর্যই যেমন মাটি, পরাধীন এবং কোনোরকম ভয়ের কারণহীন বাঘেদের অস্তিত্বও তেমন-ই। ফাঁকা, মিথ্যে। তারা সত্যিই তাদের নিজ নিজ জাতের কুলাঙ্গার।

ভয়াবহতা না থাকলে, বাঘের বাঘত্বই লোপ পায়।

মাচা থেকে দু-শো গজ দূরে ওদের নামিয়ে দিয়ে জিপ ফিরে গেল বাংলোতে। পরেশ কাছে গিয়ে দেখল, ক্যামেরন আর রিংকি দু-জনেই নেশাতে একেবারে চুর। ক্যামেরনের হাতে একটি হুইস্কির বোতল। সবুজ চৌকো দেখতে বোতলটা। নাম অ্যানসেস্টর। রিঙ্কি মেমসাহেব পিঙ্ক-রঙের একটি টাইট ব্লাউজ পরেছে, পিঙ্ক-রঙা স্কার্ট। ব্লাউজের তলাতে কিছু পরেনি। বোঝা যাচ্ছে। ওই শহুরে, ইংরিজি জানা মেয়ের, মোমের তালের মতো বুকের চেয়ে, একটু আগে দেখা ভুটানি মেয়ের পাকা মাকাল ফলের মতো শক্ত, লাল বুকের সৌন্দর্য অনেক-ই বেশি। যদিও মেয়েদের বুকের দিকে চোখ পড়লেই পরেশের গা-গোলায়, বমি-বমি পায়। তবু চোখ পড়ে গেল বলেই দেখল।

নারীরা নরকের-ই কীট। ওর হাতে ক্ষমতা থাকলে পৃথিবীর সব মেয়েদের ও গুলি করে মেরে দিত। পুরুষদের এবং এই পৃথিবীর সমূহ সর্বনাশ করছে ওরা। ওদের প্রতি কোনো দুর্বলতাই নেই পরেশের।

ছাত্তার বলল, পরেশকে, সাহেবদের সঙ্গে তুই-ই বোস পরেশ, বড়োমাচাতে।

পরেশ তীব্র আপত্তি জানাল।

ওর বমিই হয়ে যাবে। কোনো মেয়ের শরীরের অত কাছে থাকলে,

ঘেন্নাতেই ওর বমি হয়ে যাবে। কিন্তু ছাত্তার নাছোড়বান্দা। তা ছাড়া, ছাত্তার-ই তাকে সঙ্গে করে এনেছে। শিকারে কাউকে-না-কাউকে নেতা বলে মেনে নিতেই হয়। শুধু শিকার কেন, সমস্ত মারণযজ্ঞেই নেতার ভূমিকা থাকেই। সবাই যেখানে নেতা, সেখানে মারামারিটা প্রায়ই নিজেদের মধ্যেই ঘটে যায়।

অতএব ক্যামেরন এবং রিঙ্কি মেমসাহেবের টলমল পায়ে মাচার ওঠার পরেই পরেশকেও উঠতে হল। রিঙ্কি-মেমসাহেব যখন উঠছিল মাচাতে, দড়ি দিয়ে বানানো সিঁড়ি বেয়ে দুলতে দুলতে, তখন নীচে-দাঁড়ানো পরেশ তার গোলাপি স্কার্টের ফাঁকে তার গোলাপি উরু এবং নিতম্বর আভা দেখেছিল। তখন সংকোশ নদীতেও শেষ সূর্যের গোলাপি আভা। রিঙ্কি মেমসাহেব স্কার্টের নীচেও কিছু পরে নেই, বুঝেছিল পরেশ।

এই ঊরুর আভা দেখার পরমুহূর্ত থেকেই পরেশের বুকের মধ্যে একধরনের কষ্ট শুরু হল। সেই কষ্টর কথা ও আগে কোনোদিনও জানেনি। সে কষ্টটা, মেয়েদের প্রতিবছরের পর বছর ধরে জমিয়ে তোলা, ওর তীব্রঘৃণার চেয়েও অনেক বেশি তীব্রকষ্ট। সে-কষ্টের নাম ও জানে না। তাকে আগে জানেনি কখনো। এই কষ্ট নিশ্চয়ই কোনো রিপুজাত। সেই রিপুর সঙ্গে পরিচয় ছিল না আগে।

সত্যিই বড়ো কষ্ট হতে লাগল পরেশের।

বাঘটার আসার কথা, ভুটান পাহাড়ের দিক থেকে। পায়ের দাগ তাই-ই বলে। এমন গহন জঙ্গলে বেলা থাকতেই বাঘ এসে হাজির হওয়ার কথা। বিশেষ করে, আগের রাতের শেষে করা মড়ি খেয়েও গেছে একটুখানি। অতএব..।

সূর্য ডুবে গেছে কিন্তু পশ্চিমাকাশে গোলাপি আভা আছে এখনও। সংকোশ নদীর বুকে যে, নুড়িময় চর জেগেছে, এখন সেখানে একদল গোলাপি-মাথা বিদেশি হাঁস আর হাঁসী স্বগতোক্তি করছে, দিনশেষের আগে। তাদের ঠোঁট দিয়ে পালক পরিষ্কার করছে। মাচার ওপরের এই গোলাপি শরীরের হাঁসীটির-ই মতো, রিঙ্কি।

ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে। সন্ধের ঠিক আগের মুহূর্তে বনের গভীরে আলো মরে যাওয়ার দুঃখে যে-রুদ্ধশ্বাস শোক পালিত হয় কয়েক মুহূর্ত; প্রাণী, পশু, গাছপালা যখন স্তব্ধ হয়ে থাকে স্বল্পক্ষণ, সেই মুহূর্তটিতেই এসে দাঁড়িয়েছে এখন দিন। এই মুহূর্ত পেরোলেই রাত নামবে।

ক্যামেরন আর রিঙ্কি বোতলটা থেকে ক্রমাগত খেয়েই চলেছে। খেয়ে, পরেশের উপস্থিতিতেই এমন এমন কান্ড করছে যে, পরেশের মনে হচ্ছে, ওরা যেন তাকেও কোনো পাথর বা গাছ বা ফুল বলে মনে করছে। মানুষ তো দূরের কথা, গাছেরাও যে, দেখতে পায়, তা কি ওরা জানে না। আর পরেশ তো মানুষ-ই। জলজ্যান্ত শক্ত-সমর্থ একজন মানুষ।

অন্য দিন হলে, ও ঘৃণাতে মুখ ফিরিয়েই থাকত কিন্তু আজকের এই নতুন অনুভূতি ওকে চোখ ফেরাতে দিচ্ছে না। ও যত ওইসব দেখছে, যতই বুঝছে যে, মাতাল বুড়োর দাঁতহীন কামড়ে এই যুবতী মেয়ের ছটফটানি যতই বেড়ে যাচ্ছে, ততই সেই ছটফটানিটা যেন পরেশের ভেতরে চাড়িয়ে যাচ্ছে।

আজকে কিছু একটা ঘটবে।

পরেশ নিজেকে বলল। মনে মনে। সত্যিই সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। বাঘ শিকারে এসে আজ নিজেই শিকার হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ বছরের পরেশ। জঙ্গলের সব কিছুই ও জানে চেনে। এই নতুন গোলাপি মেয়ে জানোয়ারের দাঁত নখ-এর খবর-ই শুধু জানা নেই ওর। কীভাবে আক্রমণ করে তাও জানা নেই। আক্রমণ প্রতিহত করার প্রক্রিয়াও নয়।

অন্ধকার হওয়ার পর-ই বাঘটা ডাকল একবার। আশ্চর্য! বাথানের দিক থেকেই। মোষগুলোযে, বাথানের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে, নাক দিয়ে মুখ দিয়ে নানারকম শব্দ করছে তা, এতদুরে বসেও শোনা গেল।

আশ্চর্য তো! বাঘটা কাল রাতে মড়ি করেছে, আসবেও এখানেই। তবুও মোষেদের বাথানের কাছে একবার না গিয়ে পারল না।

পরেশের মনে হল, রোজ-ই একবার করে ভয় দেখিয়ে যায় সম্ভবত বাঘটা, বাথানে মোষেদের ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করবার জন্যে।

কুমারগঞ্জের মুদির দোকানি মধুদা যেমন রোজ-ই ধার দেওয়া বন্ধ করে দেবে বলে ভয়ে খাবি-খাওয়ায় পরেশকে। নখ-দন্তঅলা জানোয়ার আসলে শহরে-গঞ্জেই বেশি আছে জঙ্গলের চেয়ে। মধুদার মতো, ক্যামেরন সাহেবের মতো। তবে ওদের দাঁত-নখ দিয়ে ফালা ফালা করে দিলেও রক্ত পড়ে না। এই যা তফাত।

অনেকের দাঁত-নখে সত্যি ধারও থাকে না, যেমন ক্যামেরনের। কিন্তু তবুও দাঁত-নখ দেখিয়েই তারা সহজে কাজ হাসিল করে। আলমারিতে, ব্যাঙ্কে, তাকের পর তাক তাদের দাঁত-নখ সাজানো থাকে। কাগজে-ছাপা নখ, রুপোর দাঁত, সোনার থাবা। পরেশ জানে। জানে বলেই, বাঘের চেয়ে এদের অনেক-ই বেশি ভয় করে ওর। বাঘের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ তো জানাই। কিন্তু এদের ঘোঁৎ-ঘাঁৎ জানা যায় না। সব শিকারের-ই নিয়মকানুন থাকে। শিকারি এমনকী শিকাররাও সেই অলিখিত নিয়মকে মেনে চলেই। কিন্তু এইসব শিকারিরা কোনো নিয়ম, কোনো বিবেকের-ই ধার ধারে না।

ঘনান্ধকার নেমে এসেছে এখন। জঙ্গলের চন্দ্রাতপের নীচে অন্ধকার গাঢ়তর হয়েছে। একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। রাতপাখিরা ডাকছে থেকে থেকে। অনেক পাখি। ছাত্তার ওদের সকলের নাম-ই জানে। পরেশ ডাকগুলো চেনে; কিন্তু নাম জানে না।

বাথানের কাছ থেকে সেই যে, ডেকেছিল বাঘ, সেই ডাক থেমে গেছে

অনেকক্ষণ। এবারে সে বোধ হয় মড়ির কাছাকাছিই এসে গেছে। খুব-ই সন্তর্পণে আসবে। চারদিক দেখে নেবে। অসম্ভব না হলে, গোল করে চক্কর মারবে চারদিকে। তারপর মড়ির কাছে কোনো বিপদ যে নেই, সে-সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেই মড়িতে আসবে। সন্দেহ যদি একটুও হয়, তাহলে সে ফ্রিজ করে যাবে, সিনেমার শট-এর মতন। নাম বাঘ। তার ধৈর্যর কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। এক-ই জায়গাতে ঘাপটি মেরে বসে থাকবে হয়তো, মাচার কাছেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ছায়ার সঙ্গে মিশে থাকবে। ও জানোয়ারের চরিত্রে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। পৃথিবীর সবটুকু সময়কে তার থাবার নীচে নিয়ে বসে থাকে সে। হঠকারিতা তার চরিত্রেই নেই।

সেই কারণেই বাঘে-করা মড়ির ওপরে ধ্যানে-বসা মুনি-ঋষিদের-ই মতো নীরব, নিষ্কর্ম হয়ে বসে থাকতে হয় শিকারিকে। কিন্তু পরেশের মাচায় যেসব কান্ড-মান্ড চলছে–হি-হি হা-হা, উঃ-উঃ-ইঃইঃইঃ, কাতুকুতু, সুড়সুড়ি, ফুঃ, তার বিচিত্র আওয়াজে বাঘ তো দূরস্থান বনবেড়ালও মাচার এক মাইলের মধ্যে আসবে বলে মনে হচ্ছে না আজ রাতে।

ছাত্তারকে অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তবে কোনোই সাড়াশব্দই নেই ছাত্তারের মাচা থেকে। কী করছে সে, ভূতের মতন নিঃশব্দ নিঃসাড় হয়ে, তা সেই জানে। সেও আজ বাঘ। হয়ে গেছে।

ছাত্তার আধ ঘণ্টাটাক পরে চেঁচিয়ে বলে উঠল, এই পরেশ। এই

হারামজাদা কি বাঘ মাইরবার লইগ্যা আইছে যমদুয়ারে? না লদকা লদকির লইগ্যা? যে-জিনিস খাটে শুইয়াই করন যায়, তা করনের লইগ্যা সেগুন গাছের মাচার কী কাম বুঝি না। চল চল। লাম। ফিইরা যাই চল। কী খিটক্যাল। কী খিটক্যাল। ওই বুড়ার মাগ্যে আমিই গুলি করুম আজ। দেইখ্যা লইস তুই। হালায় হারামির পুত।

পরেশকে মাচা থেকে নামতে দেখেই ক্যামেরন হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, হামারা টাইগার কঁহা? টাইগার?

ছাত্তার তার মাচা থেকে নামতে নামতে, নিজস্ব ভাষায় নিজের মনেই বলল, ওই ম্যামছাহাবের দুই ঠ্যাঙের ফাঁকে ভালো করি দ্যাখবার কয়্যা দে পরেশ, হারামি ছাহেবরে। বাঘ মারন লাগব না আর। তার বাঘ সেখানেই শুইয়া আছে। এ হালার লাইন-ই ভিন্ন। ছ্যা: ছ্যা:। টঙে বইস্যা।

ছ্যা: ছ্যা: পরেশের গা ঘিন ঘিন করে উঠল। এক বিচ্ছিরি দৃশ্য। তায়, এত বিচ্ছিরি করে তার বর্ণনা দেওয়া।

পরেশ আসলে কবি। প্রকৃতিপ্রেমিক। ওর সূক্ষ্মরুচিতে বড়ো ধাক্কা লাগল।

গাছ থেকে নেমেই ওয়াক ওয়াক করে বমি করে ফেলল পরেশ। পরেশ আবার পুরোনো পরেশ হয়ে গেল। ছাত্তার-ই তাকে ফিরিয়ে আনল ওইরকম বর্ণনা দিয়ে। ভালোই হল। পরেশ যা নয়, তাই হতে যাচ্ছিল। পরেশ যা ছিল, তাই হতে পেরে; খুশি হল খুব। প্রচন্ড নারীবিদ্বেষ আবার

স্বাভাবিক করে তুলল তাকে।

ক্যামেরন, রাইফেল তুলল মাচাতে বসেই পরেশের দিকে। বলল, কাম আপ ইউ সান অফ আ বিচ। হোয়্যারস মাই টাইগার?

ছাত্তার ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পরেশের।

সে মুখ তুলে বলল, ম্যামসাহেবের ঠ্যাঙের ফাঁকে তর বাঘ আছে হারামির পুত। বড়োবাঘ মারতে আইছে হালায়।

ক্যামেরন রাইফেলের নল তুলল ওদের দিকে।

মাতালের ঠিক নেই। সব মাতালের তাল ঠিক থাকে না। কী করতে কী করে বসে। মুহূর্তের মধ্যে ছাত্তার তার বন্দুক তুলে গুলি করল ওদের দিকে। গুলি Ball ছিল। সেটা গিয়ে গাছের কান্ডে লাগল ক্যামেরনের মাথার একহাত ওপরে। ছাত্তার যেখানে মারতে চেয়েছিল, সেখানেই লাগল।

রিঙ্কি আর্তনাদ করে উঠল। ক্যামেরনও। পরক্ষণেই ক্যামেরন গুলি করল রাইফেল দিয়ে। গুলিটা ওদের তিনহাত বাঁ-দিকে, শালের চারাগাছে পড়ল। মাটি ভেদ করে গেল।

রাইফেলের বজ্রনির্ঘোষ গমগম করে ফিরে এল ভুটানপাহাড় থেকে।

ছাত্তার বলল, চল পরেশ, পালাই। এ হালার মাতালের ঠিক নাই। তায়, হাতে আবার ম্যাগাজিন রাইফেল। যদি গুলি লাইগ্যা যায় আন্দাজে। কওন ত যায় না। কপাল যখন খারাপ হয়, তহন...

ওরা এঁকে-বেঁকে দৌড়োতে লাগল বাংলোর দিকে।

দৌড়োত দৌড়োতে ছাত্তার বলল, হালার পুত এর নিশানাখানা দ্যাখছস। মাচার এক্কেরে নীচে খাড়াইয়া ছিলাম, তাই আমাগো তিনহাত বাঁয়ে ফ্যালাইল রাইফেলের গুলিখানরে। হালায় বড়োবাঘ মারে! খাউক! খাইয়া ফালাক হালারে বাঘে। খুব-ই খুশি হমু অনে।

–এখন কী করবে ছাত্তার! তুমি যে, ওই গুলিটা ওকে ভয় পাওয়াবার জন্যেই করেছিলে, তা তো ও বিশ্বাস করবে না। থানায় গিয়ে বলবে, আমরা ওকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম।

পরেশ, চিন্তার গলায় বলল।

-কউক না। যদি থানায় যায়, হালারে সত্যিই আমি জানে মাইরা থুমু।

–তা তো! কিন্তু এখন কী করবে?

–এখন চল, জিপ চইড়া একটু হাওয়া খাইয়া আসি।

–যাইবা কই?

–রাইমানায় চল। বড়োই রসগোল্লা খাওনের ইচ্ছা করতাছে আমার।

–পাগল হইল্যা নাকি তুমি মিয়া?

-পাগল ক্যান হমু? জিপ লইয়া আমরা ঘুইর্যা-ফিইর‌্যা শ্যাষরাতে মাচার কাছে ফিইর‌্যা যামু। ওই হালার ক্যামেরনের সাধ্য আছে নাকি এই জঙ্গলে মাচা থিক্যা নাইম্যা ওই মাইয়ারে সঙ্গে লইয়া বাংলোয় ফিরনের? ভয়েই মইর‌্যা থাকব অনে পথে। যতক্ষণ আমরা না যামু, ততক্ষণ-ই হালার শাস্তি।

–লাভ কী অইলো? বাঘ ত মারা হইলো না। টাকাটা ত দিব না। শুদামুদা হয়রানি।

-থাম ত। বাঘ মারতে কী লাগে? ওর লইগ্যা মারলে মারুম। যদি হালায় টাকা দ্যায়। নইলে বাঘ এমনিই মাইরা, চামড়া বেইচ্যা দিমু অনে লহর শ্যাখরে। ধুবড়িতে। চইল্যা যাইব গিয়া সে চামড়া, গৌহাটি। আমেরিকানরা বহুত-ই দামে লইয়া যাইব গিয়া। যে টাকা, ওই ক্যামেরনে দিত, চামড়া বিক্রি কইর‌্যা তার থিক্যা অনেক-ই বেশি পামুনে। টাকা টাকা করস ক্যান? আমরা কি ভিখারি? যদ্দিন হাতে বন্দুক আছে, তদ্দিন না খাইয়া মরুম না। শুনছস? কান খুইল্যা শুইন্যা রাখ।

হ, পরেশ বলল, মাথা নীচু করে।

বাংলোতে পৌঁছেই দেখল, ড্রাইভার উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। ড্রাইভারও ধুবড়ির। সাহেব তো ভাড়ায় এনেছে জিপ, ধুবড়ি থেকে। ড্রাইভার আনসারকে বলল ছাত্তার, চল রে আনছার ভাই, রসগোল্লা খাইয়া আসি।

ড্রাইভার আনসার বলল, চিন্তিত গলাতে, সাহেব যদি ভাড়া-মাড়া লইয়্যা গোলমাল করে? ও ছাত্তার ভাই। পরে সামলাইব কেডায়?

–ছাড়ান দে তো। ওর পেন্টুলুন খুইল্যা ফ্যালাইম না। মাগিটারে রাইখ্যা দিমু অনে। তারপর নেপালিগগা বাথানে পৌঁছাইয়া দিয়া আসুম। এক্কেরে ঘিই-বানাইয়া থুইব তারা অরে। ওইসব পিঁয়াজি আমার থনে মারন লাগব না। আমার নাম আবু ছাত্তার। হালার ক্যামেরনের কি চিনন বাকি আছে নাকি আর আমার? মুই ভালোর সঙ্গি ভালো, খারাপের সঙ্গি যম। হঃ। হালায় ভালো কইরাই জানে তা। কুননাই চিন্তা নাই তগো। চল চল, রসগোল্লার লইগ্যা মনটা হাঁচোর-পাঁচোর করতাছে।

খুব জোরে জিপ চালিয়ে আনসার যখন রাইমানাতে পৌঁছোল, রাইমানার ছোট্টমিষ্টির দোকানের মালিক, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে, বাড়ি যাওয়ার তোড়জোড় করছিল।

ঠিক সময়েই ওরা গিয়ে হাজির। রসগোল্লা গরম-ই নেমেছিল সবে।

আনসার বলল, যা হইল্যো তা ভালোর-ই জন্য। মোর প্যাটটা নরম হয়্যা ছিল সকাল থিক্যা। ধইর‍্যা যাইব গিয়া গরম রসগোল্লা খায়্যা।

দোকানের মালিক ঘাঁটু বলল ছাত্তারকে, খান খান যতগুলা খুশি খান। পয়সা কিন্তু নিমু না।

–ক্যান? পয়সা নিবি না ক্যান? আমরা কি তোর কুটুম?

-কুটুম না অইলে হয় কী! সেই মাঘমাসে আইছিলেন না ছাত্তারদা। যা হরিণের মাংস খাওয়াইছিলেন, কী কম। আমার বউ তো কয়, মুখে লাইগ্যা আছে এহনও। এবারে কী হইল শিকার? কারে লইয়া আইছেন?

পরেশের মুখটা চিরদিন-ই খারাপ।

বলল, এবারে যা শিকার হইতাছে, তা খাইলে তোমার প্যাটও নরম হইয়া যাইব গিয়া ঘাঁটু, আনসারের-ই মতন। সব খাদ্য, সব শিকার; খাইতে পারে কি হক্কলে? ত্যামন ত্যামন খাদ্যর লইগ্যা, ত্যামন ত্যামন প্যাটের দরকার।

ঘাঁটু কথার মানে না বুঝে, হাঁ করে চেয়ে রইল পরেশের মুখে।

ছাত্তার মুখভরা রসগোল্লা নিয়ে মুখ-বন্ধ-করা অবস্থাতেই ফিচিক-ফিচিক করে হাসতে লাগল।

এমন সময় বাসটা এল। শেষ বাস। জানলার খড়খড়ি খড়খড়িয়ে গ্যাটিস লাগানো টায়ারে ভটর-ভটর আর ঢিলে বনেটে ঝ্যাকর-ঝ্যাকর শব্দ করে,

পেট্রোল-ট্যাঙ্কের মুখ থেকে উপচে-পড়া পেট্রোলের তীব্রমিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে।

বাসটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তেই ড্রাইভার, বয়েস-হয়ে-যাওয়া বাইজির পেল্লাই মাই-এর মতো চামড়া ফাটা-ফাটা বালব-হর্নটি জম্পেশ করে ধরে, তিনবার টিপল, প্যাঁকু-প্যাঁকু-প্যাঁকু।

রওনা হবে আবার উলটো পথে। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নির্জন পথ। প্যাসেঞ্জার বেশি থাকলে সাহস হয়। এই দিকে নেই, এমন জানোয়ারও তো নেই।

বাসটার দিকে চেয়ে থেকে রসগোল্লা খেতে খেতে হঠাৎ-ই পরেশ উঠে দাঁড়াল তোক করে। ঘটি চেয়ে, হাতটা পথে ধুয়েই বলল, ছাত্তার ভাই, আমি চলি। ডাক আইছে আমার। দাদায় আমারে ডাকে। তুমি ওই ম্যামসাহেব আর বুড়ারে সামলাইনে।

ছাত্তার ভুরু তুলে তাকাল একবার ওর দিকে।

পরেশ ততক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে দোকান ছেড়ে, ড্রাইভারের পাশের ভালো সিটে বসবে বলে। বাসের ড্রাইভারও বন্দুক-কাঁধে পরেশ শিকারিকে দেখে খুশি হল। এই রাস্তায়, সঙ্গে শিকারি থাকলে বুকে বল লাগে। বড়োবাঘ, পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায়ই হুয়াও-হুঁয়াও করে।

ড্রাইভার বলল, আজ কিন্তু তামাহাটেই থাকন লাগব পরেশদা। বাস তো

ওই অবধিই যাইব।

–তুই থাকবি কই?

–আমি তো গুলাবচাঁদজির গদিঘরে শুইয়া থাকুম। বারান্দায় খাঁটিয়া টাইন্যা লইয়া। গরমের দিনে শোওনের চিন্তা কী?

–আর খাওন-দাওন?

–গুলাবচাঁদজির শেঠানি পুরি-তরকারি দিয়ে অনে। ফুট-ফরমাশ খাইট্যা দিই না কত্ত? ধুবড়িতে পুর্চা পৌঁছাইয়া দ্যাও, কচুগাঁতে মাইয়ার বাড়ি আচার পৌঁছাইয়া দ্যাও, কারিপাতা গাছ থিক্যা পাতা ছিইড়া আনো বন খুঁইজা। খাওইব না ক্যান? ভাবনা কী? আপনেও খাইবেননানে আমার লগে।

–নাঃ আমি মনা মিত্তিরের বাড়ি চইল্যা যামু।

–মনা মিত্তির নাই। ধুবড়ি গ্যাছেন গিয়া।

–বাচ্চু আর পাঁচু তো থাকব। মানিকদায়, গল্প করে ভারি মজার। কী কও পাঁচু?

–হঃ। যা কইছেন পরেশদা। ওয়ার-রিটার্ন মানুষগুলানের ব্যাপার-স্যাপার-ই আলাদা। কী কন?

-হ। এক্সপিরিয়েন্স-এর দাম নাই? পুরুষ মানষে যদি দুনিয়াই না দ্যাখল, তয় কইরবার মতো কইরলটা কী?

আনসার অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। মানে, বাসটার দিকে। পরেশের কম্বল, সুজনি, বালিশ সব পড়ে আছে নেপালিদের বাথানেই। জঙ্গলে তখনও রাতে বেশ ঠাণ্ডা। লোকটা বলা নেই, কওয়া নেই অমন হুট করে চলে গেল! আরও অবাক হল ও, ছাত্তার ভাইও ওকে কিছুই বলছে না বলে।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তারও হাত ধুয়ে বাসের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পরেশকে বলল, ফিরনের পথে কুমারগঞ্জে তর সঙ্গে দেখা কইরা যামু আনে।

–দেখি, কী হয়।

–যা হয় অইব। তোমারে কি অবিশ্বাস করি আমি?

–না। সেকথা...

–ঠিক আছে।

–যাই।

–যাওন নাই। আসো।

জিপটা চলে গেল। একটু গিয়েই, বন বিভাগের চেক-নাকাটা পেরিয়েই, টপ-গিয়ারে ফেলে, হেডলাইটটা ডিপার করে দিল আনসার। তারপর গভীর বনের মধ্যের রাস্তায় জিপের স্পিড বাড়িয়ে বলল, অদ্ভুত মানুষ এই পরেশদা। না, ছাত্তার ভাই।

রসগোল্লা খেয়ে ছাত্তার মুখে গুয়া-পান দিয়েছিল।

বলল, সব মানুষ-ই অদ্ভুত। মানষের ছা তো আর জানোয়ারের ছা লয় যে, একইরকম অইব। আমাগো পরেশ হইল গিয়া পোয়েট। ভাবুক। যহন অর যা মুড হয়, বাবু ঠিক তহন-ই তাই করেন। আমারও খুব ইচ্ছা যায়, পরেশ হইয়া যাই। কিন্তু ঘরে বিবি আছে, পোলা-পান; ক্ষুধা; এইটা চাই, ওইটা চাই। এই জীবনে যহন যা ইচ্ছা করে, তাই-ই করনের মতো কঠিন কাম আর কিছু নাই রে আনসার। আমরা পারি না, পারি নাই; পরেশ পারছে। লোকে ওরে ভ্যাগাব, দায়িত্বজ্ঞানহীন, লোফার কয়। কয় তো কয়! হ্যাঁতে পরেশের কিছুই যায়-আসে না। নিজের জীবনের স্টিয়ারিং অর নিজেরই হাতে। আমাগো মতন বেড়ি নাই দ্যাখ, তুই জিপ চালাইতাছস আর আমি বইস্যা আছি তোর পাশে।

নিজের জীবনের গাড়ি নিজে চালাইতে না জানলে শুদামুদা বাঁইচ্যা কোনোই লাভ নাই।

লোক ভরে যেতেই, বাসটাও ছেড়ে দিল।

পরেশ, ড্রাইভারের পাশে বসে ভাবছিল, দাদার অসুখের কথা মনে পড়াতেই যে, ও ফিরে যাচ্ছে। শুধু তা নয়, তা ছাড়াও আরও কিছু ছিল।

ওই রিঙ্কি মেয়েটার শরীর ওর সমস্ত শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। এমন যন্ত্রণা ও কখনো ভোগ করেনি। মেয়েরা হল গিয়ে পুরুষের শত্রু। ওদের ওই শরীরের মধ্যে জাদু আছে। পুরুষ হল, বহির্মুখী জীব। বনে-পাহাড়ে বন্দুক হাতে ঘুরে বেড়ানোই তার কাছে জীবনের সব। ওই মেয়েটা তাকে বন্দি করতে চেয়েছিল, না চেয়েই। অনেক বিপদের হাত থেকে বেঁচে সে, এই পঁয়ত্রিশ বছর পথ পেরিয়ে এসেছে। ওই লোভের পথে পা বাড়াবে না বলে, নিজের ভেতরে এই মেয়ে জাতটার প্রতি এক গভীর ঘৃণা জমিয়ে তুলেছে ও। সংসার, ছেলে-মেয়ে, রান্না বান্না, অসুখ-বিসুখ এসব সে দাদার পরিবারে থেকেও জেনেছে। ওপর ওপর দাদার জন্যে বউদির জন্যে যতটুকু পেরেছে, করেছে। টাকাপয়সা, তারা যা দেয়, তার থেকেও বেশি দিয়েছে চিরদিন। কোনো গদিতে থাকলে ওর চেয়ে কম খরচে ওর চলে যেত দিন। বিবেকের কারণেই পারেনি। তবে নিজের সংসার করার মতো মূর্খামি এতখানি পথ পেরিয়ে এসে, সে করতে রাজি নয়। তা ছাড়া ও মেয়ে তো সংসারের মেয়ে নয়। বাজারের মেয়ে। যাদের নষ্ট করার মতো অঢেল টাকা আছে ক্যামেরনের মতো, তারাই পারে ওরকম বাজারি মেয়ের সঙ্গে বাজার করতে। ওইসব মেয়ের ধর্মই পুরুষকে নষ্ট করা। যার ঘর আছে, তার ঘর ভাঙা। যার ঘর নেই, তাকে ঘরের মিথ্যে স্বপ্ন দেখানো। বেঁচে থাকলে, শিকার অনেক-ই করবে,

টাকাও রোজগার করবে শিকার করে। মানে মানে প্রাণ নিয়ে, তার স্বাধীনতা নিয়ে, সে তাই পালিয়ে এসেছে।

পরেশ ভাবছিল, তার শরীরটা তার সঙ্গে এই প্রথম বেইমানি করল। তার শরীরমধ্যে এত হাজার কাঁকড়া ঘুমিয়ে ছিল, তাদের দাঁড়ার কামড় যে, এমন-ই ভীষণ; তা আগে কখনো জানেনি ও। খোলা হাওয়ায় শেষচৈত্রের বনের রাতের গন্ধে, পরেশের মন আবার খুশিতে ভরে উঠেছে।

ড্রাইভার বলল, বিড়ি খাবা নাকি একটা পরেশদা?

–দ্যাও।

বলে, পরেশ হাত বাড়াল।

তারপর বিড়িটা, হাওয়া আড়াল করে ধরিয়ে, জোর ধোঁয়া ছাড়ল একবুক।

–আঃ। শান্তি; বড়ো শান্তি। বড়ো আনন্দ এই আগল-খোলা, বাঁধন-হারা জীবনে। এই শান্তির কথা ঘরে, ঘরে নিজের নিজের বউ নিয়ে জাবর-কাটা, খোঁটায়-বাঁধা পুরুষেরা কল্পনাও করতে পারে না।

শিলি নদীতে চান করতে গেছিল আজ। বহুদিন পরে।

পাশের বাড়ির মুনিয়াও গেছিল সঙ্গে। ও বলল, বাড়িতে অনেক কাজ। তাই তাড়াতাড়ি চান সেরে উঠে চলে গেছে আজ ও।

রোজ তো বাড়িতে চান করে। ভোলা কুয়োর জলে, ঘেরা বাথরুমে। সপ্তাহে একবার করে আসে নদীতে। ভালো করে পা ঘষে, মাথা ঘষে, সঙ্গে কেউ থাকলে, তাকে বলে পিঠে সাবান দিয়ে দিতে। তারপর অনেকক্ষণ সাঁতার কাটে। নদীর স্রোত তার উলঙ্গ শরীরের আনাচে কানাচে বয়ে যায়। অননুভূত অনুভূতিতে সারাশরীর আরামে আবেশে ভরে যায়। জলের যে, কত সহস্র হাত, আঙুল তা যারা নদীতে অবগাহন না করেছে তারা জানে না। তার শরীরের গোপন, অসূর্যম্পশ্যা জায়গাগুলি সেইসব আঙুলের আদরে শিরশির করে ওঠে। ভালোলাগায় মরে যায় শিলি। কত কী কল্পনা করে সেইসব মুহূর্তে, কত সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে ওঠে। যেসব স্বপ্ন, শিশুকালের পুতুল খেলার দিন থেকে প্রত্যেক মেয়েই বুকে করে বড় হয়; সেইসব স্বপ্নই জলের তলায়, দুপুরের নিরিবিলিতে সত্যি হয়ে উঠতে থাকে এক এক করে।

মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে অনেকক্ষণ থাকে জলের তলায় চোখ খুলে। জলের নীচের হলদেটে সবজে আলো প্রতিসরিত হয়ে গিয়ে, তার দু-চোখের মধ্যে দিয়ে তার মস্তিষ্কের ভেতর নানা নরম রং ছড়িয়ে দেয়।

দুপুরের এই সময়টা নদীপারে কেউই থাকে না। কোনো নৌকোও এই সময় থাকে না নদীতে। জোয়ারভাটা দেখেই ওরা তরী বায়। সকালে জোয়ারে ভেসে যায়, বিকেলে ভাটায় ফেরে।

শাড়ি-শায়া-ব্লাউজ সব নদীপারের একটি ঝোঁপের ওপরে খুলে রেখে

এসেছিল। চান করে যে, নতুন শাড়ি পরবে, তাও। যখন-ই আসে, তখন এমন-ই করে।

জলে অনেকক্ষণ পড়ে থাকার পর যখন তার হাত-পায়ের আঙুল, মুখের চামড়া ঢেউ খেলানো হয়ে গেল, শরীরে নদীর সব স্নিগ্ধতা বসে গেল, তখন-ই শুধু নদী ছেড়ে উঠল ও। জল ছেড়ে নগ্ন, রোদ-পিছলানো শরীরে ও যখন ঘুঘু-ডাকা নদীপারে উঠে আসে জল ঝরাতে ঝরাতে, তখন প্রতিবারেই ওর মনে হয়, ও যেন কোনো জলকন্যা। জলের নীচের কোনো প্রাসাদেই বুঝি ওর বাস। মাটির কোনো রাজপুত্রর দেখা পাবে বলেই যেন, ও মাঝে মাঝে এই মাটির, গাছগাছালির, পাখপাখালির পৃথিবীতে উঠে আসে।

ঝোপটার কাছে তখনও ও এসে পৌঁছোয়নি এমন সময় একটা মাদার গাছের ঝুপড়ি ডাল থেকে কে যেন, মোটা কর্কশ গলায় ডেকে উঠল, শিলি।

চমকে উঠে, প্রথমেই দু-হাত দিয়ে বুক আড়াল করল শিলি। পরমুহূর্তেই বুক খোলা রেখে ও ঊরুসন্ধি ঢাকল দু-হাতে। মেয়েদের শরীরের কোন জায়গাটা যে, বেশি গোপন, পরকে দেখানোতে বেশি লজ্জা; তা বুঝি ক্ষণেকের জন্যে বুঝে উঠতে পারে না ও।

ততক্ষণে গদাই ঝুপ করে গাছ থেকে লাফিয়ে নামে। একটা নীলরঙা

টুইলের শার্ট ওর গায়ে। মিলের ফাইন ধুতি। সে শিলির দিকে দৌড়ে এসে যে-ঝোপে ওর শাড়িটাড়ি ছিল, সেই ঝোপটার আর শিলির মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর চোখে-মুখে মুগ্ধ, লুব্ধ দৃষ্টি। জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, একটিবার হাত সরা শিলি। তোকে একবার দেখি ভালো করে।

শিলি গর্জে উঠে বলে, অসভ্য। জানোয়ার। দাঁড়াও। কাকাকে বলে দেব। কাকা তোমাকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবে।

সরল শিশুর মতো মনের গদাই বলে, শুধু একটু দেখতে চাওয়ার জন্যে পরেশ কাকু গুলি করে মারবে আমাকে? তুই বড়ো কৃপণ রে শিলি! যা নদী দেখল, মাছ দেখল, দেখল জলের শুশুক, এতবড়ো আকাশ যা দেখল, দেখল এত এত গাছ আর পাখি, দেখল আকাশভরা রোদ, তাই দেখতে চাওয়ায় এতবড়ো শাস্তি আমার?

–একবার দেখতে দে শিলি। তোর পায়ে পড়ি। গদাইকে অপ্রকৃতিস্থ দেখাল।

শিলি, এক ধাক্কায় গদাইকে সরিয়ে দিয়ে শাড়ি, জামা সব তুলে নিয়ে দৌড় লাগাল কোনো নিরাপদ আড়ালে গিয়ে ওগুলো পরে নেবে বলে।

আশ্চর্য! গদাই তার পেছনে পেছনে এল না। কোনোরকম অসভ্যতা করল না। শুধু মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল শিলির দিকে। জল-ভেজা ছিপছিপে কালো, লাফিয়ে-ওঠা শিঙি মাছের গায়ে রোদ পড়লে যেমন চেকনাই

ওড়ে, তেমন চেকনাই উড়ল দৌড়ে যাওয়া উলঙ্গ জল-ভেজা শিলির উড়াল শরীর থেকে। পেছনটাও কী সুন্দর। মনে মনে বলল, গদাই। তারপর স্তব্ধ, মুগ্ধ চোখে গদাই চেয়ে রইল, যেদিকে শিলি গেল।

গদাইও কবি। পরেশের-ই মতো। একজন নারী-প্রেমী কবি। অন্যজন নারী-বিদ্বেষী।

গদাই ভাবে, কবি এই দুনিয়ার সকলেই। কেউ কাগজে কবিতা লেখে, কেউ মনে মনে। কেউ কবিতা পাঠায় সম্পাদকের দপ্তরে, কেউ মাকাল গাছের পাতা ছিঁড়ে অদৃশ্য মনের কালিতে সেই গোপন গা-শিউরানো কবিতা লিখে ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। কবিতার যে অনুপ্রেরণা, তার-ই উদ্দেশে, নৈবেদ্যর মতো। বিজয়া দশমীর দিনে পলতেতে আগুন জ্বালিয়ে প্রদীপ ভাসায় যে-মেয়েরা, তারাও গদাই-এর-ই মতো কবিতাই লেখে, প্রদীপের আগুন-রঙা কালি দিয়ে জলের কাগজে। ভাবছিল গদাই।

সবুজ গাছগাছালির মধ্যে ত্রস্ত হরিণীর মতো ছুটে-যাওয়া শিলির দিকে শুভকামনা, মুগ্ধতা, নীরব স্তুতিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে থাকে গদাই, অনেকক্ষণ। নদীর ওপার থেকে উড়ে-আসা শঙ্খচিল ডাকতে ডাকতে উড়ে যায় শিলির মাথার উপর দিয়ে। বহুদূর থেকে নিঃশব্দে গুণ টেনে বাদামি পালতোলা নৌকোকে স্রোতের মুখে আসতে দেখা যায়। আঁতকে ওঠে শিলি। আজ বড়ো বেশিক্ষণ জলে ছিল। নইলে নৌকো আসার সময় তো এ নয়।

গদাইও মনে মনে গুণ টানে। বাদামি পাল তুলে দেয় তার মনের নৌকোয়। জোরে হাওয়া এসে লাগে তাতে। যে-হাওয়াতে জল-ভেজা শিলির নগ্নতার গন্ধ, সেই হাওয়া নাকে নিয়েই ভালোলাগায় মরে যায় গদাই।

তারপর গদাই-লশকরি চালে, বাড়ির দিকে হাঁটে। গদাই মনে মনে ভাবে, শিলিকে বউ না করতে পারলে, তেঁতুলগাছ থেকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলবে ও। শিলিকে ছাড়া ও থাকতে পারবে না। ও যে কত ভালো, শিলিকে-যে ও কত ভালোবাসে তা শিলিকে নিয়ে তার দোরবন্ধ ঘরের পালঙ্কে না শুতে পারলে, কী করে বোঝাবে শিলিকে?

গদাই-এর বুক ভেঙে এক মস্ত দীর্ঘশ্বাস উঠে এসে চৈত্র দুপুরের ঘুঘুর ঘুঘু-র-র-র–ঘু ঘু-র-র-র, ঘুঘুর-র-র-র বিধুর স্বরের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে যায়।

ঝিকা গাছের ডালে বসে বউ-কথা-কও কথা-কও-বউ-কথা-কও।

গদাই না বলে বলে, ও বউ কথা কও। কথা কও। কথা কও না ক্যান?

হাঁফাতে হাঁফাতে বাড়ি ফিরতেই শিলির বাবা বলেন, চান করতে কতক্ষণ লাগেরে তর? তুই কি রাধা হইলি? কোন কৃষ্ণ বইস্যা থাকে তর চান-দ্যাখতে, কদমের ডালে?

ধক করে ওঠে শিলির বুক। থরথর করে ঝড়ের গাছের মতো বুক কাঁপে তার।

বাবা কি জেনে গেছে?

নরেশ বলেন, ক্ষুধায় প্যাট চুই চুই করে। পরেশ আইস্যা বইস্যা আছে। রাঁধন-বাড়নের কাম নাই।

শিলি নীচু গলায় বলে, সব-ই তো রাইন্ধ্যা থুইয়াই গেছি। খালি, গরম গরম ভাত লামাইয়া দিমু আনে পাঁচ মিনিটেই।

বলেই, রান্নাঘরে ঢোকে ও।

হাঁসের ঘর থেকে দুটো মুরগি কঁক-কঁক করে ওঠে। ওদিকে চোখ তুলে চায় শিলি অবাক হয়ে। মুরগি এল কোত্থেকে?

নরেশ বলেন, পরেশ আনছে তামাহাট থিক্যা। আজ হাট ছিল। রাতে মুরগির ঝোল আর ভাত রাঁধিসানে। ক্যাবলারে কইয়া বিকাল-বিকাল ওগুলানরে কাটাইয়া থুস।

শিলি ভাবে, খাওয়া ছাড়া বাবার আর কোনো চিন্তা নেই। শুধু খাওয়া আর খাওয়া। ম্যালোরিরি জ্বর ছাইড়া যাওনের সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধা আরও জোর হয় য্যান।

এবার ভাত চড়িয়ে দেয় শিলি রান্নাঘরে গিয়ে। চাল ধুয়েই রেখে গেছিল। ঘি-এর ভান্ডটা কাত করে দেখে, কতখানি ঘি আছে। তেলের শিশিটা, রান্নাঘরের বাঁশের ছ্যাঁচা-বেড়ার দেওয়ালে গোঁজা ছিল। সেটাতেও একবার চোখ বোলায়। গরম গরম ভাত। মুসুরির ডাল। কড়কড়ে করে আলু আর বেসন-দেওয়া কুমড়োশাক ভাজা। আর সঙ্গে কাঁঠালের বিচি ভাজা।

এই আজকের রান্না।

রান্নাঘর থেকেই, উনুনের সামনে আম-কাঠের ছোটোচৌকিতে বসে বলে, কাকায় গেল কই? ভাত নামাইলে তো ঠাণ্ডা হইয়া যাইবানে।

-আইতাছে আইতাছে। নদীতে গেছে চান কইবার লইগ্যা।

–নদীতে?

বুকটা ধক করে ওঠে শিলির।

বলে, আমি তো আইতাছি নদী থিক্যাই। তারে দেহি নাই তো!

–কোন নদীতে আর কোন পথে গেছিলি তুই, তা তুই-ই জানস।

শ্লেষের সঙ্গে বলেন নরেশ।

শিলির শরীরের সব জলীয় ভাব, উরুসন্ধির জলজ স্নিগ্ধতা সব কাঠের

উনুনের তাপে শুকিয়ে যায় মুহূর্তের মধ্যে। অনেকখানি ভয়েও।

হঠাৎ-ই বাইরে উঠোনে, পরেশের গলা শুনতে পেল ও।

পরেশ বলল, কই গেলিরে শিলি? দ্যাখ, কারে লইয়া আইছি?

শিলি কোমরে আঁচল গুঁজে বাইরে এসেই দেখে, কাকার সঙ্গে গদাই।

ভয়ে আধমরাই হয়ে যায় ও। কিন্তু হেসে বলে, কী খবর? গদাইদা?

-এই তো তোমাগো খবর লইতেই তো আইলাম!

বলেই, একদৃষ্টে চেয়ে থাকে গদাই, শিলির দিকে।

পরেশ বলে, আমাগো গদাই-এর মাথাখান এক্কেরে গ্যাছে গিয়া।

বড়োঘরের দাওয়ায় বসে নরেশ বলেন, ক্যান হইল কী?

-ও নাকি আজ নদীর থিক্যা উইঠ্যা আসা পরিরে দ্যাখছে। কেবল-ই কয়, কী রূপ তার!

শিলি খিলখিল করে হেসে ওঠে। অভিনেত্রীর মতো।

বলে, বড়লোকের পোলাগো তো একমাত্র কাজ-ই হপন দেখা। কী কও গদাইদা।

–কমু কী আর। যা কই তা সত্যই।

-তা তুমি কী কইরলা তারে দেইখ্যা? কথা কয় নাই কুনো? কোন ভাষায় কথা কয় পরিরা?

শিলি নিজের সপ্রতিভতায়, নিজেই ঝলমল করে উঠল।

রীতিমতো ভালো অভিনয় করছে ও। মেয়েমাত্রই জন্ম-অভিনেত্রী।

ভাবল, শিলি।

-কথা কি আর শোনবার অবস্থা ছিল আমার?

–হে তো অজ্ঞান হইয়া পইড়্যা ছিল গাছতলায়। আমি কাছে গিয়া ডাক দিতেই, হায়! হায়! কী কান্না পোলার। যেন সাপে কাটছে তারে।

গদাই চুপ করে থাকল একটু।

তারপর বলল, বিশ্বাস করেন পরেশকাকা। সাপের কামড়ও ঢ্যার ঢ্যার ভালো আছিল। পাগল যে, হইয়া যাই নাই, তাই যথেষ্ট। সে-রূপ খালি-চোখে দেখন-ই যায় না। এত্ত তেজ।

শিলি বলল, তা ধুবড়ি থিক্যা বা তামাহাটে হাটের দিন যাইয়া একজোড়া গগলস কিন্যা আনো না ক্যান? আবারও যদি দর্শন পাও কুনোদিন। অমন

ড্যাব ড্যাবা চোখ দুইখান যে, যাইব গিয়া চিরদিনের-ই লইগ্যা।

-হ। ভাবতাছি। তাই-ই করুম। পরির দেখা তো, সাপের দেখার-ই মতো। আবার কবে যে হঠাৎ কইর‍্যা ঘটব ব্যাপারখান, তা তো কওন যায় না। আজ থিক্যা যখন-ই নদীর পারে যামু তখন-ই সেই গগলসখান পইরাই যামু অনে।

তারপরই গদাই বলল, আমি যাই। বাবায় নাইলে চিন্তা করবো আনে। না-খাইয়া বইস্যা রইব।

শিলি বলল, দুগা গরিবের ঘরে খাইয়াই যাও না, যাই-ই রান্ধা হইছে। আইস্যাই যহন পড়ছ, খাওনের সময়ে। ভালো খাবার কিছু না, তবে ভালোবাসা তো আছে।

গদাই হেসে বলল, ভালোই কইছ তুমি। ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস? কপাল আমার।

বলেই, পা বাড়াল। বলল, আসুমানে অন্য একদিন। আগে আমারে নেমন্তন্ন পাঠাইও, তবে না আমু।

পরেশ বলল, মাসিমার কাছে সকালে শুইন্যা আইলাম পুতন নাকি আইতাছে ম্যানেজারের কে এক ছোকরা আত্মীয়রে লইয়া। সামনের শনিবারে। তা অদের তো একদিন খাওয়াইতেই অইব। সেইদিন

তোমারেও কইয়া দিমু। আইস্যো য্যান।

উত্তর না দিয়ে গদাই বলল, কে? কে আইতাছে?

গদাই-এর মুখের সব হাসি মিলিয়ে গেল। কালো হয়ে গেল অমন সুন্দর মুখটা।

পরেশ বলল, পুতন।

–পুতন? আইতাছে নাকি?

গদাই ক্লিষ্টকণ্ঠে বলল।

-হ। তাই-ই তো কইল মাসিমায়।

–দেখুমানে।

বলেই, চলে গেল গদাই।

শিলির বুক নেচে উঠল আনন্দে। রাগও হল একটু। আসছেন-ই যদি এতদিন পর, তাও আবার সঙ্গে অন্য একজনকে নিয়ে কেন? একা আসতে যেন অসুবিধা ছিল! ভারি খারাপ!

নরেশ, চলে-যাওয়া গদাই-এর দিকে চেয়ে পরেশকে বললেন, গদাইটারে

ভাবতাম বোকা-সোকা। কিন্তু কথা তত বেশ চোখাচোখাই কয় দেহি।

পরেশ অন্যমনস্ক গলায় বলল, কোন কথা?

–ওই যে, কইল না? ভালোবাসা কি চিবাইয়া খাওনের জিনিস?

পরেশ হেসে ফেলল, দাদার কথা শুনে।

বলল, যা কইছ। দারুণ-ই সেন্টেন্সখান। এক্কেরে যাত্রার ডায়ালগ-এরই মতো।

.

মাদারিহাট হয়ে, কোচবিহার হয়ে পুতনরা এসে পৌঁছেছিল, রবিবার সন্ধের বাসে, ধুবড়ি থেকে।

ঠিক কখন আসবে তা জানত না। তবে জানত শিলি যে, বিকেলের দিকেই আসবে।

প্রথম-বিকেলে একবার কিরণশশীর কাছে গিয়ে কালো পাথরের বাটিতে একবাটি পায়েস দিয়ে এসেছিল।

পুতন যদি একাই আসত তাহলে থাকত ওখানে, যতক্ষণ না আসে। তবে, সঙ্গে অচেনা মানুষ নিয়ে আসছে। কেমন লোক তা কে জানে? তাই শিলি

যায়নি ইচ্ছে করেই। পুতনের দরকার থাকলে, সে নিজেই আসবে।

শিলি সামান্য দুশ্চিন্তাতেও আছে। নরেশবাবুর আর্থিক অবস্থা এমন-ই হয়ে পড়েছে যে, তা বলার নয়। কাকারও কোনো স্থায়ী রোজগার নেই। শিকার করেই যা হয়। আজকাল বনবিভাগও কড়াকড়ি আরম্ভ করেছে। ছাত্তারকাকাকে তো একবার অ্যারেস্টও করেছিল। ছাত্তারকাকা নাকি সংকোশের পারে হাতি মেরে তার দাঁত বিক্রি করে দিয়েছিল। পারমিট টারমিট নিয়ে তো শিকার কোনোদিনও করে না। তাই কাকার ওপরে ভরসা বিশেষ নেই। কবে যে, শ্রীঘরে যেতে হয়।

শিলির বাবাও ক্রমাগতই চাপ দিচ্ছেন গদাইকে বিয়ে করার জন্যে। গদাই-এর বাবার সঙ্গে বোধ হয় কোনো অলিখিত চুক্তিও হয়েছে। শিলিকে গদাই-এর সঙ্গে বিয়ে দিলে ওঁকে বোধ হয় একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দেবেন গদাই-এর বাবা। শিলির মনে হয়। তাতে বাবা কাকার খাওয়া-দাওয়া, ক্যাবলারও, ক্যাবলার মাইনে, বাবার সিগারেটের খরচ ইত্যাদি দিব্যি চলে যাবে। সেটা অবশ্য গদাই-এর বাবার কাছে কিছুই নয়। অত সম্পত্তি যাঁর। তার ওপর কুঁজোর জল তো গড়িয়ে খান না এখনও। সঞ্চয় যা আছে তো আছেই, তার ওপরেও সমানে রোজগার করে যাচ্ছেন। আর বংশের বাতি বলতে তো ওই গদাই-ই একা।

তবু শিলিকে এইভাবে বিক্রি করে দিয়ে, তার বাবা নিজের আখের গুছোচ্ছেন–এই কথাটা ভাবলেই বড়ো ঘেন্না হয় ওর। বাবার ওপরে তো

হয়-ই, তার নিজের ওপরেও হয়। তা ছাড়া গদাইদাটা যদি লেখাপড়াও করত একটু-আধটু। এদিকে চালাক-চতুর আছে। সেদিন যা-খেলাটা দেখাল। বলে কিনা, ভালোবাসা কি চিবানোর জিনিস?

নরেশবাবু বলেন, কলেজে পড়লেই কেউ অমনিতেই বিদ্বান হয়ে ওঠে না। যে-ছেলে ব্যাবসা করতে পারে, সে কি বুদ্ধি ছাড়াই পারে? বুদ্ধি না থাকলে তো গদাই বাবার অতবড়ো ব্যাবসায় সাহায্য করতে পারত না। তা ছাড়া সাধারণত ব্যাবসাদারের ছেলেদের বুদ্ধিটা দুর্বুদ্ধিই হয়। বিশেষ করে আজকাল। কী করে তোক ঠকানো যায়, কী করে পয়সা আরও বেশি রোজগার করা যায়, এই ধান্দাতে থাকতে থাকতে তাদের সুবুদ্ধি বলতে আর বিশেষ কিছু বাকি থাকে না। পুরো নজরটাই বেঁকে যায় ওদের। কিন্তু গদাই ওরকম নয়। সুবুদ্ধি নিয়েই ব্যাবসা করে ও। প্রাণে মায়া-দয়া আছে। এমনকী, এও শুনতে পান নরেশবাবু লোকমুখে যে, বাবাকে না জানিয়েই ও কর্মচারীদের নানাভাবে সাহায্য করে। বাবা নিজে যা করতেন না, বা জানলে করতে দিতেন না।

গোপেন সুকুলকে বাড়ি করার জন্যে টাকা দিয়েছে গদাই, রহমতুল্লার মেয়ের বিয়ে দিয়েছে, সব খরচ দিয়ে। সুভাষের ছেলেটাকে ধুবড়ির কলেজের হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে। নিজে পড়াশোনা না করলেও পড়াশোনার প্রতি যে, ওর শ্রদ্ধা আছে, এসবেই তা বোঝা যায়।

ছাইন্যার দাদাটার পা কেটে গেছিল কোকরাঝাড় স্টেশনে রেলের

ইঞ্জিনিয়ারের ট্রলির নীচে পড়ে, তাকে ধুবড়ি ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে চাকরিও করে দিয়েছে এই গদাই-ই। ম্যাচ-ফ্যাক্টরিতে শলাই কাঠের সাপ্লাই বিজনেসটাও গদাই একাই সামলায়। সাহেবরা তো এখনও আছে দু একজন। তাদের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা-টথাও তো চালাতে হয়। স্কুল-কলেজে দু-পাতা পড়ে কি ল্যাজ গজায়? রবি ঠাকুর বা জি.ডি. বিড়লারা কি কলেজে পড়েছিলেন?

এসব নানা কথা বলে শিলিকে বোঝাতে চান তিনি। বলেন, যারা বেশি পড়ে, পড়াশুনোয় ভালো হয়, তারা তো ওই ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া পুতনের মতো ব্যাবসাদারদের-ই চাকর হয়। যারা জানে, তারাই জানে যে, চাকরদের মধ্যে যতখানি নোংরামো, যতখানি নীচতা, খেয়োখেয়ি, ততখানি মালিকদের মধ্যে নেই। প্রমোশনের জন্যে পা-চাটে তারা, মেরুদন্ড বিকিয়ে দেয়, বউ বা বোনকে পাঠিয়ে দেয় ওপরওয়ালা বা মালিকের খাটে। অনেক বড়ো বড়ো চাকর দেখেছেন নরেশবাবু। চাকরেরা সব চাকর-ই। আর এই বাঙালি জাতটা চাকরের বংশধর, চাকর হওয়ার প্রত্যাশা নিয়েই ওদের জীবনের যা-কিছু, বিদ্যা-শিক্ষা, আর তাদের ছেলেদেরও বংশপরম্পরায় তারা চাকর-ই বানায়।

গদাই কলেজে পড়েনি, স্বাধীন ব্যাবসা করে বলেই যে, খারাপ ছেলে, তা নয়। তা ছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই বড়োলোকির মধ্যে যারা মানুষ হয়, তাদের মনে অনেকরকম ক্ষুদ্রতা, ইতরামি, ছিঁচকেমিই থাকে না। হা-

ভাতে ঘর থেকে এসে যেগুলো বড়োলোক হয়, তাদের বেশিরভাগেরই বড়োলোক হওয়ার প্রক্রিয়ার রকমটা নরেশবাবু ভালোই জানেন। একজীবনে তো আর কম দেখলেন না। তাই অনেক ভেবেচিন্তেই নরেশবাবু শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়ে দিতে চান।

তা ছাড়া, পুতন ছিল ভালো। ওই কলকাতায় গিয়ে চা-বাগানে চাকরি নিয়ে, ডুয়ার্সে যাওয়ার পর থেকেই, ওর চোখে-মুখে লোভ চকচক করে। নরেশবাবুর মনে হয় যে, পার্থিব সুখের জন্যে ও করতে পারে না, এমনকিছুই নেই। ভালো-থাকা, ভালো-খাওয়ার জন্যে, একটি স্কুটার বা টি.ভি কেনার জন্যে পুতন এখন মানুষও খুন করতে পারে।

গ্রাম থেকে উদবাস্তু হয়ে গ্রামেই এসে বাসা বেঁধেছেন নরেশবাবু, ইচ্ছে করেই। শান্তি যতটুকু থাকার, তা এখনও গ্রামেই আছে, এই গরিবির মধ্যেই, যেন-তেন-প্রকারেণ বড়োলোকির মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই, সম্মান নেই। সুখ তো নেই-ই। মেয়ের ভালো চান বলেই গদাই-এর কথা ভাবেন। তিনি নিজে আর কতদিন! শিলির মায়েরও তাই কথা ছিল। দারিদ্র্য যদি মোটামুটি রকমের হয়, মধ্যবিত্তর জীবন হচ্ছে সব চেয়ে সুন্দর, সুখের, নিরুদবেগের জীবন। জীবনের মানে শুধুমাত্র ভালো-খাওয়া, ভালো-থাকা নয়, তার চেয়েও বড়োকিছু। মূল্যবোধ-এর ওপর যে-জীবন দাঁড়িয়ে থাকে, তার ভিত, বুনিয়াদ অনেক-ই বেশি শক্ত হয়ও, মূল্যহীন সমাজ বা সংসারের স্বাচ্ছল্যের চেয়ে।

কিন্তু নরেশবাবু এও দেখেছেন যে, দারিদ্র অসহনীয় হলে তা থেকে যেসব খারাপ জিনিস জন্মায়, তা বড়োলোকির খারাপত্বর চেয়েও অনেক-ই বেশি। মানুষের তখন অমানুষ হয়ে যাওয়ার প্রবণতা জন্মায়। তিনি নিজের জীবন দিয়েই এটা উপলব্ধি করেছেন। বর্তমানের অপরিসীম দারিদ্র্য যেন, তাঁর অমন রূপগুণের একমাত্র মেয়েটার জীবনেও না বর্তায়, তাই-ই দেখে যেতে চান উনি।

বড়োলোকি যেমন ভালো নয়, মোটামুটি খেতে-পরতে না পেলে মানুষের মনুষ্যত্ব বাঁচিয়ে রাখাও যে, দায় হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝেই তিনি নিজেও যে, অমানুষ হয়ে উঠছেন, তাও বুঝতে পারেন। খিদের মতো খারাপ রোগ আর কিছুই নেই। মানুষের শরীর, মানুষের মন, সবকিছুই ছুঁচোর মতো কুরে কুরে খেয়ে যায় এই খিদে। শিলিটার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যে করেন, সেটা এই দারিদ্ররই জন্যে। নিজের অপারগতার-ই জন্যে। অপারগতা অসীম হলে, তখন অপারগ, অসভ্য, অবুঝ, অভব্য হয়ে ওঠে। এই দারিদ্রর কামড় যে-না খেয়েছে, সে কখনোই জানবে না ওঁর জ্বালা।

নরেশবাবুর, গদাই বা তার বাবার কাছে থেকে বিন্দুমাত্রও প্রত্যাশা নেই। উনি জানেন না, শিলি কী ভাবে তাঁর সম্বন্ধে! শিলির সঙ্গে গদাই-এর বিয়েটা হয়ে গেলে তিনি কুমারগঞ্জ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবেন, এই ভিটে পরেশকে লিখে দিয়ে। কারণ, চোখের সামনে থাকলেই জামাই তাঁর

জন্যে কিছু করবেই। মেয়েরও কষ্ট হবে বাবার জন্যে। মেয়ের বিয়ের পরে উনি পথে পড়ে মরলেও কোনো দুঃখ নেই ওঁর। এই জীবন, যে-জীবনে কাউকেই কিছুমাত্র দেওয়ার ক্ষমতা নেই, কাউকেই সুখী করার ক্ষমতা নেই কোনোভাবেই; সে জীবন থাকা না থাকা সমান।

আত্মহত্যা করে মরে যাবেন বলেও ভাবেন, কখনো-কখনো। জীবন মানে তো শুধু নিশ্বাস ফেলা বা প্রশ্বাস নেওয়া নয়। জীবন যদি জীবন্ত না হয়, তবে তা নিজে হাতে নিভিয়ে দেওয়াই ভালো। জীবন যদি ঈশ্বরের দান হয়, তবে সে-জীবন নিভিয়ে দেওয়ার স্বাধীনতাও ঈশ্বরের-ই দান। সব জীবের-ই মতন, মনুষ্যেতর জীবের মতো বেঁচে থাকার চেয়ে, মরে যাওয়া অনেক। ই বেশি সম্মানের।

৩. কালো-সবুজ ডুরে শাড়ি

গা-টা ধুয়ে শিলি একটি পরিষ্কার করে ধোওয়া কালো-সবুজ ডুরে শাড়ি পরেছিল। চোখে, কাজল দিয়েছিল। গলায় কুঁচফলের লাল-কালো মালা পরেছিল। উঠোনের কোণ থেকে তুলে গন্ধরাজ ফুল গুঁজেছিল খোঁপায়। লাল-কালো অথবা লাল কিংবা কালো কোনো ফুল-ই হাতের কাছে পায়নি যে, শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে খোঁপায় দেয়। কালো ব্লাউজ পরেছে একটি। সবচেয়ে ভালো ব্রাটি বের করে পরেছে আজ। তিনটি ব্রা আছে ওর সবসুদ্ধু। তার মধ্যে একটিই আস্ত। ওর চলে-যাওয়া মায়ের ব্রা আছে আলমারিতে, গোটা পাঁচেক। কিন্তু তার কুমারী বুকে তা ঢলঢল করে। ওর বুক যতদিনে মায়ের ব্রা-এর যোগ্য হয়ে উঠবে ততদিনে ব্রাগুলো ছিঁড়েই যাবে, নয়তো ইঁদুরে কেটে দেবে। ব্রা কাটলে কাটুক! ইঁদুরে-বাদুড়ে বুক না কাটলেই হল।

কোনো মেয়েই চায় না যে, তার সৌন্দর্যের মধ্যে সবচেয়ে যা সুন্দর, সেই

বুক তাড়াতাড়ি মায়েদের মতো বড়ো হয়ে যাক।

বারান্দার দাওয়ায় বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসেছিল শিলি। বাবা, নগেন জ্যাঠাদের বাড়ি গেছেন। কাকা বাসস্ট্যাণ্ডে যায় এই সময়ে। রোজ-ই। পান খায়, গল্পটল্প করে। দু দিকের বাস ক্রসিং করে। নানা খবরাখবর চালাচালি হয়। ড্রাইভারদের দিয়ে কখনো-সখনো মুরগিটা, পাউরুটিটা আনিয়েও নেয়, আপ বা ডাউনের কোনো জায়গা থেকে।

চাঁদ উঠেছে এখন বাঁশঝাড়ের পেছনে। সন্ধের আগে একঝাঁক চাতকপাখি চমকে চমকে বেড়াচ্ছিল, ফটিক-জল, ফটিক-জল বলে। বছরের এই সময়টাতেই পাখিগুলোকে দেখা যায়। অন্য সময়ে কোথায় যে যায়, কী যে করে ওরা, তা কে জানে!

একটা লক্ষ্মীপেঁচা উড়ে এসে বসল, সিঁদুরে আমগাছটার ডালে।

চাঁদের আলোয় একটুক্ষণ বসে থেকেই উড়ে গেল।

লক্ষ্মীপেঁচা, লক্ষ্মীকে আনে ঘরে। এলে, ভালো হয় খুব।

একটা গান গাইতেন মা, লক্ষ্মী বন্দনার। মনে পড়ে শিলির। ভারি সুন্দর গানটি—

এসো সোনার বরণ রানি গো, এসো শঙ্খ কমল করেএসো মা লক্ষ্মী,

বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে

লক্ষ্মীকে তো ডাকে সকলেই, কিন্তু লক্ষ্মী কি সাড়া দেন সবার ডাকে?

শিলি লক্ষ্মীকে অবশ্যই চায়, কিন্তু এই দারিদ্রর জন্যেও তার এক বিশেষ অহংকার আছে। দারিদ্র্যমাত্রই প্রত্যাশায় ভরা, ভবিষ্যতের স্বপ্নে ভরা। তার গর্ভে যে, কী ঢেকে রাখে, তা শুধু দারিদ্রই জানে। দারিদ্র্যের মধ্যে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই। শিলি অন্তত করে না লজ্জাবোধ। লজ্জা, দারিদ্র্য লুকোনোর চেষ্টার মধ্যেই।

চারপাশ থেকে চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ উঠছে। পাঁচমিশেলি গন্ধ। তার সঙ্গে সাবান দিয়ে ভালো করে স্নান-করে ওঠা শিলির গায়ের সুগন্ধও মিশে গেছে। চৈত্রসন্ধ্যার গন্ধ শুধু ওঠে না, উঠেই পাগলামিভরা চৈতি হাওয়াতে ইতস্তত ছড়িয়ে যায়। ফতিমা দিদির বুকের ভাঁজের আতরের গন্ধর মতন তা ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে, সমানভাবে। মনটা পাগল-পাগল করে। শুধু মনটাই করে না শরীরটাও, কে জানে! কোনটা শরীরের পাগলামি আর কোনটা মনের, জানে না ও। আতরের গন্ধে নিজেকে কখনো-কখনো খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করে ওর।

আজ চান করে ওঠার পর যখন জামাকাপড় পরে কাজল আঁকছিল চোখে, দেওয়ালে ঝোলানো আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে, তখন লণ্ঠনের আলোতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল শিলিকে। নিজের-ই চোখে। বেশ, বউ বউ। যেদিন

ও বউ হবে সস্তার বেনারসি পরে, সোনালি রুপোলি রিবন দিয়ে খোঁপা বাঁধবে, পায়ে আলতা পরবে, গায়ে-হলুদের হলুদ হলুদ

ছোপ লেগে থাকবে বুকের ভাঁজে, দুই কুঁচকির পাশে, নাভিতে, ক্যালকাটা কেমিকেলের কান্তা সেন্টের গন্ধে ভুরভুর করবে যেদিন তার গা, নিজের গায়ের মিষ্টি গন্ধের চেয়েও অনেক বেশি মিষ্টি হয়ে সেদিনকার সেই স্বপ্নের সুখের-ই মতন সুন্দর এক ভাব ফুটেছিল তার আলোকিত মুখখানিতে।

আজকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে করছে নিজেকে। বাড়িতে কেউই নেই এখন। ক্যাবলাটাও ছুটি নিয়ে গেছে গৌরীপুরে। এই চাঁদের রাতে, একা-বাড়িতে পুতনদা যদি আসত, যদি দু-হাতে তার এই মুখখানিকে আদরে ধরে তার ঠোঁটে আলতো করে একটা চুমু খেত, বেশ হত তাহলে।

ও খুব ন্যাকামি করত, ঢং করে বলত, কয়রা কী? অসভ্য! ছাড়ো ছাড়ো! তোমার দাড়িতে লাগে। জ্বালা করে গাল। দাড়ি কামাও নাই ক্যান? জংলি!

পুতন বলত, কামাইছিলাম তো। তবে সেই সাতসকালে। আমি কি আর জানতাম ছাই যে, তোমারে চুমু দিমু আজ? তাইলে তো বিকালে আরও একবার কামাইয়াই আইতাম।

পুতনদা তাকে ছেড়ে দেওয়ার পরও অনেকক্ষণ তার ঠোঁট দু-টি জ্বলত। জ্বালাতেও কত ভালোলাগা। কতরকমের জ্বালাই না থাকে। সত্যি।

দেখতে দেখতে কখন যে, চাঁদের আলোতে ভরে গেছে চারপাশ, নিঃশব্দে, খেয়াল-ই করেনি শিলি। হিজল গাছটার মাথার ওপরে সন্ধ্যাতারাটা উঠে স্নিগ্ধ নীল দ্যুতিতে ফুটে রয়েছে, যেন কোনো নীলরঙা উজ্জ্বল ফুল।

বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। টর্চের আলো এসে পড়ল গেটের কাছে। চাঁদের আলোতে ফিকে দেখাল সে আলো। পুতনের গলার স্বর না? তাই-ই তো। কার সঙ্গে যেন কথা বলতে বলতে আসছে।

–শিলি! শিলি আছস নাকি? কাকাবাবু? পরেশকাকু? আমি পুতন!

কে?

শিলি, জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল দাওয়ায় হেলান-দেওয়া অবস্থা থেকে।

মুখে বলল, ভিতরে আইতাছে না ক্যান? বাবায়-কাকায় কেউই বাড়িতে নাই। আমি একাই আছি।

পুতনের সঙ্গের মানুষটি বলল, ফার্স্ট ক্লাস। চাপা গলাতে।

শুনল, শিলি।

মানুষটার গলার স্বরটা ভালো লাগল না ওর। গলার স্বরেও মানুষের অনেকখানি বোঝা যায় লোকটা ভালো নয়। এই কি সেই?

শিলি বলল, মনে মনে।

পুতন লোকটিকে নিয়ে চ্যাগারের দরজা দিয়ে ঢুকে এল।

বলল, দ্যাখ শিলি, কাকে এনেছি।

পুতনদার মুখে এমন কলকাতাইয়া ভাষা শুনে, ঘাবড়ে গেল শিলি।

পুতন আবারও বলল, অনেকক্ষণ আগেই আসতুম, কিন্তু আমার বন্ধু রাজেন, চান করতে, পাউডার মাখতে এতই সময় নিল যে কী বলব। কলকাতার মানুষ তো! বড়োলোকের ছেলে।

শিলি, তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে মাদুর এনে বিছিয়ে দিল, বড়োঘরের দাওয়াতে।

রাজেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে আছে। গা থেকে সেন্টের মিষ্টি নয়, ভীষণ উগ্র গন্ধ বেরোচ্ছে, ভুরভুর করে। গন্ধটাও ভালো নয়। সুগন্ধের মধ্যেও, কিছু সুগন্ধি কাছে টানে শিলিকে; আর কিছু সুগন্ধ দূরে সরায়। হয়তো সব মেয়ের-ই এমন হয়। হয়তো পুরুষেরও হয়, যারা সুগন্ধ ভালোবাসে। তা ছাড়া, ওদের দুজনের মুখ থেকেই ভকভক করে কীরকম একটা গন্ধ বেরোচ্ছে। তাতে গা গুলিয়ে উঠল শিলির। গন্ধটা কীসের তা বুঝল না, তবে অনুমান করতে পারল। পেরেই, পুতনদার কথা ভেবে,ওর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল। প্রচন্ড কষ্ট হতে লাগল বুকের মধ্যে।

পুতন বলল ও কী? দূরে কেন? আরও কাছে এসে বোসো। কলকাতা থেকে তোমার জন্যে নতুন বন্ধু আনলুম। কতা-বাতরা বলল।

পুতনের মুখে এই ভাষা শুনে শিলির ক্রমশই রাগ বাড়তে লাগল। বাকরোধ হয়ে গেল। সত্যিই। অনেক-ই বদলে গেছে মানুষটা। যেসব মানুষ নিজের ছেলেবেলা, নিজের মা-বাবা, নিজের পরিবেশ, অনুষঙ্গ, নিজের মুখের ভাষাকে এত তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারে, দুটো পয়সা বা দুটো বেশি পয়সা রোজগার করার জন্যে, সেইসব মানুষ কখনোই খাঁটি হয় না।

মেকি মানুষরাই এরকম করে। হীনম্মন্য মানুষেরা। অমন ভন্ড মানুষদের চিরদিন-ই ঘেন্না করে এসেছে শিলি।

মনটা হঠাৎ-ই খারাপ হয়ে গেল শিলির।

এমন সময় পুতনদার সেই বন্ধু রাজেন যার নাম, পুতনদাই বলছিল, ফস করে হাতের পাঁচ-ব্যাটারির টর্চটি ফোকাস করল শিলির মুখে। হঠাৎ-ই আলো পড়ায় দুটি চোখ-ই বুজে গেল শিলির।

রাজেন নিজের মনে বলল, খাসা! ভিলেজ বিউটি।

পুতন চাপা ধমক দিল। আঃ রাজেন।

-হলটা কী? বিউটি দেখে অ্যাপ্রিশিয়েট করব না?

পুতন সামলে নিয়ে বলল, বুজেচো শিলি, রাজেন কলকাতার খুব বড়োবাড়ির ছেলে। ও হচ্ছে আমাদের বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয়। কোনোদিন গ্রাম-ই দেকেনি তো। তাই এয়েছে আমার সঙ্গে। গ্রামের মেয়েদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে ওর দারুণ ইন্টারেস্ট। তোমাকে দেখে তো প্রেমেই পড়ে গেছে। অবশ্য পড়েছিল আগেই। আমার মুখে তোমার গল্প শুনে শুনে।

শিলি পাথরের মূর্তির মতো বসেছিল।

লক্ষ্মীপেঁচাটা উড়ে গেছিল আমগাছ ছেড়ে, অনেকক্ষণ। শিলিকে ছেড়ে সব স্বপ্নও উড়ে গেছিল। অমন গন্ধভরা উদবেল চৈত্রর চাঁদের রাতে স্তব্ধ হয়ে এই নতুন পুতনের সামনে কাঠের পুতুলের মতন বসেছিল শিলি।

ভাবছিল, পুতন আসার স্বপ্নটা সত্যি না হলেই ভালো হত।

–একটা গান শুনিয়ে দাও তো শিলি, আমার ফ্রেণ্ডকে।

শিলি বিরক্ত গলায় বলল, যখন-তখন গান আসে না আমার।

–কখন আসে?

রাজেন ভকভক করে গন্ধ ছড়িয়ে বলল।

যখন আমার ইচ্ছে হয়।

শিলি বলল।

শক্ত করে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে।

–এখন একটু শোনালে হত না? আজ কী সুন্দর রাত মাইরি। গান গাইবার মতো রাত। ইচ্ছেকে কি হওয়ানো যায় না?

–শিলি কিন্তু সত্যিই দারুণ গান গায়।

পুতন বলল, শিলিকে রাজি করাবার আশায়।

-কী গান গায়?

–কত গান, রবীন্দ্রসংগীত, অতুলপ্রসাদ, শ্যামাসংগীত।

–তুমি কাদের কুলের বউ গো তুমি কাদের কুলের বউ? যমুনায় জল আনতে যাচ্চো, সঙ্গে নেইকো কেউ?–এই গানটা জান নাকি গো?

অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে বলল, রাজেন।

শিলি মাদুর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না। আমি জানি না। আর আমারে তুমি কইরা কইয়েন না আপনে। আপনে কইরাই কয়েন।

রাজেন হাসল, রসিকতা করে বলল, আচ্ছা! তাই কমু।

বলে, বাঙাল ভাষাটা ঠিক বলতে পারল কি না তা জানবার জন্যে পুতনের দিকে চাইল।

পুতন বলল, সাতবোশেখির মেলা তো এসে গেল। সামনের রবিবার। আমার বন্ধুকে নে। যাব দেখাতে। তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে? শিলি?

-না

না কেন? তোমার বড়ো গুমোর হইয়েচে দেকচি।

–গুমোর কথাটা শোনেনি আগে শিলি। কেউই বলেনি তাকে।

বুঝল, কথাটার মানে দেমাক। পুতনের মুখে ওইরকম বিজাতীয় ভাষা শুনে ও আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিল। বেড়ালে যেমন করে কবুতরের পালক ছিটিয়ে রক্তের ফিনকি দিয়ে ছিন্নভিন্ন করে খায় তেমন করেই শিলিকে ছিন্নভিন্ন করে দিল এই নতুন ক্যালকেশিয়ান কালচারের পুতন।

শিলি স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল, কত অল্পদিনে কত্ত বদলে যেতে পারে একজন মানুষ।

তারপর ভাবল, হয়তো মানুষ-ই পারে। কুকুর-বেড়ালের পক্ষেও সম্ভব নয়।

পুতন বলল, শিলি আমার মুখ চেয়ে না কোরো না তুমি। আমি নরেশকাকাকে বলব। মাও তোমাকে বলবেন। মানে, আমার মা।

শিলি হঠাৎ বলল, না। আমি কোথাও যামু না। আর তোমাগো ভালোয় কইতাছি, বাবা কাকা আসনের আগেই তোমরা চইল্যা যাও পুতনদা। তোমার তো অনেক-ই উন্নতি হইছে দেহি! মদও খাইতাছ আজকাল। কাকা আইয়া পড়লে বিপদ অইব কিন্তু। গুলি কইর‍্যা মাইরাও ফ্যালাইতে পারে তোমাগো। একা বাড়িতে আমি, আর তোমরা মদ খাইয়া আইছ আমার লগে দেখা করনের লইগ্যা। তোমাগো সাহস তো কম না।

-কইচে কী পুতন? ও পুতন? ময়না কইতিচে কী? আরে ভিলেজ-বিউটি, মদ খেয়েই তো মানুষে মেয়েমানুষের কাছে আসে! তুমি তো অবাক করলে মাইরি। আমিই কি তোমার পত্তম নাগর? অ্যাঁ।

এমন সময় দূরে সাইকেলের ঘণ্টি বাজল।

টর্চের আলোর ঝলকও দেখা গেল।

আতঙ্কিত শিলি বলল, ওই কাকায় আইতাছে। তোমরা পিছনের দরজা দিয়া পালাও। কাকার সামনে মদ খাইয়া যদি যাও, তো বিপদ হইবনে।

পুতন বলল, ন্যাক্কামি কোরো না, কাকা যেন মাল খায় না।

পুতনের মুখে এমন ভাষা এবং সে ভাষা উচ্চারণ করার ভঙ্গি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল শিলি।

এমন সময় কাকা এসে ঢুকলেন, সাইকেল হাঁটিয়ে নিয়ে।

-এই যে! পরেশকাকু। আমি এসেছি। সঙ্গে আমার বাগানের ম্যানেজারের আত্মীয় রাজেন চাটুজ্যে।

পরেশ কাছে এসে, শেয়ালের মতো নাক তুলে বাতাস শুঁকে বলল, বাবা : পুতন দেখি। লায়েক হইছ।

পুতনের ভাষার-নতুনত্বের ঘোর তখনও কাটেনি পরেশের।

সেই ঘোরের মধ্যেই বলল।

রাজেন বলল, পরেশকাকা, ওর দোষ নেই। আমিই খাইয়ে দিয়েছি ওকে। আপনি খাবেন?

–কী?

চমকিত পরেশ বলল।

–হুঁইস্কি। একটা আস্ত পাঁইট পকেটেই আছে। ব্ল্যাক-নাইট। বিলিতি মাল।

–মদ আমি খাই পুতন। কিন্তু বাড়িতে খাই না। সকলের সঙ্গেও নয়।

–এটা কি ভন্ডামি নয় পরেশকাকা?

রাজেন বলল।

–সেটা আমি বুঝব।

তারপর পুতনের দিকে ফিরে বলল, মদ খাইয়া বাড়িতে আইস্যা শিলির লগ্যে কী গল্প করতাছিলি তুই?

পুতন একটু ঘাবড়ে গেল।

বলল, এই রাজেনকে নিয়ে সাত-বোশেখির মেলায় যাব। তাই শিলিকে বলতে এসেছিলাম। ও যদি যেত, তবে আমার কলকাতার ফ্রেণ্ড খুশি হত।

পুতন বলল।

পরেশ বলল, এখনও দেরি আছে সাতবোশেখির মেলার। তা শিলি কী কয়?

ও তো বলল, যাবে না। আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন-না পরেশকাকা। ও গেলে রাজেনের ভালো লাগত। আমাদের এই গ্রামে তো বায়োস্কোপ-

থিয়েটার কিছুই নেই। বেচারার সময়ই কাটছে না। শিলি গেলে বেশ এনজয় করত ও।

পরেশ বলল, শিলি তো আর খুকি নয়। মেলাতে তো ও যাইব নিশ্চয়ই। তবে তোমাগো লগে যাইব কী যাইব না, তা সম্পূর্ণ ওর-ই ইচ্ছা। ভাইবা দ্যাখনের সময় তো যথেষ্টই আছে। নাকি কও পুতন?

–হ্যাঁ, তা ত আচেই।

পুতনের চেহারা, চাল-চলন, মুখের ভাষা সব-ই আমূল বদলে গেছে। পড়াশুনো করে, বড়ো পরীক্ষা পাশ করে, বড়োমানুষ হতে গেলে যে, নিজেকে বদলাতে হয় তা জানত পরেশ এবং সেইজন্যে হয়তো, সবাই-ই যাকে বড়ো হওয়া বলে তা ও কোনোদিন-ই হতে চায়নি। সকলের মতো ও যে হয়নি, তা জেনে নতুন করে আশ্বস্ত হল পরেশ। পুতনটার জন্যে দুঃখ হল। ছেলেটা একেবারেই বয়ে গেছে, শহরের চোর-জোচ্চোরদের মতো হয়ে গেছে স্বভাব। কিরণমাসির একমাত্র বেঁচে-থাকা ছেলেটা পুরোপুরি বুঝি অমানুষ-ই হয়ে গেল! এর চেয়ে কিরণমাসির অন্য ছেলেগুলোর মতন ও-ও মরে গেলেই ভালো হত।

–কী ভাবছেন পরেশকাকা?

-ভাবতাছি। তা, ভাবনা তো আর দেখান যায় না। আইজ তোমরা ওঠো। আমি না হয় মদ টদ খাই। কিন্তু দাদা তো এসব একেবারেই পছন্দ করে

না। জানোই তো তুমি। পথে দাদা আসতাছে দেইখ্যা আইলাম। তারিণীদার বাড়ি থিক্যা বাইরাতে দ্যাখলাম। আইয়া পইড়ল বইল্যা। দাদার আসনের আগেই তোমরা ওই পশ্চাতের চ্যাগারের দরজা দিয়া পলাও। নইলে, কীসে কী হয়, তা কহন যায় না। দাদায় তো হাই-প্রেশারের রোগী। হঠাৎ হঠাৎ রাইগ্যা যায়। জানোই তো। কী পুতন? জান নাকি?

–হ্যাঁ। হ্যাঁ। জানব না। নরেশকাকার মেজাজ তো নোটোরিয়াস। আমাকে দু-ঘা বসিয়ে দিলেই বা কী? কিন্তু আমার ফ্রেণ্ডের তো ইজ্জত বলে একটা ব্যাপার আছে।

বা : শুইন্যা বড়ো আনন্দ পাইলাম। ইজ্জত জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ দ্যাশে, পেরায় গন্ডারের মতোই দুইপাপ্য হইয়া উঠছে। হত্যই আনন্দ পাইলাম।

এবার বাইরে নরেশবাবুর কাশির শব্দ আর টর্চের আলো শোনা এবং দেখা গেল।

পরেশ বলল, ওই যে আইতাছে।

সঙ্গে সঙ্গে পুতন রাজেনকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে ছায়াচ্ছন্ন বাঁশবনের নীচের পথে মিলিয়ে গেল।

বাইরে বেরিয়েই, কথা বলতে যাচ্ছিল রাজেন। পুতন মুখ চেপে ধরল।

কিছুদূর ওকে মুখ চেপে নিয়ে গিয়ে, মুখ-থেকে হাত সরিয়ে নিল।

রাজেন বলল, তুমি কী মাইরি গুরু। শালা গা গরম করতে করতেই বিবি পালাল। তোমাকে তো বলেইচি গুরু, পেটে আমার মাল পড়লে মাগি আমার চাই-ই। তোমাদের গ্রামে খারাপ পাড়া-ফারা নেই কি? রেডলাইট এরিয়া। যেখানে শান্তির সঙ্গে ট্যাঁকের কড়ি গুনে দিয়ে মাগিদের খোমা দেখা যায়। নিজের খুপরিতে, নিজে সম্রাট হয়ে, নিজস্ব সুন্দরীকে নিয়ে যা খুশি করা যায়?

পুতন বলল, না। এই গ্রাম ভদ্রলোকদের গ্রাম।

–মরে যাই। মরে যাই! কী কতাই শোনালে মাইরি। এসব আমার জানা আছে। ঘোমটার তলায় খ্যামটা নাচে না, এমন মেয়েছেলে নেই কোনো ভদ্রলোকের গেরামে, এমন কথা আর যে-মক্কেলেই বিশ্বাস করুক, এই মক্কেল করবে না। আসলে বলো যে, তুমি ঝেড়ে কাশছ না।

পুতন একটু অসহিষ্ণু গলায় বলল, সত্যিই বলছি থাকলেও আমি জানি না।

যাঃ শালা! এখন কী করি? গা গরম হয়ে গেছে যে! এখন ঠাণ্ডা হই কী করে?

একটু এগিয়েই, ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল ওরা। সামনে হরিসভার বাঁধানো

চাতাল। পাশে পুকুর। হরিসভার চারপাশে হাসনুহানার ঝাড়। মিষ্টি গন্ধ ভাসছে চাঁদ-মাখা আকাশে।

রাজেন হরিসভার চওড়া, সিমেন্ট-বাঁধানো, চাঁদের-আলোতে চকচক-করা চাতাল দেখে বলল, বাঃ এই তো মাল খাওয়ার জায়গা। তা গুরু, প্রথমেই এইকানে নিয়ে এলে না কেন? এসো, এই চাতালে বসে নতুন পাঁইটটাকে শেষ করি।

পুতন বলল, ছি :। এখানে অষ্টপ্রহর কেত্তন হয়। হরিনাম হয়। পালাগান সব। কখনো চব্বিশ প্রহরও হয়। হরিসভার চাতালে বসে মদ খাবে কী?

–যাঃ শালা। এ ক্যালানে বলে কি মাইরি! সেই শায়েরি জানো না? এক মাতাল মসজিদে বসে মাল খচ্ছিল। তো মৌলবি এসে বলল, এখানে বসে টানচো তুমি? কেমন বে আক্কেলে তোক হে? জানো না, এখানে খুদাহ থাকেন?

বলেই রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে ভালো করে জোড়াসনে বসে পকেট থেকে পাঁইটটা

বের করল।

তারপর কী হল, শোনো। নিজেই বলল, আবার।

-কী হল?

বিরক্তির গলায় শুধোল পুতন।

–সে শালা মাতাল, মৌলবির দাড়ি নেড়ে দিয়ে বলল,

পিনে দে মুঝেমসজিদমে বৈঠকরাইয়ে উ জাগে বাতাঁদে যাহাঁ খুদাহ ন হো।

-মানে?

পুতন শুধোল। তখন বিরক্ত গলায়।

রাজেনকে এখানে এনে যে, ও ভুল করেছে, তার নিজের ক্ষতিই সবচেয়ে বেশি করেছে, তা ক্রমশই ও বুঝতে পারছে।

আবারও বলল পুতন, মানে কী হল তোমার ওই শায়রির?

শোনো গুরু, মানেটা হল, খুদাহ যদি একমাত্র মসজিদেই থাকেন তো ভালো কতা। আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু আমাকে এমন জায়গা দেখিয়ে দাও তো বাওয়া, যেখানে খুদাহ নেই। একটা জায়গা দেকাও। তাকেই বলল। সারা পৃথিবীটাই তো ইদগাহ। তোমার হরিসভা তো মসজিদের-ই মতো ধম্মেস্থান? নয় কি? আরে!

–কী হল? ঢালো মুখে এটু। মেজাজ বিগড়ে গেছে মনে হচ্ছে গুরুর।

–নাঃ। ওমনি।

-নাও, ঢালো।

–না, না। আমি আর খাব না।

–সে কী? কী হল?

–নাঃ

পুতন ভাবছিল, নিজের খারাপ হতে লজ্জা করে। সকলের-ই তো পরেশকাকার মতো বুকের পাটা নেই যে, যাই-ই করে তা বুক ফুলিয়ে করে। বাবা যখন বেঁচেছিলেন, বাবার মুখে শুনেছিল যে, অ্যামেরিকান আর টমি সৈন্যরা অথবা চা-বাগানের ম্যানেজারেরা যে বেলেল্লাপনা এদেশে এসে করেছে, তা নিজেদের দেশে করার কথা তারা চিন্তা পর্যন্ত করতে পারত না। পুতনও আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে, নিজের শেকড়ের কাছাকাছি থেকে, নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-পরিচিত, নিজের আজন্ম পরিবেশের মধ্যে থেকে, একজন মানুষের খারাপ হয়ে যেতে অনেক বেশি খারাপত্ব লাগে। ভালো হতে যে-জোর লাগে, খারাপ হতেও তেমন-ই জোর লাগে। স্রোতের শ্যাওলা যারা, তাদের কথা অন্য। পুতন নিজের কাজের জায়গায়, চা-বাগানে কুলিবস্তিতে বা ওর নির্জন কোয়ার্টারে যা-

কিছুই করতে পারে রাজেনের সঙ্গে, তা ও নিজের গ্রামে এসে করার কথা ভাবতেও পারে না। মনে হয়, ভাবলেও অপরাধবোধ জাগে একধরনের। এই বোধটা এখানে আসার আগে ওর ছিল না। এখানে এসে বুঝছে।

-কী হল গুরু? খাও এক চুমুক।

বলেই, জোর করেই পাঁইটের বোতলটা এবারে মুখে ধরে দিল পুতনের।

পুতন, আপত্তি সত্ত্বেও বড়োচুমুক লাগাল একটা।

মদের এই দোষ। অথবা গুণ! বিবেক যখন চুলকোয়, মন বলে কাজটা ভালো হচ্ছে না, অন্যায় করছ খুব; তখন জোর করে মদ খেয়ে নিলে বিবেকের চুলকুনি কমে আসে। মন বলে, ঠিক আছে। ঠিক কোচ্চো বাওয়া।

ভালো উকিলের-ই মতো, মনও গেলাসের জলের দিকে যেন তাকিয়ে প্রয়োজনানুসারে প্রমাণ করতে বসে যায় যে; গেলাসটা আধভরতি? না আধখালি?

পেটের মধ্যে গিয়ে মস্তিষ্কে ক্রিয়া শুরু করল মদ। ধীরে ধীরে পুতনের জেগে ওঠা বিবেক, তার আশৈশব অনুষঙ্গর শালীনতা, তার মূল্যবোধ; গলে যেতে লাগল অ্যালকোহলের নিঃশব্দ প্রলয়ংকরী প্রক্রিয়াতে। ধীরে ধীরে।

পুতন একটি হেঁচকি তুলে বলল, কেমন দেখলে ভাই?

–কী?

একটু যেন অন্যমনস্ক, রাজেন বলল।

–শিলিকে?

সংবিৎ ফিরে পেয়ে বলল, ওঃ খাসা মাল। সুইট নাইনটিন ইয়েট আনকিসড।

একটু চুপ করে থেকে, রাজেন বলল, তবে কী জান? আসল ব্যাপারের সময় এইসব আনটাচড জিনিস বড়ই ন্যাকামি করে। অবশ্য পুরো মজাটাই আবার সেখানেই। রেজিস্টেন্স না থাকলে কোনো ভূখন্ডই জয় করে মজা নেই। কতাটা বলত, আমাদের নাদুদা। আমার গুরু।

বলেই, রাজেন হরিসভার চাতালে উঠে দাঁড়াল। তারপর চাঁদের আলোয় সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে পায়চারি করতে করতে, না, যেন চাঁদের আলোতে ভাসতে ভাসতে জোরে জোরে কথা বলতে লাগল পুতনের সঙ্গে।

পুতনের ভয় করতে লাগল। গ্রাম্য জায়গা। তার ওপরে কাছেই ঘোষেদের বাড়ি। সে বাড়ির ছোটোকর্তার কানে যদি, এই কথোপকথন যায়, তবে

এক্ষুনি ওদের দুজনকে মেরে পুকুরে লাশ ফেলে দেবে। এ তো কলকাতা নয়। এখানে তো চেঁচিয়ে-বলা কথাকেও ঘরে ঘরে পাখা, আর রেডিয়ো-টিভি, ট্রাম আর বাস আর গাড়ির আওয়াজ ডুবিয়ে দেয় না, উড়িয়ে দেয় না। তা তো রাজেন জানে না। এখানে ফুলশয্যার রাতের স্বামী-স্ত্রীর ফিসফিসে কথাও পাশের বাড়ি থেকে শোনা যায়। নাঃ রাজেনকে নিয়ে এসে কাজটা ও ভালো করেনি আদৌ। এবারে সে নির্ঘাত-ই বিপদে পড়বে। বুঝতে পারছিল পুতন।

পুতন ভাবছিল যে, মা কিরণশশী জেগে বসে আছেন ওদের খাবার নিয়ে। হোন্দলের মা কি আর এতক্ষণ আছে? বেলাবেলিই তো চলে যায়। মুখে মদের গন্ধ নিয়ে মায়ের সামনে বসে খেতে হবে বলে বিবেক, রাজেনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, খচখচ করছে একটু।

কিন্তু হলে কী হয়। শুধুমাত্র জন্মদাত্রীর অধিকার ছাড়া, অন্য কোনো অধিকার তো নেই মায়ের। এই বাড়িটাও বাবা তাকেই উইল করে দিয়ে গেছেন। কিরণশশীর তো কোনোই জোর নেই। পুতন যা বলবে, যা করবে; তাই-ই এখন নিয়ম। অশক্ত, বৃদ্ধা, পরনির্ভর সাধ্য কী? পুতনের মুখের ওপর কথা বলেন কোনো! শহরে কিছুদিন থেকে, বাগানে চাকরি করতে এসে, স্বার্থ ও সমৃদ্ধির স্বরূপ ও প্রক্রিয়া দেখে পুতন বুঝেছে যে, নিজের ভালো করতে গেলে পরের মন্দ করতে দু-বার ভাবলে চলে না। অত যারা ভাবে, তাদের সুখী হওয়া এই জীবনে আর হয়ে ওঠে না।

মায়ের সঙ্গে বাবা শুয়েছিল, দু-জন দুজনকে এনজয় করেছিল, তাই পুতন জন্মেছিল। তার মায়ের প্রতি পুতনের বিশেষ দায়দায়িত্ব তো থাকার কথা নয়।

-বসে বসে খাও না। অমন পায়চরি করার দরকার কী?

পুতন ফিসফিস করে বলল, রাজেনকে।

রাজেন বলল, বসে বসে মাল খাওয়া মানা। সায়েবরা কী বলে জানিসনি? বলে হাউ মেনি ড্রিঙ্কস ক্যান ইউ স্ট্যাণ্ড? যদি মাল বসে বসেই খাওয়ার ছেলে, তালে তো বলতেই পাত্তো হাউ মেনি ড্রিংকস ক্যান উ্য সিট? হু। হু। তা কি তারা বলেচে? এ কতাও আমার গুরুর কাছ থেকে শোনা। হুঁ বাবা! সায়েবদের সবসময়ই আমি মেনে চলি। সায়েবদের পায়ে জুতো পরিয়ে, তেল মাকিয়ে, আমার মোমের পুতুল ঠাকমাকে, পালকি করে সায়েবকে দিয়ে ব্রিডিং করাবার জন্যে ঠাকুদ্দা পাইটেচেলো। এমনিতে কি আর আমার গায়ের রং এমন সায়েবের মতো? সায়েব দিয়ে একবার করিয়ে নেওয়ায়, পুরো গুষ্টি কেমন ফর্সা বনে গেছে বলো। আমার জ্যাটার মাথার চুলও কটা রং। জ্যাটাকে পাড়ার লোকে শুধোত, এই যে হরেন। মাকে শুধিয়ো তো, ব্যাপারখানা কী?

জ্যাটা চটে গিয়ে বলত, তোদের মায়েরা সেকেনে গিয়ে পালঙ্কের ওপরে কেলিয়ে শুলেও সায়েব তাদের ইয়েতে মুতেও দিত না। বুয়েচিস।

হ্যাঁ কতা কইত বটে বাবা। বাবার কতার সামনে কোনো শালার দাঁড়াবার জো-টি ছিল না। মিত্যে কতাও বলতে পারত অনর্গল, চোখের পাতা একটুও না কাঁপিয়ে। ভালো উকিল হবার সবরকম গুণ-ই ছেলো। কিন্তু হল না কিছুই।

–কী করতেন তোমার বাবা?

জিজ্ঞেস করল, পুতন।

–তুমি হলে, আমার একবোতলের স্যাঙাত। তোমাকে ভাই বলতে বাধা নেই। অনেক কিছুই হত। তবে, শখ হিসেবে, মেয়ের দালালিও করত কখনো-সখনো বলে শুনিচি। তা বলে, সোনাগাচির মেয়ে নয়। বড়োঘরের সব ফাস্টোকেলাস মাল। সাপ্লাই করত সাহেব সুবোদের, তারপর দিশি সায়েবদের, ব্যাবসাদার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তো দিল্লিই চলে গেসল। মাইরি! সুখ কত্তে হয়, তো দিল্লি চলো। কোটি কোটি টাকার ডিল হচ্ছে সেকেনে। মেয়েছেলে একহাতে দাও আর অন্যহাতে কনট্রাক্ট নাও; লাইসেন্স নাও। পেটে খাওয়া, জামাকাপড় পরা, মদ খাওয়াও সব-ই একসময় এসে বাস করতেই হয়। কিন্তু বিধাতা এই যে, হাড়বিহীন ওয়াণ্ডারফুল গুণী যন্তরটি দিয়েছে মাইরি সব পুরুষকে, এর গুণ হচ্ছে বিদ্যের-ই মতো। ক-জন পুরুষ শালা এই যন্ত্রের প্রপার ইভ্যালুয়েশন করল। শুধু বংশ রক্ষা করেই রিটায়ার করিয়ে দেয় নাইনটি-নাইন পার্সেন্ট পুরুষ। এর ভার্সেটাইলিটি সম্বন্ধে কতটুকু ধারণা আছে?

ক-জনের আছে?

পুতনও, রাজনের এমন জ্বালাময়ী ভাষণে একটু ঘাবড়ে গিয়ে শুধোল, বিদ্যের-ই মতন মানে। মানে কী?

-মানে, যতই করিবে দান, তত যাবে বেড়ে।

পুতন হেসে ফেলল, ওর কথা শুনে।

কিন্তু পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে গেল। ছিঃ ছিঃ কী ভাষা। কী সব আলোচনা! কিরণশশীর ছেলে সে। গরিব তারা হতে পারে কিন্তু মধ্যবিত্তর সব শালীনতা সভ্যতার গুণ তার মধ্যে তখনও কুঁই কুঁই করে হলেও একটুখানি বেঁচে ছিল। শিলির প্রেমিক ছিল সে। লেবুপাতার গন্ধ ছিল সেই প্রেমে, বৈশাখের ভোরের হাওয়ার পরশ ছিল। সব গোলমাল হয়ে গেল। তার চাকরি, তার ম্যানেজারের আত্মীয়কে খুশি করা, এসব কি চাকরির উন্নতির জন্যেই করতে হত? মাইনে একটু কম থাকলেই বা কী ক্ষতি হত?

এই কথা মনে হতেই তার মাথার মধ্যে কে যেন, গমগম করে বলে উঠল ধুলাবাড়ি! ধুলাবাড়ি। কত কী ইলেকট্রিক্যাল গুডস, কত সুগন্ধ, কত আরাম-বিলাসের উপকরণ, কত রঙিন নাইলনের প্যান্টি, ব্রেসিয়ার, কতরকম হুইস্কি। না না। উন্নতি তাকে করতেই হবে। পেছনে ফেরার উপায় নেই কোনোই। আত্মিক উন্নতি-ফুন্নতি বোকাদের ডিকশনারিতেই

পাওয়া যায়। এখন আর্থিক উন্নতিই হচ্ছে একজন মানুষের পরমকামনা। যার অর্থ আছে আজ, তার সব-ই আছে। যার দু-নম্বর অর্থ আছে, তার সবেরও বেশি আছে। সেই রাজা। দন্ডমুন্ডের বাপ। সেই এক নম্বর দু-নম্বর মান যে-কোনো ফেরেলবাজি করেই, চুরি-জোচ্চুরি, স্মাগলিং করেই এককাট্টা করা হোক-না-কেন! একবার পকেটে ঢুকে এলেই বাসস।

রাজেন বলল, জিনিসটি কিমতি হবে।

বলেই বলল, কিন্তু কেন বলো তো গুরু?

পুতনের ভয় করতে শুরু করেছিল ইতিমধ্যেই, একটু শীত-শীতও। ও তুতলে বলল, কে কে কেন?

–নোনতা বলে। আর কেন! শালা মিষ্টি খেয়ে খেয়ে মুখ মরে গেছে। একটু নিমকিন না হলে; বলেই গোড়ালির ওপর দু-পাক ঘুরে নেচে নিয়ে বলল, নিমকিন না হলে জমে না। নোনতা স্বাদ হচ্ছে দুনিয়ার সেরা স্বাদ। পৃথিবীর সব সেরা জিনিসের স্বাদ-ই নোতা।

বলেই, গলা ছেড়ে গান ধরে দিল, নিজের পেছনে তাল ঠুকে, খেমটার সুরে।

বল, গোলাপ মোরে বল, তুই ফুটিবি কবে সখী, বল গোলাপ মোরে বল...

গান থামিয়েই বলল, কার গান বলো তো গুরু?

পুতন গান-ফান বিশেষ জানে না, শোনেওনি। শুনেছে ওই শিলির-ই কাছে, যা একটু আধটু। তাই চুপ করেই থাকল।

–তুমি কী ভাবছ? গহরজানের?

রাজেন নিজেই বলল আবার।

-কে গহরজান?

গহরজানের নাম শোনোনি। কী হে তুমি? তুমি একটি মাল! ছ্যা: যাকগে তার কথা বলতে বসলে রাত পোয়াবে। আম্মা অবশ্য তাকে চোকে দেকিনি। কাকা-জ্যাটাদের কাছে শুনিচি। কিন্তু এ গান গহরজান বাইজিরও নয়।

–তো কার?

–আমাদের-ই পাড়ার এক লোকের লেখা।

–সে কে? তোমাদের পাড়ার মানে?

–জোড়াসাঁকোর। রবীন্দ্রনাথ টেগোরের।

.

আলোকঝারিতে বিকেলে গেছিল পরেশ, বন্দুকটাকে কাঁধে নিয়ে। কাল রাতে পুতন আর পুতনের বন্ধু রাজেনকে খেতে বলেছে, গদাইকেও বলেছে, দাদা নরেশ। যদি মুরগি অথবা কোটরা হরিণ পায় তো ভালো হয়। পাঁঠা আর হাঁস-মুরগির মাংস তো ওরা রোজ-ই খায়। বুনো মোরগ অথবা হরিণ খাওয়াতে পারলে, সস্তাও পড়ে। তা ছাড়া, ওরাও নিশ্চয়ই খুশি হবে। শহরের লোক রাজেন তো বুনো পশুপাখির স্বাদ-ই জানে না।

বেলা হয়েছে, কিন্তু সন্ধে হতে এখনও ঘণ্টা দুই দেরি। সাইকেলটা রেখে এসেছে টুঙ বাগানের মধ্যেই। হরিণ পেলে, সঙ্গে কাউকে নিয়ে আবার ফিরে আসতে হবে। মুরগি পেলে তো সাইকেলের হ্যাঁণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। অসুবিধে নেই কোনোই।

পাহাড়ে কিছুটা চড়েই, নালাটার মধ্যে নেমে এল পরেশ। নালার শুকনো বালিতে জানোয়ারদের পায়ের দাগ পাবেই। তারপর ঠিক করবে কী করবে, না করবে।

নালাটায় নামার সময়েই ওর ষষ্ঠেন্দ্রিয় ওকে হঠাৎ-ই সাবধান হতে বলল। এরকম হয় কখনো-কখনো। কী করে হয়, তা ও ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না। কিন্তু হয়।

নালাটাতে নেমে একটু এগোতেই পরেশ দেখল মস্ত একটি মাদি বাঘের

পায়ের দাগ। চিতা নয়, বড়োবাঘ। একেবারেই টাটকা। কিছুক্ষণ আগেই বাঘিনি গেছে শুকিয়ে-যাওয়া নদীর বালি-রেখে ধরে। মন খুব-ই খারাপ হয়ে গেল পরেশের। বাঘ যখন মারতে চায় না, তখন-ই বাঘের খোঁজ পায়। আর যখন চায়, তখন জঙ্গল হাঁকা করলেও টিকি দেখা যায় না। আজ ওর মন ওসব ঝামেলা-ঝক্কিতে যেতে চায় না। বাঘের মোকাবিলার মতো মন নিয়ে আজ বিকেলে ও বাড়ি থেকে বেরোয়নি আদৌ।

তবুও, সাবধানের মার নেই। যে-জঙ্গলে বিপজ্জনক জানোয়ার থাকতে পারে বলে মনে হয়, সেখানে ঢুকলে বন্দুকের ডান দিকের ব্যারেলে সবসময়ই এল.জি. রাখে, ছাত্তারের কথামতো। কখন যে, ইমার্জেন্সি হয়, কে বলতে পারে? কিন্তু এখন তো সম্ভাব্যতার কথা নয়, বাঘ যে আছেই, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। তাই কোনো ঝুঁকি না নিয়ে, এক ব্যারেলে বুলেট আর অন্য ব্যারেলে এল.জি. পুরল। হরিণও মারা যাবে এল.জি. দিয়ে। দূরে থাকলে বলও চালাতে পারে।

এই শুকনো নালাটার মধ্যে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলেই একটি দোলামতো জায়গা আছে ও জানে। তাতে মে মাসের শেষেও জল থাকে। ওইখানে পৌঁছে, ওই জলের পাশে, কোনো গাছের ওপরে উঠে বসে থাকলে কোনো-না-কোনো জানোয়ারের দেখা যে পাবেই, সেকথা ও জানত। মুরগি, ময়ূরও জল খেতে আসবেই। শুয়োরও আসবে তবে শহুরে রাজেন শুয়োর খায় কি না, জানা তো নেই!

তবে বাঘিনি, পরেশের আগে-আগেই গেছে। পরেশ তার একেবারে পায়ে পায়ে গিয়ে ঘাড়ে চড়তে রাজি নয়। আজকে বাঘিনির মোকাবিলা করতে আদৌ রাজি নয় পরেশ। আজ ওর মনে বাঘ নেই। মনে যেদিন বাঘ না থাকে, সেদিন বাঘের মোকাবিলা করা ঠিকও নয়। বাঘের শিকারে মন যদি পুরোপুরি কেন্দ্রীভূত না থাকে বাঘ-এরই ওপরে তাহলেই বিপদ। বিষম বিপদ।

কিছুটা এগিয়ে গেলেই ও পোঁছোবে, নালাটা বাঁক নিয়েছে যেখানে, সেইখানে ডানদিকে। সাবধানে, শুকনো পাতা এড়িয়ে বাটা কোম্পানির হান্টার শু পরে বালির ওপরে ওপরে ও নিঃশব্দে এগোতে লাগল।

কাঠঠোকরা ঠকঠক করে কাঠ ঠুকছে। কাঠবিড়ালি ডাকছে ল্যাজ তুলে তুলে, চিরির-র-র র, চিরি-র-র-র,করে। ময়ূর ডেকে উঠল নালার বাঁ-দিকের গভীর জঙ্গল থেকে কেঁয়া-আ আ-করে। বনমোরগের একটা মস্ত দল ডানদিকের জঙ্গলের গভীরে ঘুরে ঘুরে পোকা খাচ্ছে। শেষ-বিকেলের আলো লাল-কালো মোরগ আর মুরগিদের গায়ে পড়ে চমকে ঠিকরে যাচ্ছে। চারদিকে। মুরগিগুলো স্বগতোক্তি করছে পাতার মধ্যে, পাতা উলটে, পোকামাকড় খুঁটে খেতে খেতে।

বাঘিনি কাছাকাছি আছে, তাই গুলির শব্দ করা সম্ভব হল না।

আরও একটু এগোতেই, বাঘিনি একবার ডাকল উঁ-আ-ও করে।

এখন বাঘ-বাঘিনির মিলনের সময়। সঙ্গী খুঁজছে বাঘিনি। মেজাজ এখন খিঁচিয়ে আছে তার। রিঙ্কি মেমসাহেবের মতন। এই সময়ে মানুষীরা আর বাঘিনিরা করতে পারে না, এমন কম্মো নেই। মানুষ আর বাঘেরা এই সময়ে সাবধান না হলেই বিপদ।

বাঘিনি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল। কাঠঠোকরা কাঠ ঠোকা বন্ধ করল। ময়ূর-মুরগি এবং অনান্য সব পাখিরাও হঠাৎ চুপ করে গেল। বনের রানি রোদে বেরিয়েছে। চুপ করে থেকেই সম্মান জানাতে হয় যে, সেকথা ওরা সকলেই জানে।

বাঘিনি ডাকার সঙ্গে সঙ্গেই এক্কেবারেই ফ্রিজ করে গেল পরেশ। একটি খয়ের গাছের আড়াল নিয়ে। পোড়াকাঠের মতো দাঁড়িয়ে রইল। আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার সময় দিল বাঘিনিকে। যেদিকে যেতে চায়, যাক।

তারপর-ই ওর মনে হল, বাঘিনি যদি জল খেয়ে, এই নালা ধরেই আসে তাহলে তার মুখোমুখি হতেই হবে। মুখোমুখি হতে তো আজকে চায় না পরেশ। তাই, তাড়াতাড়ি নালা ছেড়ে পরেশ বাঁ-দিকের জঙ্গলে উঠে গেল।

বেলা শেষ হয়েছে। কাল পয়লা বৈশাখ। নববর্ষ বলেই নেমন্তন্ন করেছে ওদের। কিছু শিকার না করে নিয়ে গেলেই নয়। বাঘ তো আর খাওয়াতে পারবে না। শালি! বাঘিনি মশকরা করার সময় পেল না আর।

মনে মনে বলল, পরেশ।

পাতা ঝরে গিয়ে গভীর বন এখন ন্যাড়া। যেসব গাছে পাতা আছে সেইসব গাছেও লালচে হলদেটে পাতারা ফুলের-ই মতো ফুটে আছে কালো কালো ডালে, হাওয়ার ছোঁওয়ায় ঝরে যাওয়ার অপেক্ষায়। সামনেই এক দঙ্গল কুঁচফলের ঝাড়। লাল-কালোর দাঙ্গা লাগিয়েছে বনে। নীচে-ন্যাড়া, শালের বন। হাতির কানের মতো পাঁপড় ভাজার মতন মুচমুচে বড়ো বড়ো পাতা ঝরিয়ে দিয়ে সেগুন বন, এক আশ্চর্য বিধুর মৌনী ভেক ধরেছে। চৈত্রশেষের আর প্রথম বোশেখের বন, পরেশের মনকে উদাস করে দেয়। কিছুই ভালো লাগে না তার তখন।

কোনো গাছে উঠে বসলে, সেখান থেকে নালাটা ভালো করে ঠাহর করা যায়, তাই ঠাহর করছিল ভালো করে পরেশ, ঠিক সেই সময়ই ওর বাঁ-দিকে শুকনো পাতা মচমচিয়ে, কোনো কিছু নড়াচড়া করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে খয়ের গাছের পেছন থেকে সরে গিয়ে একটা শিমুল গাছের মোটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে চাইল সেদিকে। চেয়েই স্তব্ধ হয়ে গেল ও। বাসরে বাস শঙ্খচূড় সাপের জোড় লেগেছে। প্রকান্ড বড়ো এক নাগ আর নাগিনি। মাটি থেকে চার-পাঁচ ফিট উঁচু হয়ে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে একে অপরকে। হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে তাদের।

এই দৃশ্য যে, দেখতে পায় সেই-ই নাকি রাজা হয়। শুনেছে অনেকেরই কাছে। এবার কি রাজা হবে পরেশ?

নিজেই বলল, নিজেকে নিরুচ্চারে, ওই দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে।

এতদিন জঙ্গলে-পাহাড়ে ঘুরছে, কিন্তু আগে কখনোই দেখেনি শঙ্খচূড়ের জোড় লাগা।

বন্দুকের বাঁ-নল থেকে বলটা বের করে একটা দু-নম্বর ছররা পুরল তাতে পরেশ। যদি নাগ বা নাগিনি হঠাৎ দেখে ফেলে তাকে, তবে তাদের হাত থেকে বাঁচতে হলে ছররা মারা ছাড়া উপায় নেই। বল বা এল.জি. দিয়ে হঠাৎ তেড়ে-আসা সাপকে ঠেকানো মুশকিল।

বন্দুকে ছররা পুরে, সে অনিমেষে নাগ-নাগিনির মিলন দেখতে লাগল। ছাত্তার মিয়ার ভাষাতে বললে বলতে হয়, ওর দিল খুশ হয়ে গেল।

কেন জানে না, হঠাৎ-ই ওর রিঙ্কি মেমসাহেবের কথা মনে পড়ে গেল, শরীরের মধ্যে সেই ছটফটানিটা হঠাৎ ফিরে এল। পরেশ ভাবছিল বাঘ বা সাপ বা অন্য সব জন্তু জানোয়ার-ই অন্য লিঙ্গর সঙ্গে মিলিত হয়-ই। তারা তাদের মায়ের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে, না মেয়ের সঙ্গে, তার বাছ-বিচার তারা কখনোই করে না। এই বিচার থাকে কেবল মানুষের-ই। শুধুমাত্র মানুষ-ই মিলিত হয় না যন্ত্রের মতো, স্বজাতের যেকোনো স্ত্রীলিঙ্গের সঙ্গে। এবং শুধুমাত্র দু-একজন মানুষ-ই পারে, অথবা অবিবাহিত মানুষ পারে, না মিলিত হয়ে থাকতে। যেমন, পরেশ পেরেছে। মিলনের সঙ্গী, নিজের মনমতো পছন্দ করা শুধুমাত্র মানুষের-ই ধর্ম। এই পছন্দের পেছনে নানারকম সামাজিক এবং বিবেকজাত বাধাও থাকে। পছন্দ না হলে, সমাজের অনুমোদন না পেলে সারাজীবন একা একাই একজন মানুষ

কাটিয়ে দিতে পারে, দেয়ও তো সত্যিই! কত পুরুষ ও নারীও!

সেই মুহূর্তে, ও যে, মানুষ হয়ে জন্মেছে, কোনো মনুষ্যেতর জীব হয়ে নয়; এই কথাটা নতুন করে জেনে খুব-ই ভালো লাগল পরেশের। এই একাকিত্বর আনন্দ এবং যন্ত্রণা শুধুমাত্র মানুষের-ই যে, একার। অন্য প্রাণীরা এই তীব্র আনন্দ এবং দুঃখ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই যে, করতে পারে না। মেশিনের মতো তারা খায়, ঘুমোয়, জোড় লাগে, বংশবৃদ্ধি করে; তারপর একদিন মরে যায়। বেশি সময়েই তারা মরে, অন্যের খাদ্য হয়ে। কম সময়েই মানুষের মতো অসুখ-বিসুখে মৃত্যু হয় ওদের। জন্মায় অলক্ষ্যে যেমন, হঠাৎ করে; চলেও যায়, তেমনই করে।

একদৃষ্টে, জোড়া-লাগা নাগেদের দিকে চেয়েছিল পরেশ। এমন সময় ওর মনে হল, ওকে কেউ দেখছে পেছন থেকে।

জঙ্গলে নড়াচাড়া, কখনোই হঠাৎ-ই করতে নেই। হঠাৎ ঘাড়-ঘঘারাতে গেলে ঘাড়টিই খুইয়ে বসতে হয়। তাই খুব সন্তর্পণে পরেশ শরীর না ঘুরিয়ে নিজের ঘাড়টাকে আস্তে আস্তে ঘোরাতে লাগল দুই গোড়ালির ওপরে পা রেখে। আধখানাও ঘোরেনি, তখুনি তার চোখের কোনায়, সে দেখতে পেল বাঘিনি নালার মধ্যে দাঁড়িয়ে জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়াল থেকে মুখ তুলে; একদৃষ্টে তাকে দেখছে নিশ্চল হয়ে।

বাঘিনিকে দেখতে পাওয়ামাত্র পরেশও স্থাণুর-ই মতো নিশ্চল হয়ে রইল।

বাঁ-চোখের কোণে বাঘিনিকে নজর করতে লাগল সাবধানে একটুও নড়াচড়া না করে।

চোখের পাতা পর্যন্ত ফেলল না আর। পুরো দু-টি মিনিট বাঘিনি তাকে দেখল। তারপর-ই জার্মান-জঙ্গলের ঝাড়ের আড়ালে আড়ালেই চলতে শুরু করল নালার মধ্যে মধ্যে। শেষসূর্যের সোনা আলো, সেই ঝাড় ও গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা-যাওয়া তার বাদামি-লাল-আর কালো ডোরাকাটা-সাদার ছোপলাগা শরীরে পড়ে, তাকে যেন আরও জমকালো করে তুলল। আস্তে আস্তে অদৃশ্য হয়ে গেল তার হেলতে-দুলতে যাওয়া শরীর, নালার অন্য প্রান্তে।

বাঘিনি অদৃশ্য হয়ে গেল, পরেশ সাবধানে, জোড়-লাগা নাগ-নাগিনির দৃষ্টি এড়িয়ে, নালায় নামল এসে। তারপর চলতে লাগল জলের দিকে। যেখান থেকে বাঘিনি সবে জল খেয়ে উঠে

কে জানে! সে আজ জোড়-লাগার সাথি খুঁজে পাবে কি না।

বাঁকটা নিয়েছে যেই, অমনি দেখে একটা মস্ত শজারু চলেছে জলের দিকে। তাকে দেখেই, বন্দুক তুলল পরেশ। সেও পরেশকে দেখেছিল। দেখেই, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের সাদা সাদা উলের কাঁটার চেয়েও অনেক মোটা আর লম্বা, কাঁটাগুলো ফুলিয়ে সে, পিঠ গুটিয়ে গোলাকৃতি হয়ে একটি প্রকান্ড সাদা-কালো বলের-ই মতো হয়ে গেল। হয়ে গিয়েই, ঝনঝন করে

কাঁটা বাজিয়ে গভীর রাতে বল্লমের মাথায় ঘুঙুর বেঁধে, নির্জন গ্রামের পথে দৌড়ে-যাওয়া ডাক হরকরার-ই মতো ঝুমঝুমঝুম আওয়াজ তুলে বেগে দৌড়ে এল পরেশের-ই দিকে। তাকে ভয় পাওয়ানোর জন্য।

পা-দুটি শক্ত করে দাঁড়াল পরেশ। খুশিতে ঝলমল করে উঠল ওর মুখ। মনে মনে বলল, আয় শালা! আরও কাছে আয়।

শজারুটি যখন খুব-ই কাছে এসে পৌঁছোল, শেষমুহূর্তে, হাস্যকর এবং শজারুর পক্ষে লজ্জাকর ভঙ্গিতে ঘুরে, সে চলে যেতে চেয়েছিল যদিও, পরেশ তখন-ই ভালো করে নিশানা নিয়ে গুলি করল। অতকাছ থেকে রোটাক্স-বল-এর থাপ্পড় খেয়ে মুখ থুবড়ে ভূলুণ্ঠিত হয়ে পড়ল শজারুটা কাঁটা-ছড়িয়ে, দিনশেষের গরম বালি আর নুড়ির ওপরে। খানিকক্ষণ থরথর করে কাঁপতে থাকল। কয়েকফোঁটা রক্ত বেরোল মুখ দিয়ে। ঝুমঝুম ফুলিয়ে-তোলা কাঁটা, তার দম্ভর প্রতীক, ধীরে ধীরে শুয়ে পড়ল শায়ীন ওর গায়ের ওপরে। তারপর এই জন্মের মতন স্থির হয়ে গেল। প্রবলের হাতে দুর্বল চিরদিন-ই এমন করেই মরে! এতে নতুনত্ব কিছু নেই। কী জঙ্গলে, কী শহরে! কী জানোয়ার, কী মানুষ। শেষাঙ্কটা একইরকম।

পেল্লায় সাইজের, প্রায় মন-খানেক ওজন হবে শজারুটার। ওই কাঁটাসমেত তাকে একা একা বয়ে নিয়ে যেতে পারবে না কোনোমতেই পরেশ। এতবড়ো শজারু, নিম্ন-আসামের এই অঞ্চলে যে, আদৌ আছে,

তাও জানত না। আবু ছাত্তারকে বলতে হবে।

এখানে এখন তাকে রেখে গেলেও, শেয়াল বা হায়নার বা চিতার খাদ্য হয়ে যাবে। ফিরে আসার আগেই তারাই সাবড়ে দেবে পুরোপুরি। নিয়ে যেতে পারলেও নিয়ে গিয়ে লাভ ছিল না কোনো। শজারুর মাংস সকলে ভালোও বাসে না। মাটি-মাটি গন্ধ থাকে একরকম, খরগোশের মাংসর গন্ধর মতো। পরেশ নিজে যদিও ভালোবাসে। শিলিও। দাদা নরেশও শজারু ভালোবেসেই খায়। পুতনও খায় যদিও। আগে তো শজারু, বাড়ির মেয়েরাই মারত কলাগাছ ছুঁড়ে। কলাগাছ গেথে যেত কাঁটাতে। দৌড়ে পালাতে পারত না। তারপর অন্যেরা গিয়ে লাঠিপেটা করে শেষ করত।

পুতনের কলকাতার বন্ধু রাজেন হয়তো কোনোদিন শজারু খাওয়া দূরে থাকুক, শজারু কখনো চোখেও দেখেনি, চিড়িয়াখানায় ছাড়া। তার কাছেও এ এক নতুন অভিজ্ঞতাই হবে। এইসব ভেবে, কোমরের বেল্ট থেকে রেমিংটনের ছুরিটা বের করে ওখানেই বসে শজারুটাকে কাটল পরেশ। তারপর সবচেয়ে ভালো জায়গা থেকে সের পাঁচেক মাংসের একটা টুকরো কেটে, তাতে একটা ফুটো করে নিয়ে বন থেকে লতা ছিঁড়ে এনে বেঁধে ডান হাতে ঝুলিয়ে, বাঁ-হাতে বন্দুক নিয়ে ফিরে চলল।

এইরকম-ই হয়। ভাবছিল, শিকার করবে কোটরা হরিণ, ময়ূর, অথবা বনমুরগি। অথচ শিকার হল শজারু। জঙ্গলে এমন-ই হয়। যা চাওয়া যায়, তা পাওয়া যায় না; আর যা, না চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়।

এখানের রকম-সকমই সব আলাদা।

সূর্য প্রায় ডুবে এসেছে। উঁচু-নীচু পথ বেয়ে চলেছে পরেশ, টুঙ বাগানের দিকে। গাছের ছায়ারা দীর্ঘতর হয়ে বসেছে। ঝিঁঝি ডাকতে আরম্ভ করেছে চারপাশ থেকে, একটানা, ঝুমঝুমির মতো। যেন হাজার হাজার শজারু কোনো মন্ত্রবলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের গায়ের লক্ষ লক্ষ কাঁটা বাজাচ্ছে কোনো অদৃশ্য শত্রুকে ভয় পাওয়ানোর জন্যে। এই শেষ বসন্তর আসন্ন সন্ধের বনপথে হাঁটতে হাঁটতে ঝিঁঝি-র ডাকের মধ্যে, শিমুলের আর পলাশের ঝিম-ধরা লাল রঙের মধ্যে, কালো পাথর আর লাল-হলুদ শুকনো পাতার রাশ, আর হলুদ, পিছল-পিছল, শুকনো বাঁশপাতার ওপরে ভেসে চলতে চলতে নেশা লাগে পরেশের। নেশা বলতে, ওর এইটিই প্রধান। মদ, মাঝে মাঝে খায় বটে ঠিক-ই; কিন্তু মদ কোনোদিনও ওকে খেতে পারেনি। অথচ এই বন আর পাহাড়, নদী আর বাদার নেশা কিন্তু তাকে খেয়েছে। পুরোপুরিই। সম্পূর্ণভাবেই খেয়েছে। ঘাড় মটকেছে ওর, বাঘে যেমন হরিণের ঘাড় মটকায়। কোনো মুক্তি নেই পরেশের আর এই জন্মে। এই সুন্দরীর হাতেই সে নিঃশর্তে হত হয়েছে, নিরুপায়ে।

বাড়ি পৌঁছোতেই দাদা নরেশ, শজারুর মাংস দেখে খুশি হল খুব-ই। একগোছা শজারুর কাঁটা এনেছিল পরেশ, শিলির জন্যে। এই কাঁটা, শখ করে শিলি কখনো-কখনো মাথার চুলে গোঁজে। বন্ধুদের দেয়।

জংলি জানোয়ারের মাংস একদিন ঝুলিয়ে রাখলে বা ধুয়ে দিয়ে রাখলে

নরম হয়। খেতে ভালো লাগে। কিন্তু শিলি বলল, কাকা। আজ-ই ডুমা ডুমা কইর‍্যা কাইট্যা রাখুমানে।

হাত দুটো ধুয়ে এসেই জামাকাপড় না ছেড়েই বন্দুক পরিষ্কার করছিল বারান্দায় বসে, পরেশ। অন্যঘরের বারান্দায় বসে দাদা নরেশ, ভাইয়ের সঙ্গে গল্প করছিল।

ক্লিনিং রড-এর মাথায় শিলির ভেঁড়া শাড়ির নরম টুকরো পেঁচিয়ে থ্রি-ইন-ওয়ান তেল দিয়ে মুছে রাখল এবারে। শুকনো কাপড় দিয়ে আগেই ফোঁটা কার্তুজের বারুদের ময়লা ঘষে ঘষে তুলেছিল। তারপর ক্লিনিং রড থেকে নোংরা ন্যাকড়া খুলে ফেলে ক্লিনিং-রড ও বন্দুক ঘরে তুলে রেখে সে, চান করতে যাচ্ছিল যখন, তখন-ই দাদা বলল, বুঝলি রে, ছাত্তার আইছিল।

-কখন?

ঘরের দাওয়ার খুঁটি ধরেই দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, পরেশ।

-এই, বেলা চারটা নাগাদ হইব।

–কইলো কী?

–কয় নাই কিছু। তরে এই খামটা দিয়া গেছে। কইলো, টাকা আছে।

–ক্যামেরন সাহেবের কথা কইলো কি কিছু?

পরেশ শুধোল।

–হ। কইলো, বাঘ মারাইয়া দিছে তারে ছাত্তারে। সাহেবে নাকি খুশি খুব-ই।

পরেশের খুব-ই ইচ্ছে হল, রিঙ্কি মেমসাহেবের কথা জিজ্ঞেস করে একবার দাদাকে। ছাত্তার মিয়া কিছু বলেছে কি না, তার সম্বন্ধে। কিন্তু লজ্জায় জিজ্ঞেস করতে পারল না।

কেন যে লজ্জা হল নির্লজ্জ পরেশের, ভেবে পেল না।

লুঙ্গি আর গামছা নিয়ে ইন্দারায় যাওয়ার জন্যে সিঁড়ি দিয়ে নামছে ও, সেই সময়ে দাদাই আবার বলল রিঙ্কি মেমসাহেব কেডা রে?

পরেশ চমকে উঠল।

আবারও লজ্জা হল খুব।

বলল, ক্যামেরন সাহেবের লগে আইছিল শিকার করনের লইগ্যা।

–ম্যাম নাকি?

দাদা শুধোল।

-হ! ম্যাম-ই বটে। তবে বিলাতি না। দিশি ম্যাম।

–দিশি ম্যামরাও আবার শিকার করতাছে নাহি আজকাল। আগে তো রাজারাজড়ার ঘরের মাইয়ারাই খালি শিকার করত বইল্যা জানি।

–আইজকাইল যার ঘরে পয়সা, হেই রাজারাজড়া। তাগোই দিন এহন। রাজাদের আর দাম লাই কোনোই। সব, মরা হাতি।

একটু চুপ করে থেকে বলল আবার পরেশ, ছাত্তারে, আর কইল কী? রিঙ্কি ম্যামসাহেবের কথা?

নারী-বিদ্বেষী পরেশের এই রিঙ্কি ম্যামসাহেবের প্রতি এত ঔৎসুক্যে অবাক হল দাদা নরেশ। পরেশ নিজেও কম হল না।

–ও। ভুইল্যাই গেছিলাম গিয়া। ছাত্তারে কইল, যে তর লইগ্যা একশত টাকা রিঙ্কি ম্যামসাহেবে দিছে। ক্যামেরন সাহেবের টাকার লগেই আছে হেই টাকা। ওই খামেই।

পরেশ কিছু বলতে যাওয়ার আগেই নরেশ বলল, আর তরে একবার দেখাও করতে কইছে সেই ম্যামে।

–আমারে? ক্যান? কোনখানে?

অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে বলল পরেশ।

–আরও কয়দিন ধুবড়িতে থাকব ম্যাম। জিঞ্জিরাম নদীতে যাইব নাকি শুনি। কুমিরের ফোটো তুইলবার লইগ্যা। স্যা নদীটাই বা কোনখানে? নাম শুনি তো নাই কখনো।

নরেশ শুধোল।

পরেশ বলল, স্যা নদী গারো পাহাড়ের কোলে। ছোট্ট, মানে চওড়াতে ছোট্টই নদী, কিন্তু কুমিরে কুমিরে ভরতি। কিন্তু আমারে ডাকে ক্যান ম্যামে? ছাত্তার-ই তো যথেষ্ট। হ্যাঁ তো আর বাঘ শিকার না, যে দোসর লাগব।

-ম্যামেদের কথা, ম্যামেরাই জানে।

দ্ব্যর্থক গলায় বলল, নরেশ।

পরেশ বলল, যাই, চানটা কইরাই আসি। চ্যাট-চ্যাট করতাছে গা ঘামে আর শজারুর

বাইরে ফুটফুট করছে জ্যোৎস্না। আমগাছে কাক ডাকছে। আর কদিন পরেই তো পূর্ণিমা। ইন্দারা থেকে বালতি বালতি জল তুলে ঝুপ ঝুপ করে চান করতে লাগল পরেশ।

হাসনুহানা আর বেলফুল ফুটেছে উঠোনে। ওর গায়ে-মাখা নিমসাবানের

গন্ধের সঙ্গে হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধ মিশে গেল। কিছু হাসনুহানা কেটে দিতে হবে। সাপ আসে, হাসনুহানার তীব্র গন্ধে।

পরেশ ভাবছিল যে, এই জ্যোৎস্না রাতের গায়েও একধরনের গন্ধ আছে, মেঠো ইঁদুরের গন্ধের মতো, বছরের এই সময়ের রাতে লিচু গাছে গাছে লিচু-খেয়ে-বেড়ানো বাদুড়ের গায়ের গন্ধের মতো। গ্রামের গায়ে একরকমের গন্ধ; বনের গায়ে অন্যরকমের। এই চাঁদনি রাতও কতরকম গন্ধের কারবার করে। এই জ্যোৎস্নারাতও যেন আর এক সাদা দাড়িঅলা মুসলমান আতরওয়ালা। রিঙ্কি মেমসাহেবের গায়ের গন্ধের সঙ্গে যেমন, শিলির গায়ের গন্ধের মিল নেই, তেমন শিলির গায়ের গন্ধের সঙ্গে আবার আলোকঝারি পেরিয়ে গিয়ে পৌঁছোনো পর্বতজুয়ারের মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধের মিল নেই। যেমন জিঞ্জিরাম নদীর পারে দাঁড়িয়ে থাকা গারো বা রাভা মেয়েদের গায়ের গন্ধের সঙ্গে মেচ মেয়েদের গায়ের গন্ধেরও মিল নেই। প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক নদী, প্রত্যেক মেয়ের গায়ের গন্ধ আলাদা। কোনো মেয়ের খুব কাছে না এসেও পরেশ জানে তা। নদীর গন্ধের-ই মতো, মেয়েদের গায়ের গন্ধও দূর থেকে পায় ও।

হাওয়ায়, আর বৃষ্টিতে, জ্যোৎস্নায় আর কুয়াশায়, ভেসে আসে সেই গন্ধ।

কোয়াক। কোয়াক। কোয়াক করে, গম্ভীর গলায় মন খারাপ-করা ডাক ডাকতে ডাকতে একদল কেশরঅলা লম্বা-ঠ্যাং-এর সরু-গলা সাদা পাখি উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে, ময়নামারীর বিলের দিকে। আলোকঝারির

পাহাড় থেকেই এল ওরা। ছাত্তার বলছিল, এই বকগুলোর ইংরিজি নাম নাকি হেরন।

ভালো করে সাবান মেখে, আবার জল ঢেলে ঢেলে হাপুস হুপুস করে চান করতে করতে পরেশ গায়ে সেই জ্বালাটা আবারও অনুভব করল। সেই যমদুয়ারের মাচায় বসে, রিঙ্কি মেমসাহেবের কাছে থাকার সময়ে, যেমন হয়েছিল। গা-ছমছম করে উঠল বীর শিকারির। তাকে ডেকেছে কেন রিঙ্কি মেমসাহেব কে জানে? নিশির ডাকের মতোই, সেই নিরুচ্চারিত ডাক তার বুকে এক অনামা ভয় জাগিয়ে তুলল। তাড়াতাড়ি, শুকনো গামছা দিয়ে গা মুছে, ভেজা গামছা ছেড়ে ফেলে, লুঙ্গিটা পরে ফেলল পরেশ। এই জ্যোৎসামাখা উদোম রাতে, একমুহূর্ত উদোম থাকলেই গা-শিরশির করে পরেশের। বিয়ে-করা মানুষ ও মানুষীরা অনেক সহজেই বোধ হয় নিজেদের নগ্নতাকে মেনে নিতে শিখে যায়। নগ্নতাতে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা। বিয়ে না করা লোকেরা পারে না। মুহূর্তের জন্যে নগ্ন হলেও হঠাৎ সামনাসামনি পড়ে যাওয়া বুনো শজারুর মতোই তাদের গায়ের সবকটি অদৃশ্য কাঁটা ঝমঝম করে বাজতে থাকে, গা-ময় কাঁটার-ই মতো, লোমগুলো খাড়া হয়ে ওঠে।

এই চাঁদের রাত, হাসনুহানার গন্ধ, রাত-পাখির ডাক আর নিজের ক্ষণিক নগ্নতা মিলে মিশে গোঁড়, গেঁয়ো, আনপড় পরেশকে তারা যেন, হাত ধরে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় এক অচেনা পুরের দিকে। রিঙ্কি মেমসাহেবের কথা

ভাবলেই, সে যেন এখনও কেমন ঘোরের মধ্যে পড়ে যায়। পরেশ ভাবে, পরেশও কি কোনোদিন তার এতদিনের নারী-বিদ্বেষ মুছে ফেলে অন্য দশজন ল্যাজে-গোবরে পুরুষমানুষের মতো, আবু ছাত্তারের-ই মতো, কাবিন নামাহ-তে সই করে বিবি আর আওলাদ নিয়ে ঘর করবে? জীবনের এই মধ্যাহ্নে এসে?

এখন যে, বড়ো তাপের সময়। শরীরে তাপ, সংসারে তাপ; বাজারে তাপ। ঘর বাঁধার মতো ভুল, প্রথম যৌবনের অবুঝ উচ্ছ্বাসেই করা যায়, এখন আর তা হয় না। কাবিন নিমাহ-র ওয়াক্ত চলে গেছে। এখন প্রত্যেক মানুষ ও মানুষী স্বরাট সম্রাট আর সম্রাজ্ঞী। মেয়েরাই বোরখা আর পরতে চাইছে না। নিকাহ করে সারাজীবন বেঁধে রাখতে চাইছে না, তারাও আর নিজেদের, অন্য কোনোই পুরুষ গাধা-বোটের সঙ্গে।

জীবনের মানে ভেসে-যাওয়া, নদীর নিত্যনতুন বাঁকের নিত্যনতুন চমকের সৌন্দর্যর শিহরনে মুহুর্মুহু শিহরিত হতে থাকার-ই অভিজ্ঞতা। বিয়ে বা নিকাহ। সামাজিক বা শারীরিক প্রয়োজনীয়তা হয়তো ছিল পাঁচশো বছর আগেও। আজকে এই পুতুলখেলার কোনো অবকাশ-ই নেই। অন্তত পরেশের কাছে। বিয়ে না করা মানুষ, পরেশের মতো, রিঙ্কি মেমসাহেবের মতো, বিয়ে-করা মানুষদের চেয়ে অনেক-ই বেশি স্বাধীন। এবং খুশিও। তারা নিজেদের জন্যেই বাঁচে জীবনে, বিবি আর একপাল বাচ্চাদের নিয়ে হিমশিম হয়ে এই একটামাত্র জীবন, জীবনের মধ্যে থেবড়ে বসে, তাদের

জীবনের মাছি ভন ভন আঠালো মুহূর্তগুলিকে কাঁঠালের প্যাতপ্যাতে কোয়ার মতো নেড়ে-চেড়ে, জীবনের মেয়াদ শেষ করে যায় না।

সেই জীবন, এক, একঘেয়ে রিক্ত রিয়াজের জীবন, সে-জীবন কোনোদিনও বন্দেগি হয়ে ওঠে না।

না, না। পরেশ অমন ভুল করবে না।

রিঙ্কি মেমসাহেবের কথা ভেবে, তার যতই রিকিঝিকি হোক-না-কেন শরীরে।

এত ভালো ভালো কথা পরেশ মুখে হয়তো বলে না, কিন্তু তার মাথার মধ্যে যে, ভাবনার অনুরণন ওঠে, তা ভালো ভালো শব্দে প্রকাশ করলে হয়তো এইরকম-ই শোনাত।

এ জন্মে হল না। অনেক কিছুই হল না। পরের জন্মে, ভালো করে লেখাপড়া শিখবে পরেশ। অনেক বড়োলোক হবে। ক্যামেরন সাহেবদের সমাজের কোরকের গন্ধ নেবে নাকে। মস্ত হয় থাকবে সারাক্ষণ। পরের জন্মে।

আজ পুতন এবং তার বন্ধু রাজেন খাবে।

সকাল থেকে শিলি রান্নাঘরেই আছে। শহরের ছেলেকে গ্রামের রান্না

খাওয়াব, বলেছে পরেশ। কুচো মাছ ভাজা। শিঙি-বেগুন-আলু-পেঁয়াজ-কাঁচালঙ্কার রসা, চিতলের পেটি, ধুবড়ি থেকে আনিয়েছে পরেশ, বাস-ড্রাইভারকে দিয়ে। রান্না করছে শিলি, ধনেপাতা কাঁচালঙ্কা দিয়ে। কাঁঠালের বিচিভাজা। বড়ো বড়ো কইয়ের হরগৌরী। একপাশে মিষ্টি, অন্য পাশে ঝাল। চালতার আর করমচার টক। মধুদার দোকানের রসগোল্লা। আর ঘন করে জ্বাল-দেওয়া দুধের লাল-থকথকে পায়েস। সেদ্ধ চালের। কিরণশশীকেও খেতে বলেছে রাতে শিলি। বুড়ির জন্যে লুচি করে দেবে ক-খানা। কুমড়ো, আলু আর ছোলার তরকারি করবে। নিরামিষ। পায়েস তো আছেই। গদাইও আসবে।

এতদিন গদাইকে সহ্য করতে পারত না শিলি। বদলে-যাওয়া পুতন আর তার বন্ধু রাজেনকে দেখার পর থেকে গদাইকে অতখানি খারাপ আর লাগে না। যাই হোক, গদাই গ্রামের ছেলে। শিলি ওকে তবু বোঝে। ওদের বোঝে না। পুতন এতটাই বদলে ফেলেছে নিজেকে, যে, তাকেও প্রায় অচেনা বলেই ঠেকছে শিলির চোখে।

রাজেন ছেলেটার চোখের দৃষ্টির মধ্যেই দারুণ এক অভব্যতা আছে। শিলিকে নদীপারের নগ্ন দেখার পরও গদাই-এর চোখে এমন বিচ্ছিরি কদর্য দৃষ্টি ছিল না। জানে শিলি।

রাজেনের দুটি চোখের যেন অনেকগুলো অসভ্য হাতও আছে। মাকড়সার হাতের মতো রোমশ, গা ঘিনঘিন হাত। তার চোখের যে, অদৃশ্য হাত দু-

টি দিয়ে ও শিলিকে চকিতে নগ্ন করে ফেলে, তার সমস্ত লজ্জাস্থান-ই যেন অসভ্যর মতো অধৈর্যে স্পর্শ করে।

রাজেন ওর দিকে তাকালেই ভীষণ-ই অস্বস্তি বোধ করে শিলি। ভীষণ খারাপ লাগতে থাকে। নরকের কীট ও একটি। ওই রাজেন।

কাকা ওকে খেতে বলাতে তবু আপত্তি করেনি শিলি। কারণ, বাবা ও কাকার মুখের ওপর কিছু বলার মতো শিক্ষা ও পায়নি। রাজেনের জন্যেই এতপদ রান্না করতে হবে শুনে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল ও। তবু ভেবেছে, পুতনদার মতি যদি ফেরে। অনেক-ই বদলে গেছে তার পুতনদা। মতি আর ফিরবে বলে মনে হয় না। মুখের ভাষায়, ব্যবহারে, পোশাকে-আশাকে, চাউনিতে সেও অন্য এক রাজেন হয়ে উঠেছে। যে-পুতনদাকে দেখলেই, ভালোলাগায় মরে যেত একদিন, তাকে দেখেই এই ক-দিন কেমন এক শঙ্কা বোধ করেছে শিলি। খারাপ-লাগা।

একদিন দুপুরে কিরণশশীর কাছে গেছিল শিলি। পুতন আর রাজেন বাড়ি ছিল না। ধুবড়িতে গেছিল সিনেমা দেখতে।

শিলি বলেছিল, কী বুড়ি? ছাওয়াল আইছে বইল্যা কি আমারে ভুইল্যা যাওনটা ঠিক?

কিরণশশীও বদলে গেছেন। এই ক-দিনেই তাঁর চোখ কোটরে বসে গেছে। ছেলে-আসার আনন্দের বদলে, এক গভীর ভয় ও শঙ্কা তাঁকেও

ঘিরে রয়েছে।

খুব-ই লজ্জিত গলায় কিরণশশী বলেছিল, কার ছাওয়াল? পুতন, আমার ছাওয়াল না।

–কও কী তুমি? পাগল হইল্যা নাকি?

-ঠিক-ই কই রে শিলি। পুতন আর সেই পুতন নাই। এক্কেরে গোল্লায় গেছে। আমার সামনেই ছিগারেট খায়, মদ খায়। বোঝছস?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, একদিন তর কাকা পরেশরে, কতই কী না কইছি মদ খাওনের লইগ্যা। অথচ ওর কত বয়স হইছে। একদিনও আমারে অসম্মান করে নাই। আমার সামনে কখনো খায় নাই। গাল-মন্দ কইরলে, মাতা নীচু কইরাই খাড়াইয়া থাকছে। আর বলছে, আমি খারাপ মাসিমা। আমি একটা বকা। বাউণ্ডুইল্যা। আমার কথা ছাড়ান দেন। বাবা-মায়ের সম্মান কি সব পোলায় রাখে? আমি হইলাম গিয়া আমাগো পরিবারের কুলাঙ্গার।

-তাই-ই কয় নাকি কাকায়?

অবাক গলায় বলেছিল, শিলি।

-হ। তাই তো কইছে চিরডা দিন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আর আমার পুতন? ছিঃ ছিঃ কী ঔদ্ধত্য। কী কম আর। সঙ্গে ওই এক হারামজাদারে লইয়া আইছে। তরে কী কম আর শিলি। সেদিন হোন্দলের মায়ের বড়ো মাইয়াডা আইছিলো, মায়ের দেরি হইতাছে দেইখ্যা খোঁজ করণের লইগ্যা। ডাগর মাইয়া। ষোলো-সতেরো বছর বয়স হইব।

–জানি, পাঁচী নাম তো? দেখছি আমি তারে। তা হইছিল কী তাই কও।

শিলি, জিজ্ঞেস করেছিল।

–আরে মাইয়াডা যখন ফিইর‍্যা যাইতাছে তখন বাঁশবাগানের মধ্যে তারে এক্কেরে পাইড়া ফ্যালাইছিলো ওই হারামজাদায়। কী লজ্জা! কী লজ্জা! পাঁচী আইয়া আমার কাছে কাইন্দা মরে। ইডা কেমন ভদ্দরলোকের পোলা, ক তো দেহি? আমি তহন-ই হারামজাদারে ডাইক্যা কইয়া দিছি যে, পরেশরে কইয়া দিলে পরেশ গুলি কইর‍্যা থুইব আনে। তার অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা নাই কোনো। আর যদি কহনও দেহি...

কইতেই আমার পোলার আমার ওপর কী গোসসা। সে কয়, তোমার এত্তবড় সাহস!

–কও কী বুড়ি?

–বোঝ তয়। মায়েরে কয় পোলায়! কয়, তুমি আমার অতিথিরে অপমান

করো। তোমারে আমি আর এক পয়সাও পাঠাইম না। না-খাইয়া মরণ লাগব তোমার দেইখ অনে। কইয়া দিলাম আজ।

শিলি কাঁদতে থাকা কিরণশশীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তুমি কান্দো ক্যান বুড়ি? আমরা তো সবাই আছি নাকি, নাই আমরা? আমরা যদি দুগা খাই। নিজেরা যদি না-খাইয়া না মরি; তয় তোমারেও খাওয়াইমু। পুতনদার মাথাটাই এক্কেরে গেছে গিয়া। ভূত চাপছে মাথায়।

–নারে শিলি। মাথা-টাথা যায় নাই। ওডায় একনম্বরের শয়তান। এক্কেরে ওঁচা হইয়া গেছে। অরে প্যাটে ধরছিলাম ক্যান, তাই ভাইব্যাই ঘেন্না হয় বড়ো।

–ছাড়ান দাও। ছাড়ান দাও। তা ছাড়া পুতনদায় তো তোমার একমাত্র পোলা। তারে ফ্যালাইবাই বা কী কইর‍্যা তুমি? পারবা ফ্যালাইতে?

শিলি বলেছিল।

কিরণশশীর মুখে এক অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠেছিল।

বলেছিলেন, পারি কিনা দেখিস তুই। আমি সব পারি। আমারে তরা অর্ধেক চিনছস। পুরা। চিনস নাই। এমন পোলা থাকনের চাইয়া, না থাকন-ই ঢের ভালো।

শিলি বলেছিল, কাইন্দো না বুড়ি।

কিরণশশী বলেছিলেন, তরে আর পুতনরে লইয়া বুড়াবয়সে সুখে কয়ডা দিন কাটাইম, এই স্বপন বুকে লইয়াই এতগুলো বচ্ছর, প্রায় না-খাইয়াই কাটাইয়া দিছিরে শিলি! শুধাই কল্পনা আর স্বপ্ন খাইয়াই বাঁচছি। আর......

–কাইন্দো না বুড়ি।

শিলির গলা ধরে এসেছিল।

–তর কী হইবরে শিলি? ওই হারামজাদায় যে, তোরে এমন কইর‍্যা ফ্যালাইয়া দি তা আমি জানুম কী কইর‍্যা? ক। তর মতন ভালা, লক্ষ্মী একখান মাইয়া ওই হারামজাদার জীবন সুখে ভইরা দিত আনে। ছিঃ ছিঃ। পোলায় আমার কী হইয়া গেল! শহরে যেন কুননা গ্রামের ছাওয়ালরে কেউ না পাঠায় মানুষ কইরবার লইগ্যা। কী মানুষ-ই হইল। হায়। হায়!

ছিঃ ছিঃ কী বলল বুড়ি। তোমার একমাত্র সন্তান সে। আর সকলেই তো গেছে গিয়া। পুতনদা ছাড়া তোমার আর তো কেউই নাই। অমন শাপ দিয়ো না তারে। কে কইতে পারে, আবার বদলাইতেও পারে কুনোদিন। কুন কু-দেবতায় ভর করছে তার উপর। তার দৃষ্টি কাইট্যা যাইব গিয়া।

-যাউক। যাউক। এও যাউক। আমি অভিশপ্তা। বুঝছস? হতভাগী আমি।

কাউরেই লাগব না আর আমার। গলায় দড়ি দিয়া মইর‍্যা থাকুম এক রাতে। দেখিসানে তুই।

শিলি আর কথা না বাড়িয়ে চলে এসেছিল, বুড়ির গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে। চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে।

ফেরার পথে, শিলির নিজের দু-চোখও জলে ভরে গেছিল। বড়ো বড়ো ফোঁটা গাল গড়িয়ে পড়ে, বুকের ব্লাউজের সামনেটা ভিজে গেছিল একেবারে।

কী করবে শিলি? ওর চোখের জল মোছাবার তো কেউই নেই।

.

সাড়ে সাতটা নাগাদ এসে গেল ওরা সকলে।

বড়োঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে তাকিয়া বের করে দিয়েছিল শিলি।

সন্ধের পর জোর হাওয়া বয় প্রথম বৈশাখে। গরমের গওও থাকে না। তবুও হাতপাখা দিয়েছিল তিন-চারটি। রেকাবিতে মিছরি, জল, পান। বড়ো বড়ো কাঁসার গ্লাস। বাবার বিয়ের সময় পাওয়া। এসব-ই এক এক করে বের করেছিল শালকাঠের বড়োবাক্স থেকে। তেঁতুল দিয়ে মেজেছিল ভালো করে। সেইসব গ্লাসে খোদাই করে লেখা ছিল সংসার সুখী হয়

রমণীর গুণে।

শিলি লক্ষ করছিল যে, বাবার সঙ্গে মাঝে মাঝে ইংরিজিতে কথা বলছিল রাজেন। ইংরিজিতে কথা বলতে পারে এমন বেশি লোক দেখেনি শিলি। কথার মানে না বুঝলেও, অবাক হচ্ছিল।

পুতনদাও মাঝে মাঝেই ইংরিজি শব্দ, এমনকী বাক্যও বলছিল।

সবচেয়ে অবাক হল শিলি গদাইদাকেও কলকাতার সবজান্তা বাবুদের ওইসব রাজনীতি, ফুটবল, সিনেমার আলোচনাতে যোগ দিতে দেখে। গাঁইয়া গদাইও ওদের সঙ্গে তাল দিয়ে পটাপট ইংরিজি বলছিল দেখে তাজ্জব বনে গেল শিলি।

পুতন ধরল শিলিকে গান গাইতে হবে।

শিলির খুব-ই আপত্তি ছিল। কিন্তু পুতন-ই ঘরে গিয়ে ভাঙা হারমোনিয়ামটাকে বের করে নিয়ে এল। নিয়ে এসে রাজেনকে দিল।

রাজেন, জ্যাঠার মতো দু-টি পান মুখে দিয়ে হারমোনিয়ামটি নেড়ে-চেড়ে সুর বের করল।

বলল, ও বাবা! এ যে দেখি আমাদের ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্স-এর। কলকাতার?

কাকা বলল, তা বটে। তবে এই হারমোনিয়াম থিক্যা সুরের থিকা ত্যালপোকাই বারাইব বেশি। সাবধানে নাড়া-চাড়া করণ-ই ভালো।

–হ। ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্স-এরই বটে।

লজ্জা-মাখা স্মৃতিচারণের সঙ্গে বলেছিলেন নরেশ, শিলির বাবা।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন, আমার বড়োশালা যেবার আইছিলেন, শিলির মায়ের জন্যে লইয়া আইছিলেন।

হারমোনিয়ামটা শিলির দিকে ঠেলে দিয়ে রাজেন বলেছিল, একটা গান হোক।

উঠোনে কাঁঠালগাছে, লিচুগাছে, গোলাপজামগাছের পাতাতে জ্যোৎস্না চকচক করছিল। ভালো করে চান করে, একটি-ফলসা রঙা খোল আর বেগনে রঙা পাড়ের টাঙ্গাইলের শাড়ি পরা, চোখে কাজল-দেওয়া, শিলিকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। গায়ে বোধ হয়, ক্যালকাটা কেমিকেল কান্তা সেন্ট মেখেছিল। কী সাবান, কে জানে? লাক্স কি?

ভাবছিল, রাজেন।

শিলির হাঁটুসমান মিশমিশে কালো চুলে বোধ হয় আমলকীর তেল দিয়েছিল, চুলের গন্ধ ভাসছিল জ্যোৎস্নাতে। জ্যোৎস্নার গন্ধ, শিলির গায়ের

গন্ধ, রাজেনের গায়ের আতরের উগ্র গন্ধ, হাসনুহানা আর বেলফুলের গন্ধে মাতালকরা বৈশাখী হাওয়ায়-ওড়া বাঁশবনের হলুদ পিছল-পিছল ফিনফিনে পাতাদের গন্ধ; সব মিলেমিশে রাত একেবারে গন্ধমাতাল হয়ে উঠেছিল।

চাঁদের আলোয়, গদাই চোরের মতো, শিলির চোখের দিকে তাকাচ্ছিল, হ্যাঁজাকের আলোতে সবকিছুই বড়োবেশি স্পষ্ট দেখায়, কল্পনার কোনো অবকাশ-ই থাকে না সেখানে।

বড়ো ভালো লাগছে গদাই-এর এই শিলিকে। যদি শিলিকে জীবনে পায়, তবে এমন চাঁদের রাতে, নদীপারের চাপ চাপ নরম ঘাসের ওপর শুইয়ে একদিন আদর করে দেবে ও! ভালোলাগায় শিলি বলে উঠবে উ-উ-উ-উ-উ।

গদাই মনে মনে বলল,আহা, এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো!

গদাই-এর স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে রাজেন বলল, বুঝেছি। তোমার লজ্জা ভেঙে দেবার জন্যে অন্য কারও গাইতে হবে তোমার আগে। তাই না? জানো, আমার ছোটোপিসির গানের খাতায় আমাদের পাড়ার গোপেন কাকা লিখে দিয়েছিল : লজ্জা নারীর ভূষণ কিন্তু গানের বেলায় নয়।

গোপেন কাকার লব ছিল ছোটোপিসির সঙ্গে।

শিলি লজ্জায় বেগনে হয়ে গেছিল।

এমন সব কথা গুরুজনদের সামনে বলে কী করে লোকটা? কোনো সহবত-ই কি শেখেনি এই কলকাতার বাবু?

তারপরই রাজেন বলল, ঠিক আছে। আমিই শুরু করলুম তবে আগে।

বলেই, হারমোনিয়ামটা টেনে নিয়ে, শুরু করল :

মাঝে মাঝে বেলো ছেড়ে, বাঁ-হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে গাইতে শুরু করল। বাঁ-হাত দিয়ে হারমোনিয়ামের ওপর তালও দিতে লাগল মধ্যে মধ্যে। গলাটা বেশ ভালো। তবে গায়কিটা কেমন অসভ্য অসভ্য।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি,উড়ে গেল আর এল নাকু দিয়ে চলে গেলকোথায় আমার প্রাণময়না?

বলো সখী, কোথা যাবকোথা গেলে পাখি পাব?পুলিশে কি খবর দেববলো তো, জানাই গে থানায়।

ফাঁকি দিয়ে প্রাণের পাখি উড়ে গেল আর এল না।

এমন ধনী কে শহরে? আমার পাখি রাখলে ধরেদেকলে পরে, মেরে ধরেকেড়ে নেব প্রাণময়না।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গাইল গানটা রাজেন।

শিলি অবাক হয়ে গেল। অবাক হল বাবা এবং কাকাও। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসা কিরণশশীও কম অবাক হলেন না।

বড়ো ভালো গান গায় রাজেন। যেমন গলার স্বর, তেমন-ই সুরজ্ঞান, তালের ওপরও তেমন-ইদখল।

রাজেনের ওপর যত বিরক্তি জমেছিল এ ক-দিনে দেখে-শুনে, সব-ই যেন, এই একটি গান ধুইয়ে দিয়ে গেল। আশ্চর্য। গান, বড়ো দারুণ শখের জনিস।

বুঝল শিলি।

শিলি ভাবছিল, পৃথিবীতে এমন কোনো লোক বোধ হয় নেই, যার সব-ই দোষ। এই খারাপ মানুষটা যে, এত ভালো গান গায় তা বিশ্বাস করতেও মন চায় না। শুধু গানের জন্যেই মানুষটাকে ভালোবাসা যায়। সব কিছুই দেওয়া যায়। যে-মেয়েদের মধ্যে সুর আছে, গান আছে, তারাই জানে গানের মহিমা। গানের প্রভাব।

মন্ত্রমুগ্ধর মতো রাজেনের দিকে চেয়ে রইল শিলি।

নরেশ বললেন, বাঃ বাঃ। এসব গান তুমি শিখলা কার কাছে?

রাজেন বলল, কাকাবাবু, আমাদের পাড়া তো গানের-ই পাড়া। বাইজিদের গান শুনেই তো বড়ো হয়েছি। তা ছাড়া, আমার মামারা সব ছিলেন গানের পোকা। কত সব বড়ো বড়ো গাইয়ে আসতেন মামাবাড়িতে। তেলিনীপাড়ার কালোবাবু, কালীপদ পাঠক, গহরজান বাইজি। মস্ত জমিদার ছিলেন তো মামারা। পায়রা ওড়াতেন, বেড়ালের বে দিতেন। খুব-ই রমরমা ছিল। হুইস্কি খেয়ে মৌজ হওয়ার পর আলবেলার নল হাত থেকে পড়ে গেলে, চাকরের পুরো নাম ধরে ডেকে কখনো মৌজ নষ্ট করতেন না। বলতেন, রে। রে রে।

অমনি চাকরেরা দৌড়ে এসে, নল তুলে দিত হাতে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, আমি তো আমার পরিবারের কুলাঙ্গার।

হঠাৎ-ই বলল রাজেন কথাটা, হ্যারিকেনের আলোতে শিলির দিকে একঝলক চেয়েই।

–গানটা ভালো কইরাই করন উচিত ছিল রাজেন তোমার। বুঝছ। কথায় কয়, নরাণাং মাতুলক্রমঃ। মামাদের গুণগুলান সব-ই পাইছ দেহি।

রাজেন হেসে বলল, তা আজ্ঞে। তবে শুধু গুণগুলো পেলেই ভালো হত। শুধু গুণ নয়, দোষগুলোও যে, পুরোমাত্রাতেই পেয়েছি। ভালো করে কিছু করা যে, আমার চরিত্রেই নেই। আমার মন হচ্ছে, ঘাসফড়িং-এর মন।

চিড়িক চিড়িক করে চমকে চমকে উড়ে বেড়ায়। কোনো কিছুতেই স্থির হয়ে বসতে চায় না। তাই-ই কিছুই ভালো করে করা হল না। না পড়াশুনো, না গান-বাজনা, না শেয়ারবাজার। আমি একটি ওয়েস্টার। ওয়ার্থলেস। তাই শুধুই লাথি-ঝাঁটা আর অপমান-ই জুটল কপালে। অবশ্য যার যেমন যোগ্যতা, তেমন-ই তো হবে প্রাপ্তি।

হেসে, বলল রাজেন।

শিলির কিন্তু মনে হল, যেন কেঁদে বলল।

অনেক হাসির মধ্যেই কান্না থাকে। সকলের চোখে পড়ে না তা।

কথাও কিন্তু চমৎকার বলে রাজেন। শিলি ভাবছিল।

শিলি তো কোন গাঁইয়া অশিক্ষিত মেয়ে। রাজেনের কথা আর গানে ভুলে যাবে পৃথিবীর যেকোনো রাজকুমারীই। কথা দিয়ে বোধ হয় জগৎ মাত করা যায়। হয়তো, শুধু কথার কথা হলেও। মনে মনে বলল শিলি, দিয়ে দেবে সহজেই ও রাজেন যা চায়। তা ছাড়া ওর যা কিছুই আছে। সে তো অন্য সব মেয়ের-ই আছে। বিশেষ কিছু বা বেশিকিছু ওর নেই দেমাক করার মতন।

ওর ফুলে, ওর নরম, সবুজ বর্ষা শেষের স্নিগ্ধ মাঠে। একটু বসবে হয়তো তারপর-ই ঘাসফড়িং আবারও হয়তো উড়ে যাবে অন্যদিকে।

কে জানে, শিলি হয়তো জানে না, কিছু ক্ষণিক মরণ থাকে, যা দারুণ সুখের। সেই ক্ষণিক মরণের গভীর আনন্দর স্মৃতি নিয়ে বাকিজীবনের অনেক দুঃখই হয়তো লাঘব করা যায়। পুতনদাকে আর ভালো লাগছিল না একটুও।

শিলি কেবল-ই ভাবছিল। ভাবনার যদি পা থাকত, তবে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কত হাজার মাইল যে, পরিক্রম করে ফেলত ও, তা সে-ই জানে। ভাবছিল শিলি, মরারও অনেক রকম থাকে। কিছু কিছু মৃত্যু হয়তো থাকে, যা জীবনের চেয়েও অনেক বেশি প্রার্থনার।

কে জানে? কতটুকুই বা জানে শিলি?

গদাই বলল, এবার শিলির গান হোক একটা। কী বলেন নরেশকাকু?

রাজেন বলল, নরেশ কিছু বলার আগেই, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

–ওঁর গান হবে বলেই তো আমার উপক্রমণিকা। ওঁর গান শুনব বলেই তো বসে আছি। বলেই, হারমোনিয়ামটা ঠেলে দিতে যেতেই, শিলি বলল, আপনি আর একটা গান। আপনার এই গানের পর আমার গান হয় না।

–সে কী? একটা গান শুনেই। আমি কিন্তু এর চেয়ে ভালো গাই। আজ আমার গলাটা সত্যিই ভালো নেই।

গদাই পাতিহাঁসের মতো ফ্যাসফ্যাসে গলায় বলল, রাজেনকে, খুব-ই ন্যাকার-ঠ্যাকার জানা আছে দেহি আপনের।

–ন্যাকার-ঠ্যাকার কথাটার মানে?

অবাক হয়ে রাজেন শুধোল।

নরেশ বলল, তুমি চুপ করবা গদাই। ন্যাকার-ঠ্যাকার কারে কয় জান তুমি?

গদাই অপ্রতিভ হয়ে পড়ল।

রাজেন পরিবেশ অপ্রিয় হয়ে ওঠে, সেই ভয়ে কথা ঘুরিয়ে শিলিকে বলল, নাও নাও, তুমি এবার গাও। না গাইলে আমি খাব না কিন্তু এখানে।

আর বলতে হল না শিলিকে। বাড়ির সামনে পাহাড় দেখা যাচ্ছে শূন্য খেতের পর। চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি রুপোঝুরি হয়ে উঠেছে পুরো অঞ্চল। আলোকঝারি দিনের আলোয় সোনাঝুরি, আর অন্ধকারে মিশি-নিশি। ওইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে, হারমোনিয়ামটাকে কোলের কাছে টেনে নিতে নিতে শিলি নিজেই আলোকঝারি হয়ে উঠল। ওর মনে হল, গানের-ই আর এক নাম আলোকঝারি। আজ ওর ভেতরে গান ফুলের মতো ফুটেছে। এক্ষুনি এর সুবাস ছড়িয়ে না দিতে পারলে, নিজ-সুবাসেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাবে শিলি।

শুরু করল শিলি,

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে। উছলে পড়ে আলো।ও রজনীগন্ধা তোমার গন্ধসুধা ঢালো। পাগল হাওয়া বুঝতে নারে ডাক পড়েছে কোথায় তারেফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো। নীল গগনের ললাটখানি চন্দনে আজ মাখা,বাণীবনের হংসমিথুন মেলেছে আজ পাখা। পারিজাতের কেশর নিয়ে ধরায় শশী, ছড়াও কী এ ইন্দ্রপুরীর কোন রমণী বাসরপ্রদীপ জ্বালো।

তারপর অস্থায়ী, অন্তরা হয়ে সঞ্চারী থেকে আভোগে এসে পৌঁছোল শিলি।

গান শেষ হলে, রাজেন বলল, বাঃ।

একটি মাত্র শব্দ। শুধুই বাঃ।

ওই একটি শব্দ দিয়েই যা বোঝাবার বুঝিয়ে দিল রাজেন। হৃদয়-মথিত শব্দ।

শিলি যখন গান গাইছিল, তখন চাঁদের আলোয় বসে পুতন ভাবছিল, ও একাই জানে, এই গান কার উদ্দেশে গাওয়া। শিলি যে, পুতনকেই ভালোবাসে, পুতনের অপেক্ষাতেই যে, তার সব প্রতীক্ষা, তা রাজেন জানবে কেমন করে? ভালোবাসা তো আর রাতারাতি হয় না।

আর তখন গদাই ভাবছিল, ফুলের বনে কারে ভালো লাগে শিলির, তা ওই কলকাতাইয়া বকাটায় জানব ক্যামনে? কিরণমাসির ছাগল-পুত ওই পুতনেই বা বোঝব ক্যামনে। এই গান গাইল শিলি। হুদা গদার-ই লইগ্যা।

রাজেন ভাবছিল, সম্পূর্ণই অন্য কথা।

ভাবছিল, বড়ো হওয়ার পর থেকে মেয়েদের শরীর নিয়ে অনেক-ই ঘাঁটাঘাটি ছিনিমিনি করল। মেয়েদের ও যেমন বোঝে, তেমন কম লোকেই বোঝে, এমন একটা ধারণা জন্মে গেছিল ওর। ভিলেজ-বিউটি শিলির শরীরটাকেই পেতে চেয়েছিল রাজেন। শিলিকে দেখার পর থেকেই ওকে শারীরিকভাবে পাবার জন্যে তীব্র এক আসক্তি বোধ করছিল। প্রত্যেক শরীরের স্বাদই আলাদা। তাই-ই তৃপ্তি হয় না কিছুতেই। এত পেয়েও তৃপ্তি হয়নি। সবসময়েই মনে হয়েছে, আরও চাই, নতুন চাই। নতুন প্রক্রিয়াতে চাই। অথচ আজ এই আলোকঝারির পায়ের কাছের গন্ডগ্রামের চাঁদ-মাখা সন্ধেবেলা কী যে, ঘটে গেল হঠাৎ ওর মধ্যে। প্রতিসরিত চাঁদের আলোয় শিলির মুখটিকে দেখে রাজেনের মধ্যে প্রেম কাকে বলে, সেই সম্বন্ধে এই প্রথম যেন, এক অনুভব জাগল। এই প্রথম ও জানল কাম শুধু জ্বালাই বাড়ায়, আর প্রেম দেয় স্নিগ্ধতার প্রলেপ। ওর মধ্যে এক আশ্চর্য গভীর শান্তিকে অনুভব করতে লাগল ও। কারও সামনে বসে থাকলেও যে, এত ভালো লাগতে পারে কখনো, সে সম্বন্ধে

সত্যিই ওর কোনো ধারণা ছিল না। ওর সামনে কোনো মেয়ে বসে থাকলেই ওর অভিজ্ঞ চোখ দিয়ে মনে মনে তাকে নিরাবরণ করেই দেখতে ভালোবেসেছে রাজেন এতদিন, কিন্তু আজকের এই শালীন, সুন্দর অনুভূতির শরিক এর আগে সত্যিই কখনো হয়নি। নিজের মধ্যের দুর্বলতায়, নিজের ভঙ্গুরতায়, মুগ্ধতায় বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল রাজেন ক্রমশ নিশ্চুপে।

এমন সময় শিলি বলল, আর একখানা গান কি গাওয়া যায় না?

বাঙাল, গেঁয়ো মেয়েটির সবকিছুই বড়োমিষ্টি লাগছে রাজেনের। এমনকী ওই দুর্বোধ্য ভাষাও।

রাজেন বলল, ইনডায়রেক্ট ন্যারেশানে কথা কইলে আমি জবাব দিই না সে কথার। তা ছাড়া আমার কি মা-বাবার দেওয়া নাম নেই কোনো?

শিলি হাসল। প্রায়ান্ধকারের মধ্যেও উঠোনে ও দাওয়ার আলোর প্রতিসরণে শিলির দাঁত ঝিকঝিক করে উঠল।

শিলি বলল, আচ্ছা! আবারও কইতাছি, রাজেনদা আর একখানা গান গাইয়া ধন্য করেন আমাগো।

বলেই, হেসে উঠল।

নরেশ এবং পরেশ দুই ভাই-ই তাদের মেয়ে এবং ভাইঝির হঠাৎ প্রগলভতাতে একটু রুষ্ট হল। কিরণশশী, এই নতুন শিলিকে দূরে বসে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। সবচেয়ে বেশি অবাক হয়েছিল পুতন। এবং হতাশ হয়েছিল গদাই।

আর কথা না বাড়িয়ে, রাজেন হারমোনিয়ামটাকে টেনে নিয়ে শুরু করল :

কী হল আমার সই বলো কী করি।নয়ন লাগিল যাহে, কেমন পাসরি হেরিলে হরিষ চিত, না হেরিলে মরিতৃষিত চাতকী যেন যাকে আশা করি। ঘনমুখ হেরি সুখী দুখী বিনে বারি।

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে নিধুবাবুর এই টপ্পাখানি গাইল রাজেন।

এই গানটি তার ছোটোমামার কাছে তোলা। এপর্যন্ত এই গানটি কয়েকশোবার গেয়েছে একা একা, নিজেকে শোনাবার জন্যে এবং অন্যদের শোনাবার জন্যেই বেশি। কিন্তু এই গানের বাণীর আসল তাৎপর্য ও যেন, এইমুহূর্তে প্রথমবার আবিষ্কার করল। এতদিন টপ্পার কাজের প্রতিই মনোযোগ ছিল বেশি। আজ গানের প্রতিমার শোলার কাজ ছাপিয়ে প্রতিমার পূর্ণ, প্রস্ফুটিত মুখখানি গোচরে এল, মনের অতল গভীরতা স্পর্শ করল রাজেনের জীবনে। গেয়েও যে, এতখানি মগ্ন হওয়া যায়, শুধু শুনেই নয়– এই অভিজ্ঞতাও যেন, জীবনে এই প্রথম হল।

শিলি স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। আরও একঝাঁক হেরন কোয়াক কোয়াক

কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে চাঁদভাসি রাতের মোহময়তাকে মুহূর্তের জন্যে ছিন্ন করে আলোকঝারির দিক থেকে এসে ময়নামারীর বিলের দিকে চাঁদের আলোয় ভাসতে ভাসতে চলে গেল। গানের পরের নৈঃশব্দ্য তাদের ক্ষণিক অপার্থিব দূরাগত শব্দে যেন গাঢ়তর হল।

অনেকক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন।

নৈঃশব্দ্যর চেয়ে বড়োগান আর কিছুই নেই। ভাবছিল রাজেন।

সেই ঐশ্বরিক স্নিগ্ধ নিস্তব্ধতাকে হঠাৎ ধেবড়ে দিয়ে গদাই তার পাতিহাঁসের গলায় বলল, খাইতে দ্যাও শিলি। ক্ষুধা লাগছে বড়ো। কাল ভোরেই আবার কোকরাঝাড় যাওন লাগব আমার।

পরেশ ও নরেশ দু-জনেই বলল, হ। হ। শিলি। এইবারে আস্তে আস্তে জোগাড়-যন্তর কর।

কিরণশশী মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে গদাইকে বললেন, সন্ধ্যাকালেই ক্ষুধা লাগে ক্যান রে তর? তুই কি শিশু?

গদাই উত্তর দিল না। ওকে শিশু বললে ও খুশিই হয়। শিশুর-ই মতো মুখ হাঁ করল। এমন-ই করে যে, যেকোনো সময়েই পোকামাকড় ঢুকে যেতে পারত।

রাজেন ভাবছিল ক্ষুধা ওরও পেয়েছে। কিন্তু এই খিদে ভাতের খিদে নয়, নারীশরীরের খিদেও নয়, এমন-ই এক খিদে, যার বোধ মনে না জাগলে মানুষজন্মই বৃথা। ও মানুষ হয়েই তো জন্মেছিল। জোড়াসাঁকোর রাজেন। আজ ও দ্বিজ হল।

কিরণশশী, হাঁটু মটমটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গাঁটে গাঁটে বড়োই ব্যথা। ধনেশ পাখির দুর্গন্ধ তেল মালিশ করেন। পরেশ, কিরণশশীর জন্যে ধনেশ পাখি মেরে আনে বন-পাহাড় খুঁজে।

তারপর স্বগতোক্তি করলেন, যাই মাইয়াডারে সাহায্য করি গিয়া। এতগুলান পাত, ও একা সামলাইব কী কইর‍্যা?

হাঁসের ঘরে, সেই কথা শুনে, একটা হাঁসী হিসহিস করে উঠল।

গদাই-এর গলার স্বর শুনেও করে থাকতে পারে।

আর ক-দিন বাদেই সাতববাশেখির মেলা। রাজেনকে নিয়ে পুতন বেরিয়েছে সন্ধের পরে চাঁদের আলোতে সাতবোশেখির মেলার পথটি দেখাতে।

কথা হয়েছে, সেদিন ওরা সকলে মিলে একইসঙ্গে যাবে মেলাতে। পুতন, রাজেন, শিলি, চাঁপা, চামেলি, গদাইও।

পরেশ কাকা পরে যাবেন নিজের সময়মতো সাইকেলে। শিলি এবং অন্যান্য মেয়েরা যাবে গোরুর গাড়িতেই। ছইয়ের নীচে খড় বিছিয়ে, তার ওপর শতরঞ্চি পেতে নেবে। আর রাজেন, পুতন, গদাই ওরা সকলে যাবে হেঁটেই।

সেদিন নানারকম মানুষ যাবে পাহাড়ে। রাজবংশী, অহমিয়া, রাভা, মেচ সব নারীরা। বাঙালিবাবুরাও অনেক। বউ-মেয়ে-আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে ডিমডুমা চা-বাগানের সাঁওতাল কুলিরা। ধুবড়ির ম্যাচ ফ্যাক্টরির বিহারি কুলিরা। মিশ্র মানুষের পায়ের ধুলোয় বন-পাহাড়ের পথপাশের গাছগাছালি ভরে যাবে। গমগম করবে পথ, মানুষের গলার স্বরে। টুঙ-বাগানে, অভিজ্ঞমাত্রই জানেন যে, সেদিন সাইকেল লুকিয়ে রেখে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। সাইকেল চুরিও হয়ে যেতে পারে।

পুতন ভাবছিল, এই রাজেন ছেলেটার নিশ্চয়ই কোনো অসুখ করেছে।

দু-তিনদিন হল একেবারেই বদলে গেছে ও। খায় না, হাসে না,খারাপ খারাপ কথা বলে, মেয়েদের দিকে রসের চোখে তাকায় না। আশ্চর্য। ড্রিঙ্কও করতে চায় না। শুধুই সিগারেট। খেয়ে যাচ্ছে, একের পর এক।

ওর চোখে এক দারুণ ঔজ্জ্বল্য এসেছে। বিয়ের পর পর মেয়েদের চোখে যেমন আসে। ওর মনের মধ্যে কী যেন, সব ঘটছে। ভাঙচুর। নদীর পাড় ভাঙার মতো। অথচ যে ভাঙাভাঙির আওয়াজ পাশে দাঁড়ানো মানুষও

শুনতে পায় না।

পুতন বলছিল, শৈলেন ডাক্তারের কাছেই রাজেনকে নিয়ে যাবে একবার তামাহাটে। নিদেনপক্ষে শৈলেন ডাক্তারের ছোটোভাইকে খবর দিয়ে আনিয়ে একবার দেখিয়ে নেবে ঠিক করল রাজেনকে। কিছু একটা ব্যামো বাধালে বিপদে পড়বে পুতন-ই।

-কেমন দেখলে?

পুতন শুধোল।

উঁ?

অন্যমনস্ক গলায়, রাজেন বলল।

-কেমন দেখলে?

পুতন আবারও বলল।

-ভালো। পাখিটা তো?

-আরে না না। পাখি নয়। আলোকঝারি পাহাড়ে যাওয়ার পথটা কেমন দেখলে?

স্বপ্নোত্থিতর মতো রাজেন বলল, ওঃ হ্যাঁ। বেশ ভালোই তো! বা : চমৎকার।

আসলে রাজেনের ওপরে এই আলোকঝারি পাহাড়, গঙ্গাধর নদী, এই গ্রাম্য এবং বন্যপ্রকৃতি এক আশ্চর্য অজ্ঞাতপূর্ব, অপ্রতিরোধ্য, প্রভাব বিস্তার করেছে। কলকাতার ছেলে। শিশুকাল থেকেই প্রকৃতির সঙ্গ বলতে কচি বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাওয়া আর মাসে একবার দাদু বা মামাদের সঙ্গে গাড়িতে ময়দানে যাওয়াকেই জেনেছে। হর্টিকালচার গার্ডেনেও গেছে অবশ্য বার কয়েক। মামাদের বাগানবাড়িতে।

তারপরেই চা-বাগান।

উত্তরবঙ্গর সৌন্দর্যর তুলনা হয় না কোনো। তবে তা তিস্তার উপত্যকার। ওই চা-বাগানটা একটা ছোটোশহরের লাগোয়া। বড়োজঙ্গল বা নদী কাছাকাছি নেই। সোজা লালমাটির বা পিচের পথ, মাপা-জোকা। তার দু-পাশে সমান মাপের চা-বাগান। সারবদ্ধ কুলি-লাইন। বাবু কোয়ার্টার। অফিসারদের বাংলো। বড়োগাছ বলতে, শেড-ট্রিগুলো। প্রকৃতির মধ্যে যে, অনিয়মের নিয়ম আছে, অবিন্যাসের মধ্যে নিহিত থাকা দারুণ এক বিন্যাস আছে, তা হঠাৎ করে চোখে পড়ে না কারোরই। এখানে এতদিন আসার পরও চোখে পড়েনি রাজেনের। হঠাৎ পড়ল। ওর মনের মধ্যে এই আলোকঝারির আঁচল-ঘেঁষা ছোটোগ্রামের প্রভাব অনিবার্যভাবেই পড়েছে। শিলির এবং রাতপাখিদের গলার স্বর, বাঁশবনের চৈতি-হাওয়ার

কান্না, দিনের বেলাতে আলোকঝারির পাতা-ঝরা বনের মধ্যে দিয়ে দৌড়ে যাওয়া কোটরা হরিণের লালচে-চমক। জুম-চাষের জন্যে পুড়িয়ে-দেওয়া জঙ্গলের প্রান্তবর্তী খেতের সীমানাতে কালো হয়ে যাওয়া পত্রহীন গাছের ওপরে লাল-কালো ফুলের মতো সার সার বনমুরগিকে বসে থাকতে দেখা– সব-ই ওর জীবনকে এক নতুন ব্যাপ্তি দিয়েছে।

গঙ্গাধর নদী বেয়ে চলে যাওয়া পালতোলা নৌকোর নিঃশব্দ গতি, উদবেড়ালের বালির পারের গর্ত ছেড়ে হঠাৎ জলে লাফিয়ে পড়া, এইসব দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ রাজেনকে এক সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। বাস-ট্রাম-ঘোড়ারগাড়ির কলকাতায় আশৈশব লালিত হয়েছে বলেই, এই ভিড়ের, ধুলোর, ধুয়োর পৃথিবীতে এখনও এমন এক আশ্চর্য জগৎও যে, বেঁচে আছে; তা ওর জানাই ছিল না।

এসব তো আছেই! তার ওপরে শিলি! শিলিকে কতটুকুই বা জেনেছে ও? অথচ তবু, সেই রাতের পর থেকেই, রাজেনের স্বপনে-জাগরণে শুধুমাত্র শিলিই। শিলি ছাড়া আর কেউই নেই। এমনকী বাগবাজারের সোনালি, যার সঙ্গে ওর প্রচন্ড লদকালদকি আছে এবং যে কারণে রাজেনের বাবা সোনালিকে একবার গুম করিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছিলেন, সেও মুছে গেছে মন থেকে ওর।

কলকাতার রাজেন ভাবত, ব্যাঙ্কের টাকা, কোম্পানির কাগজ, বাড়ি, ডেইমলার বা ক্যাডিলাক বা রোলস বা মার্সিডিস গাড়িই বুঝি ঐশ্বর্যর

একমাত্র সংজ্ঞা। এমন আদিগন্ত আকাশ, এমন সুগন্ধি বাতাস, এমন পাখির স্বর, ফুলের শোভাও যে, কম বড়ো ঐশ্বর্য নয়, তা ও এখানে এসেই জেনেছে। এই দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা, সরল, সোজা, উচ্চাশাহীন, লোভহীন মানুষগুলোর প্রতি ওর এক আশ্চর্য মমত্ববোধ এবং শ্রদ্ধাও জেগেছে।

এখানে এখনও মানুষের পরিচয় বিত্ত দিয়ে নয়। হৃদয়ের মাপ দিয়ে এখনও মানুষের পরিমাপ হয়। পয়সা ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই যে আছে, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে, সে-সম্বন্ধে এখন পুরোপুরিই নিঃসন্দেহ রাজেন।

-বসবে নাকি একটু ওই গুঁড়িটার ওপরে? তুমি দেখছি হাঁফিয়ে গেছ।

পুতন বলল, রাজেনকে।

রাজেন কথা না বলে, পথের পাশে ঝড়ে-পড়া একটা গাছের গুঁড়ির ওপরে বসল।

পুতনও বসল পাশে।

হাঁফাচ্ছিল ঠিক-ই রাজেন, কিন্তু সেটা শুধুই চড়াই ওঠার জন্যে নয়।

দৌড় চলছিল বাইরে নয়, তার মনের মধ্যে। প্রচন্ড দৌড়। ওর মূল

থেকে, জন্মাবধি যে, পরিবেশের মধ্যে ও বড়ো হয়ে উঠেছে সেই পরিবেশ থেকে ও দ্রুত দৌড়ে আসছিল ভেতরে ভেতরে এই নতুন অনাস্বাদিত পরিবেশ ও জীবনের দিকে।

মূল থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না কোনো মানুষ-ই। কূপমন্ডুকতাকেই সুখ বলে জেনে এসেছে তারা, যুগযুগ ধরে। সহজ সুখের, সম্পদের, পুরুষানুক্রমিকভাবে গড়ে-তোলা বিত্তর, প্রতিপত্তির, নিশ্চিন্তির, নির্ভরতার, একঘেয়ে, থিতু, পরিক্রমাহীন জীবনকেই সবচেয়ে বেশি প্রার্থনার বলে জেনে এসেছিল রাজেন, জীবনের এতগুলো বছর, ওর পূর্বপুরুষদের-ই মতন। আজ হঠাৎ স্বেচ্ছায় ছিন্নমূল হতে চাওয়াতে ওর জীবনের গোড়াতেই টান ধরেছে। জীবনের অনেক ছন্দবদ্ধ ধ্যানধারণার অসারতা বা সার সম্বন্ধেও রাজেনের মনে গভীর সব প্রশ্ন জেগেছে। ওর মধ্যে যে, এত গভীর ভাবনা ভাবার ক্ষমতা ছিল, সে-সম্বন্ধে ওর কোনো ধারণা পর্যন্ত ছিল না আগে।

পুতন কুমারগঞ্জের ছেলে। ওও ওর মূল ছিঁড়ে কূপমন্ডুকতার অন্ধকার ছেড়ে বেরোবার জন্যে বদ্ধপরিকর। অথচ কত ভিন্ন ওদের দুজনের চাওয়া। ওর পাশে বসেও রাজেনের ভেতরে ভেতরে যে কী হচ্ছে, তা বুঝতে পর্যন্ত পারছে না ও।

–জল খাবে নাকি?

পুতন শুধোল রাজেনকে।

রাজেনের মতিগতি, চোখের ভাব বড়ো একটা ভালো লাগছিল না পুতনের। রাজেনের জন্যে ও চিন্তিত হয়ে উঠেছে।

মুখে কথা না বলে, চোখ দিয়ে রাজেন বলল, পরে।

পুতন বলল, প্ল্যানটা কী করলে রাজেন? সময় তো ফুরিয়ে আসছে। তুমি কি সাতববাশেখির মেলার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যেই শিলিকে জোর করেই? সেদিন পূর্ণিমা। আলো থাকবে কিন্তু অনেক। বন-পাহাড় হাসবে আলোয় আলোয়। আর একটা কথা। তোমাকে যে, সুখী করতে পেরেছি, তুমি যে, আমার ওপরে সন্তুষ্ট, এ কথাটা কিন্তু চা-বাগানে ফিরে ম্যানেজারবাবুকে ভালো করে বোলো।

রাজেন পূর্ণদৃষ্টি মেলে পুতনের চোখে চাইল।

অনেকক্ষণ ধরে সেই নীরব দৃষ্টি পুতনের চোখের ওপরে স্থির হয়ে রইল।

রাজেন মুখে বলল, নিশ্চয়।

পুতন আবারও বলল, বলো, রাজেন প্ল্যানটা কী করলে বলো?

পুতনের কথাতে এবারে বিরক্ত হল রাজেন। জিভে টাগরা ঠেকিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত শব্দ করল। বিরক্তিসূচক। তারপর-ই চুপ করে গেল।

উপত্যকা থেকে একটা ময়ূর ডেকে উঠল। তারপর-ই ঝুপ ঝুপ শব্দ করে উড়ে এল ওপরে। কিছুটা এসেই, কী যেন একটা গাছে বসল, মস্ত ল্যাজ ঝুলিয়ে। একটা ময়ূর চৈত্রমাসের পূর্ণচাঁদের ঠিক মধ্যিখানে বসেছে, গাছের ডালে, ক্যালেণ্ডারের ছবিতে যেমন দেখা যায়।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না ও।

রাজেন মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল সেদিকে। চিড়িয়াখানায় আর মার্বেল প্যালেসে ছাড়া ময়ুর দেখেনি ও কখনো। তার ওপরে সত্যিকারের জংলি ময়ূর। ভাবতেই পারছিল না যে, সত্যিই দেখছে। চাঁদের আলোয়, জঙ্গল-পাহাড়ের সবকিছুর আলো-ছায়া, হাওয়ায় নড়ানড়ি করা পাতার হাতছানি, আলোছায়ার বুটিকাটা গালচে সবকিছুতেই এমন রূপ যে হয়, তা কি রাজেন জানত? আলোকঝারিতে না এলে, না এলে কুমারগঞ্জে। তথাকথিত শিক্ষাহীন, বি.এ. এম.এ ডিগ্রিহীন শিলির মতন মেয়েও যে, হয় তাও কি এই নারীমাংসলোলুপ শহুরে রাজেন জানত? বড়োই রহস্যময় বলে মনে হয়।

অবাক হয়ে, চেয়ে রইল রাজেন। মুগ্ধ চোখে। ঠিক সেই সময়-ই বনের গভীর থেকে করাত চেরার আওয়াজের মতন চিতাবাঘ ডেকে উঠল। সমস্ত বন-পাহাড় যেন, চিরে চিরে গেল সেই ডাকে। সমস্ত গাছের কোটরে, নদী ও পাতার আদ্রতাবাহী অদৃশ্য রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই আওয়াজ ভরে গেল। ময়ুরটা ভয় পেয়ে ডাল ছেড়ে উড়ল আবার। ঝুপ ঝুপ করে

বড়ো বড়ো ডানায় আওয়াজ তুলে। তারপর রাতের বনের গভীরে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ ভেঙে যাওয়া স্বপ্নের মতো।

পুতন বলল, চলো চলো, বাড়ি যাই। বড়োবাঘের কাছে তেমন ভয় নেই। এই চিতাগুলোকে ভরসা নেই। এও তোমার ভাগ্য। সারাজীবন বনে ঘুরেও অনেকের চিতার ডাক শোনা বা চিতাকে দেখার ভাগ্য হয় না। পরেশকাকাকে বলতে হবে, চিতাটার কথা।

রাজেনের ওই জায়গা ছেড়ে ওঠার আদৌ ইচ্ছে ছিল না। ময়ূরের-ই মতো চিতাবাঘও ও শুধু চিড়িয়াখানাতেই দেখেছে। ওর কাছে ময়ূরও যা, চিতাবাঘও তা। আরও বিস্ময়ের জন্যে অপেক্ষা করতে রাজি ছিল ও।

কিন্তু চিতা যে, কী জিনিস, তা পুতনের ভালো করেই জানা ছিল। ও যখন ছোটো তখন তাদের সবচেয়ে ভালো গাই যূথীকে নিয়ে যায় এমন-ই এক চিতাতে, বর্ষার এক বিকেলে। আলোকঝারি পাহাড় আর গ্রামের মাঝের মাঠে চরছিল যূথী। তা ছাড়া, কালকের হাটে শুনেছিল যে, পর্বতডুয়োর দিকে একটি মানুষখেকো চিতা এক মেচ-বুড়োকে নিয়ে গেছে। পুতন হঠাৎ উঠে পড়ে রাজেনের হাত ধরে বলল, চলো চলো আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

চোখে ঘোর-লাগা, বিবশ মনের অনিচ্ছুক রাজেন বলল, চলো।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে পুতন বলল, তুমি অনেক-ই বদলে গেছ

রাজেন। জানলে!

হুঁ।

রাজেন বলল।

–কিন্তু কেন?

–কী জানি!

–সত্যি অনেক-ই বদলে গেছ।

পুতনের কথার কোনো উত্তর দিল না রাজেন।

–শিলিকে ভালো লাগেনি তোমার?

–হুঁ। একইভাবে বলল রাজেন।

-তবে? তুমি চাও না তাহলে ওকে? নাকি, চাও?

–হুঁ।

–তুমি চাও ওকে?

পা থামিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে রাজেনের মুখে চেয়ে শুধোল, পুতন।

রাজেন উত্তর দিল না কোনো।

মনে মনে বলল, চাওয়ার অনেকরকম আছে পুতন। তুমি সেসব বুঝবে না। এম.কম-এ ফাস্ট ক্লাস পেলেই মানুষ যে, সব-ই জানবে বা বুঝবে, তার কোনো মানে নেই। আই-এ এস, আই-পি-এস, সায়ান্টিস্ট, হলেও নয়। ওই সমস্ত বিদ্যা, ডিগ্রি, ওই সমস্ত অর্জন শুধু বাইরে থেকেই দেখা যায়। ডিগ্রির কাগজগুলো পাকিয়ে ঠেসে রাখা যায় আলমারিতে, নিজের গর্বের সঙ্গে; কিন্তু তার বাইরেও অনেক জানা থাকে, তা সেই কৃতীরাও যে, জানবেন-ই, এমন কোনো মানে নেই। এই শিক্ষা, বাইরে থেকে দেখা যায় না, কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটি দিতে পারে না এ। এমনকী যার মধ্যে এই শিক্ষার উন্মেষ হয়, সেও পূর্বমুহূর্তে জানতে পারে না যে, তার মধ্যে তা আছে বা এল। এইসব শিক্ষা জীবনের শিক্ষা, জীবনে চলতে চলতে পাথরের গায়ের শ্যাওলার মতো জন্মায় এ, জীবন থেকেই পাওয়া। যাকে ভালো বাংলাতে বলে জীবনসঞ্জাত।

এসব বই পড়ে জানার নয়।

রাজেন এতদিন নারীঘটিত ব্যাপারের শারীরিক দিকের চরম করেছে বলেই, হয়তো আজ ও বুঝতে পারছে যে, মেয়েরাও ওর-ই মতো মানুষ-ই। নিছক-ই পুরুষের খেলার বা ভোগের সামগ্রী নয়। এবং পুরুষের চরম আনন্দ বোধ হয় কোনো ঈপ্সিত নারীর মন পাওয়ার-ই মধ্যে শরীর পাওয়ার মধ্যে আদৌ নয়।

বড়োই লজ্জা হয়েছে রাজেনের। এতদিন এ কথাটাই বুঝতে পারেনি?

ছিঃ ছিঃ।

৪. এখন শেষবিকেল

এখন শেষবিকেল। বৈশাখের বিকেল। কালবৈশাখী আসতে পারে আজ। পশ্চিমের আকাশ সাজছে। যদি আসে, তবে কিছু আমগাছের মুকুল আর কিছু গুটি আম ঝরে যাবে। গেলে যাবে। এসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারে আর কোনো ঔৎসুক্য নেই কিরণশশীর।

কিরণশশী, কুলোতে করে কিশমিশ বাছছিলেন। হাঁসগুলো প্যাঁ-অ্যাক, প্যাঁ-অ্যাক করে হরিসভার পুকুর থেকে দিনভর গুগুলি আর কুচোমাছ খেয়ে পেট ফুলিয়ে হেলতে-দুলতে উঠোন পেরিয়ে খোপের দিকে ফিরছিল।

ওরা এখুনি খোপে ঢুকবে না। কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে গা শুকিয়ে নেবে পড়ন্ত রোদে। ওদের গায়ে জল দাঁড়ায় না। যদিও তলপেট ও ভেতরের দিকে ভেজা থাকে। তা ছাড়া, সারাদিন জলে থাকায় হিম হয়ে যায় শরীর। কেউ কেউ এক পা তুলে অন্য পা-টা পেটের মধ্যে গুঁজে গোল গোল চোখ, আধো বুজে কত কী ভাবে। হাঁসেরা কী ভাবে? কেউ কি

জানে?

শিলি এসে এখুনি বসল কিরণশশীর সামনে। রান্নাঘরের দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে।

শিলি বলল, করতাছটা কী বুড়ি?

–পোলাউ রাঁধুম, তাই কিশমিশ বাছতাছি।

লিচু গাছে পাখিরা শোর করছে।

এই দুই নারীই নিজের নিজের ভাবনাতে ডুবে রয়েছেন ও রয়েছে। অনুষঙ্গর কোনো প্রভাব-ই পড়ছে না কারও ওপরেই। দূরে, নগেন সেনের বাড়ির খোনা মেয়েটি, পুকুরের দিকে মুখ তুলে হাঁসদের ডাকছে চৈ... চৈ....চৈ...চৈ,...চৈ। তার নাকিসুরের ডাক এই সন্ধের মুখের বিষণ্ণতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটু পরেই সন্ধে হয়ে যাবে। নানারকম আওয়াজ। হাঁসেদের বাড়ি ফেরার ডাক ডাকছে সে, কুলোতে করে ধান নিয়ে, ফলসা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। ওঁদের পুকুর থেকে বাড়িতে আসার রাস্তা ওই ফলসাতলা দিয়েই। ডাকছে, চেঁ, চৈ, চেঁ, চৈ, চৈ।

এইসব শব্দসমষ্টির ঝুমঝুমির মধ্যে বুঁদ হয়ে যায় শিলি।

মসজিদের আহ্বান ভেসে আসছে। মকবুল চাচা মগরিবের নামাজে বসেছেন। ওদের বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে আসার সময়ে একটু আগেই দেখে এসেছে শিলি।

-খবদ্দার।

বলেই, হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে উঠল। একেবারে উঠোনের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে।

দু-জনেই চমকে উঠলেন ওঁরা। আলিমুদ্দির; চমকে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এ হাঁক। রমজান মিয়ার ছোটোছাওয়াল কখন যে, এসেছে, তা ওঁরা দেখেন-ইনি।

আলিমুদ্দি ঝুড়ি নামাল উঠোনে। ঝুড়ি নামিয়ে, গামছা দিয়ে মুখের ঘাম মুছে বলল, বড়োই মেহনত গেছে আজ সারাটা দিন। বোঝলা দিদি।

ওর লাল-হওয়া মুখের দিকে চেয়ে শিলি বলল, হ। তাই ত দ্যাখতাছি। জল খাবা নাকি এটু? তা ম্যাহত তোমার কোনদিন যায় না তাই কও দেহি।

–তা দিদি যা কইছ। ওই তুমি যা, এই মাইনষের দুঃখ-কষ্ট বোঝলা। আর কেউই বোঝে না।

শিলি হাসল।

বলল, আমিই হইল্যাম গিয়া কুমারগঞ্জের বুঝি মা। কী কইস?

–পানি? পাইলে তো খুবই ভালো হয়। পানি আনলা কই?

আলিমুদ্দি বলল।

কিরণশশী বলল, দিবিটা কীসে? জল?

–ক্যান? আমি আইন্যা দিতাছি। রান্নাঘরে গ্লাস আছে তো নাকি?

–নমঃশুদ্র আর মোছলমানদের গ্লাস নাই।

–ছিঃ ছিঃ।

বলল, শিলি।

আলিমুদ্দির পরিশ্রমে লাল-হওয়া মুখ আরও লাল হয়ে যায়।

শিলি বলে, আমি এই আইতাছি। তুমি খাড়াও দেহি এক মিনিট আলিমুদ্দি।

বলেই, আঁচল উড়িয়ে দৌড়ে গেল নিজেদের বাড়ির দিকে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই পেতলের রেকাবিতে ওর নিজের হাতে তৈরি

কাঁচাগোল্লা আর গ্লাস নিয়ে ফিরে এল। কাঁচাগোল্লার রেকাবিটা আলিমুদ্দির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ধরো।

-আমি পানি আইন্যা দিতেছি তোমারে।

বলেই, কথা ঘোরাবার জন্যে বলল, মাছ পাইল্যা কি আজ? তাই কও। বুড়ি হক্কলরে দাওয়াত দিছে তো।

কথাটা বলেই, লজ্জা পেয়ে গেল।

আলিমুদ্দি, যে নিজে হাতে সারাদুপূর পোলো দিয়ে দিয়ে বৈশাখের খর রোদে, পুকুরে আর বিলে মাছ ধরে আনল কিরণশশীর নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানোর জন্যে, সেই নিজে কোনোদিনও একটু জল খেতে পারবে না এ বাড়িতে? ওর সামনে, কিরণশশীর দাওয়াতের কথা না বললেই পারত।

ভাবল, শিলি।

আলিমুদ্দি জলের গ্লাসটা নিতে দ্বিধা করছিল।

শিলি বলল। না খাও তো আমার মাথাডা খাও। ছাত্তার চাচায় আমাগো রসুই ঘরে বইস্যা আমাগোর জন্যে মোরগা রান্ধে। বি.এ., এম.এ পাশ করি নাই বটে, কিন্তু অশিক্ষাও পাই নাই মা-বাপের কাছে। খাও। খাও।

কাঁচাগোল্লা খেয়ে ও যখন জল খাচ্ছে তখন কিরণশশী শিলিকে বললেন, ওই গ্লাসে যেন পুতনরে আবার জল দিস না, হে তগো বাড়ি গ্যালে।

শিলি বিরক্তির গলায় বলল, সে আমি বুঝবনে। তোমার ছাওয়ালে আর আলিমুদ্দিতে ফারাকাটা কী? তোমার ছাওয়ালরেই বরং কইয়া দিয়ে, সে য্যান আমাগো বাড়ি আর না যায়। আমি এক-ই গ্যালাসে হক্কলেরে জল দিম। খাইলে খাইবে, নাইলে যাইতে মানা কইর‌্যা দিয়ে। তুমি মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া অরে ছাইড়্যা দ্যাও না ক্যান। সারাদিন খাওন-দাওন নাই। বাড়ি যাইব না, না খাড়াইয়া খাড়াইয়া তোমার বক্তৃতা শুনব অনে?

-খুব কথা শিখছস ত দেহি।–

-হ। শিখছি। কথা কি তোমার পোলায় একাই শিখছে?

কিরণশশী বললেন, ভারি পিরিত তো দেহি মোছলার পুতের লইগ্যা।

শিলির বড়ো লজ্জা হল।

তারপর বলবে না ভেবেও বলেই ফেলল, তোমাগো কপালে আরও অনেক-ই দুঃখ আছে বুড়ি। যারা মাইনষেরে মাইনষের সম্মান এহনেও দিতে শ্যাখে নাই, তারা নিজেরাই মানুষ হয় নাই। আমার বাবায় তো হেই কথাই কয়।

–তর বাবা তো মহাপন্ডিত। তার কথা থো এহন। দয়া কইর‌্যা মাছগুলান বুইঝ্যা লইয়া, আমার আয়নার সামনের সিন্দুরের কৌটার ভিতর একখান দশটাকার নোট আছে, অরে আইন্যা দে।

–পাইছস কী কী রে মাছ?

কিরণশশী শুধোলেন, আলিমুদ্দিকে, একেবারে নৈর্ব্যক্তিক গলায়। যেন, চৌকাঠের সঙ্গে কথা বলছেন।

–আপনে ত কুচামাছ-ই কইছিলেন। তা পাই নাই। বাইন মাছ, অ্যাই দেখেন দুইডা, পেরায় সাপের মতো বড়ো হইবনে। আর এই বাইশখান কই পাইছি। খুব-ই বড়ো। মাগুর। একখানের ওজন-ই হইব গিয়া পেরায় তিনপোয়া।

-আর?

–পোলো দিয়া আর কী পামু? আমি ত আর নদীতে জাল ফেইল্যা মাছ ধরি না।

–তাইলে, আমার চিতল পামু কোত্থিকা?

–মুনীন্দ্ররে কইয়েন।

–কাল পারবা তো আনতে?

–পারব না ক্যান? রোজ-ই তো ধরে দেহি, চার-পাঁচটা কইর‍্যা। তবে, বেশিবড় হইব না। বড়ো চায়েন তো ধুবড়ি থিক্যা আনন লাগব। গরম পইড়া গেল গিয়া। খারাপ না হইয়া যায়।

শিলি, কিরণশশীর ঘর থেকে টাকাটা এনে আলিমুদ্দিকে দিল।

কিরণশশী বললেন, দুইডা টাকা ফেরত দিয়া যাবি। এই কয়ডা মাছের দাম দশটাকা। তুই ডাকাইত হইয়া গেলি দেহি।

স্বল্পক্ষণ মুখ নীচু করে চুপ করে থেকে আলিমুদ্দি বলল, ঠিক আছে।

-কাল দিয়া যামু আনে। এহনে তো নাই।

–কাল দিলেই হইব।

আলিমুদ্দি ঝুড়ি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

শিলি বলল, চলো আমিও যাব।

-এই ত আইলি।

কিরণশশী বললেন।

-নাঃ, কাল আসুমানে।

–সক্কাল কইর‍্যা আসস। আমি একা সব সামলাইতে পারুম না।

–ক্যান, হোন্দলের মায়ে ত আছেই।

–তা হইলেও পারুম না।

–তাইলে নিমন্ত্রণ করনের দরকার কী?

রুক্ষ গলায় বলল, শিলি।

কিরণশশী অবাক হয়ে তাকালেন শিলির দিকে। কিন্তু মুখে কিছু বললেন না।

শিলি বুঝল, কিরণশশীর মন খারাপ। তাই মেজাজও খারাপ। শিলির নিজের মেজাজও কিছু ভালো নয়। সবসময়ে অন্যায় বরদাস্ত হয় না। আলিমুদ্দির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে শিলি বলল, ওই বুড়ির কথায় কিছু মনে করিস নাই তো তুই?

–আরে নাঃ। মনে করনের কী আছে?

–কিছু মনে করিস না। আজ বাদে কাল মইরা যাইব গিয়া। মানষেরে যারা এমন কইর‍্যা অপমান করে, তাদের পাপ লাগে। লাগেই।

–ছাড়ান দাও দিদি। বুড়াবুড়িরা আর ক-দিন। নরেশকাকা, পরেশকাকায়

তো এক্কেরে অন্যরকম মানুষ। সবাই কি সমান অইব? মোছলমানেরাও কি সবাই সমান? তুমি কও?

কথা ঘুরিয়ে, শিলি বলল, আমার বাজে বকনের সময় নাই।

তারপর-ই বলল, শোন। কাল দুপুরে আমাগো বাড়ি তর নিমন্ত্রণ। খাবি আইস্যা। আমাগো সাথে বইস্যা। আমি, তুই, বাবায় আর কাকায়। ছাত্তার কাকারে যদি পাওন যায় তো তারেও কয়্যা দিমু।

-পাগল হইল্যা নাকি? দুপুরে ক্যামনে পারুম? সারাদিন মাছ না ধইরবার পারলে আম্মায় রান্ধে কী? আব্বার শরীরও তো ভালো নাই। বাতে এক্কেরেই মাইরা থুইছে। ঘর থিক্যা বাইরাইতেই পারে না। সারাদিন যা পাই, তাই বেইচ্যা-বুইচ্যা চলে কোনোমতে। বুনটারে বিয়া দিতে গিয়া দুই হাজার টাকা কর্জ হইয়া গ্যাছে গিয়া। তাও তো দামাদ তারে দুইবেলা ঠেঙ্গাইতেছে। আবার নিকাহ করনের ইচ্ছা আর কী! তাও গদাইদায় সুদ লয় না। ওই কর্জর লইগ্যা কখনো তাগাদাও করে না। বলে, নাই-ই যদি পারস, তো দিবি না। আমার তো বুন নাই। না হয় তর বোনের বিয়াটা আমিই দিয়া দিছি। হইছেটা কী তায়?

একটু থেমে, আলিমুদ্দি বলল। সত্যই। গদাইদার মতো বড়োলোক দ্যাশে আর নাই। মনখান তো না, যেন ব্রহ্মপুত্রই।

শিলি, আলিমুদ্দির পাশে হাঁটছিল। শেষবিকেলের আলো পড়ে ওকে আরও

সুন্দরী দেখাচ্ছিল। আলিমুদ্দি ভাবছিল, এমন একটি বউ পেলে ব্রহ্মপুত্রয় নৌকো ভাসিয়ে তাকে নিয়ে মাছ ধরে একেবারে বড়োলোক হয়ে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। এ জন্মে হবার নয়। শিলিকে দেখলেই ওর শরীরের রক্ত দৌড়াদৌড়ি করে। শিরা-উপশিরা সব শক্ত হয়ে যায়।

মোড়ে এসে ধরা গলায় বলল, চলি দিদি।

–তাইলে আইবি না কাল?

–ক্যামনে আসুম দিদি? রাতে একদিন কইও, অবশ্যই যামু। তুমি আদর কইর‍্যা খাওয়াইবা আর যামু না, তা কি হয়?

–কালরাতে তো এ বাড়ির নিমন্ত্রণ। আহা, দিন ঠিক কইর‍্যা কমু তরে আলিমুদ্দি। অবশ্যই আসিস য্যান।

আলিমুদ্দি বাঁশবনের আড়ালে হারিয়ে গেলে, হঠাৎ-ই শিলির মনে হল, আলিমুদ্দি কোথায় যে, থাকে, তাও ও জানে না। যদিও একই গ্রামে বাড়ি ওদের, তবুও ওদের বাড়ি কখনো চোখেও দেখেনি। তবে শুনেছে যে, বাড়ি ওই নামেই। আসলে ঝুপড়ি একটি। শীতকালে চরেই ঘর বানিয়ে থাকে আলিমুদ্দি। তরমুজ ফলায়, ধানও। এই করেই কোনোরকমে চলে। ওর চওড়া বুক। পাথরের মতন হাত-পা, সরু কোমর, বাঁশির মতো নাক আর মাথাভরতি চুলে, ভারি ভালো দেখে ওকে শিলি। ওকে দেখলেই বুকের মধ্যে রক্ত ঝুনুক-ঝুনুক করে।

কিন্তু রক্তরসঙ্গে নাচতে পারা তো যায় না। রক্ত যা বলে, তা শোনাও যায় না।

মানুষের জীবন বড়ড়াই কষ্টের।

ভাবে, শিলি।

বাড়ি ফিরেই, গা ধুতে ঢোকে স্নান-ঘরে। সিঁদুরে আমগাছে বোল এসেছে। খুব তাড়াতাড়িই এসেছে এবারে। আজ কালবৈশাখী আর এল না। মেঘ উড়ে গেছে দূরে। হাওয়া জোরে বইলেই আমের বোলের গন্ধ ভাসে আলতো হয়ে। শেষবিকেলের রোদের সোনার আঙুল ছুঁয়েছে গাছ-গাছালিকে এখন। একটি বসন্তবৌরি পাখি ডানা ঝট-পটিয়ে উড়ে যায় আমগাছের গভীর থেকে।

স্নান করতে করতে শিলি ভাবে যে, রাজেন ছেলেটি বেশ। কত কী জানে!

বাবা-কাকার সঙ্গে কত কী বিষয়ে আলোচনা করল সেদিন। কত জ্ঞান।

আর খুব ভদ্রও কিন্তু। দোষের মধ্যে করলুম, খেলুম, নুন, নঙ্কা, নেবু, নুচি এইরকম অসভ্য ভাষায় কথা বলে এই-ই যা।

আর গান? সেদিন তার গানে সে, শিলিকে একেবারেই মেরে রেখে গেছে। এরকম গান শিলি আগে কখনো শোনেনি। এমন ধরনের গানও

নয়। গান যদি তেমন করে গাওয়া যায়, তবে সেই গায়ক বা গায়িকা তাৎক্ষণিক সম্রাট অথবা সম্রাজ্ঞীই হয়ে ওঠে। তাকে অদেয় তখন কারোরই কিছু থাকে না।

একটি গান গেয়েছিল গত রাতে রাজেন। কালও এসেছিল রাতে। পুতন আসেনি। একাই এসেছিল। বাবা ও কাকা বাড়িতেই ছিলেন। কাল গেয়েছিল এই গানটি :

ওগো কেমনে বলো না,ভালো না বেসে থাকি গো।পাগল করেছে মোরেওই দুটি আঁখি গো।কী জানি কী গুণ করেরেখেছে মন মজাইয়ে,সাধ হয় সদা যেন,বুকে করে রাখি গো। ওগো কেমনে বলো না?

গানটি যে, শিলিকে উদ্দেশ করেই গাওয়া তা শিলির বুঝতে বাকি ছিল না। শিলির মনও সেদিন রাত থেকেই রাজেনকে বুকে করে রাখতেই চায়। কিন্তু এদেশের মেয়েদের তো বুকে করে রাখার অধিকার নেই; ক্ষমতাও নেই। বুকে থাকার জন্যেই তারা। রাজেনের বুকে থাকার অনেক-ই অসুবিধে। বৃদ্ধ বাবা, কাকা। কলকাতায় কার যেতে না ইচ্ছে করে? কোনোদিন তো যায়নি।

পুতনদা, কাকাকে বলেছে, রাজেনরা নাকি বনেদি বড়োলোক। কলকাতায় যারা বড়োলোক, তারা গদাইদের মতো গেঁয়ো বড়োলোকদের দু-হাজারবার কিনে যেকোনো হাটে আবারও বেচে দিতে পারে নাকি।

রাজেনদের অনেকগুলো গাড়ির মধ্যে একটি গাড়ি আছে রোলস। সেই গাড়িটির-ই যা দাম, তাতে গদাই আর গদাইর বাপের সব সম্পত্তি নিলামে চড়ানো যায়। রাজেনও বাবার এক ছেলে। তবে, ছেলের স্বভাব-চরিত্রটি সুবিধের নয়।

শিলি, গায়ে সাবান দিতে দিতে ভাবছিল, ওর মা বলতেন, ছেলেদের চরিত্র কখনো নোংরা হয় না। অন্য মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক থাকলেই পুরুষমানুষকে ছোটো বলা যায় না। যদি সে ছোটোমনের মানুষ হয়, তবেই শুধু ছোটো বলা যায় তাকে।

ছোটোমনের পুরুষমানুষের মতো ঘৃণিত জীব আর নেই।

চান সেরে গা মুছছিল যখন, তখন কাদের গলায় আওয়াজ পেল যেন বাইরে।

রাজেন আর পুতন? বুকটা ধক করে উঠল শিলির।

তারপর-ই বুঝল যে, শুধু রাজেন।

তাড়াতাড়ি করে জামাকাপড় পরে ফেলল ও। রাজেনের সামনে অসুন্দর হয়ে যেতে চায় না। নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছিল যে, যে-মানুষটিকে দু-চোখে দেখতে পারত না ক-দিন আগেই, সেই মানুষটিই এখন তার মনের মানুষ হয়ে উঠেছে। তার পাশে, পুতনদাকেও মনে ধরে না আর।

এ কি শুধু গানের-ই জন্যে? নাকি মানুষটি যে, খারাপ, দুশ্চরিত্র এসব শুনেছে বলেই, তার প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেছে ও। যে-মানুষেরা নিজেদের সবসময়ই ভালো বলে প্রমাণ করতে চায়, আসলে তাদের মধ্যে বেশিরাই বোধ হয় খারাপ। শিলির অভিজ্ঞতা তাই-ই বলে। ভালোমানুষ, বড়ো সহজে খারাপ হয়ে যেতে পারে, যেমন পুতনদা হয়েছে। কিন্তু যাকে খারাপ বলেই জানা আছে, তার আরও খারাপ হওয়ার ভয় থাকে না কোনোই। বরং ভালো হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। খারাপ যদি ভালো হয়, তখন সে বোধ হয় ভালোই থাকে বাকিজীবন। খারাপের ওপর ভরসা করা চলে, ভালোর ওপরে কখনোই নয়, কারণ, কোন মুহূর্তে, সে যে খারাপ হবে, তা নিজেও আগের মুহূর্তে জানে না।

শিলির মা, একজনকে ভালোবাসতেন। আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ছিল তাঁর। একবারমাত্র তিনি মাকে দেখতে এসেছিলেন কুমারগঞ্জে। নাম ছিল সুধীর। শিলি ডাকত সুধীরমামা বলে। দু-দিন ছিলেন ওদের বাড়িতে।

বাবা সে দু-দিন নানা অছিলাতে ইচ্ছে করেই বাড়ির বাইরে ছিলেন। সুধীরমামা চলে যাওয়ার পর মা বলেছিলেন, তোর বাবা মানুষটা বড়ো উদার রে শিলি। এমন পুরুষ, সব মেয়ের-ই শ্রদ্ধার পাত্র।

সুধীরমামা আঁচড়ের চপ খেতে ভালোবাসতেন বলে, দু-দিনই বিকেলে আঁচড়ের চপ করেছিলেন মা। মনে আছে শিলির।

একদিন আলিপুরদুয়ার থেকে খবর এল পোস্টকার্ডে যে, সুধীরমামা কুমারগঞ্জের দিকেই আসছিলেন শিলির মায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে। স্টেশনে নেমে, বাস ধরার আগেই রক্তবমি করে প্ল্যাটফর্মেই মারা যান। অচেনা মানুষের মৃতদেহ মর্গে নিয়ে যায় পুলিশ। কাটা ছেঁড়া হয়। সাতদিন পরে সুধীরমামার ছোটোভাই লোকমুখে খবর পেয়ে মর্গে পৌঁছে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। সুধীরমামা তখন আর সুধীরমামা ছিলেন না। গলে, ফুলে, পচে সে নাকি এক বীভৎস ব্যাপার। ওইখানেই দাহ করে ফিরে যান তাঁর ভাই।

গিয়েই মাকে একখানা পোস্টকার্ড লেখেন।

সুধীরমামাও খুব মদ খেতেন। বিয়ে-থা করেননি। মামাবাড়ির আত্মীয়দের কানাঘুসোয় সে শুনেছে, মাকে ভালোবাসতেন বলেই তিনি বিয়ে করেননি। পুববাংলার এক-ই গ্রামে বাড়ি ছিল ওঁদের। মায়ের নিজের নামে না ডেকে সুধীরমামা মাকে ডাকতেন পারু বলে। দেবদাসের পার্বতী।

জীবনের শেষটাতে অনেক-ই মিল ছিল দেবদাসের সঙ্গে।

শিলির মা বলতেন, তোর বাবা কাঠ-খোট্টা মানুষ। প্রেমের মতো গভীর ব্যাপার ওঁর জন্যে নয়। তবে, প্রত্যেক মানুষের-ই প্রেমের প্রকাশ আলাদা আলাদা। সুধীরমামার মৃত্যুর পর বাবাই ওদের বাড়িতে এঁচড়ের চপ

কোনোদিনও আর করতে দেননি। মাকে বলতেন, সুধীরবাবু খেতে অত ভালোবাসতেন। ও জিনিস আর নাই-ই বা করলে।

সুধীরমামাও কিন্তু দারুণ ভালো গান গাইতেন। যে দু-দিন ছিলেন, গানে গানে মুখর করে রেখেছিলেন। মায়ের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতেন। শিলির খুব অবাক লাগত তখন, ওই মাকে দেখে। মা যেন অন্য মা হয়ে গেছিলেন। এক অচেনা মানুষ।

সুধীরমামা চলে যাওয়ার পর, মা বলেছিলেন একদিন শিলিকে ডেকে, দেখ শিলি, প্রেমে যদি কোনোদিনও পড়িস কারও সঙ্গে, সত্যিকারের প্রেম রে, মোহ নয়, তবে তাকে কখনো বিয়ে করিস না। বিয়েটা একটা অভ্যেস। অন্ধকার ঘর। আর প্রেম হচ্ছে আলোকিত বারান্দা। যেখানে পাখি ডাকে, ফুলের গন্ধ ভাসে।

শিলি শুধিয়েছিল, কী করে বুঝব মা, যে, প্রেমে পড়েছি?

মা হেসে, শিলির থুতনিতে হাত দিয়ে বলেছিলেন, বুঝতে ঠিক-ই পারবি।

–প্রেম যেমন আনন্দর, তেমন বড় কষ্টেরও। প্রসব-বেদনার চেয়েও অনেক বেশি কষ্ট প্রেমে। প্রেম এলে, ঠিক বুঝবি। যদিও শব্দ করে, জানান দিয়ে আসে না প্রেম।

-তবে? মানুষ প্রেমে পড়ে কেন? অত যদি কষ্টই?

হেসেছিলেন মা। বলেছিলেন, না-পড়ে পারে না বলেই পড়ে।

রাজেন বারান্দাতে বসেছিল। রাজেন একাই। পুতন বোধ হয় পৌঁছে দিয়েই চলে গেছিল। যেকোনো কারণেই হোক, পুতনদা কয়েকদিন হল এড়িয়ে যাচ্ছিল শিলিকে।

শিলি বলল, বসুন একটু। আসছি।

বলেই ভেতরে গিয়ে চুলটা ঠিক করে, চোখে কাজল দিয়ে এল।

বাবা আর কাকা একসঙ্গেই বেরিয়েছিলেন। গজেনকাকাদের ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়ার সালিশি হয়েছেন ওঁরা। রোজ-ই একবার করে যাচ্ছেন ক-দিন হল।

আজকে মিটিয়ে দিয়ে আসবেন, এমন-ই কথা আছে।

শিলি এসে বসল, রাজেনের সামনে।

বলল, কী করলেন? সারাটা দিন?

–কিছুই করলাম না। অথচ দিনটা চলে গেল। এই কথাই ভাবছিলাম। আমার মতো উদ্দেশ্যহীন লোকের দিন তো বটেই, জীবনও বোধ হয় এমনি করেই চলে যাবে। চলে যাবার সময়ই শুধু জানতে পারব যে, চলে গেল।

–তাই?

শিলি বলল।

–আমি কাল-ই ফিরে যাচ্ছি। চা-বাগানে।

শিলির বুকটা ধক করে উঠল। মনে হল যেন কোনো স্বপ্ন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল। প্রথমটা, কোনো কথাই বলতে পারল না শিলি। তারপর সামলে নিয়ে বলল, সাতবোশেখির মেলা দেখে যাবেন না? মেলার মুখেই চলে যাবেন?

–যেতে যখন হবেই, তখন মায়া বাড়িয়ে আর লাভ কী?

–মায়া? কীসের মায়া?

মুখ নামিয়ে বলল, শিলি।

–এই! কুমারগঞ্জের মায়া। এখানের মানুষজনের মায়া।

-ওঃ ।

-এখানের মানুষজনকে ভালো লাগল না বুঝি?

–না। না। তারজন্যে নয়। হয়তো উলটোটাই। বেশি ভালো লাগলেও চলে

যেতে হয়। চলে যাওয়াই ভালো।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি, কলকাতায় কখনো যাওনি, না?

-না।

–কখনো কি যাবে?

–আমরা গেঁয়ো লোক। তার ওপরে কলকাতায় তো আমাদের আত্মীয়স্বজনও কেউই নেই। থাকার জায়গাই বা কোথায়? তা ছাড়া বিনা কাজে বেড়িয়ে বেড়াই এমন সামর্থ্যও তো আমাদের নেই। বাবা কাকারও আমি ছাড়া কেউই নেই। ওঁদের কে দেখবে?

-আমি আমার মাকে লিখেছি তোমার কথা।

–আমার কথা? আমার কথা কী লিখেছেন?

–এই! যা মনে হয়েছে।

–কবে লিখেছেন?

–যেদিন তোমাদের বাড়িতে খেয়ে গেলাম, সেদিন-ই রাতে। তোমার গান শোনার পর।

–আমার কথা লেখার কীই-ই বা আছে। লেখাপড়া শিখিনি। কোনো গুণ নেই। আমি অতিসামান্য মেয়ে।

–সেই কথাই লিখেছি। তোমার গানটা ভালো করে করা উচিত শিলি।

-আমার কোনোই গুণ নেই। বড়োলোকের বকা ছেলে বলেই সকলে আমাকে জানে। আমার দোষের শেষ নেই। কিন্তু গান আমি ভালোবাসি। এবং নিজের কথা অন্য কেউই এখানে বলার নেই বলেই বলছি; যে, গান ব্যাপারটা আমি একটু-আধটু বুঝি। তুমি গান ভালো করে শিখলে, দেশের নামি গাইয়েদের একজন হতে পারো। ভগবান-দত্ত গলা তোমার। তুমি কি রিয়াজ করো কখনো?

–রিয়াজ? জীবনে করিনি।

–তবেই দ্যাখো। ঠিক-ই ধরেছি। কিছু গাইয়ে থাকেন, ঈশ্বর নিজেই তাঁদের অনেকখানি পথ এগিয়ে দিয়ে, অন্যদের হ্যাঁণ্ডিক্যাপ করে দিয়ে আসরে নামান তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে।

–হ্যাণ্ডিক্যাপ কী?

–ও। সে তুমি বুঝবে না। ও ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার। রেসের মাঠের টার্ম। আমি তো রেসের মাঠেও যাই। সব গুণ-ই তো আছে।

-কী হয়? সেই মাঠে?

হেসে ফেলল রাজেন, শিলির নিষ্পাপ অজ্ঞতায়।

বলল, সে তুমি যখন কলকাতায় যাবে, তখন জানবে। তোমাকে একদিন নিয়ে গিয়ে ঘোড়দৌড় দেখিয়ে আনব। তোমাদের এখানে যেমন আমার বিস্ময়ের অনেক কিছুই আছে, গঙ্গাধর নদী, রাঙামাটি, পর্বতজুয়ার, আলোকঝারি, আমার অদেখা সাতববাশেখির মেলা এবং তুমি– এই শিলি। তেমন, তোমারও বিস্ময়ের অনেক জিনিস-ই আছে কলকাতায়।

–আমি কলকাতায় যাব কেন হঠাৎ? ঠিক বুঝলাম না।

-আমার মা তোমাকে চিঠি লিখবেন, নেমন্তন্ন জানিয়ে। আর আমার বাবা লিখবেন তোমার বাবাকে। তুমি তোমার বাবার সঙ্গেই যাবে। পরেশকাকাকেও নিয়ে যেয়ো। ওখানে কত বড়ো বড়ো বন্দুকের দোকান আছে। ওঁকে দেখাব। আমার ছোটোমামারও খুব শিকারের শখ ছিল। ছিল কী, এখনও আছে। বিহারের হাজারিবাগ, ওড়িশার ঢেনকানল ইত্যাদি কত জায়গাতে শিকারে যান উনি, প্রতিশীতে। পরেশকাকাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন উনি।

-কেন? আমাদের নেমন্তন্ন করবেন কেন, আপনার মা-বাবা?

–আমার তোমাকে খুব ভালো লেগেছে বলে। মানে, তোমাদের সকলকেই।

–তাই?

বলে, বড়ো বড়ো চোখ মেলে শিলি চেয়ে রইল, রাজেনের মুখের দিকে বিস্ময়ে।

ওর বুকের মধ্যে দারুণ এক উত্তেজনা বোধ করতে লাগল ও।

হঠাৎ রাজেন বলল, তোমার বিয়ে কবে? শিলি?

বড়োকষ্ট হল রাজেনের কথা শুনে শিলির। একটু আগেই বুকে যে, আনন্দর বোধ চিড়িক, করে উঠেছিল, তা-ই হঠাৎ বেদনার বোধ হয়ে গেল।

সামলে নিয়ে বলল, আমার বিয়ে? কে বলেছে, আপনাকে?

–অনেকের কাছেই তো শুনছি। তোমার বিয়েতে আমাকে নেমন্তন্ন কোরো কিন্তু। আর বিয়ের আগেই একবার কলকাতা বেড়িয়ে যাও। আমাদের নায়েবমশাইকে পাঠাবেন বাবা, তোমাদের নিয়ে যাবার জন্যে।

–আমার বিয়ের কথা শুনেছেন, কিন্তু পাত্রটি কে?

বেশ মজা লাগছিল শিলির। মজার গলাতেই বলল।

–পাত্র?

–হ্যাঁ।

–পাত্র দু-জন আছেন বলে শুনেছি।

এবারে শিলি হেসে ফেলল। বলল, ও তাহলে বিয়েটা পাকা হয়নি এখনও? তা ছাড়া পাত্র একজন নয়, দু-জন? একেবারে স্বয়ংবর সভা যে!

বোকা বনে গেল রাজেন।

বলল, হয়তো তাই-ই।

–পাত্রই যখন ঠিক হয়নি এখনও, তবে তো বিয়ে নাও হতে পারে।

শিলি বলল।

–তা নয়। শুনেছি বিয়ে হবেই। এবং শিগগির।

–পাত্র তাহলে দু-জনের জায়গায় তো চারজনও হতে পারে। পাকাই যখন হয়নি।

এবারে হেসে ফেলল রাজেন। আনন্দে।

বলল, তাই?

-তাই-ই! তবে আমার বাবা ছাড়া তো আমার কেউই নেই। বাবাকে ছাড়া

কোথাও যেতে পারব না। আর পারব না বলেই, বোধ হয় বাবা-কাকা আমার জন্যে এখানের-ই কোনো পাত্রর কথা ভাবছেন। আমার না আছে রূপ, না আছে কোনো গুণ। লেখাপড়াও শিখিনি বলার মতো। আমার বাবার টাকাও নেই। আমার যেমন যোগ্যতা, তেমন পাত্রই আমার জুটবে।

–পুতনকে তোমার কেমন লাগে শিলি?

হঠাৎ বলল, রাজেন।

শিলি চুপ করে রইল।

-কী? কিছু বলছ না যে?

–সত্যি কথা বলব? আপনি কথাটা নিজের কাছেই রাখবেন তো?

নির্ভয়ে বলো।

–খুব-ই ভালো লাগত। পাশাপাশি বাড়ি। তা ছাড়া বড়ো হওয়ার পর বেশি ছেলেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ তো পাই না আমরা, এই গাঁয়ের মেয়েরা। তাই পুতনদাকেই দেখেছি ছোটোবেলা থেকে। খুব-ই ভালো লাগত। পড়াশুনোতেও ভালো। আমাদের গর্ব। তার মায়েরও গর্ব। পুতনদার মাও আমাকে খুব ভালোবাসেন। কিন্তু এই পুতনদা মানে, যে পুতনদা আপনার সঙ্গে এবারে এল, তাকে আমার ভালো লাগেনি। অনেক-ই বদলে গেছে

পুতনদা।

রাজেন বলল, ওকে আমিই বকিয়ে দিয়েছি। দোষ আমার-ই। ও সত্যিই ভালো ছেলে। আমার সংশ্রব ছাড়লেই ও আবার তোমার পুরোনো পুতনদাই হয়ে যাবে।

-জানি না। যাদের যে-কেউই এত সহজে নষ্ট করতে পারে, তাদের ওপর ভরসা কি করা যায়? আসলে, পুতনদার মধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিল নিশ্চয়ই। নিজে নষ্ট না হতে চাইলে, অন্যে কি নষ্ট করতে পারে কাউকে?

–নিশ্চয়ই পারে শিলি। এই যেমন তুমি। এক রাজেন এখানে এসেছিল, তুমি তাকে আবার নষ্ট করে অন্য রাজেন করে দিলে।

একটু চুপ করে থেকে বলল, আসলে নষ্ট হবারও নানারকম থাকে তো!

শিলি, আহত গলায় বলল, আমি? আমি আপনাকে নষ্ট করে দিলাম? কী বলছেন আপনি?

–দিলেই তো। নষ্ট হওয়া মানে, সবসময় খারাপ হওয়া নয়। পুরোনো যা, তা নষ্ট তো হলই। বদলে যাওয়ারও তো আর এক নাম নষ্ট হওয়া! নাকি?

শিলি চুপ করে রইল। মুখ নামিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে, নিজের আঙুলে আঁচলের কোণটি পাকাতে পাকাতে বলল, আমি; আমি...

ওর দিকে চেয়ে খুব ভালো লাগছিল রাজেনের। কলকাতার কোনো মেয়ে এমন করে আঁচল আঙুলে পাকালে তাকে অভব্য-অসভ্য বলা হত। অথচ এই চাঁদ-ভাসি উঠোনের এক কোণের বারান্দায়, এই গ্রাম্য মেয়েটির আঙুলে আঁচল পাকানো দেখে রাজেনের মনে হল, এর চেয়ে বেশি ভদ্র, স্বাভাবিক অভ্যেস আর কিছুই হতে পারে না। সেখানে যা মানায়, যা রেওয়াজ।

একটু পর-ই পুতন ফিরে এল।

শিলি বুঝল ও চলে যায়নি, হয়তো কিছু কিনতে-টিনতে গেছিল।

পুতন হাঁটিয়ে-আনা সাইকেলে, কির-র-র-র শব্দ তুলে উঠোনে ঢুকল।

বলল, হুইস্কি পেলাম না গুরু, রাম এনেছি।

রাজেন উঠল। বলল, এখানে নয়। শিলি বাড়িতে একা আছে। তা ছাড়া শিলি পছন্দ করে না এসব।

একটু চুপ করে থেকে রাজেন বলল, তুমি মদ খাওয়া ছেড়ে দাও পুতন।

–যাঃ বাবা। ভূতের মুখে রামনাম!

–তাই-ই! ভূত যে, ভগবান হয়ে ওঠে কখনো-কখনো, তাও তো সত্যিই।

–কী ব্যাপার?

–কেন? ভূত ভগবান হতে পারে না?

অবাক হয়ে রাজেনের সঙ্গে চলে যেতে যেতে পুতন শিলিকে বলল, শিলি, তাহলে এই কথাই রইল। দেখা হবে সাতবোশেখির মেলায়।

রাজেন কিছুই বলল না পুতনকে, সেই কথার পিঠে। শিলিকেও নয়।

শিলি অবাক হল।

রাজেন বলল, চললাম শিলি। ভালো থেকো। খুশি থেকো, সবসময়ে।

–হঠাৎ এইসব কথা? সময় কি চলে যাচ্ছে নাকি?

পুতন বলল।

তারপর বলল, এখান থেকে যেদিন যাবে, সেদিন-ই এইসব ফেয়ারওয়েলের কথা হবে এখন। অনেক-ই হবে। ফুল, মালা, চোখের জল।

রাজেন উত্তর দিল না।

শিলি, চ্যাগারের দরজা অবধি এল ওদের সঙ্গে। যাওয়ার সময়ে রাজেন খুব কাছ থেকে শিলির মুখে তাকাল একবার।

তারপর আবারও বলল, মাঝে মাঝে গানের রিয়াজ করলে ক্ষতি কী? ভেবে দেখো।

তারপর-ই নীচু গলায় বলল, ভালো থেকো শিলি।

ভালোবেসে, কাউকে ভালো থাকতে বলার মধ্যেও যে, এত লজ্জা, এত সুখ থাকতে পারে, তা রাজেনের জানা ছিল না।

ওরা দু-জনে জ্যোৎস্নার মধ্যে বাঁশপাতা-ঝরা আলো-ছায়ার ডোরাকাটা শতরঞ্জি মাড়িয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পুতন আর রাজেন। সাইকেলের চেনের কিরকির শব্দ হচ্ছিল। আমের বোল-এর আর কাঁঠালের মুচির গন্ধে ম ম করছিল চাঁদভাসি, কুমারগঞ্জ। কোকিল ডাকছিল, কাক-জ্যোৎসাকে দিন ভেবে। পাগলের মতো। কোকিলদের মধ্যেও পাগল থাকে। আর বউ কথা-কও।

শিলির দু-চোখের সামনে দিয়ে, যেন রাজেন নয় মায়ের প্রেমিক সুধীরমামাই জ্যোৎস্নায় ভেসে ভেসে চলে গেলেন।

মা চলে গেছেন। সুধীরমামাও গেছেন আরও আগে। মানুষ ঠিক-ই মরে যায় একদিন না একদিন, কিন্তু প্রেম থেকে যায় অন্যের মধ্যে। প্রেমিক-প্রেমিকার রূপান্তর ঘটে মাত্র। প্রেমিক এক-ই থাকে। দিদিমা, মা অথবা মেয়ের। জন্মে জন্মে তাদের চেহারা এবং নাম বদলায়। রকমের বদল বোধ হয় না।

হঠাৎ-ই কুচিন্তায় মন ভরে উঠল শিলির।

শিলির মন বলল, রাজেন আর কোনোদিনও ফিরে আসবে না এই কুমারগঞ্জে; শিলির কাছে। কে জানে? আসবে কি?

মনে একথা হতেই মনে মনে সেই মনের মুখ চেপে ধরল ও।

ওরা দু-জনে বড়োরাস্তায় পড়ে চাঁপার মাঠের দিকে যেতে লাগল। চাঁপার গন্ধে ম ম করে জায়গাটা। তাই খুব-ই পছন্দ করে পুতন। ওখানে বসেই মাল খাচ্ছে গত তিনদিন হল ওরা।

পুতন বলল, গুরু? কী হল তোমার? মনমরা দেখছি যে। আর কী? যে জন্যে আসা সেই কারণ তো সিদ্ধ হবে এবারে। কিছু বলো গুরু।

-গুরু তো ছিলে তুমিই? আমি আবার গুরু হলাম কবে থেকে।

রাজেন বলল।

-তোমার নিজের গুণেই।

পুতন বলল।

হেসে ফেলল, রাজেন।

বলল, তাই-ই?

পুতন বলল, ভিলেজ-বিউটির নথ কবে খসাবে? কেস তো একেবারে তৈরি করেই ফেলেছ। ওকে নষ্ট করবে বলেই তো এখানে আসা তোমার। পারোও বাবা তুমি। শিকারি বাঘও তোমার মতো ধৈর্য রাখে না। অসীম ক্ষমতা তোমার। খুরে খুরে পেন্নাম।

–হুঁ।

–পথেই খাবে নাকি? খুলব পাঁইট?

অধৈর্য গলায় বলল, পুতন।

–নাঃ। আমি খাব না।

রাজেন বলল, অন্যমনস্ক গলাতে।

–সে কী? এ কী কথা? সন্ধেবেলা ওষুধ না খেলে শরীর ম্যাজম্যাজ করবে

না? আমি তো খাবই। তুমিই আমাকে ধরিয়ে, এখন তুমিই..বাঃ।

–এ সব না-খাওয়াই ভালো। পরে, এই-ই খায়।

–যাঃ শালা। বলছ কী তুমি গুরু? যাকগে, কাল অবধি তো খাও। তারপর দেখা যাবে এখন। গুড়ি-গুডি বয় হওয়া যাবে।

-আরে! সাতবোশেখির মেলার দিনেই তো ক্লাইম্যাক্স হবে। না খেলে, চলবে কেন? প্ল্যানটা কী করলে শুনি?

-কীসের প্ল্যান?

-বাঃ, প্ল্যানটা যাতে নির্বিঘ্নে করতে পারো। তাই তো তোমাকে একা পাঠালাম আগে। কীসের প্ল্যান আবার কী?

–শিলিকে নষ্ট করার প্ল্যান।

–ওঃ।

বলেই, চুপ করে গেল রাজেন।

মনে মনে বলল, একথা ঠিক-ই যে, ওকে নষ্ট করতেই এসেছিলাম। কিন্তু নিজেই নষ্ট হয়ে গেলাম। অথবা, কে বলতে পারে; অমৃত হয়ে গেলাম!

রাজেন, পুতনকে বলেনি যে, কাল ভোরের বাসেই ফিরে যাবে ও। অনেক-ই কাজ বাকি আছে। সময় বেশি নেই।

পুতন বলল, তুমি কথাবার্তা কইচো না যে!

বলল, একেবারেই কলকাতার লোকেদের-ই মতন। ওই ভাষা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে, পুতনের খুব গর্ব হয় আজকাল। কিছু মেকি মানুষ, মেকি-বাঙাল তাঁদের মাতৃভাষার ব্যাপারে একধরনের হীনম্মন্যতাতে ভোগেন। পুতনও তাদের-ই দলে। ব্যতিক্রম নয়। মেকিরাই তো এখন দলে ভারী সব জায়গাতে। তাদের-ই রাজত্ব। অথচ একদিন পুতন ঘৃণা করত। আজ সে তাদেরই একজন।

তবুও রাজেন কথা বলল না।

-কী গুরু? উত্তর দিচ্ছ না যে কথার?

রাজেন হাসল এবারে।

বলল, জান পুতন আমি না মাইরি, আলোকঝারি হয়ে গেছি।

পুতনের প্রতি এক গভীর কৃতজ্ঞতা বোধ করছিল রাজেন।

–সে আবার কী?

–সত্যিই। আলোকঝারি।

তারপর বলল, আমি তোমার কাছে খুব-ই কৃতজ্ঞ যে, তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলে।

–আরে এখন-ই কী! কালকে কম্মো ফতে থোক। তারপরে না! কেস যেমন তৈরি করেছ, তাতে তো জোর খাটাতেও হবে না দেখছি।

রাজেন হাসল।

মুখে কিছু বলল না।

হাসিটা, চাঁদের আলোতেও অদ্ভুত ঠেকল পুতনের।

মনে মনে বলল, অনেক-ই দিন জোর খাটিয়েই পেয়েছি মেয়েদের। গায়ের জোর, টাকার জোর, বুদ্ধির জোর। এবারে পাব জোর না-খাটিয়েই। হেরে যাব এবারে। যেসব জেতাকে, আমি জেনে এসেছিলাম, তারা যে সব-ই সস্তা জয়ের রং-করা হার, আত্মাবমাননাই একরকমের, তা আমি আজ জেনেছি। সসম্মানে জিতব এবার।

–কী হল গুরু। কতা কও। হলটা কী তোমার?

–আর কথা? সত্যি পুতন। আমি নিজেই আলোকঝারি হয়ে গেছি তোমাদের দেশে এসে। সত্যিই!

-কেন? আলোকঝারি কেন?

–এত আলো, এত আনন্দ; আমার মধ্যে সত্যিই হাজারো ফোয়ারা খুলে গেছে। তা থেকে দিন-রাত শুধু আলোই ঝরে। খুশিও! এও কি এক আলোকঝারি নয়? আমার মন? এই আমিকে কি আমি জানতাম?

পুতন ভাবছিল, এক-ই মানুষের অনেকগুলো মানুষ থাকে বোধ হয়। বোধ হয় নয়; অবশ্যই থাকে।

রাজেনের মধ্যে থেকে এ কোন মক্কেল হঠাৎ বেরিয়ে এল মাল না খেয়েই, এমন হেঁয়ালি শুরু করল, কে জানে! কলকাতার মালেদের বোঝাই মুশকিল। কিরণশশীর ভাষাতে বলতে গেলে বলতে হয়, খিটক্যাল। কী খিটখ্যাল।

ভাবছিল পুতন।

দূরের আলোকঝারি পাহাড়টা চাঁদের আলোতে রুপোঝুরি হয়ে গেছিল। আর দু-দিন পরেই পূর্ণিমা। পাহাড় থেকে নানা রাত-পাখি আর নিশাচর জানোয়ারদের আওয়াজ ভেসে আসছে। ওদের চলে-যাওয়া দেখে এসে, শিলি বারান্দার খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, আলোকঝারির দিকেই চেয়েছিল। আজ বিনুনি বেঁধেছিল ও। এক বিনুনি। বাঁ-দিক দিয়ে ঘুরিয়ে, বুকের ওপর ছেড়ে দিয়েছিল কালো, চিকন সাপের মতন। শ্বেতকরবী গুঁজেছিল বাঁ কানের পেছনের চুলে।

ভাবছিল শিলি, সুগন্ধি ঘোরের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, স্বপ্নে সাঁতার দিয়ে, এক অচেনা স্বপ্নের দেশে ভেসে যাচ্ছিল ও।

আলোকঝারি থেকে উড়ে-আসা ময়নামারীর বিলের দিকে চলে যাওয়া, ঘাড়ে কেশর ঝোলানো সাদা হেরনরা কোয়াক কোয়াক কোয়াক করে ডাকতে ডাকতে উড়ে যেমন করে ভেসে যায়, তেমন-ই উড়ে যাচ্ছিল শিলি, নিঃশব্দে।

এইমুহূর্তে মাকে বড়োই মনে পড়ছিল ওর।

মা আজ পাশে থাকলে বড়োভালো হত। মা যে, ওর মধ্যেই ছিলেন আর রাজেনের মধ্যে সুধীরমামা।

একথা মনে করেই রোমাঞ্চিত হচ্ছিল ও।

রাজেনকে ও মরতে দেবে না।

উঁচুমহল

১. বম্বের নারিমান পয়েন্ট

উঁচুমহল – উপন্যাস – বুদ্ধদেব গুহ

বম্বের নারিমান পয়েন্ট-এ দূর থেকে যে, বাইশ-তলা হালকা-ছাইরঙা বহুতল বাড়িটি দেখা যায় তার একতলার এন্ট্রান্সে ঝকঝকে পেতলের প্লেটে লেখা আছে এম. বি ইন্টারন্যাশনাল ইনক; তার নীচে বাবোটা লিমিটেড কোম্পানির নাম।

এম. বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক আমেরিকাতে ইনকর্পোরেটেড নয়। আমেরিকার লিমিটেড কোম্পানিগুলির শেষে থাকে ইনক, যেমন সুইডিশ কোম্পানির আগে থাকে আকটিবোলাগেট অথবা সুইস কোম্পানির আগে থাকে সোসাইটে।

চা, কফি, টিভি, মিউজিকাল ইনসট্রুমেন্টস, ইলেকট্রিক ফারনেস, কটন ও পলিয়েস্টার ফেব্রিকস, ফার্মাসিউটিকালস গুডস তা ছাড়াও বহুজিনিস

নিয়ে ব্যাবসা করে এই অতিকায় কোম্পানিগোষ্ঠী। অথচ মূলমালিক ওই এম. বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক। সেটি একটি হোল্ডিং কোম্পানি। আসল মালিক মনীষ বসু। অবশ্য আরও দু-জন ডামি ডিরেক্টর আছেন। তাঁরা মনীষার-ই বেনামদার।

বম্বেতে শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-হেমন্ত ইত্যাদি কোনো ঋতুর বালাই নেই। বম্বের লোকেরা বলেন, মাত্র তিনটিই ঋতু এখানে। হট, হটার এবং হটেস্ট।

এখন হট। জুলাই মাস।

কাঁটায় কাঁটায় সকাল ঠিক সাড়ে নটায় একটি আকাশি-নীল রঙা বি. এম.ডাব্লু গাড়ি এসে মেইন গেট-এর সামনে দাঁড়াল।

মনীষা নিজেই চালাচ্ছিল। পেছনে ধবধবে টেরিলিনের উর্দি আর টুপি পরা ড্রাইভার। চারজন ডোরমেন দৌড়ে এসে দরজা খুলল। মনীষা নামল। হালকা ফেডেড-জিনস এবং ওপরে হালকা-হলুদ একটি সিল্কের জ্যাকেট পরে। বুক-পকেট থেকে কালোর মধ্যে সাদা ফুল-তোলা একটি কলম উঁকি দিচ্ছে। ম-ব্লা মাস্টারপিস।

মনীষার বাবার কাছ থেকে চেয়ে-নেওয়া এই কলমটি। বাবার মাত্র এই একটি সম্পত্তিই মনীষা চেয়ে নিয়েছিল, বাবা যখন বেঁচেছিলেন। দুই বোন দুই ভাই বাবার অন্যসব কিছুই পেয়েছে। মনীষা কিছুই নেয়নি। ও জানে যে, সব-ই নিয়েছে। বাবার গুণ বলতে যা কিছু ছিল সেইসবের

উত্তরাধিকারিণী। জাগতিক সম্পত্তি আর দোষ অন্যরা কাড়াকাড়ি করে নিয়েছে। অবশ্য ও শুধুই যে, গুণ পেয়েছে এমনও নয়। দোষ মনীষা যে, একেবারেই পায়নি তা বলা যায় না। মনীষা নিজেই শুধু জানে সেই দোষের কথা। সেই দোষ হচ্ছে জেদ। দোষও বটে গুণও বটে। কিন্তু সেজন্যে ও কিছুমাত্র বিব্রত বা লজ্জিত নয়। অমন দোষ এমন মেয়েকেই মানায়।

কার্পেট-মোড়া লবি পেরিয়ে এসে লিফট-এর সামনে দাঁড়াল মনীষা। এটি প্রাইভেট লিফট। সোজা উঠে গেছে। চেয়ারপার্সন-এর সেক্রেটারিয়েট পেরিয়ে তবে তাকে ঢুকতে হয় নিজের অফিসে। পার্সোনাল সেক্রেটারি, ইকনমিক সেক্রেটারি, ডেভালাপমেন্ট সেক্রেটারি, রিসার্চ সেক্রেটারি, পাবলিক রিলেশনস সেক্রেটারি এবং প্রাইভেট সেক্রেটারি। তাদের প্রত্যেকের-ই আছে আবার ছোট্ট একটি করে নিজস্ব দপ্তর।

হালকা গোলাপিরঙা কার্পেট এবং ফিকে নীল-রঙা অ্যাক্রিলিক পেইন্টে মোড়া দেওয়াল। মনীষার নিজস্ব সেক্রেটারিয়েটের টেলেক্স, ইলেকট্রনিক টাইপ-রাইটার, পার্সোনাল কম্পিউটার সব সার সার সাজানো। এফেক্টিভ এয়ার-কণ্ডিশানিং। অনভ্যস্তদের ঠাণ্ডা লাগে।

মনীষা প্রত্যেকের গুড মর্নিং-এর উত্তরে হাসিমুখে মর্নিং টু ইউ অল বলেই, নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল।

নিজের ঘরের চারদিকের দেওয়াল বিলিতি, ওয়ালপেপারে মোড়া। ঢুকলে, মনে হয়, কোনো গভীর জঙ্গলেই কেউ ঢুকে পড়ল বুঝি। একধারে ঘন সবুজ পাইনের বন। অন্যদিকে হেমন্তর বার্চ ও চেস্টনাট, হলদেটে-লালের বাহার ফল। গাঢ় সবুজ কার্পেট নীচে। শেডেড ল্যাম্প।

চেয়ারপার্সনের ঘরে মস্ত একটি টেবিল। কাচ-ঢাকা। টেবিলের ওপরে একটুকরো কাগজও নেই। মনীষার কোনো বিশেষ চেয়ার নেই। সেই গোল-টেবিলের যেদিকে যখন খুশি সে বসে। অন্য একটি চেয়ার অবশ্য আছে, জানলার পাশে। জন কেনেডির মতো। একটি রকিং-চেয়ার। যখন-ই কিছু ভাবতে হয় তখন সেই চেয়ারে বসেই দোলে মনীষা। না-দুললে ওর ভাবনা খোলে না। টেবিলের ওপরে মাস্টার ইন্টারকম। ছ-টি টেলিফোন ছ-রঙা।

মনীষার কোম্পানিগুলিতে মেয়েরাই সমস্ত উঁচু পোষ্টে আছে। ছেলেরা মুখ্যত কেরানি, মিনিয়ালস, বেয়ারা, ড্রাইভারস। যেসব মহিলারা উইমেনস লিব উইমেনস লিব করে চেঁচান তাদের মনীষা করুণা করে। উইমেন আর অলরেডি লিবারেটেড। উইমেনস লিব কথাটার মধ্যেই একটা হীনম্মন্যতার গন্ধ আছে। মনীষা সেই কারণেই এই কথাটা অথবা এই কথার প্রবক্তাদের ভালো চোখে দেখে না।

ইন্টারকম তুলে ও পার্সোনাল সেক্রেটারিকে বলল, স্যুসি, হোয়াট আর দ্যা স্পেশ্যাল প্রবলেমস অফ দ্যা ডে?

–ওনলি ওয়ান ম্যাম।

–কী?

–মিস্টার অতীশ সরকার।

–হুঁজ হি?

–আমাদের সবচেয়ে বড়ো কম্পিটিটর। ইলেকট্রনিক্স-এ। অন্যান্য ক্ষেত্রেও। কলকাতার কলিনসনস-এর, ব্যাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়া ল্যাম্প-এর এক্সপ্যানসন তো মি. সরকার-ই এম. আর. টি পি-তে লাগিয়ে স্টল করে দিয়েছেন। এখন লেগেছেন আমাদের পেছনে। আজকেই বারোটাতে আপনার সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

–আজকে? বারোটায়? মাই গুডনেস। আমাকে আগে জানাওনি কেন?

–আপনি তো প্যারিস থেকে গত সপ্তাহতে ফিরেই দিল্লি, ম্যাড্রাস এবং কলকাতায় চলে গেলেন। কাল আপনার ফ্লাইট ডিলেইড ছিল তো তিনঘণ্টা। তবুও আমি এয়ারপোর্টে দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করে তারপর বাড়ি ফিরে যাই। রাত এগারোটায়। ড্রাইভার মকবুল আপনাকে কি আজকের অ্যাপয়েন্টমেন্টের লিস্ট দেয়নি?

-ওঃ আই সি। না সুসি। মকবুল দিয়েছিল বটে। বাট আই ওজ ভেরি

ভেরি টায়ার্ড! দেখার সুযোগ পাইনি। বাট ইন এনি কেস আই কান্ট মিট দ্যাট মি. সরকার টুডে। ইউ হ্যাভ টু ক্যানসেল দ্যাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট?

-কী বলব ওঁকে?

–দ্যাটস ইয়োর বিজনেস স্যুসি। ডোন্ট আস্ক মি সিলি কোয়েশ্চেনস।

–হি ইজ আ বিগ শট।

–আই কেয়ার আ স্ট্র। এম. বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক ইজ নো স্মল অর্গানাইজেশন ইদার।

সুসির সঙ্গে কথা শেষ করেই প্রাইভেট সেক্রেটারি কুমুদিনীকে ডাকল মনীষা।

মর্নিং ম্যাম।

মর্নিং! কুমুদিনী। আমার ঘরে এক্ষুনি এসো একবার।

কুমুদিনী সারাভাই-এর কেরিয়ারের ব্যাপারটা খুব-ই গোলমেলে। স্কটল্যাণ্ড-ইয়ার্ড-এ সে কিছুদিন চাকরি করেছিল। তারপর একটি প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি চালাত নিজেই বম্বেতে। এদিকে ইংরেজিতে কবিতা লেখে। ভালো সেতার বাজায়। ইকেবানাতে ওসাকার স্কুলের ডিপ্লোমা হোল্ডার। দেখতেও অতিসুন্দরী। বিয়ে করেছে একজন ম্যানেজমেন্ট

অ্যাকাউন্টেন্টকে। হি ইজ ভেরি হাই আপ ইন দ্যা টাটাজ। একটিই মেয়ে ওদের। তিন বছর বয়স।

–ইয়েস ম্যাম। হোয়াটস দ্যা অ্যাসাইনমেন্ট?

ঘরে ঢুকে কুমুদিনী জিজ্ঞেস করল!

মনীষা ম-ব্লাঁ কলমটি দিয়ে ঠোঁটে আলতো করে আঘাত করতে করতে বলল, ওয়েল। এতদিনে তোমাকে একটি ইন্টারেস্টিং কাজের ভার দিতে পেরে আমি খুব খুশি। তুমি সুসির সঙ্গে দেখা করো। মিস্টার অতীশ সরকার অফ সরকার অ্যামুলগ্যামেটস। আই অ্যাম টোল্ড দ্যাট হি ইজ বিগ গাই। আই ওয়ান্ট টু ফাইণ্ড আউট হাউ বিগ হি রিয়্যালি ইজ। তার সম্বন্ধে আমি সমস্ত ইনফরমেশান চাই। যতটুকু আমি জানি, তা হচ্ছে যে, সে ব্যাচেলর। কিন্তু প্লে-বয় নয়। ইউ নো, ওয়ান অফ দ্যাট টাইপ হু আর ম্যারেড টু মানি। আ রিয়্যাল ব্লকহেড অফ দ্যাট সর্ট।

–কী কী ইনফরমেশান চাই আপনার ম্যাম?

-সব। তার গ্রুপের সব কোম্পানির ব্যালান্সশিট। এ বছরের বাজেটেড ফিগারও। দিল্লি, বম্বে এবং কলকাতার স্টক এক্সচেঞ্জে তার কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দামের ওঠা-নামার গ্রাফস। যদি সম্ভব হয়। তার কোথায় কোথায় ইন্টারেস্ট আছে?–ভারতবর্ষে এবং বাইরেও মাইনর হোল্ডিং থাকলেও আমার জানা চাই। কোনো ফ্লি-পোর্টে কোম্পানি ফ্লোট

করছে কি না! বছরে সুইটজারল্যাণ্ডে কতবার যায়? এটসেট্রা। ইউ নো হোয়াট আই মিন! এবং অফ অল থিংগস, মানুষটার দুর্বলতা কী কী! রেস খেলে? মেয়েঘটিত দোষ আছে? মদ খায়? গান শুনতে ভালোবাসে? বই পড়ে? মাছ ধরে?

–দুর্বলতা আমি যতদূর জানি, নেই। আমার স্বামী ওঁকে নানা পার্টিতে মিট করেছেন। ওঁর কাছেই শুনেছি। মি. সরকার ইজ আ মেল শভিনিস্ট পিগ।

--তাই-ই? মাই ফুট!

বলেই তাড়াতাড়ি বলল, সরি। আই ডিডনট ওয়ান্ট টু হার্ট ইয়োর হাজব্যাণ্ড। আই ডোন্ট বিলিভ ইট। পুরুষ মানুষ মাত্রই দুর্বল। ফাইণ্ড আউট দ্যা এরিয়াজ অফ হিজ উইকনেসেস। গেট গোল্ড অফ দি অ্যাকিলিসেস হিল কুমুদিনী।

মনীষা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল।

একটু চুপ করে থেকে বলল, ওয়েল! যদি এই অতীশ সরকার অন্যরকমও হয় দ্যাটস ওলসো ফাইন। দ্যাট স্যুটস মি ফাইন। শুয়োর-পোড়া গন্ধ আমার দারুণ লাগে। বারবিকিউ! হাঃ! আ মেল শভিনিস্ট পিগ।

একটু ভেবে মনীষা বলল, তোমার স্বামীকে বলো যে, কালকেই দ্যাট

মিনস ফ্রাইডে ইভনিং তাজমহল হোটেলে মি. সরকারকে ইনভাইট করতে। ফর চাইনিজ ফুড। হার্বার বারে ইউ ওল হ্যাভ ইয়োর ককটেইলস। তারপর যখন গোল্ডেন ড্রাগন-এ খেতে ঢুকবে তখন আই উইল জাস্ট ওয়াক ইন ক্যাজুয়ালি। এলোন। তখন-ই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে তোমরা। আমি তোমাদের টেবিলে জয়েন করব। তারপর লিভ দ্য রেস্ট টু মি। ইতিমধ্যে অন্য ইনফরমেশানগুলোও জোগাড় করার চেষ্টা করো। গেট ইন টাচ উইথ হিজ ট্রাস্টেড মেন। টাকার বাণ্ডিল ছুঁড়ে দাও। এভরিবডি হ্যাঁজ আ প্রাইস কুমুদিনী। ইণ্ডিয়াও ছটো ছোটো আফ্রিকান বা ইস্ট-এশিয়ান দেশগুলোর-ইমতো হয়ে গেছে। ইউ ক্যান হ্যাভ এনিবডিজ লয়্যালটি। ইটস জাস্ট আ ম্যাটার অফ প্রাইস। গভীর লজ্জার, এটা দেশের পক্ষে। কিন্তু গভীর আনন্দের আমাদের পক্ষে। নইলে এমন ব্যাবসা করা যেত না। যাই-ই হোক কী করবে না করবে তা তোমার-ই ব্যাপার। কিন্তু করতে হবে। আই ওয়ান্ট দিজ ইনফরমেশান বাউট হিম; ভেরি ভেরি ব্যাডলি।

–ওক্কে ম্যাম।

–বেস্ট অফ লাক কুমুদিনী। সময় নেই সময় নষ্ট করবার।

কুমুদিনী চলে গেলে, মনীষা তার ফিনানসিয়াল সেক্রেটারির লাইন তুলল।

–নমিতা ভাট।

–গুড মর্নিং ম্যাম।–এনি প্রবলেম নমিতা?

–না। আজকে কোম্পানি ফিফথ-এর নতুন অ্যাকাউন্টেন্টের ইন্টারভিউ আছে। ফিনানসিয়াল অ্যাডভাইজার এবং চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট চান যে, আপনি থাকুন সেই সময়ে। ইটস আ কিই-পোস্ট।

--হোয়াট? সেরগিল ওয়ান্টস মি টু বি প্রেজেন্ট? হাউ ডেয়ারস শি টেল হার টু টক টু মি বাউট ন্যাউ। আই উইল স্যাক হার।

কটাং করে ফোন নামিয়ে রাখল বিরক্ত মনীষা।

লাল আলোটা দু-বার ব্লিপ-ব্লিপ করে নিভে গেল ইন্টারকম-এর।

প্রীতম সিরগিল দিল্লির মেয়ে। ওর বাবা দিল্লিতে ইনকামট্যাক্সের কমিশনার ছিলেন। প্রীতম নিজে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট। কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, চার্টার্ড সেক্রেটারি এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট। কম্পিউটারের ট্রেনিং আছে ওর। সেরগিল-ই পুরো গ্রুপের নাম্বার ওয়ান ওর ডিভিশনে। অ্যাকাউন্টস, ট্যাক্সেশান, ব্যাঙ্ক ম্যানেজমেন্ট সব-ই ওর ওপরে।

ইন্টারকম পি-পি করল! প্রীতম লাইনে এসেছে। বলল, গুড মর্নিং ম্যাম।

–মর্নিং প্রীতম। ডু ইউ ওয়ান্ট আ স্যাক? তুমি কি চাও যে, তোমার

চাকরিটা চলে যাক? প্রীতম তুতলে উঠল। বলল, নো ম্যাম। বাট হোয়াই?

-তুমি কোন সাহসে বলো যে, ফিফথ-কোম্পানির নতুন অ্যাকাউন্টেন্টের ইন্টারভিউ আমি নিজে নেব? তোমাদের মতো যোগ্যজনের ওপর তো ইন্টারভিউ নেওয়ার ভার দেওয়াই আছে। ফাইনাল সিলেকশানটাও তোমরা বলতে পারবে না?

–পারব, কিন্তু...

–কোনো কিন্তু নেই এরমধ্যে। এম বি ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপার্সনের আরও অনেক ইম্পর্টান্ট কাজ আছে। আমিই যদি ইন্টারভিউ নেব তবে তোমাদের রাখবার দরকার কী আমার? তুমি একমিনিট আমার ঘরে এসো।

প্রীতম দু-মিনিটের মধ্যে এল ঘরে।

মনীষা বলল, ইন্টারভিউ বোর্ডে আমি থাকব না। কিন্তু ফাইনাল সিলেকশানে তিনজনকে সিলেক্ট করে নিয়ে সেপারেটলি জিজ্ঞেস করবে যে, ফিফথ-কোম্পানি থেকে আমার মাসে দশ লাখ টাকা দু-নম্বর চাই। কী করে বের করবে না করবে দ্যাট ইজ হার হেডেক। তাকে যা আমরা মাইনে এবং পার্কস দেব প্লাস ক্যাশ প্যাকেট তাতে আমরা ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে চাইলেও সে থাকবে এখানে। এদেশের মানুষের গায়ের চামড়া গন্ডারের মতো হয়ে গেছে। চল্লিশ বছরে যথেষ্টই পুরু হয়ে

গেছে তা। যারা চরকা কাটত, খদ্দর পরত, প্লেইন লিভিং ও হাই থিংকিং-এ বিশ্বাস করত সেইসব আত্মত্যাগী আদর্শবানদের বংশধরেরা সব গন্ডার হয়ে গেছে। শুনে নাও কান খুলে। ইটস আ ডিল। প্রত্যেক মাসের তিন তারিখের মধ্যে দশলাখ টাকা, এক-শো টাকার নোটে আমি আমার টেবলে চাই। গ্লাডিঅলা ফুল-ভরা বাস্কেটের নীচে টাকাটা পাঠাবে। কেউ যেন বুঝতে না পারে। আমি জানব, তুমি জানবে আর ফিফথ কোম্পানির সেই নতুন অ্যাকাউন্টেন্ট জানবে। পুরুষদের ইন্টারভিউ নিতে পারো কিন্তু ফাইনাল সিলেকশন করতে হবে তিনজন মেয়ের মধ্যে থেকেই। যাও।

প্রীতম চলে যাচ্ছিল। ওকে ডেকে বলল ইউ নো, এই টাকাও ব্যাবসায়েই দরকার। আমি বাড়ি নিয়ে যাব না। অন মানি। বিভিন্ন পার্টির ফাণ্ডে ডোনেশন দিতে হয়। দিল্লিতে কোনো লাইসেন্স বা পারমিট পেতে গেলেও খরচ করতে হয়। আমরা, বিজনেস পার্সনরা কোনো রিস্ক নিতে পারি না। প্রত্যেক ঘোড়াকেই ব্যাক করতে হয়। তো সে পার্টির নেতা যতবড়ো রাসকেল-ই হোক-না-কেন! মোস্ট স্টুপিড জনগণ, ইমোশানের বশে কখন যে, কাকে ভোট দেবে কে জানে? যাও। উই হ্যাভ নো চয়েস। উই হ্যাভ টু রাইড উইথ দ্যা টাইড।

প্রীতম-এর মতো কোয়ালিফায়েড, ভালো ফ্যামিলির মেয়েকে মনীষা যে, এমন করে বলে তাতে মাঝে মাঝে প্রীতম-এর মনে হয় যে, চাকরি ছেড়ে দেয়। এসব দু-নম্বরি তিন নম্বরি মামলাতে ওর থাকতেও ইচ্ছে করে না।

কিন্তু যে টাকা ও পার্কস এবং যে ক্যাশ-প্যাকেট মনীষার কাছ থেকে ও নিজেও পায় তা দেওয়ার ক্ষমতা বা উপায় টাটা বা ডি. সি এম. বা ধিরুভাই আম্বানীরও নেই বোধ হয়। এই ইনফ্লেশানের বাজারে, যারজন্যে এই রাজনৈতিক নেতাদের লোভ-ই দায়ী। প্রীতম-এর চোখের সামনেই সমস্ত দেশটাই অসৎ হয়ে গেল। যার ই কোনো উপায় আছে, তার পক্ষেই সৎ থাকা আর সম্ভব হচ্ছে না। কোনো মানুষ-ই চায় না যে, সে খারাপ হয়ে যাক। কিন্তু এই ইনফ্লেশান এবং এই আশ্চর্য রাজনীতিই প্রত্যেক সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, পেশাদার মানুষদেরও জোর করে ঠেলে দিয়েছে এই ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে। দিল্লিতে গ্রীষ্মকালে যে, ধুলোর ঝড় ওঠে, সেইরকম চোখ-জ্বালা করা আঁধির মধ্যে।

প্রীতম-এর যদিও নিজের সংসার নেই। এখনও বিয়েই করেনি ও। দিল্লির মহারানিবাগে একটি বাড়ি আছে। বাবার-ই বানিয়ে যাওয়া। এখন মা একাই থাকেন। সেই বাড়ির একতলা ভাড়া দিলেও কম আয় হয় না। ভারতের রাজধানী দিল্লির ব্যাপার-স্যাপার-ই আলাদা। এই গরিবগুরববাদের দেশের কোনো ব্যাপারের সঙ্গেই এর সাযুজ্য নেই। কিন্তু টাকা বড়োই খারাপ জিনিস। একবার এতে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সব-ই গেল। মদ ছাড়া যায়, সিগারেট ছাড়া যায়, টাকার আর ক্ষমতার লোভ কিছুতেই ছাড়া যায় না।

এয়ার-কণ্ডিশানড ফ্ল্যাট, এয়ার-কণ্ডিশানড গাড়ি, বছরে একটা করে

হলিডে, এনিহোয়্যার ইন দ্যা ওয়ার্ল্ড। প্রীতম-এর নিজের কথা ছেড়ে দিলেও তার মা পড়ে গেছেন পুরোপুরি এই ফাঁদে। খরচ বাড়ানো সোজা, কমানো বড়ো কঠিন। মায়ের মুক্তির সম্ভাবনা নেই। হয়তো ওর নিজেরও নেই। প্রীতম-এর বাবা সাধু-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না তা প্রীতম জানে। সাধু হলে ওই চাকরি করে মহারানিবাগে লনঅলা বাড়ি করা যেত না।

ভাবছিল প্রীতম, মা আসলে বাবা থাকতেই নষ্ট হয়ে যান। অবশ্য প্রীতম যে, জীবনে ওয়েল-সেটলড হয়েছে তাও তার বাবার-ই জন্যে। বাবাকে ক্রিটিসাইজ করে না তাই। অথবা অন্যভাবে বললে বলতে হয়; মা-ই হয়তো বাবাকে নষ্ট করে দেন। আসলে, মেয়েরাই বেশিরভাগ পুরুষকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তোলে, সে স্ত্রী-ই হন কী প্রেমিকা বা রক্ষিতা। তাঁদের স্বামীদের আয় আর তাঁদের চাহিদার মধ্যে কোনোই সাযুজ্য থাকে না প্রায়-ই। ঘটনা যাই-ই ঘটুক এখন মনীষা যদি প্রীতমকে লাথিও মারে মনীষার পায়ের ইটালিতে তৈরি গুচ্চির অ্যাঙ্কল বুট দিয়ে, তাহলেও চাকরি ছাড়ার উপায় তার আর নেই। এ জীবনের মতো ফেঁসে গেছে প্রীতম। বড়ো বড়ো বিজনেস টাইকুইন্সরা এমনি করেই টাকা দিয়ে বেঁধে রাখেন তাদের চারধারের মানুষদের। এ বাঁধন দেখা যায় না। কিন্তু অক্টোপাসের বাঁধনের মতোই তা। কিছুদিনের মধ্যেই বিবেক বাঁধা পড়ে।

প্রীতম চলে গেলে রকিং চেয়ারটাতে এসে বসল মনীষা। মনীষা ভালো করেই জানে যে, সে তার অফিসারদের যেমন করে রেখেছে তাতে, স্ত্রী-

পুরুষ নির্বিশেষে তাদের উলঙ্গ হয়ে তার ঘরের কার্পেটে হামাগুড়ি দিতে বললেও তারা তাই-ই দেবে। স্বাধীনতাউত্তর এই ভারতবর্ষে এখন শক্তির আর ক্ষমতার মূলউৎস হচ্ছে দুটি। এক, টাকা। দুই, রাজনৈতিক ক্ষমতা। মেধা এখন আর কোনো শক্তিই নয় এদেশে। ইন্টেলেকচুয়াল পাওয়ারের কোনো দাম নেই আর। ফাঁকা আওয়াজ হয়ে গেছে। কৃষ্টি, সংস্কৃতিরও কোনোই দাম নেই। বড়োলোকেরা কদর করলে তবেই সেসবের দাম। সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা সবকিছুই নির্ভরশীল, এঁদের দয়ায়, যাঁদের মধ্যে বেশিরভাগই এসবের প্রকৃত মূল্যায়ন করার বিন্দুমাত্র যোগ্যতাও রাখেন না।

কিন্তু মনীষা রাখে।

মনীষা জানে যে, তার প্রতিযোগীরা সকলেই মনীষা নয়। এইজন্যে মাঝে মাঝে সে বড়ো বিমর্ষ বোধ করে। সব ব্যাবসাতেই প্রতিযোগীদের স্তরে নিজেকে নামিয়ে আনতে হয় টিকে থাকতে গেলে। এই নামিয়ে আনার কারণে ক্লান্তিবোধও করে। গভীর ক্লান্তি।

টাকা আর রাজনৈতিক ভ্রুকুটি দিয়ে দেশের প্রায় সমস্ত মেধাবী ও গুণী মানুষদের ইঁদুর বানিয়ে রেখেছে মনীষা এবং তার প্রতিযোগীরা। তাই-ই যেসব মেধাবী মানুষ এখনও মেরুদন্ড টান করে দাঁড়াবার ক্ষমতা রাখতেন তাঁরা দেশ ছেড়ে চলে গেছেন। যাঁরা যেতে পারেননি তাঁরা হয় ছোটোখাটো সংস্থাতে অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানে আছেন। আর পেনশন

চালু রাখার জন্যে কোনোরকমে চাকরি বজায় রাখার প্রাণান্তকর চেষ্টায় কোনোক্রমে দিনাতিপাত করছেন। মেরুদন্ড তাঁদেরও নেই। কলমের জোর নেই, সাহস তাঁরা দেখাতে পারেন না। কোনোরকমে ফাইল সামলে চাকরিজীবন শেষ করে সসম্মানে রিটায়ার করার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকেন। সেখানেও তাঁদের মেধায় মরচে পড়তে সময় লাগে না বেশি। ধার ভোঁতা হয়ে যায়। অবশ্য ব্যতিক্রম আছে বলেই দেশ এখনও থেমে যায়নি।

মনীষা এই ব্যবস্থাতে আদৌ খুশি নয়। কিন্তু ও নিরুপায়। তার জন্মের আগে থেকেই দেশ। যেভাবে চলেছে তাতে ওর নিজের কোনোই চয়েস ছিল না। স্বাধীনতার বয়স হল প্রায় চল্লিশ। তার বয়স তিরিশ। বাবার ছোট্ট একটি কোম্পানিতে সে এসে যোগ দিয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এপাশ করে। ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। কলকাতার মডার্ন হাই স্কুলে পড়েছিল। আরও বেশি পড়াশুনা সে করেনি কারণ অল্পবয়সেই ও শিখেছিল হাঁসের বাচ্চা যেমন ডিম থেকে বেরিয়েই সাঁতার কাটে, ব্যবসায়ীর ছেলে-মেয়েকেও তেমনি স্কুল-কলেজের বেড়া ডিঙোনো মাত্রই ব্যাবসায়ে ঢুকে পড়তে হয়। ব্যাবসাতে হাতেকলমে যা শেখার, বিবেক ঘষে ফেলার নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত হওয়ায়, প্রতিযোগীকে জয় করার অদম্য উদ্যম, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা, প্রতিযোগীর লোক ভাগিয়ে আনা, তার কারখানার ইউনিয়ন লিডারকে পয়সা দিয়ে তার কারখানা স্ট্রাইক করিয়ে দেওয়া, এসব-ই হাতেকলমে শিখতে হয়। বই পড়ে এসব শেখা যায় না। বইয়ে খুব কম কথাই লেখা থাকে। ভালো ব্যাবসাদার হতে

পারলে অনেক পন্ডিত ও বিদ্বানদের-ই নিজের চাকর করে রাখা যায়।

এদেশীয় বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে জুতোও পালিশ করানো যায় কারণ মেরুদন্ডে একেবারেই ঘুণ ধরে গেছে এই জাতের। জুতো-পালিশ করানো যায় এইজন্যেই যে, এক জাহাজ মেধা ও বিদ্যা, সংস্কৃতি আর আত্মাভিমান জড়ো করেও একমুঠো সাহসের সমান হয় না নিক্তি। সবাই বিকিয়ে দিয়েছে নিজেদেরএকটু ভালো থাকা, ভালো খাওয়া, একটা ফ্ল্যাট, একটা গাড়ির জন্যে ।

ব্যাবসা করতে গেলে সাহস লাগে, আর অন্য সবকিছুর চেয়েও বেশি। আর লাগে, সেন্স অফ টাইমিং, একধরনের ষষ্ঠবোধ, যা একজন ব্যবসায়ীকে অন্যদের তুলনায় অনেক আগেই তার গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। তার কর্মচারীরা বিদ্যায়-বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক-ই বড়ো কিন্তু তার দুঃসাহস আছে। একটার-পর-একটা ঝুঁকি নিয়ে, এদের প্রত্যেককে মাসের এক তারিখে তাদের প্রাপ্য নিশ্চিতভাবে হাতে তুলে দেওয়ার পরও অর্গানাইজেশনকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সকলে পারে না। এই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা, এই দুঃসাহসের-ই আর এক নাম এন্টারপ্রেনারশিপ।

মনীষা, তার দেশের অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের চেয়েও বেশি ক্লিষ্ট থাকে দেশের মানুষের এই চারিত্রিক অবক্ষয়ের কথা ভেবে। অনেক ফ্লাইওভার, ব্রিজ, রাস্তা, পাতাল রেল, হোটেল, স্টেডিয়াম হল দেশে, কিন্তু মানুষেরা সব লিলিপুটিয়ান হয়ে গেছে। মানুষরা অমানুষ হয়ে গেছে। চেহারায় লম্বা-

চওড়া হলে কী হয়? এরা সব মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গধারী জীব।

পার্সোনাল ফোনটা বাজল। ডাইরেক্ট লাইন।

মনীষা উঠে গিয়ে ধরল বিরক্তির সঙ্গে–

–হাই।

ওপাশ থেকে দীপ বলল।

–কী খবর?

নিরুত্তাপ গলায় বলল মনীষা।

-কাল কী করছ রাতে?

–ভাবছি। এখনও ঠিক করিনি। সি-রক-এর রিভলভিং রেস্তরাঁতে চাইনিজ খেতে যাব ভাবছি।

ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল।

-একা?

–আমি তো একাই। আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যালোন।

–একা থাকতে চাও, তাই-ই একা!

কথা ঘুরিয়ে মনীষা বলল, সুমিত্রার কী খবর?

–ভালো।

কথা এড়িয়ে গেল দীপ।

মনীষা ভাবছিল, আশ্চর্য দাম্পত্য-সম্পর্ক ওদের। দীপ আর সুমিত্রার। এই মুহূর্তে হয়তো সুমিত্রাও তার কাফফ-প্যারেডের অফিসের ঘর থেকে সুরেশ নেভাটিয়া অথবা বি সুব্রামণিয়মকে ফোন করছে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা নামেই আছে। একসঙ্গে কোনো পার্টিতে গেলে হানি-হানি করে দু-জনে দু-জনকে। অথচ পুরো ব্যাপারটা জোলো।

দীপ ছেলেটা আসলে একটা ইডিয়ট। ওর ধারণা ও খুব হ্যাঁণ্ডসাম। হয়তো ও হ্যাঁণ্ডসামও কারও কারও চোখে। কিন্তু মনীষার মনে হয়, টাইয়ের বা টেরিকটের কাপড়ের অথবা সুইমিং কস্টিউমের বিজ্ঞাপনের মডেল হিসেবে ওকে মানালেও মানাতে পারে। ও কী করে মনীষার কাছে আসার স্বপ্ন দেখে, মনীষা ভেবেই পায় না। সেইজন্যেই মনে হয় ছেলেটা ইডিয়ট। মনীষা বোস অনেক হয় না; একজন-ই হয়েছে। যে-পুরুষের কাছে সে হারতে রাজি না থাকে, যার মধ্যে নিজের চেয়েও ভালো বা বেশিকিছু না দেখতে পায়, সে-পুরুষ মনীষার জন্যে নয়। এবং সেকারণেই লক্ষ পুরুষের লোভী চোখ তার ওপর থাকা সত্ত্বেও সে আজ অবধি

একজনেরও কাছাকাছি আসেনি মনের। এমনকী শরীরেরও। শরীর তো মনের থেকে অনেক-ই কম দামি, তবুও শারীরিকভাবেও আসেনি দেশে বিদেশে কারও সঙ্গেই।

তার ফার্স্ট-কাজিন পবিত্রর বন্ধু জয় একদিন কলকাতার বাড়ির ছাদে চকিতে চুমু খেয়েছিল তাকে। তখন ও বি. এ. পড়ে। সেন্ট জেভিয়ার্স-এ পড়ত জয়। যে কর্মটি জয় করেছিল তাকে চুমুও বলে না। আচমকা চিনেপটকা ফাটার-ই মতো অতর্কিত, মোস্ট আন রোমান্টিক ঘটনা একটা।

কলকাতায় গতবছর একটি চাকরির জন্যে দেখা করেছিল জয় মনীষার সঙ্গে। পুরুষগুলো সত্যিই আত্মসম্মানজ্ঞানহীন। জয় বিয়েও করেছে। স্ত্রী দক্ষিণ কলকাতার একটি সম্ভ্রান্ত স্কুলে পড়ায়। এক ছেলে এক মেয়ে। ফর ওল্ড টাইমস সেক বহুবছর আগে কোনো একদিন চিনেপটকার মতো হঠাৎ একটি চুমু খেয়েছিল যে, সেই দাবিতেই বোধ হয় চাকরি চাইতে এসেছিল। মনীষার একটি কোম্পানির কলকাতার ব্রাঞ্চে হাজার তিনেক টাকা মাইনের একটা চাকরি তৎক্ষণাৎ দিয়েও দিয়েছিল সেলস ডিপার্টমেন্টে। প্রকৃত সেল্ফ-রেসপেক্ট নেই এদিকে ফালতু সেন্স অফ রেসপেক্ট আছে। বলেছিল, অনুনয় করে, মাইনেটা যেন স্ত্রীর চেয়ে বেশি হয়, একটাকা হলেও বেশি হয়। এই কথা বলে, স্ত্রীর লাস্ট-ড্রন স্যালারির সার্টিফিকেটও দেখিয়েছিল।

হাসি পেয়েছিল মনীষার। ভবিষ্যতে মনে হয় বাঙালি মেয়েরাই স্বামীদের খাইয়ে-পরিয়ে রাখবে। বি. এস. সিটা অবশ্য পাশ করেছিল জয়। তাও কম্পার্টমেন্টালে। চেহারাটা অনেকটা সৌমিত্র চ্যাটার্জীর মতোই। বাঙালি মেয়েরা ওরকম চেহারা বোধ হয় খুব-ই পছন্দ করে। একসময় যেমন উত্তমকুমার ক্রেইজ ছিল।

একটি জবরদস্তি চুমুর, তাও অন্যপক্ষের জবরদস্তিতে খাওয়া; দাম একটু বেশিই পড়ে গেল। ওয়েল। হোক গিয়ে। ফর ওল্ড টাইমস সেক।

বাঙালি ছেলেরা কেন যে, এত মিনমিনে হয়ে গেল। চোর ডাকাত, ঠগ, জোচ্চোর পর্যন্তও একটা ভালো বেরোয় না ওদের মধ্যে থেকে। ভেরি স্যাড। ভেবেছিল মনীষা। আগে বাঙালিরা ভালো কেরানি হত, চাকুরে, মেধাবী অধ্যাপক, ফরেন সার্ভিস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস, রেভিনিউ সার্ভিসের অফিসার! আজকাল তাও হয় না। কোথায় যে, তলিয়ে যাচ্ছে জাতটা! ভাবলেও কষ্ট লাগে। অথচ সেই জাতের নিজেদের এই অধঃপতন নিয়ে কোনো মাথাব্যথাই নেই। এখনও সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স, হামবড়াই, আম্মা কিছু কম নই। ভাবলে হাসি পায়।

ওপাশ থেকে দীপ কী যেন বলছিল। ন্যাগিং চ্যাপ। আ পেইন ইন দ্যা নেক। বাঁ-হাত দিয়ে টেলিফোনের বোতামটা টিপে নিজেই রিসিভার নামিয়ে রাখল।

সুমিত্রা মনীষার সঙ্গে মডার্ন হাই স্কুলে পড়ত। বম্বেতেই সেটল করেছিলেন ওর বাবা। সুমিত্রার স্বামী হিসেবেই দীপের সঙ্গে প্রথম আলাপ। এইজন্যেই সুমিত্রাকে মনীষা ওর ডাইরেক্ট আনলিস্টেড টেলিফোন নাম্বারটা দিয়েছিল। দীপকে যে, কেন বিয়ে করল ও ভেবে পায়নি মনীষা। ওকে কী করে একেবারে ফেলে দেবে তাও বুঝতে পারে না মনীষা। সুমিত্রা সত্যিই ওর বান্ধবী। অনেক-ইমিল আছে দু-জনের। তবে ইদানীং চারিত্রিক দিক দিয়ে একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। হয়তো স্বামীর কাছ থেকে যা পায় না তা অন্যের কাছ থেকে নিয়ে পুষিয়ে নিতে চায় নিজের শূন্যতা।

দীপের বাবার অনেক সম্পত্তি ছিল কলকাতায়। এলাহাবাদে এবং দিল্লিতেও। বেচারাম বাবু! একটা করে সম্পত্তি বেচে আর মৌজ করে দীপু দু-নম্বরের টাকায়। চাকরি যেটা করে, সেটা লোকদেখানো। হাজার খানেকও মাইনে পায় কি না সন্দেহ। ছেলেটার কোনো সেন্স অফ প্রোপোরশন নেই। নইলে, মনীষার দিকে হাত বাড়ায়? সিলি! সেন্স অফ প্রোপোরশন অবশ্য খুব কম পুরুষের মধ্যেই দেখেছে ও। পুরুষদের অপমান করে, ছোটো করে, চাকরি খেয়ে, ব্যাবসা ডুবিয়ে খুব-ই আনন্দ পায় মনীষা। অনেক বছরের অত্যাচারের শোধ তোলে ও একা হাতে। যতটুকু পারে। মনীষাও হেরে যেতে পারে, যার কাছে তেমন পুরুষের দেখা মেলেনি আজ অবধি। হয়তো বাকি জীবনেও মিলবে না। ওর ব্যাবসাকেই ওর স্বামী করে নিতে হবে।

ইন্টারকম তুলে নিয়ে আবার ডাকল অ্যাসিকে।

–ইয়েস, ম্যাম।

–মি, সরকারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল করে দিয়েছ?

–নো ম্যাম। তাকে পাচ্ছিই না।

–পাচ্ছি না মানে কী? কনটাক্ট হিজ সেক্রেটারি অ্যাণ্ড লিভ দ্যা মেসেজ।

–তাও কী আর করিনি! সঙ্গে সঙ্গেই করেছি। কিন্তু...

–কিন্তু কী? এতে আবার কিন্তু কীসের?

–সেক্রেটারি বলছে যে, তিনি গল্ফ খেলতে গেছেন।

–হোয়াট? মি. সরকার মাস্ট বি অ্যান এক্সট্রা-অর্ডিনারি গুড ম্যানেজার। ইটস অ্যাডমিরিবেল দো। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কি ওঁর সেক্রেটারি ক্যানসেল করে দিয়েছে? তা নইলে কীরকম দায়িত্ববান মানুষ তিনি? এদিকে বলছ বিগ শট!

–নো; ম্যাম নট অ্যাট অল। সে বলল, আমার বস অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা জানেন। আই অ্যাম শিয়ের দ্যাট হি উইল বি দেয়ার ইন টাইম। ইফ হি কান্ট গো, হিজ ডেড-বডি উইল গো। আই কান্ট রিচ হিম ন্যাউ। ইটস টু

লেট! সরি।

-হোয়াট?

মনীষা বলল। হিজ ডেডবডি উইল কাম?

-ইয়েস ম্যাম। মি. সরকারের সেক্রেটারি তো তাই-ই বললেন। মি. সরকার নাকি তাই ই বলেন সকলকে। এপর্যন্ত জ্যান্ত অবস্থাতেই যদিও গেছেন সব জায়গায়।

বলেই, হাসল একটু।

মনীষা বিরক্ত গলায় বলল, এটা কি হাসির ব্যাপার হল? তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? ওঁর সেক্রেটারি গল্ফ ক্লাবেও ফোন করে ক্যানসেল করতে পারলেন না? তাঁকে ধরার দায়িত্ব কি আমার?

–চেষ্টা করেছিলেন তাও। গক্লাবের অফিস থেকে নাকি বলেছে, হি মাস্ট বি ইন অর অ্যারাউণ্ড দ্যা নাইনথ-হোল ন্যাড। হি রিফিউজেজ টু কাম টু রিসিভ হিজ কল। ইন ফ্যাক্ট হি হেইটস টু বি ডিস্টার্বড ইন হিজ গেম। দ্যাটস হিজ স্ট্যাণ্ডিং ইনস্ট্রাকশন।

–সিলি ওল্ড ফুল। বুড়োবয়সে এই রোদে গল্ফ খেলে মারা যাবে। পাগল নাকি? বয়স কত মি. সরকারের? এনি আইডিয়া অ্যাসি? ওভার সেভেন্টি?

–জানি না তা ম্যাম। তবে কম করে ষাট-টাট তো হবেই। এতবড়ো ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার গড়ে তুলেছেন যখন।

মনীষা হাসল।

বলল তোমার থিয়োরি ঠিক হলে তো আমার বয়স পঁচাত্তর হওয়া উচিত ছিল।

সুসি বলল, ইউ আর অ্যান এক্সেপশান ম্যাম। দেয়ারস ওনলি ওয়ান মনীষা বোস ইন ইণ্ডিয়া।

-স্টপ ইট স্যুসি। আই নো হোয়াট আই অ্যাম।

ফোনটা নামিয়ে রেখে মনীষা ভাবছিল, মোসাহেবি, ফ্ল্যাটারি জিনিসটা এমন-ই যে, যে কেউই করুক; তা পছন্দ হয় না। আবার কেউ তেমন করে করলে খুব ভালোও লাগে। যদি কেউ তেমন করে করতে জানে। যেকোনো জিনিস-ই একটা আর্ট। আর্টের লেভেলে জীবনকে তুলতে পারে ক-জন? এইরকম কাঁচা গ্যাস, তাও নিজের কর্মচারীদের কাছ থেকে; খেতে ভালো লাগে না।

মনীষার খাস বেয়ারা বাদেকার এসে টেলেক্স ম্যাসেজের ট্রে আর চিঠিগুলো দিয়ে গেল। এইসব টেলেক্স রেসপেকটিভ ডিপার্টমেন্ট এবং কোম্পানির নাম্বার ওয়ানরা দেখেছেন। শুধু যেগুলো মনীষার দেখা

একান্তই দরকার সেগুলোই পাঠিয়েছেন ওঁরা। যে-এগজিকিউটিভ তাকে বেশি বদার করেন, বেশিবার সাহায্য চান, বেশি প্রবলেম নিয়ে আসেন, তাঁর সি. সি. আর.-এ ইনকমপিটেন্ট লেখে মনীষা। তবে এই অতীশ সরকার বুড়োটার কাছে, একটা জিনিস নিশ্চয়ই শেখার আছে। ম্যানেজমেন্ট। এত বড়োঞ্জপের নাম্বার ওয়ান হয়ে যে-মানুষ বেলা পৌনে বারোটা অবধি গল্ফ খেলার সময় পায়, সে-মানুষটা সময়কে কবজা নিশ্চয়ই করতে পেরেছে। মনে মনে একটু ভয়ও করতে লাগল ওর। এমন কেয়ার-ফ্রি অ্যাডভার্সারিকে ও জীবনে ফেস করেনি। ভয় হতে লাগল একথা ভেবে যে, হেরে যাবে না তো? সরকার নিশ্চয়ই ধূর্তচূড়ামণি। এমন সেকনফিডেন্ট নাম্বার-ওয়ান বিদেশেও কম-ই দেখেছে। গল্ফ খেলছে! তাও, শনিবার বা রবিবার নয়। সপ্তাহের মধ্যে উইকডেইজ-এ। গল্ফ খেলছে। ফানি! ভেরি ফানি ইনডিড!

টেলেক্স মেসেজগুলো দেখে, ড্রয়ার থেকে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ ছোটো ছোটো প্যাড বের করে যে-ডিপার্টমেন্টাল হেডকে যা ইনস্ট্রাকশান দেওয়ার দিয়ে ট্রেটা ফেরত পাঠিয়ে দিল ও বাদেকারের হাতে স্যুসির কাছে। স্যুসিই এবার যা করার তা করবে।

ঘড়িতে দেখল পৌনে বারোটা। কেমন যেন নার্ভাস লাগতে লাগল মনীষার। এমন কখনো হয় না। হয়নি আগে। যে-মানুষ অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলে তার ডেড-বডিও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে আসে, তাকে মিট করার

আগে একটু উত্তেজনা হওয়ারই কথা। তার ওপর সে নাকি বোয়ালমাছ। মনীষার কফি প্ল্যানটেশানের, ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স ইণ্ডাস্ট্রিজের ইন্টারেস্ট সব-ই গিলে খাওয়ার মতলব আছে নাকি মানুষটার। এমন বাঙালি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টও দেশে যে, আছে তা জানা ছিল না ওর। সরকার পদবি কি বাঙালি ছাড়া অন্য রাজ্যের লোকেরও হয়? কে জানে?

বাথরুমে গেল মনীষা। হালকা পিঙ্ক-মার্বেল মোড়া বাথরুম। পিঙ্ক বিদে। পিঙ্ক বেসিন। ইনসেট করা বাথটাব। কমোড। দেওয়ালে হোয়াট-নট। পাশে হালকা-নীল ড্রেসিংরুম। কয়েক প্রস্থ জামাকাপড়, প্যান্টি, ব্রা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে কসমেটিক্স। মেয়েদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিস।

জানলা দিয়ে একবার সমুদ্রের দিকে তাকাল। দুপুরের সমুদ্রে নিশ্চয়ই এখন নোনা গন্ধ। এয়ার কণ্ডিশানড বাথরুম থেকে গন্ধ পাওয়া যায় না। শব্দও নয়। গন্ধ-শব্দ-হীন দৃশ্য শুধু। সি-গাল ওড়াওড়ি করছে। জলের ওপরে। জলের মধ্যে রোদের ভাপ। এয়ার কণ্ডিশানড ঘরে বসে বাইরের অসহ্য রোদকে দেখতে ভালো লাগে। হাওয়াতে সমুদ্রের উপর ছোটো ছোটো ঢেউ উঠছে।

আয়নাতে তাকাল একবার মনীষা। ওকে ফিলম স্টারের মতো সুন্দরী কেউই বলবে না। কিন্তু যাদের সৌন্দর্য চেনার চোখ আছে তারা এক নজরেই চিনবে তাকে। লম্বাটে মুখ। লালচে-ফর্সা। চুল টান টান হয়ে

পড়ে আছে পিঠে। নেমে গেছে হাঁটু অবধি। চোখে স্টিল ফ্রেমের চশমা। গোল। হংকং থেকে নিয়ে এসেছিল গতবার। গালে দু-টি কালো আর তিনটি লাল তিল। ওকে দেখলে হার্ভার্ড কী কেম্ব্রিজের ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়ানো আপনভোলা, ইংরেজি কী ফিলসফির ছাত্রী বলে মনে হলেও হতে পারে। কিন্তু এতবড়ো বিজনেস ম্যাগনেট বলে মনে হওয়ার কোনো-ই উপায় নেই।

সময় দ্রুত চলে যাচ্ছে। ড্রেসিংরুম থেকে ফোনটা তুলে মনীষা বলল স্যুসিকে, মি. সরকার নিশ্চয়ই দেরি করবেন। এলে, তোমার গেস্টরুমে বসিয়ে কফি খাইও। তারপর আমার ঘরে এনো। আই অ্যাম ফিলিং আ লিটল ডিজি।

সুসি উদবিগ্ন গলায় বলল, ডক্টর ওয়াংখেড়কে কি ডাকব ম্যাম? ডিসপিরিন পাঠিয়ে দেব? আছে আমার কাছে।

-না না। কিছু দরকার নেই।

মনীষা আবার আয়নাতে তাকাল। তার সুন্দর চোখ দুটি, আনত দিঘল বড়ো-বড়ো আইল্যাশ। মাঝে মাঝে নিজের চোখ দেখে নিজেই অবাক হয়ে যায় মনীষা। ওর তিরিশ বছরের নারীশরীরের মধ্যে বিজনেস ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল টাকুন হওয়া সত্ত্বেও যে, একজন নারী বাস করে, যে বড়ো নরম আসলে; অথচ বাইরের কাঠিন্যর মুখোশ যার সত্তার অন্তরতমে

কেটে বসে গেছে সেই মেয়েটির মুখ-ই আয়নাতে ভেসে এল হঠাৎ। মুখোশটাই জীবন হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। আর কিছুদিন এমনি চললে মুখটি বোধ হয় হারিয়েই যাবে। ইউনাইটেড স্টেটস-এর সেনেটর কোহেনের একটি উক্তি মনে পড়ে গেল ওর। হোয়েন ইউ স্টেপ ইনটু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ মিররস, ইট ইজ ভেরি হার্ড টু ডিটারমাইন রিয়ালিটি ফ্রম রিফ্লেকশান।

চোখ বন্ধ করে ফেলল মনীষা। তারপর বাড়াবাড়ি জিনস ও জ্যাকেট খুলে ফেলে সিল্কের শায়া বের করে ভোপালের মৃগনয়নী থেকে কিনে আনা হসসা সিল্কের মেরুন আর কালো স্ট্রাইপের শাড়ি পরল একটা। পনিটেইল খুলে চুলটা ছড়িয়ে দিল পিঠময়। ম্যাচ করা ব্লাউজ পরল। নাভিতে, বগলতলিতে এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দুতে শ্যানেল নাম্বার ফাইভ স্প্রে করে দিল একটু। মুখে হালকা করে পাউডার বুলোল। আইব্রো পেনসিল দিয়ে ভ্রূ ঠিক করল। ঠোঁটে হালকা-মেরুন লিপস্টিক বুলোল ক্রিশ্চিয়ান-ডায়র-এর। চোখে, লক্ষ্ণৌ থেকে আনানো সুর্মা। তারপর আয়না যখন বলল যে, ভালো দেখাচ্ছে, মেয়েলি দেখাচ্ছে; তখন নিজের ঘরে ফিরে চেয়ারে বসল।

কেন জানে না, এই অদেখা রাঘব-বোয়াল বুড়োটা ওকে বড়ো আন-নার্ভড করে দিয়েছে। মনটা বড়োই উচাটন হয়েছে। এমন হয় না কখনো। এরকম ডেয়ার-ডেভিল কেয়ার ফ্রি প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করেনি সে।

ঘড়িতে তখন বারোটা বাজতে দুই। ইলেকট্রনিক ঘড়ির কাঁটা যখন ঠিক বারোটাতে তক্ষুনি ইন্টারকম তুলে স্যুসিকে ডাকল।

ওপাশ থেকে স্যুসি বলল, হি ইজ অলরেডি হিয়ার ম্যাম। জাস্ট ওয়াকিং ইনটু মাই রুম। শ্যাল আই লেট হিম ইন? অর শ্যাল আই কিপ হিম ওয়েটিং ইন মাই রুম?

-না, না। তোমার ওখানে বসবার দরকার নেই। আমি রেডি হয়ে গেছি। তুমি নিজেই নিয়ে এসো।

বলেই, বলল না না, তোমার আসার দরকার নেই। বেশি ইম্পর্ট্যান্স দেওয়া হবে। বাদেরকে দিয়েই পাঠাও।

পাছে ঝুসি তার বেশ-পরিবর্তন দেখে কিছু ভাবে, তাই-ই...।

মেয়েরা বড়ো ছোটো-মনের ও সন্দিগ্ধ হয়। নিজে মেয়ে বলেই একথা হাড়ে-হাড়ে জানে ও।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখার আগে ফিসফিস করে বলল, হাউ ওল্ড ইজ দ্যা ওল্ড হ্যাঁগ? দ্যাই গাই? স্যুসি?

স্যুসি ইন্টারকম-এই যেন গলে গেল আইসক্রিমের মতো। বলল, ওঃ ম্যাম। হি ইজ আ রিয়্যাল গাই! হি হার্ডলি উড বি থার্টি। সো ইয়াং।

বিয়ারস আ গোটি বেয়ার্ড। আ রিয়্যাল ঐভি গাই! অ্যাণ্ড নাউ হি গোজ। হি ইজ টেরিফিক।

এই প্রথম মনীষার তার অর্গানাইজেশনের টপ-লেভেলে সব-ই মেয়ে এবং অনেক অবিবাহিত মেয়ে রাখাটাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে মনে হল।

বাদেকর দরজায় দু-বার টোকা মারতেই মনীষা নিজে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে বলল, ওঃ কাম ইন মি. সরকার। প্লিজ বি সিটেড।

মি. অতীশ সরকার হাত বাড়িয়ে নীচু হয়ে বো করে মনীষার হাতটা নিল। মনীষা! কী বিপদেই যে পড়ল! কেন যে, স্যুসি অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করেছিল কে জানে? মনীষার হাতে হাত দিয়ে আলতো করে চুমু খেলেন। বললেন ইটস সো নাইটস টু হ্যাভ মেট ইউ।

–প্লেজার ইজ মাইন।

মনীষা বলল।

কেন জানে না মি. সরকারের মুখে ও পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাতে পারল না। মানুষটার চোখের দৃষ্টিটা এমন, যেন মনে হয় মনের গভীরতম প্রদেশে সে-চাউনি পৌঁছে যায়। তার কাছ থেকে কোনো গোপন তথ্য এমনকী নিজেকে আড়াল করে রাখা কঠিন।

মনীষা বলল। হোয়াট উড ইউ লাইক টু হ্যাভ মি. সরকার? ইউ ওর প্লেয়িং গল্ফ ইন দ্যা সান আই অ্যাম টোল্ড। ইউ মাস্ট বি ভেরি থার্স্টি। আরনট ইউ?

উত্তরে মি. অতীশ সরকার পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি কি বাঙালি? আমি ভেবেছিলাম আপনি সাউথ ইণ্ডিয়ান হবেন! ভাসু। অনেক বাসুই কিন্তু বাসু লেখেন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড। এত কমবয়সি একজন বাঙালি মেয়েই যে, এম. বি. ইন্টারন্যাশনালের কর্ণধার ভাবতে পারিনি। মাই হার্টিয়েস্ট কনগ্রাচুলেশনস।

–হ্যাঁ। কী করে বুঝলেন যে, আমি বাঙালি? দেখেই?

মনীষা চোখ নামিয়ে বলল।

–হ্যাঁ। চেহারা দেখেই। বাঙালি মেয়ের সৌন্দর্য কি অন্য কাউকে মানায়, না অন্য কেউ পেতে পারে? এমন সুন্দরী বাঙালি মেয়ে আমি কিন্তু দেখিনি।

বলেই, মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে বলল, আই মিন এভরি ওয়ার্ড অফ ইট। চুল, চোখ, আইল্যাশ, হাঁটার ধরন, মানে..

–ওয়েল, এনাফ ইজ এনাফ। এবার থামুন। ইউ আর হিয়ার টু ডিসকাস বিজনেস। আরনট উই?

মনে মনে কিন্তু রাগিয়ে গেল মনীষা। কিন্তু পরক্ষণেই ভয়ে ঘামতে লাগল। সাংঘাতিক লোক এ। মনীষার ব্যাবসা আর ইন্ড্রাস্ট্রি যদি কেউ ডোবায় তো এই লোকটিই একমাত্র পারে ডোবাতে। এই বোয়ালমাছেই খাবে তাকে। ডেঞ্জারাস।

মনীষা নিজেকে বলল, সাবধান মনীষা। সাবধান। ডোন্ট বি ক্যারেড অ্যাওয়ে বাই হিজ চার্ম। হি হ্যাঁজ মেনি অ্যা থিংগস আণ্ডার হিজ স্লিভস। বাঙালিকেই তার সব চেয়ে বেশি অবিশ্বাস। বাঙালি হচ্ছে সাউথ-আমেরিকার নদীর পিরানহা মাছের-ই জাত। তারা নিজেরাই নিজেদের খেয়ে বেঁচে থাকে। কাঁকড়ার জাত। একজন ওপরে উঠলে অন্যরা তার পা কামড়ে টেনে নামায় নীচে। বাঙালির ইকুয়ালাইজেশান পলিসি বড়ো বিচিত্র।

আপনি লাঞ্চ কোথায় খান? কাজের কোনো কথাতেই না গিয়ে হঠাৎ-ই প্রশ্ন করলেন মি. সরকার মনীষাকে এলোমেলো করে দিয়ে।

-কোনো ঠিক নেই। কখনো ক্লাবে যাই, কখনো তাজ-এ। বা ওবেরয় টাওয়ার্স-এ। এখানেও আনিয়ে নিই কখনো-কখনো। লাঞ্চ ইজ নট ইম্পর্ট্যান্ট অন আ ওয়ার্কিং-ডে।

–আমার একটা কাম্পারি খেতে ইচ্ছে করছে খুব-ই। উইথ সোডা অ্যাণ্ড প্লেন্টি অফ আইস। চলুন, লেটস গো আউট ফর লাঞ্চ। ওখানেই বিজনেস

ডিসকাস করে নেব। ফর আ চেঞ্জ। শত্রুরা একসঙ্গে লাঞ্চ খেতে খেতে তাদের বিজনেস ডিসকাস করে তো।

–আপনাকে আমি শত্রু মনে করি কে বলল, আপনাকে?

–মিত্রও যে মনে করেন না তা আমি জানি।

–তারপর-ই বলল কোথায় পাবেন কাম্পারি? আজ তো ড্রাইডে বম্বেতে!

–আমার ঘরে যাব। আমি তাজ-এই উঠি। বার বার। ওল্ড উইং-এ। ঘরে তো দেবেই রুম সার্ভিসে ফোন করলে! আপনার কি আপত্তি আছে আমার হোটেলের ঘরে যেতে?

মনীষার মস্তিষ্ক বলল, সাংঘাতিক ডিজাইনিং চ্যাপ। তাকে ধনে-প্রাণে মারবে এই লোক। রাজি হোয়য়া না কিছুতেই। অপরিচিত মানুষ হয়ে একজন অল্পবয়সি মহিলাকে নিজের ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবের মধ্যেই প্ল্যান আছে। অথচ প্রস্তাবটিকে অশালীন বলে মনে হল না।

মুখে বলল, হোটেলে না গেলেই কি নয়? কাম্পারি খেতেই হবে আপনার? আমার অফিসের সেলারে জিন ছিল কিন্তু। ভোদকা ছিল স্কচ ছিল অনেকরকম। রয়্যাল স্যালুটও।

–থ্যাঙ্ক ইউ। কাম্পারি-ই খেতে হবে। আমার যখন যা-ইচ্ছে করে আমার

তক্ষুনিই চাই। এখন-ই। রমাপদ চৌধুরীর একটি উপন্যাস আছে-না এই নামে। আমাদের জেনারেশনের মানসিকতা উনি নির্ভুলভাবে ধরতে পেরেছিলেন। আমরা হচ্ছি রাইট ন্যাউ-এ বিশ্বাসী প্রজন্মর মানুষ। কী বলেন আপনি? সাবস্টিটিউটে আমি বিশ্বাস করি না। কোনো সেকেণ্ড বেস্ট-এর সঙ্গে আমার কমপ্রোমাইজ নেই। না ব্যাবসায়ে; না জীবনে।

–মি. সরকার...

বাঘিনির মতো প্রতাপশালিনী মনীষা গলা খাঁকরে অবশেষে খ্যাঁকশিয়ালির মতো গলায় কী যেন বলতে গেল।

–মি. সরকার নয়। অতীশ। আমিও আপনাকে মনীষা বলেই ডাকব। আমার মনে হয় আমরা কনটেমপোরারি। আপনি কোন বছরের স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট? কোথা থেকে?

–নাইনটিন সেভেনটি টু। কলকাতায়। মডার্ন হাই। স্কুল-লিভিং নয়। হায়ার সেকেণ্ডারি।

–আমি সেভেনটি। সেন্ট-জেভিয়ার্স স্কুল থেকে। মডার্ন হাই যখন, তখন স্মিতাকে চিনতেন? ও-ও সেভেনটি টুর ব্যাচ।

-স্মিতা? চ্যাটার্জি?

–দ্যাটস রাইট। ও আমার ফাস্ট-কাজিন। আমার পিসি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলেন বামুনের ছেলেকে। চ্যাটার্জি। ইনফ্যাক্ট আমাদের ফ্যামিলিতে সকলের-ই লাভ-ম্যারেজ।

–আপনার?

কথাটা জিজ্ঞেস করবে না ভেবেও করে ফেলল মনীষা। হেয়ার-ট্রিগারে আঙুল লাগা গুলির মতোই বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা। আর ফেরানো যাবে না। লজ্জায় মরে গেল প্রশ্নটা করেই। মোস্ট ইরেলিভেন্ট প্রশ্ন।

অতীশ একটু চুপ করে থাকল। তাকিয়ে রইল মনীষার চোখের দিকে অনেকক্ষণ। তারপর বলল, বিয়ে করার সময় এখনও পাইনি। তবে, আমার ইচ্ছে সম্বন্ধ করেই বিয়ে করব। বেশ নতুন-নতুন গন্ধ থাকবে বউ-এর গায়ে। টক টক; মিষ্টি-মিষ্টি। কে জানে কেমন?

মনীষা হেসে ফেলল। মি. সরকারের ছেলেমানুষি কথার ধরনে। কথাবার্তা শুনে মনে হয় মানুষটা একেবারেই ছেলেমানুষ। এতবড়ো ব্যাবসা করে, কে বলবে তা! এমন করে সদ্য-পরিচিতা মহিলা অ্যাডভারসারির সঙ্গে কথা বলে কেউ? একেবারে আনকনভেনশনাল, আনপ্রেডিকটেবল মানুষ।

–চলুন, তাহলে আর দেরি কেন? খিদেও পেয়ে গেছে।

–আপনি কি ডিসকাস করবেন? আমার কোনো সেক্রেটারিকে কি সঙ্গে

নেব?

মনীষা বলল।

–নট অ্যাট অল। উই উইল বি এবল টু টেক কেয়ার অফ আওয়ারসেলভস। প্রাইভেট-লিফট দিয়ে নেমে পথে আসতেই মনীষার সোফার তার আকাশিনীল বি. এম. ডাব্লু. গাড়িটি নিয়ে এল।

–আঃ। আ লাভলি কার। কনভার্টিবল কি? হুড খোলা যায়?

–হ্যাঁ। সুইচ টিপলেই!

মনীষা বলল।

–ওকে, যদি আমাদের বিজেনস-মিটিংটা ঝগড়া না হয়ে যায় তবে একদিন মুনলাইট ড্রাইভে যাব আপনার সঙ্গে এই গাড়িতে।

ওরা কথা বলতে বলতেই অতীশ সরকারের সাদা মার্সিডিস চালিয়ে নিয়ে এল পার্কিংলট থেকে তার গোর্খা-ড্রাইভার।

বাঃ। মনীষা বলল। আমারও একটা আছে। তবে ফিকে হলুদ রঙের। থাকবেই। আফটার অল, মনীষা বাসু ইজ দ্যা চেয়ারপার্সন অফ এম. বি. ইনক।

বলেই, বলল, আপনি আমার গাড়িতেই আসুন। আমার ড্রাইভারকে আপনার ড্রাইভার নিয়ে আসুক তাজ-এ। ব্যাটা বি. এম. ডাব্লুতে চড়েনি কোনোদিন। মনীষা বসুর দৌলতে চড়ে নিক একটু।

মনীষা হাসল। বলল, আহা! মার্সিডিস যেন ফেলনা গাড়ি।

–মনীষা বসু যে-গাড়িতে চড়ে তার তুলনায় সব-ই ফেলনা, খেলনা। মনীষার মধ্যে ভীষণ খুশির, ভীষণ ভয়ের, গা ছমছম একধরনের অনুভূতি হতে লাগল। এই মানুষটা সাংঘাতিক। ব্যাবসাসংক্রান্ত ফেভারের কথা তো ছেড়েই দিল, ব্যক্তিগত কিছু চেয়ে বসলেও ও হয়তো না বলতে পারবে না। কিছু কিছু পুরুষ থাকে, মেয়েদের পক্ষে যাকে না বলা ভারি মুশকিল। এদের-ই বোধ হয় ইরেজিস্টিবল বলে।

খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল অতীশ। পাশে বসে ভাবছিল ও। বেশ গান বেজে উঠল : ডিড আই স্যে আই লাভ ইউ? ডিড আই স্যে আই কেয়ার?

–রাইট! মাই ক্রেজ।

অতীশ বলল।

–সো ইজ মাইন।

মনীষা বলল।

–কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়? আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না, ভালোবাসায় ভোলাবো আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলবো না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাবো। ভালো লাগে না?

–নিশ্চয়ই!

–অজয় চক্রবর্তী? তোমারি গাহি জয়? রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের প্রণয় কুসুম বনে। বিচ্ছেদ ভুজঙ্গ রয়েছে সজনি।

–ইস আপনার সঙ্গে আমার রুচির খুব-ই মিল দেখছি।

মনীষা উচ্ছল হয়ে বলল।

ওকে নিভিয়ে দিয়ে অতীশ বলল, দ্যাটস ইমম্যাটেরিয়াল, ব্যাবসার পলিসিতে মিল। থাকাটাই বড়োকথা।

বলেই, ক্যাসেট-প্লেয়ারটা বন্ধ করে দিল। মনীষা একবার দেখল অতীশের দিকে। তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। আর পাত্তা দেবে না লোকটাকে। নিজেকে বেশি চালাক মনে করে। ওভারস্মার্ট একটা।

তাজ-এর লাউঞ্জের সামনে পৌঁছোতেই উর্দিপরা শিখ গেটম্যান ওকে বিরাট সেলাম ঠুকল। চাবি গাড়িতে লাগিয়েই নেমে গেল অতীশ। তারপর ডানদিকে ঘুরে গিয়ে লেফট-হ্যাণ্ড ড্রাইভ মার্সিডিস-এর দরজা খুলে নামাল

মনীষাকে। তারপর এসকর্ট করে নিয়ে গিয়ে রিসেপশনে চাবি চাইল।

ওল্ড-উইং-এর লিফট অবধি হেঁটে গিয়ে লিফটের বোতাম টিপল। সুইমিং পুল-এর দিক থেকে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে ফেডেড জিনস ও হালকা বেগুনি টি-শার্ট পরে প্রায় দৌড়ে এসে অতীশকে বলল, হাই! ডার্লিং!

–হাই! হাউ ইজ লাইফ রিতা? মিট মনীষা বাসু।

রিতা বলল, হাই। মনীষাকে।

তারপর-ই বলল, হাই আর ইউ প্লেসড দিস ইভনিং অতীশ?

বাইরে বৃষ্টি নেমেছিল। সেদিকে দেখিয়ে, অতীশ পাঞ্জাবিতে বলল কিন্না আচ্ছা মওসুম হেগা। আই প্রেফার টু বি টোটালি ডিসপ্লেসড দিস ইভনিং।

বলেই বলল, ওয়ার্ক! ওয়ার্ক! অ্যাণ্ড ওয়ার্ক। নো রেসপাইট রিতা।

-ওক্কে!

বলে, একটু অপমানিত মুখে রিতা রিসেপশনের দিকে হেঁটে গেল।

অতীশ বলল, ইচ্ছে করেই আপনার পরিচয় দিলাম না। আরও জেলাস হত। দিল্লির গল্ফ ক্লাবে আলাপ। ওরা শিখ। খুশয়ন্ত সিংদের সঙ্গে

কীরকম আত্মীয়তাও আছে। প্রপার্টি-ওনার্স, বিজনেস-টাইকুন।

লিফট-এ উঠতে উঠতে বলল, দিল্লি গল্ফক্লাবে ভদকা-বেসড হোয়াইট-লেডি খেয়েছেন কখনো? দারুণ করে।

নাঃ। মনীষা বলল।

তারপর বলল, শীতকালে গেলে কখনো-কখনো ওখানে রোদে বসে লাঞ্চ খাই!

--ফাইন। নেক্সট টাইম আই উইল বি উইথ ইউ।

মনীষা কিছু বলল না।

ওর হাঁটু কাঁপছিল। ভালোলাগা কাকে বলে ও জানত। ফলিং ইন লাভ হেড ওভার হিলস কথাটা শিশুকাল থেকেই শুনে এসেছে। কিন্তু ভেবেছিল, ওটা কথার-ই কথা। অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড-এ অ্যালিসদের জীবনে কখনো অমন ঘটনা ঘটলেও ঘটতে পারত। রোমিয়ো-জুলিয়েট পড়েছিল। লায়লা-মজনুর গল্প শুনেছিল! ইম্ফলে একটি প্রোপোজড ইণ্ডাস্ট্রির প্রোজেক্ট-রিপোর্ট নিয়ে স্টাডি করতে যখন মণিপুরে গেছিল তখন থৈবী খাম্বার প্রেমের গল্পর কথাও শুনেছিল কিন্তু তার জীবনে, কোনো শিক্ষিতা, আধুনিক, প্রচন্ড প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মেয়ের জীবনেও এমন দুর্ঘটনা যে, ঘটতে পারে তা আজ বেলা পৌনে বারোটার সময়ও

কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না। কিন্তু এখন...

অতীশ বলল, কী ভাবছেন?

–নাঃ।

–কিছু তো ভাবছেন। মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্ক একমাত্র যোগাসন, গল্ফ, টেনিস অথবা স্কোয়াশ খেলার সময়-ই শুধু অন্য ভাবনা মুক্ত থাকে। নইলে না ভেবে তার উপায়-ই নেই। কিছু একটা ভাবছেন নিশ্চয়ই।

মনীষার অসহায় লাগতে লাগল। কান্না পেয়ে গেল ওর। মা-বাবার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁরা থাকলে দৌড়ে গিয়ে বলত, বাঁচাও আমাকে তোমরা, এই সুন্দর ইরেজিস্টেবল পুরুষ মানুষটার হাত থেকে।

–সো! হিয়ার উই আর!

বলেই, লিফট থেকে নেমে মনীষাকে এসকর্ট করে নিয়ে বাঁ-দিকের করিডরে পড়েই ডানদিকের সবচেয়ে বড়ো স্যুইটের দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

–হাউ বাউট উ্য! মে আই ফিক্স ইউ আ ড্রিঙ্ক?

–ব্লাডি মেরি। প্লিজ! জাস্ট ওয়ান।

ঘোরের মধ্যে বলল, মনীষা।

–তা কি হয়? একটা খেলে গৃহস্থর অকল্যাণ হবে। সে রসগোল্লাই হোক কী ব্লাডি মেরি।

–বসুন! এ কী! দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

স্যুইটের সিটিং-রুমের সোফায় ধপাস করে বসে পড়ল মনীষা। এত আনস্মার্ট লাগেনি নিজেকে কখনোই।

অতীশ ঘরের ফ্রিজ খুলে দেখল। নিজের মনে বলল, টোম্যাটো–জ্যুস? ইয়েস! ভদকা? ইয়েস! লেমন স্লাইসেস? ইয়েস।

তারপরেই বলল, নাঃ। রুম সার্ভিসেই বলে দিই। ভালো করে বানিয়ে দেবে ওরা। একসঙ্গে দুটো লার্জ বলে দিই? নইলে আমাদের ডিসকাশন-এর সময় আবার উঠে অর্ডার করতে হবে।

মনীষা কিছু বলতে পারল না।

উঠে বলল, মে আই ইউজ ইয়োর টয়লেট প্লিজ?

–শিয়োর। প্লিজ যান। ফিল অ্যাট হোম। বাঙালির ঘরে এসে এমন কিন্তু কিন্তু করছেন

মনীষা বেডরুমে গিয়ে টয়লেটে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে লক করে দিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিজেই আঁতকে উঠল। সমস্ত মুখ লাল টকটকে হয়ে গেছে। গায়ে, মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে। ঠোঁট-দু-টি শুকিয়ে গেছে। ভীষণ পিপাসা। মুখ ধুল ঠাণ্ডাজল দিয়ে। তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নতুন করে মেক-আপ করল ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে। ওডিকোলোন লাগাল। হাত কাঁপছিল ওর। তারপর অনেকক্ষণ পর বেরোল বাথরুম থেকে।

রুম-সার্ভিসের বেয়ারা দু-টি বড়ো ইটালিয়ান কাম্পারি, দু-টি সোডা, আইস-ব্যাকেট এবং দু-টি বড়ো ব্লাডি-ম্যারি রেখে দিল এনে মধ্যের কাঁচের টেবিলে। বিলটা সই করে কুড়ি টাকার একটি নোট দিল অতীশ বেয়ারাকে। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। বলে, সে চলে গেল। যাওয়ার সময় বলল, হাউ বাউট লাঞ্চ স্যার?

–প্লিজ ব্রিং আ মেনু-কার্ড ফ্রম গোল্ডেন ড্রাগন। উই উইল প্লেস দ্যা অর্ডার ফর চাইনিজ ফুড।

বলেই, ব্লাডি-ম্যারির গ্লাস তুলে দিয়ে মনীষার হাতে, নিজের কাম্পারির মধ্যে সোড়া ও আইস কিউব ফেলে, স্টারার দিয়ে নারিয়ে গ্লাসটি উপরে তুলে বলল : ট্যু দা ফাস্ট মিটিং অফ মনীষা অ্যাণ্ড অতীশ। চিয়ার্স!

মনীষা বলল, চিয়ার্স! অস্ফুটে। ওর যে অফিসে কাজ আছে। দু-টি ব্লডি-

ম্যারি খেয়ে

তারপর গোল্ডেন-ড্রাগন-এর এলাহি লাঞ্চ খেয়ে ফিরতে ফিরতে তো চারটে বেজে যাবে। সত্যিই সর্বনাশ হল ওর।

মনীষা নিজেকে শক্ত করে বলল, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের নীলগিরির কফি প্ল্যানটেশানের কথা জিজ্ঞেস করবেন?

কফি–প্ল্যানটেশান? ওঃ। নোঃ। শুধু তাই নয় আরও অনেক ব্যাপার ছিল ডিসকাশনের। কিন্তুলেটস কল ইট আ ডে। আজকে কোনো কাজের কথা নয়। দু-জনে মুখোমুখি সমান দুখে দুখী বাহিরে বারি ঝরে ঝরঝর।

মনীষার সেই অবশ ভাবটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। একজন পুরুষের জন্যে, সে যত বড়ো ডন জোয়ান-ই হোক-না-কেন, তার তিল তিল করে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য সে নষ্ট করতে পারে না। এম. বি. ইন্টারন্যাশনালের মান্থলি স্যালারি আর ওয়েজেস-এর বিল-ই দু-কোটি টাকা। তার সুস্থ, সবল ও অনভিভূত থাকার ওপরে নির্ভর করছে অগণ্য পরিবারের শুভাশুভ। নতুন কম্পিউটার আর টি ভি প্রোজেক্টের জন্যে ব্যাঙ্কের কাছে দশ কোটি টাকা লোনও নিয়েছে। আশা করছে তিন বছরের মধ্যে ব্রেক-ইভিন করবে। তারপর প্রফিট আসতে শুরু করবে। ব্রেক-ইভিন পয়েন্ট পেরিয়ে গেলেই ইণ্ডাস্ট্রিজ-এ প্রফিট আসতে শুরু করে বানের তোড়ের মতো। বাঙালি ইণ্ডাস্ট্রি মাইন্ডেড নয়, রিস্ক নিতে পারে না, ধৈর্য ধরতে

পারে না বলেই তার ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট হওয়া হয়ে ওঠে না। অতীশ সরকার প্রায় তাকে ঘায়েল করে এনেছিল। আর একটু হলেই মনীষার ভেতরের চিরন্তন নারী-সত্তা আর ব্যবসায়ী সত্তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। যাক সামলে নিয়েছে মনীষা। মানুষটা তার পৌরুষের চমক আর মনোহারিত্ব দিয়ে তাকে হারিয়ে দিয়ে তার গ্রুপ অফ কোম্পানিজকে করায়ত্ত করবে ভেবেছিল এইরকম প্রেমের অভিনয় মনীষা আগেও অনেকবার দেখেছে। তবে কখনোই সে, এমন দুর্বল হয়ে পড়েনি। ব্লাডিম্যারির গ্লাসে একটি বড় চুমুক দিয়ে মনীষা বলল, না, কেন? আমাদের তো বিজনেস ডিসকাস করতেই এখানে আসা!

অতীশ যেন মনীষার চোখের ভাষা পড়তে পারল মুহূর্তের মধ্যে। একটু অন্যমনস্ক দেখাল তাকে।

কাম্পারির গ্লাসে সেও বড়ো একটি চুমুক দিয়ে বলল, আই অ্যাম সরি। আমি হয়তো অনেক কিছু ইম্যাজিন করতে শুরু করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আমার ও আপনার জীবনে বিজনেস ছাড়াও অন্য অনেক কিছুই আছে। সুস্থ সাধারণ অন্য অনেক নারী-পুরুষের-ই মতো। আমি এই ব্যাবসা করে করে নিজেকে তো প্রায় নষ্টই করে ফেলেছি। এখন দেখছি, আপনিও ব্যতিক্রম নন।

ব্যতিক্রমের কোনো ব্যাপার নেই। বিজনেস ইজ বিজনেস অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল মনীষা।

তারপর অতীশের দিকে চেয়ে বলল, আপনি কেন আজকের মিটিং চেয়েছিলেন, তা জানালে খুশি হব।

অতীশের মুখ দেখে মনে হল ও ব্যথিত হয়েছে। প্রথমে, তাই-ই মনে হল। পরক্ষণেই বুঝল মনীষা যে, অতীশ একজন পাকা অভিনেতা। ঘাঘু পুরুষ। রিতার সঙ্গে রাত কাটাবে আর আমাকে এমন-ই ভাব দেখাচ্ছে যেন আমাকে দেখে একেবারে ওভারহোয়েলমড। চালাকি করার জায়গা পায় না।

মনে মনে বলল মনীষা, নিজেকে।

নড়বড়ে হয়ে যাওয়া নিজেকে পেপ-আপ করার জন্যে গ্লাসে একটা বড়ো চুমুক দিল।

এমন সময় ফোনটা বাজল।

–দ্যাটস রাইট।

অতীশ বলল, রিসিভার তুলে। স্মার্টলি। তারপর-ই বলল, ও। নিশ্চয়ই চিনতে পারছি। মি. সারাভাই। কেমন আছেন?

মনীষা বুঝল, কুমুদিনী ইতিমধ্যেই কাজে নেমে পড়েছে। দ্যাটস ফাইন। অতীশ বলল, মে বি, হোয়েন আই কাম নেক্সট টাইম। আই অ্যাম লিভিং

টুমরো ফর ব্যাঙ্গালোর। ডাহা মিথ্যুক! রিতাকে বলল কলকাতা আর কুমুদিনীর স্বামীকে বলছে ব্যাঙ্গালোর।

–কবে আবার আসব? ও। আমার সেক্রেটারির নাম্বারটা রেখে দিন। ওকে সপ্তাহখানেক পরেই ফোন করে জেনে নেবেন। বোঝেন তো! নিজের হোয়্যারাবাউটস নিজেই জানি না।

ফোনটা রেখে দিতেই আবার বেজে উঠল।

–ইয়েস। বিয়ান্দকাব হোয়াট ইজ ইট? আই টোল্ড ইউ টাইম অ্যাণ্ড এগেইন নট টু ডিস্টার্ব মি ডিউরিং লাঞ্চ আওয়ার। কী ব্যাপার? জে ক্লাসের টিকিট নেই? ঠিক আছে। টেল ইয়োর ড্যাম ট্রাভেল-এজেন্টস টু গেট মি অ্যান ইকনমি ক্লাস টিকিট। আমার কাল সকালে দিল্লি যেতেই হবে। ফিকির-এগজিকিউটিভ কমিটির মিটিং আছে। তুমি আবার আমাকে চারটেতে কনটাক্ট করো। না, না, অফিসে। যখন যাব। অফিসেই ফিরে যাব আমি।

ফোনটা নামিয়েই তাজ-এর অপারেটরকে ফোন করে বলল অতীশ, তিনটে অবধি কোনো ইনকামিং কল যেন তাকে না দেওয়া হয়। তাই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি ডিস্টার্বড়। মনীষা বলল, মে আই ইউজ ইয়োর ফোন?

দু-দিকে দু-হাত ছুঁড়ে দিয়ে অতীশ বলল, হোয়াই নট। বাই ওল মিনস।

মনীষা তার নিজের অফিসে ফোন করে স্যুসিকে বলল, যে, সে তাজ-এ আছে চারটের সময় ফিরবে। সাড়ে চারটেতে প্রত্যেক গ্রুপ-এর ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোলারদের মিটিং ফিক্স করে ওঁদের বলে দাও।

ওপাশ থেকে অ্যাসি বলল, গ্রুপ ওয়ানের মিসেস রতনঝংকার যে, আজ বিকেলের ফ্লাইটে কলকাতা যাচ্ছেন।

--টেল হার টু পোস্টপোন হার ট্রিপ। ট্রাভেল এজেন্টকে বলে দাও। আই হ্যাভ ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাটারস টু ডিসকাস উইথ ইচ অফ দেম। আর শোনো আমাকে এখানে আর ডিস্টার্ব কোরো না।

ফোনটা রেখেই অতীশকে বলল, কই? গোল্ডেন-ড্রাগন-এর মেনু তো নিয়ে এল না। কখন লাঞ্চ অর্ডার করবেন? কখন ফিরব?

-ওঃ। আই অ্যাম সরি!

বলেই, অতীশ আবার রুম-সার্ভিসে ফোন করল। করে, বলে দিল তারপর নিজের গ্লাসটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল মনীষার সামনে। বলল, আপনি যখন এত কিন অন ডিসকাসিং বিজনেস তখন দয়া করে দিন দশেক বাদে আপনার অফিসেই আমাকে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবেন। আপনার সেক্রেটারিকে বলবেন যেন, আমার সেক্রেটারিকে জানিয়ে দেয়। আমিও বলে যাব আমার সেক্রেটারিকে।

–আমি পরশু একবার লানডান-এ যাব তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট হয়ে ফিরব। যদি এক-দু-দিন দেরি হয় তবে অসুবিধে হবে না নিশ্চয়ই।

মনীষা বলল।

-না, না। আপনার সুবিধেমতোই দেবেন। তা ছাড়া আমি রবিবারে সিংগাপুরে যাচ্ছি। সেখান থেকে তাইপে। তারপর ব্যাংকক হয়ে ফিরব। আপনার অসুবিধে না করেই দেবেন।

–দেন, লেটস গেট ব্যাক টু প্রিলিমিনারি থিংগস।

মনীষা বলল, হ্যাঁ। এবার আপনি ডাই-হার্ড প্রফেশনালের-ই মতো কথা বলছেন।

অতীশ পরক্ষণেই বলল, কিছু মনে যদি না করেন তো আজ থাক। আমার বিজনেসম্যানের মুখোশটা আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পরমুহূর্তেই খসে গেছে। সেটা না পরে, বিজনেস আমার দ্বারা হবে না। হয় না। কথা দিচ্ছি যে, এর পরের মিটিং-এ শুধুই বিজনেস-ই আলোচনা করব। যদি আপনাকে আমার ঘরে ডেকে নিয়ে আসাতে এবং হঠাৎ এমন ইনফরম্যাল আনবিজনেসম্যান লাইক ব্যবহার করায়, আপনি আমার ওপর অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে ক্ষমা করবেন। অনেস্টলি, আই অ্যাম রিপেনট্যান্ট। আপনি আমাকে কী ভাবছেন জানি না, তবে যা ভাবছেন আমি তা নই।

মনীষা নৈর্ব্যক্তিক গলায় বলল, এতে ভাবাভাবির কী আছে?

মনে মনে বলল, আপনি যা, তাই-ই ভেবেছি। ঠিক-ই ভেবেছি। তবে আপনি নিজেকে খুব চালাক মনে করেন। আমিও কিছু হাবাগোবা নই। তবে প্রায় নিজের সর্বনাশ-ই করে ফেলেছিলাম আর কী! এম. বি. ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারপার্সন নিজেকে একজন মধ্যবিত্ত বাঙালি মেয়ের মতো এত সহজে প্রেমে পড়ার লাক্সারি অ্যাফোর্ড করতে দিতে পারে না। ছিঃ কী করতে বসেছিলাম আমি!

চমৎকার বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বম্বের বর্ষাকালটা আমার দারুণ লাগে। নইলে অন্য সময় বিচ্ছিরি। নেহাত পেটের দায়েই বার বার আসতে হয়। নইলে আমার হেডকোয়ার্টার্স ব্যাঙ্গালোর, দ্যা গার্ডেন-সিটি অফ ইণ্ডিয়া! আমার সবচেয়ে ফেভারিট। ওখানেই সেটল করব ঠিক করেছি। যখন করব। জানি না কবে সেই সুদিন হবে। অতীশ বলল।

মনীষা পরিবেশটাকে যেমন গুরুগম্ভীর করে তুলেছিল, তা থেকে একটু সরে এসে বলল, বেশি বয়সে ওখানে না থাকাই ভালো। বাত হয়। গাউট। আর্থরাইটিস হয়।

–বেশি বয়স অবধি কি বাঁচব? যা হেকটিক লাইফ লিড করি! আমার ইচ্ছে, আমি পঁয়তাল্লিশেই রিটায়ার করে হয় ব্যাঙ্গালোরে আঙুরের চাষ করব, নয় কুনুরে আমার ছোট্ট কফি-প্ল্যানটেশনেই কাটাব আর যে-ক-

বছর বাঁচি!

-এত তাড়াতাড়ি মরার ইচ্ছে কেন?

–নাঃ। মানুষের জীবনের দৈর্ঘ্যই তো তার বেঁচে থাকার একমাত্র পরিমাপ নয়। জীবনের ভলিউম, জীবনের মাস, অ্যাচিভমেন্টস-ই একজন মানুষের জীবনের ওয়েইং-স্কেল। তা বিচার করেই সবকিছু। যে-ক-বছর বাঁচি, ঘূর্ণিঝড়ের মতোই বাঁচব, যেমন বাঁচছি কুড়ি বছর থেকে। ইনফ্যাক্ট বাবার মৃত্যুর পর থেকেই। ভেবেছিলাম, ঘূর্ণিঝড়ে পড়া ঝরাপাতার মতো উড়ে বেড়ানোর জীবনে ছেদ টানবার একটা সুযোগ আসবে। অ্যাটলিস্ট অ্যাট সাম পয়েন্ট অব টাইম। ভেবেছিলাম! অনেকবারই হাতের কাছে এসেও সে-সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে। হয়তো বহুবার আরও যাবে। কিছুই করার নেই। জীবন এইরকম-ই।

শেষের দিকে অতীশের গলাটা যেন সেন্টিমেন্টাল হয়ে গেল।

রুম-সার্ভিসের বেয়ারা গোল্ডেন-ড্রাগন-এর মেনু নিয়ে এল।

অতীশ বলল, ইয়া! থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। তারপর মনীষাকে বলল, কী স্যুপ খাবেন? আপনি?

–শাক ফিন।

--ফাইন। আমিও তাই। আর? আর কী খাবেন?

–হাক্কা-নুডলস। আর মিক্সড ফ্রায়েড-রাইস। উইথ ব্যাম্বু-শুটস। দ্যাট শুটস মি ফাইন কিন্তু একটাই বলুন। এরা কোয়ানটিটিতে বড্ডই বেশি দেয়।

ঠিক! তা বলে কোয়ালিটি ডিসপেন্স করে নয়। তাজ ইজ তাজ।

তারপর বলল, আমি সারাসকাল গল্ফ খেলেছি। দারুণ খিদে পেয়েছে। দুটো করেই বলি। যতটুকু পারবেন খাবেন। লিচু আর আইসক্রিম বলি? ডেসার্ট হিসেবে?

–আমি বড্ডই ওয়েট পুট-অন করেছি।

মনীষা বলল। মেনু থেকে চোখ সরিয়ে অতীশ পূর্ণদৃষ্টিতে চাইল মনীষার দিকে। বলল, আই ডোন্ট থিঙ্ক সো। ইউ আর জাস্ট রাইট ফর ইয়োর হাইট। এভরিথিং ইন দ্যা রাইটেস্ট প্রোপোরশন অ্যাট দ্যা রাইট প্লেসেস।

মনীষা ব্লাশ করল। অসভ্য পুরুষ! পুরুষ মাত্রই অসভ্য।

অতীশ বলল, ভালো করে খাবেন। নইলে এতবড়ো দায়িত্ব সামলাবেন কী করে? রোজ সওনা নেবেন আর সাঁতার কাটবেন।

–রোজ সওনা নিয়ে আর সাঁতার কেটেই তো এই। আমার বাড়িতেই আছে।

--ফাইন। যদি কোনোদিন দয়া করে বাড়িতে ডাকেন ভবিষ্যতে, তাহলে আমারও সওনা নেওয়ার আর সাঁতার কাটার সৌভাগ্য হবে! পালি হিলে? তাই-না? নাম্বারটা লেখা আছে। রেডিলি মনে করতে পারছি না।

–তা জানি। সব খোঁজ নিয়েই তো আপনি এসেছেন।

–কোয়াইট রাইট। সব খোঁজ না নিয়ে আমি মনীষা বসুর কাছে আসিনি। তবে দেখলাম যে, আমি ভুল। সব খোঁজ নেওয়া সত্ত্বেও যা-খুঁজতে এসেছিলাম তা পেলাম না। তা ছাড়া জানার অনেক কিছুই বাকি ছিল।

বলেই দু-কাঁধ শ্রাগ করে বলল, ওয়েল! কান্ট বি হেল্পড!

তবে যে বললেন, আপনি ভেবেছিলেন ভাসু আমি। বাসু শুনে চমকে গেছিলেন যেন, এমন-ইভাব দেখালেন আমার অফিসে।

ওটা আপনাকে ইমপ্রেস করার জন্যে। সে-মুহূর্তেও আমি সরকার অ্যামালগামেটস-এর নাম্বার-ওয়ান ছিলাম। কিন্তু পরমুহূর্তেই অতীশ সরকার হয়ে গেছিলাম। জাস্ট অতীশ সরকার। ইন মাই ইণ্ডিভিজুয়াল, প্রাইভেট; কনফিডেন্সিয়াল ক্যাপাসিটি। যে, নিছক-ই একজন তিরিশ বছরের ক্লান্ত একা পুরুষ।

অন্যমনস্ক দেখাল অতীশকে। কিছুক্ষণ চুপ করে অন্যদিকে চেয়ে রইল।

তারপর মনীষার দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, মনীষা বসুকেও আমি নিছক একজন নারী হিসেবেই এখানে ডেকে এনেছিলাম। ইন হার ইণ্ডিভিজুয়াল ক্যাপাসিটি। তাঁর বিত্ত, সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি বাদ দিয়েই–শুধুমাত্র তাঁর নরম ব্যক্তিত্ব আর সৌন্দর্য নিয়েই তিনি আসবেন ভেবেছিলাম। ভুল হয়েছিল। ভুলের জন্যে ক্ষমাও চেয়েছি!

বলেই, মুখ নীচু করে ফেলল অতীশ।

এই লোকটাকে বুঝতে পারছে না মনীষা। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে, লোকটা যা বলছে তা সত্যি। সিনসিয়ারলিই বলছে। মনে হচ্ছে, হি মিনস এভরি ওয়ার্ড অফ ইট। পরমুহূর্তেই মনে হচ্ছে, লোকটি একটি ঠগ। চিট। স্যুইগুলার। প্রফেশনাল লেডি-কিলার। তার চেহারা আর ব্যক্তিত্বর চমক দিয়েই সে এম. বি. ইন্টারন্যাশনালকে কবজা করে নিয়ে তারপর-ই মনীষা বাসুকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

কুমুদিনী বলছিল, অতীশ সরকার এম. বি. ইন্টারন্যাশনাল ইনক-এর হোল্ডিং-এর অনেক কোম্পানির-ই শেয়ার কর্নার করতে আরম্ভ করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। বম্বে-কলকাতা-দিল্লি কোনো জায়গার স্টক-ব্রোকাররাই সন্দেহ প্রকাশ করেননি। এই আপাত-স্থিরতার পেছনে যে, অতীশ সরকার-ই, সে-খবরও মনীষার বিভিন্ন ম্যানেজারেরা প্রাইভেট ডিটেকটিভ-এজেন্সির মাধ্যমেই জানতে পেরেছে। ব্যাপারটা খুব-ই বুদ্ধিমানের মতো করছে। আলাদা করে ছোটো ছোটো শেয়ারহোল্ডারদের

সঙ্গে দেখা করে ওর এজেন্টরা ফ্যাবুলাস প্রাইস অফার করছে। এক-একটা লট কিনেই চুপ মেরে যাচ্ছে। আবার কিছুদিন পরে এগোচ্ছে।

অতীশ বলল, কাল দিল্লিতে পৌঁছিয়েই একটি কবিতার কথা মনে পড়বে আমার।

–কার কবিতা? শঙ্খ ঘোষ, না শক্তি, সুনীলের?

–না। ওঁদের কবিতার খুব-ই ভক্ত ছিলাম একসময় যদিও। এখন সময় পাই না। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ-ই মনে আছে কিছু কিছু। মনে আছে বলেই মনে পড়ে। মনে না থাকলে আজ আর নতুন করে পড়ার সময় থাকত না।

–কোন কবিতা? সন্দিগ্ধ চোখে চেয়ে শুধোল মনীষা। বিস্মিত হল অতীশের কাব্যপ্রীতি দেখে! এরকম ভার্সেটাইল ব্যাবসাদার আগে মিট করেনি কখনো। বাঙালি ব্যাবসাদার তো নয়ই!

–আপনি কিন্তু খাচ্ছেন না। আমি আরও দুটো কাম্পারি খাব। আপনি আমাকে কাম্পানি দেবেন না?

–আমি ড্রাঙ্ক হয়ে অফিসে যেতে চাই না।

–চারটে ব্লাডি-ম্যারি খেলেই এতবড়ো গ্রুপের চেয়ারম্যান যদি ড্রাঙ্ক হয়ে

যায় তবে তার কোম্পানি বিক্রি করে দেওয়াই ভালো।

–কখনো বেচলেও আপনাকে বেচব না।

মনীষা বলল।

–আমি কিনলে-না সে প্রশ্ন উঠবে? কেন মিছিমিছি ঝগড়া করছেন? ঝগড়া করতে হলে করবেন পরের দিন। আজ ভাব। শুধু ভাব।

বলেই, রুম-সার্ভিসে অর্ডার করল আরও ড্রিঙ্কস-এর।

মনীষা ভাবল, সর্বনাশ! আরও ব্লাডি ম্যারি।

বলল, আপনি কি আমাকে রেপ-টপ করবার মতলব করছেন নাকি? কী মতলব বলুন তো!

এবারে হেসেই বলল মনীষা।

–আপনার কি মনে হয় অতীশ সরকারেরও কোনো মেয়েকে রেপ করার প্রয়োজন ঘটে। উলটে সারাক্ষণ নিজেকেই বাঁচিয়ে রাখতে হয়, উইথ গ্রেট ডিফিকাল্টি; ফ্রম বিইং রেপড বাই। লেডিজ।

মনীষা বলল, আপনার নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা বড্ড বেশি উঁচু।

–একটুও নয়। কথাটা আপনার বেলাও কি প্রযোজ্য নয়? মানে, আপনাকেও কি সারাক্ষণ ভদ্রলোকদের হাত থেকে বাঁচতে হয় না? হাজার-রকমের নইসেন্স-এর হাত থেকে? ফর ইনস্টান্স, আপনার সেই বান্ধবীর স্বামী, আহাঃ নামটা মনে করতে পারছি না। আপনার স্কুলের বান্ধবীর স্বামী...

চমকে উঠল মনীষা। কী সাংঘাতিক লোক! ওকে ইনসাইড-আউট করে জেনে তবেই এসেছে ওর কাছে। লোকটা ওর সম্বন্ধে জানে না এমন কিছুই নেই। এমনকী পার্সোনাল লাইফ সম্বন্ধেও।

কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ না করে বলল, সে তো আমি মেয়ে বলে। আমি একা কেন? সব মেয়েকেই ওইরকমভাবেই এখনও বাঁচতে হয়। পুরুষরা তো জানোয়ার-ই! ইন মেজোরিটি!

–তা ঠিক! লস্ট-কেসে কখনো আগ্ম করি না আমি। কিন্তু সুন্দরীরা কিন্তু জানোয়ারদের-ই বেশি পছন্দ করেন। জানি না কেন! নইলে বিউটি অ্যাণ্ড দ্যা বিস্ট কথাটা আসতই না। যাকগে, কবিতাটা বলি।

কবিতাটির নাম নষ্ট-স্বপ্ন। আপনি জানেন?

–আমার কোনো স্বপ্নই নষ্ট হয়নি। নাঃ। জানি না।

মনীষা বলল।

–যদি না হয়ে থাকে তো আপনি লাকি! তবে এটা বোধ হয় বাজে কথা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এম্পায়ার গড়ার স্বপ্ন ছাড়াও একজন পুরুষ অথবা নারীর অন্য অনেক-ই স্বপ্ন থাকে। যেসব স্বপ্নের রং ফিকে বেগুনি। অথবা লেমান-ইয়ালো। সেইসব স্বপ্ন, সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নষ্ট হয়ে যায়। প্রত্যেকটি স্বপ্নই। কোনো কোনো মহিলা যেমন কনসিভ করতে পারেন কিন্তু প্রতিবারেই তাঁদের জ্বণ নষ্ট হয়ে যায়, সেইসব স্বপ্নও তেমন-ই। হাউ আনফরচুনেট! নষ্ট হওয়ার জন্যেই স্বপ্ন। স্বপ্ন-মাত্রই নষ্ট হয়। জহরলাল নেহরুর ভারত-গড়ার স্বপ্নর মতো। হোয়াট আ ট্র্যাজেডি!

বলেই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করতে লাগল অতীশ উদাত্ত সুললিত গলায়, সুন্দর কাটা কাটা ডিকশানে। তার বাংলা আবৃত্তি শুনে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল মনীষার যে, এই যুবক-ই সরকার অ্যামালগ্যামেটস-এর কর্ণধার।

কালকে রাতে মেঘের গরজনেরিমিঝিমি বাদল-বরিষণেভাবতেছিলেম একা একা–স্বপ্ন যদি যায় রে দেখাআসে যেন তাহার মূর্তি ধরেবাদলা রাতে আধেক ঘুমঘোরে।মাঠে মাঠে বাতাস ফিরে মাতি।বৃথা স্বপ্নে কাটল সারারাতি।হায় রে, সত্য কঠিন ভারী,ইচ্ছামত গড়তে নারি–স্বপ্ন সেও চলে আপন মতে।আমি চলি আমার শূন্যপথে। কালকে ছিল এমন ঘন রাত, আকুল ধারে এমন বারিপাত–মিথ্যা যদি মধুররূপে আসত কাছে চুপে চুপে–তাহা হলে কাহার হত ক্ষতি! স্বপ্ন যদি ধরত সে মুরতি!

–বাঃ।

মনীষা বলল। চমৎকার। চমৎকার আবৃত্তি করেন তো আপনি!

–হ্যাঁ। যে নিজে লিখতে না পারে, নিজের মনের কথা অন্যকে বোঝাতে না পারে; তার অন্যর কবিতা আবৃত্তি করা ছাড়া উপায়-ই বা কী?

–'ক্ষণিকার? না?

–বাঃ। ঠিক ধরেছেন তো! অনেকেই বলতে পারতেন না। রবীন্দ্রনাথ তো অবসলিট-ই হয়ে গেছেন তরুণদের কাছে। তারজন্যে কিছু মডার্ন কবি-সাহিত্যিকও দায়ী। যাঁরা নিজেরাই ভালো করে না পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বাতিল করে দিয়েছেন।

–বাড়াবাড়ি রকমের অডাসিটি! আপনার কী মত জানি না। তেমন বিকল্প না থাকলে বাতিল করাটা স্পর্ধার ব্যাপার। শূন্য-স্পর্ধা। এবার আমিও তাহলে আপনাকে একটু শোনাই। ক্ষণিকা থেকেই।

–বাঃ। ওয়াণ্ডারফুল। এরা ড্রিঙ্কস দিতে এতদেরি করছে কেন? কী হল কী তাজমহল হোটেলের?

বলেই, রুম সার্ভিস; টেলিফোন ডায়ালের ছ-নম্বর ঘোরাল। ওপাশ থেকে উত্তর আসার আগেই বেয়ারা এসে কলিংবেল বাজাল। ফোন নামিয়ে

রেখে, বিল সই করে, টিপস দিয়ে, মনীষার ড্রিঙ্কস নিজে হাতে বানিয়ে দিয়ে মনীষাকে এগিয়ে দিয়ে বলল, ব্লাডি ম্যারিটা শেষ করে নতুনটাতে চুমুক দিয়েই শুরু করুন। গায়ে জোর না করলে দুরূহ কর্ম করা যায় নাকি?

–আমি কিন্তু একটুখানি বলব। শুনে, আপনার বলতে হবে কোন কবিতা।

–পরীক্ষা হোক। আমি জানতাম, আপনি ভালো রবীন্দ্রসংগীত আর অতুলপ্রসাদের গান গাইতে পারেন। আবৃত্তিও করতে পারেন জানতাম না। না!

আবারও চমকাল মনীষা।

–আপনি যে তার-ই সঙ্গে জেনেসিস গ্রুপের ফিল, কলিনস-এর নাম করবেন সেটা জানাও অভাবনীয় ছিল।

অতীশের কথা কেটে দিয়ে মনীষা বলল, একে আবৃত্তি বলে না।

পুনরাবৃত্তিই বলা ভালো। বলেই, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, বেশ ছুটি করিয়ে দিলেন কিন্তু আপনি আজ। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন ক্লাস-কাটে, কলকাতার চাকুরেরা যেমন মিথ্যে কথা বলে অফিস-কাটেন, তেমন-ই আর কী! এমন রোজ রোজ হলে দু-জনের ব্যাবসাই উঠে যাবে। দেখতে হবে না আর।

--যাক। যাক। উঠেই যাক। সঙ্গে যন্ত্রণাটারও শেষ হবে। এই দৌড়ে বেড়ানোর নাম কি জীবন? যতটুকু হয়েছে তাতেই কেটে যাবে বাকি জীবন। আরও আরও করার তো শেষ নেই!

অতীশ বলল।

–এবার শুনুন। আমি কিন্তু অলরেডি হাই হয়ে গেছি। আপনার স্বপ্ন-প্রসঙ্গেই মনে এল কবিতাটি। তাই...

–কিছু হতে হলে হাই হওয়াই ভালো। লো হতে যাবেন কোন দুঃখে? বলুন এবার। অতীশ বলল। কপাল যদি আবার ফিরে যায়প্রভাব কালে হঠাৎ জাগরণে, শূন্য-নদী আবার যদি ভরেশরৎমেঘে ত্বরিত বরিষণে,বন্ধু ফিরে বন্দী করে বুকে,সন্ধি করে অন্ধ অরিদল,অরুণ ঠোঁটে তরুণ ফোটে হাসি,কাজল-চোখে করুণ আঁখিজল,তখন খাতা পোড়াও, খ্যাপা-কবি,দিলের সাথে দিল লাগাও দিল।বাহুর সাথে বাঁধো মৃণাল বাহুচোখের সাথে চোখে মিলাও মিল।

–স্পেনডিড। কবিতার নাম যথাসময়। পাশ?

মনীষা মুখ না তুলেই বলল, পাশ।

এমন কবিতা ওর মনেই বা পড়ল কেন? আর মনে পড়লে বলতেই বা গেল কেন ছাই!

নিজের অবিমৃষ্যকারিতায় হতভম্ব হয়ে ভাবল মনীষা।

২-৪. মনীষার অফিসে

মনীষার অফিসে নিজের সাদা-মার্সিডিস চালিয়ে ওকে পৌঁছে যখন দিয়ে গেল অতীশ তখন চারটে বেজে দশ! কী লজ্জা! এমন কখনো হয়নি আগে।

–সি ইউ এগেন। এরপরের মিটিং-এ যদিও শুধুই বিজনেস ডিসকাসড় হবে, নেভারদিলেস আই ওয়ান্ট দ্যাট মিটিং টু বি আ ক্লোজ-ডোরড ওয়ান। আমারও কোনো এইডস থাকবে না আপনারও না। অ্যাণ্ড রিমেম্বার। ক্লোজ-সার্কিট টিভি ক্যামেরাও যেন না চালানো থাকে আপনার ঘরে। অভ্যন্তরীণ সমস্যা আলোচনা করতে যাব আমি আপনার ক্রেমলিন-এ। আই নো অল বাউট ইয়োর অর্গানাইজেশন। অ্যাণ্ড বাউট দ্যা চেয়ারপার্সন অ্যাজ ওয়েল।

একটু থেমে, হেসে বলল, দশ-বারো দিন সময় দিয়ে গেলাম। দেশবিদেশের সব ডিটেকটিভ-এজেন্সি লাগিয়ে আপনাকে আমার

অর্গানাইজেশান এবং আমার সম্বন্ধে জানবার পূর্ণসুযোগও দিয়ে গেলাম। ন্যাউ, মেক হে! হোয়াইল দ্যা সান শাইনস।

আবার বলল, সি ইউ।

বলেই, মনীষার ডান হাতের পাতাটি নিজের ঠোঁটের কাছে তুলে আলতো চুমু খেল। অতীশ। মনীষার শরীরের মধ্যে প্রথম কৈশোর থেকে জমিয়ে রাখা যা-কিছুই সবচেয়ে দামি বলে জানত, যা কিছুকে কাঠিন্যর ফয়েল দিয়ে মুড়ে রেখেছিল, সব-ই যেন হঠাৎ ফ্রিজ থেকে বের-করা আইসক্রিমের মতোই গলে গেল। ওর বাহ্যিক ব্যক্তিত্বর হিমবাহ হঠাৎ-ই যেন কোনো দৈব দুর্বিপাকে কোনো উষ্ণ সাগরে এসে পড়ে অতিদ্রুত জীবনের নোনা জলে মিশে যেতে লাগল! ভীষণ ইনসিকিয়োর ফিল করতে লাগল ও। আবার দারুণ সিকিয়োরড ও। কী সর্বনাশ যে, ঘটে গেল ওর জীবনে।

সাড়ে-চারটেতে মিটিং ডেকেছিল। মিসেস রতনঝংকার তাঁর কলকাতার ট্রিপ ক্যানসেলও করেছেন। স্যুসি বলল, শি ইজ আ লিটল আপসেট। শি কুড হ্যাভ অ্যাটেনডে আ ফ্রেণ্ডস বার্থ-ডে পার্টি। হার পি-এ টোল্ড মি।

–টেল হার টু গেট লস্ট।

মনীষা বলল। পনেরো-শো টাকাও জলে গেল। এই লাস্ট-মিনিট ক্যানসেলেশনে। ওসব কোনো ব্যাপার-ই নয় এতবড়ো কোম্পানিতে।

কোনো বড়ড়া কোম্পানিতেই নয়। প্রাইভেট সেক্টরে এসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। মিটিং ক্যানসেল করাটাও কোনো ব্যাপার নয়। আফটার অল, সমস্ত বড়ো অর্গানাইজেশানের নাম্বার ওয়ানদের-ই কতগুলো প্রেরোগেটিভস থাকেই। সেইসব প্রেরোগেটিভস সংবিধান মান্য-করা নির্বাক, অভুক্ত জনগণের বাধ্যতামূলকভাবে নেতাদের হাতে তুলে দেওয়া প্রেরোগেটিভস নয়। এই প্রেরোগেটিভস মনীষা অথবা অতীশ নিজে অর্জন করেছে। নিজে হয়তো পুরো করেনি মনীষা, কিন্তু তার পরিবারের অর্থ, তার ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, দিল্লিতে তার পুল এইসব-ইতাকে কিছু স্বাধিকার দিয়েছে। মাঝে মাঝে; সবসময় নয়, এই স্বাধিকার প্রয়োগ করে আহ্লাদিত বোধ করে ও। যেমন আজকের মিটিংটা ক্যানসেল করে বোধ করল। সকলের-ই মাঝে মাঝে জানা উচিত নতুন করে যে, মনীষার সুবিধে-অসুবিধে বা ক্বচিৎ ইচ্ছায় বা অনিচ্ছাতে তার-ই নিয়োজিত এগজিকিউটিভসদের অনেককেই দশ-পনেরো কুড়ি হাজার মাস-মাইনের মানুষদেরও উঠতে বসতে হয়। প্রাইভেট সেক্টরে বড়োচাকরির যেমন সুখ অনেক, অসুখও কম নয়। পাবলিক সেক্টরের বড়ো চাকরিওয়ালারা তার সব খোঁজ হয়তো রাখেন না। ক্বচিৎ এই ভেটো প্রয়োগ করে, ও নিজের ক্ষমতাকে এবং নিজেকেও পুনরাবিষ্কার করে। ইউনাইটেড নেশনস-এর সিকিয়োরিটি কাউন্সিলের মিটিং-এ রাশিয়া বা ইউনাইটেড স্টেটস যেমন করে। নিজের পুনরধিষ্ঠান এবং স্বাধিকারের সীমা সম্বন্ধে বারংবার সচেতন হওয়ার-ই অন্য নাম তো বেঁচে থাকা।

ইন্টারকম তুলে মনীষা বলল, স্যুসি। আই অ্যাম গোয়িং হোম। শ্যাল বি হিয়ার অ্যাট নাইনও ক্লক শার্প টুমরো। বাই। গো থ্রু দ্যা টেলেক্সস অ্যাণ্ড স্যু দ্যা নিডফুল। ডোন্ট ডিস্টার্ব মি অ্যাট দ্যা রেসিডেন্স।

স্যুসি ঘড়ির দিকে চেয়ে অবাক হল। হেডকোয়ার্টার্স থেকে কোনোদিনও পাঁচটার এক মিনিটও আগে অফিস ছেড়ে যান না ম্যাডাম। কোনো বিজনেস কম্পিটিটরের সঙ্গে সাড়ে বারোটায় লাঞ্চে বেরিয়ে চারটে বাজিয়েও ফেরেন না। এই প্রথম! কী হল ম্যাডামের কে জানে; অতীশ সরকারের কথা মনে পড়ল সুসির। ওর মুখে এক স্মিতহাসি ফুটে উঠল। মনে মনে বলল, আফটার অল, ম্যাডামও ওর-ই মতো একটি মেয়েই! অতীশ সরকারকে দেখে এবং তার সঙ্গে কথা বলে যেকোনো মেয়ের-ই শরীর-মন রিকি-ঝিকি করে উঠবে। তা ম্যাডামের আর বিশেষ দোষ কী? ওর বয়ফ্রেণ্ড চেরিয়ান জর্জকে একটা ফোন করল। আজ ও-ও একটু তাড়াতাড়ি বেরোবে।

.

০৩.

মনীষার বিশ্বাস হচ্ছিল না গতকালের কোনো কথাই। ও যে, কী করে এমনভাবে প্রতিপক্ষর কাছের মানুষ হয়ে গেল, তা ভেবে লজ্জা করছিল ওর। ব্লাডি-ম্যারির সঙ্গে কিছু মিশিয়ে টিশিয়ে দিয়ে তাকে দ্রব করে

দেয়নি তো অতীশ?

যা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। অফিসের প্রত্যেককে মনীষা বলে দিল যে, ও লানডান ফ্রাঙ্কফুর্ট থেকে ফিরলেই সরকার অ্যামালগ্যামেটস-এর ওপরে পুরো রিপোর্ট চায়। বম্বে, কলকাতা, ব্যাঙ্গালোর, ম্যাড্রাস এবং দিল্লির আলাদা আলাদা ডিটেকটিভ এজেন্সিকে ভার দেওয়ার কথা বলল। তা ছাড়া কুমুদিনী নিজে যা করার করবে। সিঙ্গাপুরে ওদের কন ম্যানকে ফোন করে বলে দিতে বলল, সরকারদের সিঙ্গাপুরের কোম্পানি সম্বন্ধেও সব খোঁজ খবর নিতে। এও বলে দিল যে, প্রত্যেক ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছ থেকে লিখিত কনফারমেশন নেবে, যাদের এই বিশেষ কাজ দেওয়া হয়েছে এবং হবে যে, সরকার অ্যামালগ্যামেটস তাদের মক্কেল নয়।

লুফৎহানসার ফ্লাইট। ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ নেমে লানডান-এর ফ্লাইট নিল। হিথ্রো এয়ারপোর্টে যখন প্লেনটা ল্যাণ্ড করল তার আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সি গাল একটি। টারম্যাকের পাশের ঘাসে। লানডানে এলেই খুব ভালো লাগে ওর। মা-বাবার সঙ্গে প্রথম এসেছিল যখন ওর বারো বছর বয়স। লানডান ইজ লানডান। ওল্ড ইজ গোল্ড। কিলবি, ওর লানডানের ম্যানেজার নিতে এসেছিল। কিলবিকেও বলে দিল ওই ব্যাপারে।

লানডানের কাজ সেরে যেদিন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এ পৌঁছোল সেদিন শনিবার। ছুটির দিন। ইচ্ছে করেই বেলা এগারোটার ফ্লাইট নিয়েছিল।

ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ কাজেই আসুক আর বেড়াতেই আসুক দিলীপদার বাড়িতেই ওঠে। দিলীপ রায়চৌধুরী। দিলীপদা আর নীলিমা বউদি অফেনবাখ-এ থাকেন। মার্কেটিং স্ফিয়ারে পশ্চিম জার্মানির একজন কেউকেটা দিলীপদা। বাঙালির গর্ব। ওয়েস্ট জার্মানির হুজ হু-তে নাম ছাপা হয়। কুইন এলিজাবেথ যে-মডেলের গাড়ি চড়েন মার্সিডিজ, সেই মডেলের গাড়ি চড়েন দিলীপদাও। ওদের একমাত্র মেয়ে রাজকুমারীও রাজকুমারীর-ই মতো দেখতে। চেহারায় তো অতিসুন্দরীই তার চেয়ে বড়োকথা ওর ডিম্যেনুর। রাজকুমারীদের-ই মতো। জার্মানটা তো জার্মানদের মতোই বলে, ফ্রেঞ্চ এবং ইংরেজিও সেরকম-ই বলে। অথচ বাঙালি সংস্কৃতিও পুরোপুরি বাঁচিয়ে রেখেছে। ওর পড়াশুনা শেষ হলে, দিলীপদার সঙ্গে একটা ভেঞ্চার করে রাজকুমারীকে এখানে তার হেড করে দেবে ইচ্ছে আছে মনীষার। তার আগে বোম্বেতে নিয়ে এসে মাস ছয়েক ওর সঙ্গে রাখবে। হাতেকলমে কাজ দেখাবার জন্যে। দিলীপদাও তাঁর অফিসে মাসদুয়েক রেখে শেখাতে পারেন।

রিজার্ভ-ব্যাঙ্ক যদি আর একটু লিবারাল হত তবে ব্যাবসা, বিদেশে কেমন করে করতে হয় দেখিয়ে দিত মনীষা।

অবশ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কেরও তেমন দোষ নেই। চারধারে চোরেদের এত ভিড় যে, সবাইকেই চোর ভাবেন তারা। অবশ্য মনীষার কোনো প্রবলেম হয় না। হবেও না যতদিন অমিতাভ কাকা ডেপুটি গভর্নর। এই সময়টাতে

দিল্লিতে অনেক-ই বড়ো বড়ো পদে দেখা যাচ্ছে বাঙালিদের অনেকদিন পর। বলতে হবে ভেরি প্লেজেন্ট কোইনসিডেণ্ড। বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস-এর চেয়ারম্যান এখন জে জে দত্ত সাহেব। রেভিন সেক্রেটারি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহেব। বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেসের মেম্বার ইনভেস্টিগেশন এস কে রায় সাহেব। চেয়ারম্যান টিঙ্ক সাহেবের ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কে যাওয়ার একটা গুজব শুনছে। যদি চলে যান, পেলে কী আর অমন লুক্রেটিভ প্রেস্টিজাস পোস্ট ছেড়ে দেবেন? যদি চলেই যান তবে হয়তো রায়সাহেব-ই চেয়ারম্যান হবেন সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডায়রেক্ট ট্যাক্সেস-এর। রায়সাহেব নিজে অবশ্য কখনোই এমন সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেন না। বলেন কারা যে, গুজব রটাচ্ছে, জানি না। গুজবও হতে পারে। গুজব, এই গুজবের-ই দেশ ভারতবর্ষ!

অবশ্য টিঙ্ক সাহেবও মানুষ চমৎকার। রায়সাহেবদের-ই ব্যাচমেট। নারায়ণ সাহেব যখন চেয়ারম্যান ছিলেন আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মনীষাকে ওরা সকলেই চেনেন এবং অতটুকু মেয়ে এতবড়ো ব্যাবসা একা হাতে এফিসিয়েন্টলি চালাচ্ছে দেখে, ওকে সবসময়ই সাহায্য করেন ওঁরা প্রত্যেকেই। যখন যতটুকু দরকার পড়ে। মেয়ের-ই মতো দেখেন সকলে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টে ল্যাণ্ড করার পর মনীষা দেখল, ওকে নিতে এসেছেন দিলীপদাই। কিন্তু রায়চৌধুরী নন, দিলীপ চ্যাটার্জি। খুবই মজার মানুষ।

দিলটাও অন্য দিলীপদার-ই মতো বড়ো। ওঁর স্ত্রী জয়া। বিজয়ওয়াড়ার মেয়ে। এখানের হাসপাতালে আছেন। খুব-ই ভালোমনের মেয়ে। আর ওঁদের একমাত্র ছেলে, দশ বছরের বাপির মতো হ্যাঁণ্ডসাম ছেলে মনীষা জীবনেও দেখেনি। মনীষা ঠাট্টা করে বলে যে, বাপি একা হাতেই নাতসি-জার্মানির সর্বনাশ করে দেবে বড়ো হয়ে। জার্মান মেয়েদের এতবড়ো কিলার আর হবে না কখনো। বাপি জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা তেমন বলতে পারে না। ইংরেজি অবশ্য বলে। সেইটাই বড়ো হলে গুণ হয়ে দাঁড়াবে। ও একাই জার্মানির মহিলাকুলে কৃষ্ণ হয়ে শ্বেতাঙ্গিনিদের নাকানিচোবানি খাওয়াবে। মনীষার বিশ্বাস। খুব-ই সপ্রতিভ ছেলে।

গাড়িতে উঠেই দিলীপদা বললেন, রায়চৌধুরী একটু বার্লিনে গেছে কাজে। তাই আমরাই নিতে এলাম। রাতে ভূপাল রায় আর মিসেস রায় পীযূষ বিশ্বাসের বাড়ি আসবেন। তোমাকে শুঁটকি মাছ খাবার নেমন্তন্ন করেছেন পীযূষবাবু। মনীষা হাসল, কৃতজ্ঞতায়; ভালোলাগায়। এঁদের কাছে কত কীই যে পায়, পেয়েছে; বদলে কিছুমাত্রই করতে পারে না। বড়োজোর কখনো এয়ারপোর্ট গাড়ি পাঠানো। বা কানেকটিং ফ্লাইটের দেরি থাকলে বাড়িতে বা হোটেলে ডিনার খাওয়ানো। তাও দু-তিনবছরে একবার।

একটি ভারী চিঠি দিলেন দিলীপদা। বললেন, রায়চৌধুরীর বাড়িতে সিঙ্গাপুর থেকে কে পাঠিয়েছে তোমাকে স্কাইপ্যাক কুরিয়ার-সার্ভিসে।

মনীষা খামটা নিয়ে দেখল, লেখা আছে : ফ্রম : এস অ্যামালগ্যামেটস।

বুক ঢিপঢিপ করতে লাগল মনীষার।

জয়া বউদি বললেন, কী হল তোমার? শরীর খারাপ?

–না।

একটু পরে বলল, দিলীপদা। এবারে কিন্তু আমি ফ্রাঙ্কফুর্টে হোটেলেই উঠব। বুকিং করা আছে। আমার অনেকগুলো বিজনেস-মিটিং আছে। অফেনবাখ বা তোমাদের ওখান থেকে আসা-যাওয়া করতে অসুবিধে হবে।

–আহা! অফেনবাখ অথবা আমাদের বাড়ি যেন ফ্র্যাঙ্কফুর্ট থেকে কতই দূর? হেসে বলল, জয়া।

–না। তা ছাড়া দিলীপদাও তো নেই।

–বাঃ নীলিমা আর রাজকুমারী তো আছে। ওদের কাছেই তো নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে। তা ছাড়া ওরা না থাকলেও আমার বাড়িতে কি থাকতে পারবে না দু-দিন?

–থাকতে পারতাম সকলের কাছেই। কিন্তু মিটিং চলবে দেরি করে। হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলেই ডিনার অ্যারেঞ্জ করেছেন ওঁরা।

দিলীপ বলল, ঠিক আছে। তোমাকে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আমরা চলে

যাচ্ছি। রাতে

আমরা সকলে এসে তোমাকে নিয়ে যাব।

–শুঁটকি মাছটা কাল রাতেই কোরো। পীযূষদা আর ভূপালদাকে বোলো। বউদিদেরও। রেলিশ করে খাব কাজ-টাজ শেষ করে। সকাল দশটাতে ফ্লাইট। পরশু। অসুবিধে হবে না কোনো।

ওকে! দিলীপদা বলল। তুমি যেমন বলবে। কাজ করতেই তো আসা। কাজে বাগড়া দেবই বা কেন আমরা! অবুঝ তো নই!

তারপর বলল, আমার আর দিলীপের তো প্রায় তিরিশ বছর হয়ে গেল জার্মানিতে! এখানের লোকেদের মুখে শিখেছিলাম: ওয়ার্ক কামস ফাস্ট ইন আ ম্যানস লাইফ। এখন দেখছি শুধু ম্যানস নয়, ইন আ উওম্যানস লাইফ অ্যাজ ওয়েল।

জয়া বলল, বলো ইন আ পার্সনস লাইফ।

–দ্যাটস রাইট। গত তিরিশ বছরে শুধু জার্মানিই নয়, আমাদের দেশও অনেক বদলে গেছে। নইলে এতটুকু মেয়ে সারাপৃথিবীময় ঘুরে ব্যাবসা করছে। তাও আবার বাঙালি মেয়ে। আমাদের সময় তো ভাবাই যেত না।

জয়া বউদি দিলীপদার এবং অন্য সকলের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা

বলেন। জার্মান অবশ্য

বলেন জার্মানদের মতোই। জার্মান হাসপাতালে কাজ।

মনীষা বলল জয়াকে, রাগ করলে না তো তোমরা বউদি?

–তোমাকে তো আর নতুন দেখছি না আমরা। এত সহজেই রাগ করব?

হোটেলে নেমে আঙুল দিয়ে নামটা দেখিয়ে আগামীকাল সকালে ফোন করতে বলল ওদের।

ফ্র্যাঙ্কফুর্ট-এর সবচেয়ে ভালো হোটেল। নাম্বার বের করে নেওয়া কোনো প্রবলেম নয় কারও পক্ষেই। গাড়ি থেকে ব্যাগটাকে দিলীপদা নামিয়ে দিয়ে যখন চলে গেল তখন ভাবল ও। কিন্তু মুশকিল হল হোটেলে নামবার পর।

কোনো ঘর নেই বলল রিসেপশন থেকে।

–সরি, একটিও নয়।

–ঘর থাকার কথাও নয়।

বম্বের তাজ বা ওবেরয় টাওয়ার্স, দিল্লির হায়াত রিজেন্সি বা মৌরীয়া শেরাটনে বা তাজ-এ গিয়েও উইদাউট রিজার্ভেশনে ঘর পাওয়া মুশকিল।

আসলে তো ওর বুকিং ছিলও না। অতীশের চিঠিটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ও ডিসিশান নিয়ে মিথ্যে কথাটা বলেছিল। ওর হাত-পা আবারও ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কারও বাড়িতে থাকলে কিছুটা সামাজিকতা তো করতে হয়-ই! ও এখন একেবারেই একা থাকতে চায়। অতীশ কী লিখেছে তা পড়তে চায়। ধারে-কাছে আর কাউকেই এখন ও চায় না। কাউকেই নয়। কী করে ও দিলীপদার, মানে যেখানে ওঠবার কথা ছিল ওর, তার ঠিকানা জানল? রীতিমতো আন-নার্ভিং ব্যাপার।

হোটেলের লবি থেকে ওর কাস্টমারের বড়োসাহেবকে ফোন করে বলল, অন্য জায়গায় থাকার কথা ছিল কিন্তু ও ডিসিশন চেঞ্জ করছে; ইনি কি একটা ঘর...।

কার্ল রিমেনস্নাইডার বলল, এম এস বাসু। আপনি রিসেপশানে আবার ফিরে যেতে যেতেই আপনার ঘর ওই হোটেলেই আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

এবারে রিসেপশানে ফিরে যেতেই একেবারে ভি আই পি ট্রিটমেন্ট।

মনীষা ভাবল, নাঃ। রিমেনস্নাইডারের হোল্ড আছে।

তারপর হেসে রিসেপশানের মেয়েটিকে বলল, তাহলে এই যে, আমাকে বললেন ঘর । নেই।

–ঘর সত্যিই নেই। ইটস দ্যা বেস্ট স্যুইট উই হ্যাভ। আই ডিডনট টেল

আ লাই!

–সুইট?

–ইয়েস ম্যাম। সুইট, অ্যাণ্ড দ্যা বেস্ট স্যুইট ইন দ্যা বেস্ট হোটেল ইন ফ্রাঙ্কফুর্ট!

অ্যামেরিকান আর্মির বেস থাকাতে ফ্রাঙ্কফুর্টের অনেকেই ইংরেজি শিখে নিয়েছে। হোটেলে তো ইংরেজি জানেই সকলে। তবে জার্মান জাতের রকমটাই একটু আলাদা বলেই যেন কী ইস্ট আর কী ওয়েস্ট জার্মানি সব জায়গাতেই জার্মানরা এক হতে চাইছে! হাবে-ভাবে বোঝা যায়। দুই জার্মানিকে এক হতে দিতে রাশিয়া বা আমেরিকা কেউই চায় না। বিরাট স্যুইট। ভারতীয় টাকা দিয়ে ডয়েশ মার্ককে গুণ করতেই দেখা গেল যে, স্যুইটের ভাড়া দিনে আট হাজার টাকা! মনীষা ভয় পেয়ে বেডরুমে না ঢুকেই সিটিং রুম থেকে রিসেপশানে ফোন করল।

–কোনো গোলমাল হল না তো!

তারা বলল, কোথাওই ভুল হয়নি। ইউ আর মিস্টার রিমেনস্নাইডারস গেস্ট।

মনীষা পড়ল বিপদে। সারাবছরে এই কাস্টমারের সঙ্গে এম বি ইন্টারন্যাশনাল এমনকিছু বিরাট ব্যাবসা করে না অথবা করবার আশু

সম্ভাবনাও নেই। খাতিরটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের মনে হল। তখনও বেডরুমে না ঢুকেও নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে রিমেনস্নাইডারকে ফোন করল আবার।

কার্ল বলল, আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমাকে অটো হেফফনার ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন যে, ইউ শুড বি লুকড আফটার লাইক আ প্রিন্সেস। ইটস অ্যান অর্ডার। ইউ নো! হিজ উইশ ইজ আ কম্যাণ্ড টু মি।

কে হেফফনার? আমি তো চিনি না। মনীষা আরও বিপদে পড়ে বলল অসহায়ের মতো।

তারপর বলল, প্লে-বয় ম্যাগাজিনের হিউ হেফনার না তো?

–তুমি অটোকে না চিনতে পারো। কিন্তু পশ্চিম জার্মানির সকলেই তাকে চেনে। এত বড়োলোক পশ্চিম-জার্মানিতে কম-ই আছেন।

–কিন্তু আমার তো এই হোটেলে ওঠার-ই কথা ছিল না।

তখনও সন্দিগ্ধ গলায় বলল মনীষা।

–তা আমি জানি। দিলীপ রায়চৌধুরীর অফেনবাখ-এর বাড়িতে তোমার জন্যে হলুদ গোলাপের বোকে এবং ওয়াইন-এর বাস্কেট পৌঁছে গেছে তোমার ফ্লাইট ল্যাণ্ড করার সঙ্গে সঙ্গেই। তুমি আমাকে ফোন করবার

পরও আমি যদি তোমার জন্যে এমন ব্যবহার না করি, তাহলে আমার সঙ্গেই ব্যাবসা বন্ধ হয়ে যাবে। বছরে কত বিলিয়ন মার্ক-এর ব্যাবসা করি, হেফফনারের সঙ্গে তা তুমি জানো না, এম এস বাসু। আমি তোমার ব্যাপারে কোনো ঝুঁকিই নিতে পারি না। আই কানট অ্যাফোর্ড টু। এবারে আমি কিছুই করছি না। হেফফনার-এর অতিথি তুমি। কার ইনস্ট্রাকশানে হেফফনার তোমাকে প্রিন্সেস-এর ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে তা অবশ্য আমি বলতে পারব না।

মহাবিপদেই পড়ল মনীষা। এদিকে স্নান করতে ইচ্ছে করছে খুব। কিছুই করতে পারছে না। অতীশের চিঠিটা পর্যন্ত খুলতে পারছে না।

নীলিমা বউদিকে ফোন করল একটা। বউদি বললেন, আরে। ফুলে-ফলে আমার ফ্ল্যাট ভরে গেল, ওয়াইন এসেছে এক ঝুড়ি। তুই কোন জার্মান বিজনেস ম্যাগনেট-এর সঙ্গে প্রেমে পড়লি রে? ফ্রাঙ্কফুর্টের সবচেয়ে এক্সপেনসিভ ফ্লোরিস্ট-এর দোকান থেকে ফুল এসেছে। রেয়ারেস্ট ওয়াইনস। তোর দাদা থাকলে এখানে সব নিজেই নিয়ে নিত। বলত, ওয়াইনের কদর ইউরোপের লোকেরাই করতে পারে। তোর ওপরে এসব ওয়েস্ট!

–তা সব-ই দাদার জন্যেই রেখে দাও। দুই দিলীপদাকে ভাগ করে দিয়ে।

–তা না হয় হবে।

–কিন্তু পাঠালটা কে?

–সে কী? তুই নিজেই জানিস না?

–না। এ তো রহস্য-কাহিনির মতো শোনাচ্ছে। তুমি কার্ডটা খোলো তো।

–সে কী রে! তোকে কে পাঠিয়েছে ভালোবেসে। আমি খুলে পড়ব? প্রিন্স-ট্রিন্স হলে যদি আমিই এই বয়সে নতুন করে প্রেমে পড়ে যাই? তোর দাদার কী হবে?

--ছাড়ো তো দাদার কথা। প্রেমের আবার কোনো বিশেষ বয়স আছে নাকি? কলার খোসায় পা পড়ার মতো! পড়লে হড়কাতে হবেই।

মনীষা বলল আর উপায় কী বলো বউদি? তোমার এখানে আসতে অথবা আমারও যেতে তো পনেরো-কুড়ি মিনিট লেগে যাবেই এই পিক আওয়ারে! কে পাঠাল তাই যদি না জানা যায়!

–ধর। দেখি, খুলি। আরে! এ কী কান্ডরে! এ কোন প্রিন্স-চার্মিং লেখা আছে উইথ লাভ! অ্যাটিশ?

–কিন্তু সে পাপিষ্ঠের নামটা তো বলবে?

বুকটা ধক করে উঠল মনীষার। মুখে যতই সপ্রতিভতা ঝরাক না কেন!

বউদি বলল, অ্যাটিশ! সে কে রে। জার্মান নাম বলে মনে হচ্ছে। রাশ্যানও হতে পারে। মনীষা বলল, অ্যাটিশ। তাই বলো বউদি। বুঝেছি! সেই বদমাশটা। হতচ্ছাড়া।

–কে? কে রে মনীষা?

–ওই একটা জার্মান প্লে-বয়, না-না জার্মান ঠিক নয়। অস্ট্রিয়ান প্রিন্স টিরল-এ বাড়ি। লানডানে মিট করেছিলাম। বিলিয়নিয়র! অনেক ব্যাবসাও আছে। আমি আজ-ই পালাব এখান থেকে। বলে ফেলেই ভাবল, সর্বনাশ হল। পালিয়ে এসেই আবারও পালানোর কথা?

–সে কী রে? তাহলে এখানে চলে আয়। পুলিশকে ইনফর্ম করব?

–না, না। আর একটু দেখি। তোমাদের জানাব। দরকার হলেই জানাব।

.

টেলিফোনটা নামিয়ে রাখতেই রিমেনস্নাইডার আবার ফোন করে বলল, আর ইউ কম্ফর্টেবল? আমাকে হেফফনার এক্ষুনি ফোন করে বলল যে, আমার সঙ্গে তোমার মিটিং-এর দরকার নেই। মানে, তুমি যে-জন্যে এখানে এসেছিলে। তোমরা গত ছ-মাসে যা এক্সপোর্ট করেছিলে তার দশগুণ বেশি মাল আগামী ছ-মাসে কোরো। সেম এফ. ও. বি. প্রাইসে। তোমার সঙ্গে আমার মিটিং শেষ হল। ও আর একটা কথা ইন্সপেকশান

কিন্তু জিনিভায় সার্ভেল্যান্সকে দিয়ে করতে হবে। এস. জি. এস. জিনিভা। ওদের সঙ্গে ইণ্ডিয়ার যে কোম্পানির এগ্রিমেন্ট আছে, সেই কোম্পানি করলেও হবে। রাখলাম। রিল্যাক্স ম্যাম। পরশু সকালে ঠিক সময়ে গাড়ি যাবে তোমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছোতে। টেক ইয়োর ওন টাইম অ্যাণ্ড এনজয়। তোমার গাড়ি হোটেলে পৌঁছে গেছে। রিসেপশানে বললেই হবে। চব্বিশ ঘণ্টা একটি সোফার ড্রিভন মার্সিডিস হোটেলের পার্কিং লনে থাকবে তোমার জন্যে! গুটেন-মর্গেন ম্যাম। তিনজন সোফার শিফট-ডিউটিতে থাকবে।

বলেই, রিমেনস্নাইডার লাইন ছেড়ে দিল।

ও ধপাস করে বসে পড়ল সোফাতে সারাদিন স্কুল করা নীচু ক্লাসের আলুথালু ছাত্রীর মতো। ওর বুদ্ধি যত, সব-ই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে গেছে। বুদ্ধি ওর কিছু কম নেই বলেই জানত। কিন্তু জড়ো করতে সময় লাগবে!

মনীষা ভাবল, এবার সবচেয়ে আগে যা করা দরকার তা হচ্ছে অতীশের চিঠিটা পড়া। এই চক্রান্তর কারণটা কী তা জানতে হবে। ভাগ্যিস নীলিমা বউদি অতীশ নামটা বুঝতে পারেনি। জার্মানিতে পরিচিত বাঙালিদের একে অন্যে সকলেই চেনে। ওই ফুলের দোকান থেকে ফুল কিনে আর প্রচন্ড এক্সপেনসিভ রেয়ারেস্ট-ওয়াইনস দিয়ে ডালি সাজিয়ে দেওয়ার মতো বাঙালির সংখ্যা ওখানে বেশি নেইও। তাই বেচারি নীলিমা বউদি ভেবেছে মনীষার কোনো জার্মান বিজনেস কানেকশান হবে হয়তো।

কিংবা কোনো কোম্পানির নাম!

ভুলে যাওয়ার আগে আর একবার ফোন করার কথা ভাবল, নীলিমা বউদিকে ওগুলো ওকে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে। তারপর-ই ভাবল, অতটুকু বুদ্ধি ওঁর আছে। তা ছাড়া ওঁরও সোফার-ড্রিভন গাড়িও যখন আছে।

এবার আর সময় নষ্ট নয়। স্যুটকেসটা খুলে পায়জামা আর টপটা বের করে বেডরুমে ঢুকে সব জামাকাপড় খুলে বাথরুমে গেল মনীষা অতীশের চিঠিটা নিয়ে। যাওয়ার সময় নিজের মুখোশটাকেও খুলে ফেলে একেবারে নিরাবরণ হয়ে গেল। গরম ও ঠাণ্ডা জল মিশিয়ে ক্রিস্টালের ট্রান্সপারেন্ট বাথটাবের দু-টি কল খুলে পেপার-কাটারের অভাবে হাত দিয়েই চিঠিটা খুলে বাথটাবে শুয়ে পড়ল।

যদিও সিংগাপুরের হোটেল থেকে অনিয়ন-স্কিন পেপারে লিখেছে অতীশ তবুও রীতিমতো ভারী চিঠি।

কী চমৎকার বাংলা হাতের লেখা। ভাবা যায় না! মুগ্ধ হল মনীষা। কয়েক লাইন পড়তেই বুঝল, হাতের লেখা; যাঁরা সাইন বোর্ড লেখেন তাঁদেরও চমৎকার হয়। কিন্তু হাতের লেখা আর লেখার হাতের এমন মণিকাঞ্চন যোগ বড়ো একটা হয় না।

ব্যাংকক

মনীষা, কুরিয়ার-সার্ভিসে পাঠানো এই চিঠি, আমার অনুমান, তোমাকে যাঁরা এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে আসবেন (দিলীপ রায়চৌধুরী অথবা দিলীপ চ্যাটার্জি) নিশ্চয়ই ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টেই তোমার জন্যে নিয়ে আসবেন! এবং তুমি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে আমি ওঁদের ঠিকানা কী করে জানলাম তা ভেবে।

কী করে জানলাম, তা নাই-ই বা জানলে। তবে বুঝতে নিশ্চয়ই পারছ যে, তোমার চেয়ে আমার অর্গানাইজেশান অনেক এফিসিয়েন্ট। লানডান-এ তুমি কোন হোটেলে ছিলে তাও আমি জানতাম। কিন্তু ফোন করিনি ইচ্ছে করেই। ফোন করলে সকালবেলার এই প্রেজেন্ট অথবা আনপ্লেজেন্ট সারপ্রাইজ তোমাকে দিতে পারতাম না।

–এই অবধি পড়েই মনীষা ভাবল অতীশ বড়োই ফাস্ট-ওয়ার্কার। আর তুমি সম্বোধন করে লেখার অধিকার সে কী করে পেল কে জানে!

তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, মানুষটার সাহস তো কম নয়! তুমি সম্বোধন করেছে!

অস্বীকার করব না যে, আমি দুঃসাহসী। আর যাই হোক সাহসের অভাব নিয়ে সারাপৃথিবীতে এতবড়ো ব্যাবসা চালানো যায় না। সাহস তোমারও আছে, স্বীকার করি। নইলে ভারতবর্ষের মতো জায়গাতে একজন মেয়ে হয়ে তুমিও এতবড়ো ব্যাবসায়িক সাম্রাজ্য চালাতে পারতে না। আমাদের

দেশে মহিলা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেয়েও বয়সে তিরিশের নীচে থেকেও হাঙর-কুমির অধ্যুষিত পরিবেশে এতবড়ো ব্যাবসা তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারত না। আমিও হাঙর।

আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলে যে, কলকাতার বি. বি. ডি. বাগে যতরকম এবং যতসংখ্যক মাংসাশী হিংস্র শ্বাপদ আছে, তা ভারতবর্ষের কোনো জঙ্গলেও নেই। কথাটা শুধু আমাদের দেশের বড়ো বড়ো শহরের ব্যাবসা-কেন্দ্রগুলি সম্বন্ধে নয়, পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড়ো ব্যাবসাকেন্দ্রিক শহরগুলি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

আমিও অনেক-ই হিংস্র জন্তুর মধ্যে একজন। প্রতিযোগীকে ঘাড় কামড়ে রক্ত চুষে খেয়ে চিরদিন-ই আমি এক গভীর আনন্দ পেয়েছি। প্রতিযোগীর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে নভোস্থল থেকে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশে যেতেও আমার কখনো দ্বিধা হয়নি।

কিন্তু আমি একাই নই। তুমিও আমার-ই মতো। আমি বড়ো হাঙর।

তুমি আমার চেয়ে একটু ছোটো। আমার মতো মানসিকতা তোমারও। নইলে বেঁচে থাকতেই পারতে না, এই নির্মম প্রতিযোগিতার পৃথিবীতে। তুমি যে, বহালতবিয়তে বেঁচে আছ এবং তোমার ব্যাবসা ক্রমশ-ই বড়ো করে তুলছ তাতে একথাই প্রমাণ হয় যে, তুমিও ভ্যাম্পায়ারের মতো প্রতিযোগীর রক্ত খেতে ভালোবাসো।

আমরা হয় বাঘ নয় হাঙর। কিন্তু আমি এই ক্রমাগত যুদ্ধের খেলায় মেতে থেকে যুদ্ধের দামামার শব্দে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বোধ হয় ভুলেই যেতে বসেছিলাম যে, হাঙর কিংবা বাঘেরাও তাদের প্রজাতির জন্য কারও সঙ্গে প্রাকৃতিক নিয়মেই প্রাপ্তবয়স্ক হলে মিলিত হয়। হাঙর অথবা বাঘও তার নিজের প্রজাতির অন্য লিঙ্গর কারও সঙ্গে সহবাস করে। সংসার পাতে অল্পদিনের জন্য। ঘাড় কামড়ে ধরে মিলনের সময়। তখন সে-কামড় প্রাণহরণের জন্যে নয় মিলনের আনন্দকে তীব্রতর করার জন্যেই।

মনীষা, অতীশ সরকার এতদিন ভাবত যে, সে তার ব্যাবসাকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। তার জীবনে প্রেম বা বিবাহর মতো মূর্খামি অথবা বিলাসিতার সময় কখনোই হবে না। কিন্তু তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই আমি নিজেকে নিয়ে বড়োই মুশকিলে পড়েছি। ব্যাবসা আমার মাথায় উঠেছে। সমস্তক্ষণ শুধু তোমার কথাই ভাবছি। হঠাৎ-ই যেন বুঝতে পারছি যে, জীবনে ব্যাবসাই সব নয়, টাকা, সম্পত্তি, মান, যশ ক্ষমতাই শেষকথা নয়। প্রত্যেকের-ই ফুরোয় একসময়। এই ফুরিয়ে যাওয়া দুঃখের নয়। নদী যখন সাগরে গিয়ে মেশে তখন-ই তার যাত্রা সার্থক হয়, পরিপূর্ণ; পরিপ্লুত হয় সে। আমার পথ চলা এ জীবনের মতো সাঙ্গ করার সময় এখনও হয়নি। তবে যতিচিহ্নর সময় হয়েছে। তোমার সঙ্গে মিলিত না হতে পারলে, তোমাকে নিয়ে ঘর না বাঁধতে পারলে আমার এই গন্তব্যহীন চলাকে চিরদিনের মতো স্তব্ধ করে দিতে হবে।

মানুষ হিসেবে, আমার কারও কাছে হারবার সময় এসেছে। বুঝতে পারছি যে, জীবনে কোনো কোনো হার অনেক-ই বড়ো বড়ো জিত-এর চেয়েও অনেক-ই বেশি দামি। এবং এই হার স্বীকারের প্রকৃত মূল্য যারা না বোঝে, জীবনের পথে কোনো ছায়াচ্ছন্ন রম্য বাঁকে এসে নিজেকে যে, পথশ্রান্ত পথিক বলে না মনে করে, না বোঝে যে, কারও কোলে মাথা দিয়ে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশ পেয়েছে, সব ক্লান্তি অপনোদনের, তার যেমন করেই হোক করা উচিত, তবে বলতে হবে যে, সে বড়োই অভাগা।

তেমন কোনো মানুষের খোঁজ সে যখন পায়, যে তার মনের মানুষ। তার মনুষ্যত্ব বোধ হয় তখন-ই সম্পূর্ণতার দিকে ধাবিত হয়। আমার মনে হচ্ছে, তোমাকে দেখার পর থেকেই আমিও আমার জীবনের পথে তেমন-ই কোনো বাঁকে এসে পৌঁছেছি।

আমার এই পথ অন্ধগলি যাতে না হয়ে ওঠে, অন্য কারও হাতে হাত রেখে এই চলাকে যাতে আরও দুর্বার অর্থময় ও সুস্থির গন্তব্য চলা না-করে তুলতে পারি তাহলে সারাজীবন-ই শুধু পথের ধুলাতেই ধূলিধূসরিত হব। কোনো এক বন্ধনহীন প্রাপ্তিতে যদি পথের সাথিকে বাঁধতেই না পারি তাহলে এই চলা এবং গতি সম্পূর্ণই নিরর্থক হয়ে উঠবে।

আমি জানি, যতটুকু তোমাকে জেনেছি তাতে; যে-তুমি আমার হাতে তোমার হাত যে, রাখবেই তার কোনো স্থিরতা নেই। বেশিরভাগ মেয়েকেই বুঝতে আমার আধঘণ্টাও লাগেনি। মিথ্যে বলব না, দেশে এবং

বিদেশে বহুজাতীয় নারীর সঙ্গে আমি সহবাস করেছি। ব্যাবসার কারণে ছাড়া, ব্যক্তিজীবনে আমি কখনো কারও সঙ্গেই মিথ্যাচার করিনি। আমি যা, তা তোমাকে জানাতে চাই কিছুই না-ঢেকে। এই বহুজাতিক শব্দটিতে জাত কেবল চামড়ার রঙেই সীমাবদ্ধ নয়। অনেক-ই রকম মানসিক স্তরের নারীর কথাও আমি বলছি। কিন্তু কখনো এমন অঘটন ঘটেনি যে, কাউকে প্রথম দর্শনেই জীবন-সঙ্গিনী করতে ইচ্ছে জেগেছে। কারও হাতে ঠোঁট-ছাঁওয়াতেই আমার স্কোয়াশ-খেলা ঋজু পাইনের মতো শরীরকে উইপিং উইলোর মতো নুয়ে পড়া মনে হয়েছে। অথচ নুয়ে-পড়ার মধ্যেও যে, এত গভীর আনন্দ তা সেদিনের আগে কখনো জানিনি।

তুমি হয়তো ভাববে যে, আমি কী লজ্জাহীন, অভিমানহীন অথবা আত্মসম্মানজ্ঞানহীন! তা হয়তো ভাববে। কিন্তু আমার চরিত্রে শিশুকাল থেকে দু-টি দোষ কখনোই ছিল না। এক ভয়। অন্যটি দ্বিধা। যখন আমি ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র, তখন আমার বাবা আমাকে একদিন ওঁর ঘরে ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, এক জীবনে অগণ্য মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে, পরিচয় হবে; কাছাকাছি আসবি তাদের। কোনো পুরুষের মতো পুরুষের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন মনে হবে যে, ঘর বাঁধার মতো কারও মুখোমুখি এসেছিস তখন তাকে জানাতে দ্বিধা করবি না যে, তুই তাকে চাস। হাঁটু গেড়ে তার পায়ের কাছে বসে বলবি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। কাউকে ভালোবাসার কথা বলার মধ্যে নিজেকে ছোটো করার কোনো ব্যাপার নেই। ঈশ্বর আর প্রেমিকের কাছে নতজানু হলে মানুষের

সম্মান-ই বাড়ে। আত্মা শুদ্ধিকর যা, তা করতে কখনো দেরি করিস না। ভয়ও পাস না।

কোনো নারীর কাছে নতজানু হয়ে আমি তোমাকে ভালোবাসি বলার পর সেই নারী দু টির মধ্যে একটি জিনিস-ই করতে পারে। তার বেশি ঘটনীয় আর কিছুই নেই। হয় সে তোকে তার মৃণালভুজে টেনে নেবে, নয় সে তোর বুকে পদাঘাত করবে।

বলেছিলেন, জীবনে সতোর কোনো বিকল্প নেই। অন্তত কিছু কিছু ব্যাপারে। ব্যাবসা করতে নেমে সবসময় সততা নিয়ে চলে না। প্রতিযোগী শঠ হলে তার সঙ্গে শঠের মতোই ব্যবহার করবি। শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। তার সঙ্গে ভালোমানুষি করা মানে মৃত্যু। হেরে যাওয়া। কিন্তু প্রেমের বেলায় তোর প্রাণের পরমনৈবেদ্য কোনো নারীর কোমল হাতে সতোর সঙ্গে তুলে দিবি। গ্রহণ করলে তো তুই ধন্যই হলি। গ্রহণ না করলেও ছোটো হয়ে গেলি এমন ভাবিস না। সৎ-প্রেম নিবেদন করলে আত্মাই উজ্জ্বলতা পায়।

মনীষা, আমিও বিশ্বাস করি যে, দুঃখ না পেলে মানুষ পূর্ণতা পায় না। দুঃখ পেলে পাব। দুঃখের বা মিথ্যে অহমিকাভরা অভিমানে ঘা লাগবার ভয় যে-করে তার দ্বারা আর যাই-ই হোক শুদ্ধ প্রেম কখনোই হয় না।

মনের মানুষ কারও জীবনেই বার বার মুখোমুখি আসে না। এলে, তাকে

চিনতে ভুল করাটা বোধ হয় পরমমূর্খতা। তার জন্যেই প্রতীক্ষা করেছিলাম।

আমার মনে হয় যে-মানুষ নিজে যে-মানসিক স্তরের তার কখনো অযোগ্য কাউকে বিকল্প করা অনুচিত। এই স্তর বলতে–আমি অর্থনৈতিক, জাতিগত, সামাজিক-পরিচয়গত স্তরের কথা বলছি না। আশাকরি তুমি বুঝবে মানসিক স্তর বলতে আমি কী বোঝাতে চাইছি। ভিন্ন স্তরের মানসিকতার একজন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে-সম্পর্ক গড়ে ওঠে কখনো-কখনো; সে-প্রেম, প্রেম নয়। হঠকারিতা, করুণা, দয়া, বা অনুকম্পাই মাত্র। এইসব অনুভূতি নির্ভর প্রেম আসলে মোহ। মোহর বিভিন্ন স্তর। তার আয়ু অত্যন্ত স্বল্প। স্বল্প বলেই আমাদের দেশে পর্যন্ত ডিভোর্সের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে।

বাবা এও বলেছিলেন যে, আমি জাত মানি না, দেশ মানি না, শুধু মানুষ মানি। তুই আমার একমাত্র সন্তান। তোর সুখ-ই আমার সুখ। তুই যাকে হাতে ধরে তোর বলে আনবি আমি তাকেই বরণ করে নেব। তার সঙ্গে আমি শোবও না, সংসারও করব না। আমার মতামত এই ব্যাপারে ইমম্যাটেরিয়াল।

জানো মনীষা। বাবা চলে গেছেন আজ দশ বছর হল।

আমারও বয়স পঁয়ত্রিশ হল। দেখায় হয়তো কম।

তোমাকে সেদিন অফিসে নামিয়ে দিয়ে আমি আবার হোটেলেই ফিরে গেছিলাম। অফিসে আর যাওয়া হয়নি সেদিন। ব্রিফকেস-এ বাবার একটি ছবি থাকে সবসময়। বাবার ছবিটিকে বের করে মাথায় ঠেকিয়েছিলাম। জানি না তুমি আমার হবে কি না। হলে, আমার বাবার মতো খুশি আর কেউই হতেন না তোমাকে দেখে। তুমি নিজস্ব অধিকারেই রাজকুমারী। কিন্তু তোমায় রাজরানিও হতে হবে।

আমি ঈশ্বর মানি, এই সুপার-কম্পিউটারের যুগে। এবং নিজের কারখানায় কম্পিউটার তৈরি করার পরও। ঈশ্বরের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। বিজ্ঞান-ই ঈশ্বরবোধ আমার মধ্যে গভীর করেছে। এই বোধ সকলের মধ্যে প্রত্যাশার নয়। ভগবান-টগবান মানি না বলাটা হয়তো অতি-সপ্রতিভতার লক্ষণ। কিন্তু ঈশ্বর আর চলিতার্থের ভগবান সমার্থক নয়। আশাকরি তুমি বুঝবে-কী আমি বলতে চাইছি। তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে ঈশ্বরের এই ইচ্ছে যে, আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হই। স্বামী-স্ত্রী হিসেবে।

ছাত্রাবস্থায় এডগার অ্যালান পো আমার অন্যতম প্রিয় লেখক ছিলেন। ওঁর সম্বন্ধে পরে, একটি লেখা পড়ে অনেককিছু জেনেছিলাম। যা জেনেছিলাম তার সাক্ষ্য দেয় তাঁর লেখা। এডগার অ্যালান পো-র কাছে Art meant only beauty and true beauty always contained an element of strangeness or vagueness। ওঁর সমসাময়িক আমেরিকান

লেখকদের থেকে তিনি অনেক-ই অন্যরকম ছিলেন। বোদলেয়রের মতো বড়োকবিও বলেছিলেন, He is a saint! আজও পোকে ফরাসীয়রাই বেশি সম্মান করেন আমেরিকানদের চেয়ে। তুমি হয়তো জান। হয়তো সাহিত্য কী এবং কেন তা ফ্রেঞ্চরা অনেকের চেয়েই ভালো বোঝেন বলেই।

তোমাকে প্রথম দিন দেখেই, বাদল দিনের মেঘের মতো তোমার মুখের মধ্যে রোদ আর ছায়া খেলতে দেখেই, তোমার ব্যবহারের ও আমার প্রতি মনোভাবের অতিদ্রুত পরিবর্তন ও পুনঃপরিবর্তন দেখে আমার পো-র লেখার কথা মনে হয়েছিল। তুমিও আমার চোখে Concept of strangeness and vagueness এবং সেইজন্যেই সৌন্দর্যর সংজ্ঞা। তুমি আমার কাব্য।

ইবসেনের পরে নরওয়েজিয়ান লেখকদের মধ্যে স্যুট হামসুন সবেচেয়ে বেশি বিখ্যাত। তুমি আমার চেয়ে ভালো জানবে। ওঁর সম্বন্ধে যেমন বলা হয়, He had a superb contempt for everything that was not of aesthetic value in his own eyesi

আমারও দৃষ্টিভঙ্গি হুবহু ন্যুট-হামনের-ই মতো। তবে তফাত এই যে, আমার আখরগুলি সোনা হয়ে উঠবে না কখনো। ন্যুট হামসুন সম্বন্ধে বলা হত Words were gold in his hands! তবে আখরগুলি নয়, আমি নিজেই হয়তো সোনা হয়ে যেতে পারি যদি তুমি আমাকে একটিবার

ভালোবেসে ছুঁয়ে দাও।

–ভালো থেকো

ইতি তোমাকে বউ করতে চাওয়া

অতীশ।

.

০৪.

বাথটাব-এর জল মনীষার সমস্ত শরীরকে উষ্ণতায় জড়িয়ে নিয়েছিল। মনীষা দুটি চোখ-ই বুজে ফেলল। তারপর বাথটাবে উঠে বসে চিঠিটা বেসিনের পাশে রাখল। তারপর আবারও জলের গভীরে ডুবিয়ে দিল সমস্ত শরীরকে। শুধু মাথাটি জেগে রইল। শরীরে গভীর ঘুম। স্বপ্নভরা ঘুমের ফেনাতে শরীর পিছল হয়ে গেল। ডুবে গেল সমস্ত শরীর। শুধু মাথাটি জেগে থাকল।

একটি ছোটো হাঙর সাঁতরে আসছে দূরের নীল সাগর থেকে। দূর সমুদ্রর নোনা সন্ধে, সি-গালের বিধুর তীক্ষ্ণ ডাকে ওর নাক ও কান ভরে গেল। দুটি চোখ ভরে এল জলে।

স্বপ্নর মধ্যেই টয়লেটের টেলিফোনটি বেজে উঠল। ঘণ্টা বাজল। পাগলা-

ঘণ্টি বাজল মস্তিষ্কর মধ্যে। জলভেজা, রক্তাভ নগ্ন শরীরের ডান হাতটি বাড়িয়ে ফোন ধরবার জন্যে বাথ টাব ছেড়ে এক ঝটকায় উঠতে যেতেই জল চলকে পড়ল টয়লেটের মেঝেতে।

–ছিঃ। মনীষা বকল নিজেকেই।

এবং হয়তো অতীশকেও।

টেলিফোনটা বেজেই যাচ্ছিল। মেঘলা দুপুরের কামাতুর কবুতরের মতো।

ঋক

১-৪. কীসের গন্ধ বেরোচ্ছে

ঋক – উপন্যাস – বুদ্ধদেব গুহ

০১.

কীসের গন্ধ বেরোচ্ছে?

ঋক বলল।

–কই? না তো!

তৃষা বলল। ওপরে নাক তুলে।

–স্পষ্ট পাচ্ছি যে, আমি।

–কী জানি! কীসের গন্ধ!

–নিশ্চয়ই গ্যাসের। গ্যাস সিলিণ্ডার লিক করেছে।

শুনেই তৃষা লাফিয়ে উঠল বসবার ঘরের সোফা ছেড়ে। আতঙ্কিত গলায় একটি সংক্ষিপ্ত আওয়াজ করে রান্নাঘরের দিকে দৌড়োল। পরক্ষণেই বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে উৎকণ্ঠিত গলায় জোরে ডাকল, মুঙ্গলীরে! ও মুঙ্গলী।

ডেকেই তৃষার মনে পড়ল মুঙ্গলীকে তো হাটে পাঠিয়েছে; মনে পড়তেই, দৌড়ে বসার ঘরে ফিরে এসে বলল, আপনি পারেন না? ঠিক করে দিতে? ঋক?

ঋকও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অত্যন্ত লজ্জিত ও বিব্রত মুখে সে বলল, না। আমি তো স্টোভে অথবা কাঠের উনুনে রান্না করে খাই। গ্যাস সিলিন্ডারের আমি কিছুই জানি না।

এদিকে গন্ধটা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে বাড়িময় ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এই ছোট্ট জনপদের ডিসেম্বরের কাঁচাপথের রাশ রাশ ধুলোর গন্ধ আর বিভিন্নরঙা পুটুস ফুলের উগ্র গন্ধকে ছাপিয়ে গ্যাসের গন্ধ যেন দমবন্ধ করে দিচ্ছিল।

তৃষা কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, কিছু একটা করুন না! কীরকম পুরুষ মানুষ আপনি!

অপ্রস্তুত গলায় বোকার মতো ঋক বলল, কাউকে বরং ডেকে আনি বাইরে গিয়ে। আমি এসব পারি না।

–কী পারেন আপনি?

ঝাঁঝালো স্বরে বলল তৃষা।

ঠিক তক্ষুনি বাড়ির সামনের মস্ত মহুয়াগাছটার গুঁড়ি ও ডালপালার প্রতিধ্বনির সিরসিরানি তুলে নতুন অ্যাম্বাসাডর গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ করে প্রণত ঢুকল। তৃষা দৌড়ে গেল বাইরে। বলল, আর কাছে এনো না গাড়ি, রান্নাঘরে গ্যাস লিক করছে। ঋক বসে আছেন, কিন্তু উনি জানেন না কিছুই। তুমি এসো শিগগির।

সঙ্গে সঙ্গে ইঞ্জিন বন্ধ করে প্রণত গাড়িটাকে গ্যারাজের পাশে পার্ক করিয়ে দৌড়ে ভেতরে এসে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। এবং একটু পরেই বেরিয়ে এল।

বলল, কখন ফিট করে দিয়ে গেছে গ্যাস কোম্পানির লোক?

–এই তো। হবে আধঘণ্টাটাক।

–ভারি ইরেসপনসিবল তো! কমপ্লেইন করতে হবে। আর তুমিই বা কেমন? রান্নাঘরের ব্যাপার তুমি নিজেও তো একটু জানবে। মুঙ্গলী

কোথায়?

–হাটে গেছে।

অপরাধীর মুখে তৃষা বলল।

–রান্না তো আমি দু-একটি পদ মাত্র করি। তাও রোজ নয়। সব-ই তো করে মুঙ্গলীই।

তা হলেও এগুলো এলিমেন্টারি জিনিস। একটুকুও না জানলে চলবে কী করে।

কী বলবে, ভেবে না পেয়ে তৃষা মুখ নামিয়ে বলল, আমি বুঝি এর আগে কোনোদিনও রান্না করেছি!

–আমার মতো সাধারণ অবস্থার মানুষকে যখন বিয়ে করেছ তখন করতে তো হবে। আস্তে আস্তে সব-ই শিখে নিতে হবে। নইলে চলবে কী করে। আজকাল রাজা-মহারাজার স্ত্রীদেরও রান্না করতে হয়।

বলেই, বিব্রত হয়ে উঠে দাঁড়ানো ঋক-এর দিকে ফিরে প্রণত বলল, বোসো ঋক। তুমি আজ হাটবারে হাটে না গিয়ে অসময়ে আমার এখানে যে!

–স্যার! আপনার টেলিফোন কি খারাপ? টেলিফোনে আপনাকে কিছুতেই

কনটাক্ট করতেনা পেরেই আমাকে দিয়ে ম্যানেজার সাহেব বলে পাঠালেন যে, কলকাতা থেকে এম. ডি.আসছেন কালকে। আপনাকে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে যেতে হবে পাটনাতে। এম. ডি কে রিসিভ করতে। আমারও এখুনি ফিরে গিয়ে অ্যাকাউন্টস-ট্যাকাউন্টস সব আপ-টু ডেট করে রাখতে হবে। ব্যাকলগ জমে গেছে। আজ বোধ হয় রাত দেড়টা-দুটো হয়ে যাবে বাড়ি যেতে যেতে। আমি যাই এখন স্যার।

–ক-টায় বেরুবেন উনি?

–বলেছেন তো ভোর ছটায়। ওঁর গাড়ি করেই আপনাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবেন। এম. ডি. কলকাতা থেকে হপিংফ্লাইটে আসছেন। রাঁচি হয়ে।

–ও।

–ম্যানেজার সাহেব আরও বলেছেন যে, কালকে দুপুরে আপনি সস্ত্রীক ওঁর বাড়িতেই খাবেন। এম. ডি. ওঁর বাড়িতেই লাঞ্চ করবেন।

–আমি যাব না।

তৃষা বলল। প্রণত ও ঋক দু-জনকেই শুনিয়ে।

-কেন?

বিরক্ত গলায় শুধোল প্রণত।

আমার ভালো লাগে না। একটানা ইংরেজি বলতে হবে। হেঁ হেঁ করতে হবে।

কেন ইংরেজি বলতে কি তুমি পারো না? পারো বলেই তো তোমাদের বাড়ির সকলে বলেছিলেন। স্বামীদের চাকরির উন্নতিতে স্ত্রীদেরও একটু সাহায্যর দরকার। বিশেষ করে আজকাল।

–আমি ওসব পারি না। ভালো লাগে না।

তৃষা বলল, অপরাধীর গলায়।

–তা বললে চলবে কেন? তোমায় যেতেই হবে। ঋক, তুমিই সাড়ে বারোটা নাগাদ এসে একটা সাইকেল রিকশা ধরে তৃষাকে নিয়ে যাবে ম্যানেজার সাহেবের বাংলোতে। আমি খুব ই ব্যস্ত থাকব। তোমাকেও নিশ্চয়ই লাঞ্চ-এ বলেছেন উনি।

–না স্যার। আমাকে বলেননি। না বলেছেন ভালোই করেছেন। কোনোক্রমে আমি ডেবিট-ক্রেডিটটা সামলাই। বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি, ইংরিজি-ফিংরিজি আমি তো একেবারেই বলতে পারি না। আমাদের লেভেলের কাউকেই ম্যানেজার সাহেব বলেননি।

–কিন্তু লেখো তো বেশ ভালোই। ম্যানেজারের সঙ্গেও তো কাজ চালিয়ে নাও দেখি।

–লেখা আর বলা তো এক নয় স্যার। তেমন সমাজে না মেলামেশা থাকলে, তেমন স্কুলে না পড়লে, ফটাফট ইংরিজি বলা যায় না। অভ্যেসের ব্যাপার।

–বাজে কথা। আমিও তো বাংলা মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি। চেষ্টা থাকলেই শেখা যায়। তোমরা হলে টিপিক্যাল বাঙালি। সাধে বাঙালি সব জায়গাতেই পিছু হটে যাচ্ছে! অদ্ভুত তোমরা! সত্যি!

–আমি যাব স্যার?

–হ্যাঁ, এসো। শ্রীবাস্তব সাহেবকে বলে দিয়ো যে, আমি তৈরি হয়েই থাকব।

ঋক বলল, হ্যাঁ স্যার। আসি বউদি।

বলেই, দু-জনকে নমস্কার করে চলে গেল, সাইকেলের টায়ারে কাঁকুরে মাটিতে কিরকির শব্দ তুলে।

–আমার খুব খিদে পেয়েছে।

প্রণত বলল।

তৃষার মুখটা কালো হয়ে গেল। বলল, গ্যাসটা একটু জ্বেলে দেবে? আমি মাংসর চপ গড়েই রেখেছি। আমি মানে, আমি আর মুঙ্গলী। এক্ষুনি ভেজে দিচ্ছি।

–গ্যাস জ্বালাটাও কি এমন কঠিন কাজ? চলো, জ্বেলে দিচ্ছি। আজকে দেখে নাও। এরপরে আর কোনোদিন বোলো না যে, পারি না।

–আমার ভয় করে। তুমি তো জানই যে, আমার মা আগুনে পুড়ে... আগুনকে বড়োভয় পাই আমি।

সব বাড়ির সব আনপড় কাজের লোক-ই গ্যাস জ্বালছে। তোমার মতো এমন ঢং কাউকেই করতে দেখিনি।

তৃষা কথা না বলে প্রণতর সঙ্গে রান্নাঘরে গেল। গ্যাসটা প্রণত জ্বেলে দিতেই ও বলল, সবাই কি সব পারে?

–সব না পারে তো কিছু তো পারে!

উত্তরে কিছু না বলে তৃষা একবার তার চোখ দুটি তুলে প্রণতর দিকে তাকাল। প্রণতর দু-চোখে বিরক্তি। যদিও ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ-মাস। তৃষা পরিষ্কার বুঝতে পারে যে, প্রণত ওকে পছন্দ করে না। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিল তৃষা। বলল, তুমি হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি চা আর চপ নিয়ে যাচ্ছি খাওয়ার ঘরে।

রান্নাঘর থেকেই তৃষা শুনতে পেল যে, প্রণত খুব বকছে মালিকে। চপ ছেড়েছিল সবে কড়াইয়ে। কী নিয়ে যে, বকাবকি তা ঠিক বুঝতে পারল না চপ ভাজার শব্দে। চপ ভাজা হলে, স্যালাড সাজাল একটি প্লেটে। টোম্যাটো আর চিলি-গার্লিক সস-এর শিশি দু-টি ফ্রিজ থেকে বের করে খাওয়ার ঘরের ম্যাটের ওপর সাজিয়ে ডাকল প্রণতকে। একটু পর প্রণত এসে টেবিলে বসল।

তৃষা বলল, তুমি খাও, আমি চা-টা নিয়ে আসছি।

রান্নাঘরের জানলা দিয়ে শীতের বিকেলের রোদ এসে পড়েছিল। কম্পাউণ্ড ওয়ালের পাশে বড়ো বড়ো সেগুন গাছের পাতাদের পেছন দিকে কমলা রঙা রোদ পড়ায় যেন সবুজ ধূলিধূসরিত পাতাগুলির রং পালটে গেছে। এবারের শারদীয় আনন্দবাজারে বাণী বসুর উপন্যাসে পড়েছিল কমলালেবুর রসের মতো রোদ! বা ওইরকম কিছু। ভারি ভালো লেগেছিল উপমাটি। এমন এমন বিকেলে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন মনে পড়ে যায় তৃষার। মন খারাপ যেমন লাগে তেমন একরকমের ভালো লাগাও মনকে ছেয়ে ফেলে যেমন, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান শুনলে হয়। এসব জিনিস প্রণত বোঝে না। সকালবেলার আলো বা সন্ধে হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্ত প্রণতর মনে কোনো দাগ কাটে না। নিজের কোম্পানির কাগজপত্র এবং স্টেটসম্যান কাগজ ছাড়া প্রণত আর কিছুই পড়ে না। গান ভালোবাসে না ও। কাজকর্ম সেরে ফিরে এসেই চান করে।

পটাপট কয়েকটা হুইস্কি খায়। তারপর খাবার খেয়েই শুয়ে পড়ে। তৃষা খেল কি না এবং কী খেল তা কোনোদিনও চোখ মেলে দেখেও না প্রণত, যদিও দু-জনে একসঙ্গেই খেতে বসে। প্রণত ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লে তৃষা কখনো খুব নীচুগ্রামে বিয়ের সময়ে তার সেজোমামিমার প্রেজেন্ট করা ক্যাসেট-প্লেয়ারে কোনো প্রিয় গান শোনে। কখনো-বা, চাঁদ থাকলে বারান্দার চেয়ারে বসে থাকে একা।

তৃষার যুবতী শরীরটার প্রতিও কোনো আকর্ষণ নেই প্রণতর। মনের খোঁজ তো সে রাখেই না। রাখে না একথাটা বুঝতে পেরে বড়ো অপমানিতও বোধ করে ও। ও সুন্দরী নয়, কিন্তু কুশ্রীও নয়। তা ছাড়া সকলেই বলে ওর ফিগার খুব ভালো। কিন্তু প্রণত তো, ওকে দেখেশুনেই বিয়ে করেছে। শুধু তাই নয়, মেজোমামার কাছে লম্বা তালিকাও ধরিয়ে দিয়েছিল প্রণত তৃষাকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার খেসারত দাবি করে। গডরেজের ফ্রিজ, টেলেরামার কালার টি. ভি., ডাবল বেড় খাট–সি. পি. টিক-এর, গডরেজের আলমারি, সোফাসেট, কার্পেট এবং আরও কত কী! তার ওপরে কুড়ি হাজার টাকা নগদ বউভাতের খরচ হিসেবে। এই তালিকার পেছনে প্রণতর নিজের হাত কতখানি ছিল আর তৃষার-ই সমবয়সি ছোটোমামির হাত কতখানি ছিল ও এখনও জানে না। কী একটা রহস্যর গন্ধ পায় ও সবসময়। অথচ তার তল পায় না।

এসব কথা আগে জানলে এ বিয়েতে রাজিই হত না তৃষা। ও তো পণ্য

নয় যে, তাকে ঘর বদলাতে দাম দিতে হবে! যে-শিক্ষিত পুরুষ কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হওয়ার বদলে টাকা দাবি করে, বউভাতে ঘটা করে আত্মীয়-বন্ধু খাওয়ানোর খরচ দাবি করে মেয়ের বাড়ি থেকে, তার শিক্ষা বলে আদৌ কিছু আছে বলে মনে করে না তৃষা। প্রণত ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে কিন্তু শিশুকাল থেকে তৃষা শিক্ষা বলতে যা-কিছুকেই জেনে এসেছে তার ছিটে ফোঁটাও দেখে না প্রণতর মধ্যে। অন্তত এই ছ-মাসে দেখেনি। প্রণত নিজেকে ইচ্ছে করে লুকিয়ে রাখলে আলাদা কথা।

তৃষার বাবা যখন মারা যান তখন বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান তৃষার বয়স পাঁচ। মামারা ওকে আর ওর মাকে যত্ন করে নিয়ে এসে তাঁদের কাছেই রাখেন। আদর-যত্ন স্বাচ্ছল্যের অভাব ছিল না বড়োলোক এবং উদার মামাদের আশ্রয়ে। কিন্তু তাদের দাবি বলতেও কিছু ছিল না। দয়াপ্রার্থীই ছিল তারা মানে তৃষা ও তৃষার মা। বিয়ের আগে অনেক আকাশ-কুসুম কল্পনা করেছিল যে, বিয়ে হলে স্বামীই হবে তার জোর খাটাবার মানুষ। তার সব আবদারের, আহ্লাদের দাবির মানুষ।

তৃষার মা দু-বছর আগে হঠাৎ রান্নাঘরে আগুনে পুড়ে মারা যান। আর কেউ জানুক আর না জানুক তৃষা জানে যে, ছোটোমামির ব্যবহার-ই মাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। মায়ের মৃত্যুর পর-ই মামা-মামিরা তৃষার বিয়ে দিতে খুব-ই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

বিশেষ করে ছোটোমামা-ছোটোমামি। বিপত্নীক মেজোমামাকে এতসব

কথা বলা যেত না। এ বিয়েতে তৃষার রাজি হওয়াটাও একধরনের আত্মহত্যাই বলা চলে। ওর না-তেমন পছন্দ হয়েছিল প্রণতর চেহারা, না কথাবার্তা। কিন্তু ছোটোমামির জন্যে মামাবাড়িতে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

–কই? চা কি হল?

হঠাৎ প্রণতর ডাকে চমকে উঠল তৃষা। বলল, যাই। ও এরকম-ই। সংসার করার সম্পূর্ণ অযোগ্য।

চা নিয়ে গিয়ে বলল, আর চপ লাগবে তোমার? নিয়ে আসি?

–লাগত। যদি সময়মতো জিজ্ঞেস করতে? এখন আর লাগবে না।

–'তুমিও তো চাইতে পারতে, শুধুই আমাকে গালমন্দ করার সুযোগ খোঁজো তুমি!

মনে মনে বলল তৃষা। কিন্তু মুখে কিছুই বলল না। নিজের জন্যেও এককাপ চা ঢালল প্রণতকে দেওয়ার পর। দুধ-চিনি মিশিয়ে নিয়ে বারান্দায় এসে বসল।

পথ দিয়ে সাইকেল-রিকশা যাওয়ার আওয়াজ হচ্ছিল ক্রিং ক্রিং করে। লোহার গেটটা টিনের পাত দিয়ে ঢাকা। বাইরের চলমান পৃথিবীর কিছুই

দেখা যায় না ভেতর থেকে। শুধু শোনা যায় মাত্র। দূরে কারা যেন মাইকে গান বাজাচ্ছে! কিশোরকুমারের গান। গান শুনতে শুনতে চা-টা শেষ করল তৃষা।

জামাকাপড় পরে এসে প্রণত বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি। আজ তাস খেলার নেমন্তন্ন আছে সুরদের বাড়িতে। সেখানেই খেয়ে আসব। তুমি কি যাবে?

–না। তোমরা মদ খাবে, সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করবে আর তাস খেলবে। আমি গিয়ে কী করব?

–মডার্ন মেয়ে। তাস খেলতেও জানে না? ভাবাই যায় না। তোমার মামারা তোমাকে যে, কী শিখিয়েছিলেন তা তাঁরাই জানেন। বিয়ের জন্যে কিছুটা প্রস্তুতি লাগে। এরকম থরোলি আনপ্রিপেয়ার্ড ব্রাইডের কথা ভাবা পর্যন্ত যায় না।

তৃষা কথা না বলে বাইরে চেয়ে বসে রইল। প্রণতর অ্যাম্বাসাডর ধুলো উড়িয়ে চলে গেল। গেটটা একমুহূর্তাঁর জন্যে খুলল মালি। পথটা চোখে পড়ল একঝলক। কতরকম মানুষ, দোকান, যানবাহন। পরমুহূর্তেই বন্ধ হয়ে গেল গেট। গেটটা টিনের পাত দিয়ে বন্ধ করা না থাকলে তাও সময় কেটে যেত তৃষার গেটের দিকে চেয়েই।

তৃষা ভাবছিল, প্রণতর নাম কে রেখেছিলেন জানে না ও, তবে নামটি

প্রণত না হয়ে উদ্ধত হলেই মানাত বেশি।

প্রণত চলে যেতেই মুঙ্গলী এসে ঢুকল। খুব সেজেছে ও আজকে। হাট থাকলেই সাজে। জবজবে করে তেল মেখেছে! গাঢ় লাল রঙের ব্লাউজের সঙ্গে গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরেছে। রুচিশীল চোখে ধাক্কা লাগে। কিন্তু মুঙ্গলী যাদের জন্যে সাজে তারা হয়তো এইরকম সাজ পোশাক-ইপছন্দ করে।

মুঙ্গলী হাসল। বলল, তোমার জন্যে বগারী পাখি এনেছি। এখন খাবে? না রাতে?

তৃষা বলল, খাব না। তোর সাহেবকে দিস। সে ভালোবাসে। রাতে এবং কাল দুপুরেও সাহেবের নেমন্তন্ন। কাল রাতে রোস্ট করে দিস।

মুঙ্গলী চলে গেলে তৃষা ভাবছিল কেন যে, পাখিগুলো খায় মানুষে। ক্ষুদে ক্ষুদে পাখি। বর্ষার সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো দ্রুতগতিতে এ গাছ থেকে ও গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। মানুষের খিদে বড়ো আগ্রাসী হয়ে গেছে। এই লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে শিগগিরই। হাটে জ্যান্ত পাখি সামনে মেরে ভেজে দেয় আর গবগ করে খায় লোকে।

সন্ধে হয়ে যাবে একটু পর-ই। মনটা বড়ো খারাপ লাগছিল তৃষার। ওর মন খারাপ-ই থাকে। আজকে যেন বেশি খারাপ লাগছে। সংসারে যার আপনজন বলতে কেউই নেই সেই শুধু জানে মন খারাপের এই রকমটি।

খস খস করে রুক্ষ পায়ের আওয়াজ করে মালি এল। যেন মাটি ফুড়েই উঠল। চমকে গেল তৃষা। কোন দিক দিয়ে এল কে জানে!

-কী ব্যাপার?

–সাহেব বড়ো বকাবকি করলেন আমাকে।

–হ্যাঁ। রান্নাঘর থেকে শুনছিলাম বটে! কিন্তু বুঝিনি। কেন?

–আপনি ওই জংলি পালশগাছগুলো কাটতে বারণ করেছিলেন।

–হ্যাঁ। করেই তো ছিলাম। ডিসেম্বর শেষ হতে চলল, মার্চের গোড়া থেকেই ফুল আসবে গাছগুলোতে। লালে লাল হয়ে যাবে কম্পাউণ্ড। তুমিই তো বলেছিলে মালি।

–বলে তো ছিলাম-ই মেমসাহেব। আপনারা তো এ বাড়িতে এসেছেন মাত্র তিনমাস। আর আমি তদারকি করছি ত্রিশ বছর। আমি জানি না তো কে জানে? জনস্টন সাহেব আর মেমসাহেবও খুব ভালোবাসতেন তাই রেখে দিয়েছিলেন কম্পাউণ্ডের দেওয়ালের পাশের গাছগুলোকে। কত বড়ো হয়ে গেছে গাছগুলো।

–তা তোমার সাহেব বকলেন কেন?

–সাহেব বলেছেন, এই রবিবারের মধ্যেই তোক এনে সব জংলি পলাশ

কেটে ফেলতে হবে। সাহেব ওখানে চাষ করে আলু, বেগুন আর তামাকপাতা লাগাবেন।

–তামাকপাতা?

-হ্যাঁ, মেমসাহেব। সাহেব কাগজ পাকিয়ে সিগারেট খান না। নিজের চাষের তামাক এবার থেকে পাকিয়ে খাবেন।

–তাই?

অন্যমনস্ক গলায় বলল তৃষা।

তারপর বলল, আমার জন্যে তোমায় বকুনি খেতে হল মালি। আমি খুব দুঃখিত। তোমার সাহেবের বাড়ি, সাহেব তোমার মনিব, সাহেব যা বলেন তুমি তাই করবে। আমি আর কিছু কখনো বলব না তোমাকে।

আমাকে মাপ করে দেবেন মেমসাহেব।

মালি বলল মাথা নীচু করে।

–না, না। তুমিই আমাকে মাপ করে দিয়ো।

.

০২.

ভোর ছ-টাতে বেরিয়ে গেছিল প্রণত। চা করেছিল মুঙ্গলীই। তৃষা তার আগেই উঠেছিল। দরজা অবধি পৌঁছেও দিয়েছিল প্রণতকে। তবে দরজার আড়ালেই ছিল। বারান্দাতে আসেনি। ম্যানেজার শ্রীবাস্তব সাহেবের চোখের চাউনিটা মোটেই ভালো লাগে না তৃষার। মেয়েদের চোখ ঠিক-ই বোঝে। কিছু পুরুষ থাকে-না, যারা চোখ দিয়ে মেয়েদের চেটে খায়, লোকটা সেই শ্রেণির। বদমাইশ ব্যাচেলার। প্রণতর সঙ্গে এই লোকটার কোম্পানির সম্পর্ক ছাড়াও আরও কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় তৃষার। সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর শরীরের প্রতিও এমন অনাসক্তি কোনো পুরুষের স্বাভাবিকতার মধ্যে পড়ে না। তৃষা, ব্যাপারটা ঠিক কী তা বুঝতে পারে না। তবে অনুমান করতে পারে। অস্পষ্ট অনুমান। অতিস্বল্পবার-ই প্রণত বিয়ের পরে । ওকে আদর করেছিল। তার স্মৃতিও আদৌ সুখাবহ নয়। বরং কৈশোর থেকে সুন্দর সব নানা। রঙিন কল্পনায় রাঙা এই ব্যাপারটি ওর কাছে রীতিমতো ভীতিজনক-ই হয়ে উঠেছে। প্রণতকে সেইসব মুহূর্তে মনে হয়েছে কোনো জঘন্য দস্যু। তৃষাকে প্রণত সেই হৃদয়হীন, রোমান্টি। কতাহীন একটি যন্ত্রর-ই মতো কামড়ে ছিঁড়ে ধর্ষণ-ই করেছে। সেই প্রক্রিয়াতে একফোঁটাও ভালোবাসা ছিল না একবারও। ভালোবাসার কথা মাইকে ঘোষণা করতে হয় না। কুকুর বেড়ালও চোখ দেখে, ভাব দেখে তা বোঝে। তাই, ভালোবাসা যে, এই সম্পর্কে একটুও নেই, তা তৃষা নিঃসন্দেহে বুঝে গেছে! কিন্তু বোঝেনি

ভালোবাসার বদলে আর কী আছে। প্রণতর তাকে বিয়ে করার পেছনে ঠিক কোন উদ্দেশ্য ছিল– সেটাই স্পষ্ট হয়নি এখনও তৃষার কাছে! বড়ো ভয়ে ভয়ে দিন কাটে তার। ছোটোমামিই আগ বাড়িয়ে এই সম্বন্ধ । এনেছিল। অনেকদিন থেকেই নাকি চিনত প্রণতকে। এই চেনার রকমটাও ঠিক জানে না তৃষা।

সকালের কাজকর্ম সেরে রোজ যে-সময়ে স্নান করে সেই সময়েই স্নান করেছিল। বিয়েতে অনেক বই পেয়েছিল তৃষা। তারমধ্যে আশাপূর্ণা দেবীর প্রথম প্রতিশ্রুতিও ছিল। কয়েকদিন হল পড়া আরম্ভ করেছে। ভারি ভালো লাগছে। স্নান করে উঠে ভিজে চুল ঝকঝকে রোদে মেলে দিয়ে বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে বইটি পড়ছিল এমন সময়ে গেট খুলে একটি সাইকেল ঢুকল। কিরকির শব্দ হল কাঁকুরে মাটিতে। বই থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে, ঋক।

ঋক রায় প্রায় তৃষার সমবয়সিই হবে। প্রণতর চেয়ে তিন-চার বছরের ছোটো। ভারি লাজুক প্রকৃতির মানুষ ঋক। তবে সেই লজ্জা প্রায়-ই হীনম্মন্যতার দরজায় পৌঁছে যায় এবং যখন তা পৌঁছোয় তখন ঋককে অত্যন্ত অপছন্দ করে তৃষা। প্রণতদের অফিসের বেয়ারা, রামখেলাওন ছাড়া একমাত্র ঋকের-ই যাওয়া-আসা আছে প্রণতর বাড়িতে। তাও কাজ বা খবর নিয়েই আসে, যখন আসে। তৃষার সঙ্গে ঋকের ব্যবহারে তৃষা খুব মজা পায়। বিলক্ষণ বোঝে যে, কোনো দুজ্ঞেয় কারণে ঋক তৃষাকে

খুবই পছন্দ করে।

–আসুন!

তৃষা বলল।

–যাবেন না বউদি? তৈরি হননি এখনও?

–ক-টা বাজে? ভালো বই হাতে পেলে আমার সময়জ্ঞান থাকে না।

–বাজে এগারোটা। কী বই?

–প্রথম প্রতিশ্রুতি। আশাপূর্ণা দেবীর।

–আপনার পড়া হয়ে গেলে আমাকে দেবেন।

--দেব। কিন্তু আপনার তো সাড়ে বারোটায় আসার কথা ছিল। তাই না?

–হ্যাঁ। কিন্তু এম. ডি-র ইন্সপেকশান শেষ হয়ে যেতেই এম. ডি. এবং স্যারেরা সবাই শ্রীবাস্তব সাহেব মানে ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে চলে গেলেন। শুনতে পেলাম, আসলে ইনস্পেকশন একটা ছুতোমাত্র। আমাদের মাদ্রাজি এম, ডি. এসেছেন ওঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে। রাতটা কাটিয়ে কাল-ই চলে যাবেন কলকাতা। বাঁচা গেল। যা টেনশানে ছিলাম!

–আপনি কোন সময়ে টেনশানে থাকেন না?

–তা ঠিক।

–প্রণত কি আমাকে এখুনি যেতে বলেছে?

–না। ঠিক তা নয়। আমি ভাবলাম ইন্সপেকশন-ই যখন হয়ে গেল তখন একটু আগে। আগেই যাই।

তৃষা ঋকের চোখে চোখ রেখে বলল, কেন?

–মানে, এমনিই! যদি আপনি আগে যেতে চান তাহলে আগেই নিয়ে যাব। নইলে...

–নইলে কী? আমি যদি না যাই?

–অ্যাইরে! না-গেলে তো আমার-ই গিয়ে স্যারকে খবর দিতে হবে।

তৃষা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বলল, আপনি বসুন। আমি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। কিছু খাবেন? চা বা কফি!

–না, না। অফিসে একটু আগেই কফি খেয়েছি।

তৈরি হতে হতেই তৃষা মুঙ্গলীকে ডেকে বলল মালিকে একটা রিকশা

ডাকতে বলতে।

রিকশাও এল তৃষাও তৈরি হয়ে বেরোল।

ঋক বলল, আপনি রিকশাতে উঠুন আমি আপনার আগে সাইকেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

–সে কী? আমি তো গভর্নর নই যে, আমার আগে আগে পাইলট-এর দরকার। তা ছাড়া প্রণত তো আপনাকে সাইকেল-রিকশা করেই আমাকে নিয়ে যেতে বলেছিল। তাই-না?

–তা ঠিক। তবে আমার সাইকেল?

–গ্যারাজের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখুন। মালির কোয়ার্টার পাশেই। বাড়ির ভেতর থেকে চুরি হবে না। ভয় নেই।

রিকশাতে তৃষা উঠে বসলে ঋক বলল, দু-জনে আঁটবে?

তৃষার দু-চোখে চকিত কৌতুক ঝিলিক মেরে গেল। বলল, সব রিকশাতেই তো দু-জন করেই যায় লোকে। উঠে আসুন।

যতখানি সম্ভব তৃষার ছোঁয়া বাঁচাবার চেষ্টা করেই একপাশে বেঁকে বসল ঋক। তবুও ছোঁয়া বাঁচানো গেল না। তৃষার স্নান-করে-ওঠা শরীরের ছোঁয়া এবং পারফিউমের গন্ধে বেচারি ঋক বেশ বেসামাল হয়ে পড়ল।

তৃষা বলল, আপনার বাড়ি কোনদিকে? রিকশাওয়ালাকে বলে দিন।

–সুরাইয়াগঞ্জে। কিন্তু আমার বাড়ি কেন?

–কতদূর? লাগবে কতক্ষণ? যেতে?

–সাইকেল-রিকশাতে পনেরো-কুড়ি মিনিট।

–আপনার বাড়ির দিকেই যেতে বলুন।

–কী-কী-কী বলছেন? কেন?

–এমনিই! এতআগে ওখানে গিয়ে কী করব?

–স্যার রাগ করবেন না?

-কার ওপর?

–আপনার ওপর না হোক আমার ওপর। –সে আপনার স্যার-ই জানেন। আমি কী করে বলব বলুন?

–ও।

অস্বস্তির গলায় বলল ঋক।

–আপনার কি খুব-ই কষ্ট হচ্ছে আমার পাশে বসে যেতে? অমন হাঁসফাঁস করছেন কেন?

–না-না-না। সেকথা বলছি না। বলছি, এমন তো কথা ছিল না!

–আমার বাড়িতে যে, আমি একা থাকি।

–তা তো জানিই। নইলে কী আর স্টোভে রান্না করে খান!

–আপনি জানেন? ও হ্যাঁ, আমিই তো স্টোভে রান্না করার কথা কাল বলেছিলাম।

–মনে পড়েছে? আপনি মানুষটা বড়োভুলো মনের।

–হ্যাঁ, আমার মা তাই বলতেন বটে!

–বলতেন মানে? মা নেই?

–না। মা-বাবা-কেউই নেই।

ঋক বলল।

–তাই?

–হ্যাঁ।

তারপর একটু চুপচাপ। সাইকেল-রিকশার চেইনের শব্দ। অন্য সাইকেল-রিকশা এবং সাইকেলের শব্দ। লোকজনের কথাবার্তার টুকরো-টাকরা।

–আমার বাড়িতে কী দেখতে যাচ্ছেন?

--আপনার পরিবেশ। একজন মানুষকে পুরোপুরি জানতে হলে মানুষটির রুচি, তার বাড়িঘর, তার পরিবেশ সম্বন্ধেও তো জানতে হবে।

–আমাকে পুরোপুরি জেনে আপনার কী লাভ? তা ছাড়া আমি যে, মাইনে পাই তাতে আমার পক্ষে যে, খুব ভালো করে থাকা সম্ভব নয়, তা তো আপনি ভালোই জানেন। আপনার বাড়িতে যা-আছে আমার তার কিছুমাত্র নেই।

–জানি না। তবে অনুমান করতে পারি। তবে আপনার বাড়িতে হয়তো কিছু আছে যা, আমার বাড়িতে একেবারেই নেই। কে বলতে পারে?

–কেন যে, যাচ্ছেন?

অস্বস্তিভরা গলায় বলল ঋক।

–এমনিই....।

–বেশ।

রিকশাওয়ালাকে আগেই পথ বলে দিয়েছিল ও। একটা বাঁক নিয়েই রিকশাটা একটি নির্জন পথে পড়ল। সেপথে পড়েই মনে হল মুরাদগঞ্জের সঙ্গে এই সুরাইয়াটোলির কোনো যোগাযোগ-ইনেই। দু-পাশে বড়ো বড়ো মহুয়া আর শিমুলগাছ। ঝাঁটি জঙ্গল। খোওয়াই। পথের বাঁ-দিকটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেছে।

তৃষা বলল, বা :। নদী আছে বুঝি বাঁদিকে?

–হ্যাঁ। আর বাড়ির পেছনের বারান্দাতে বসলে একেবারে কাছেই নদী। ভারি সুন্দর। কালো পাথরের, লালমাটির আর সবুজ জঙ্গলের মধ্যে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে।

–নাম কী নদীর?

–হুরি-নালা।

–‘হুরি মানে কী?

–পরি-উরি হবে হয়তো। কথায় বলে না? হুরি-পরি।

–বলে বুঝি? কখনো শুনিনি।

–ওই যে, ঘন শালজঙ্গল দেখছেন সামনে, তারইমধ্যে আমার বাড়ি।

–নিজের নাকি?

হাসল ঋক। না, না। ভাড়াবাড়ি। আসলে এক জমিদারের ভান্ডার ছিল একসময়। শরিকে শরিকে ঝগড়াতে এখন জমিদারেরা ফকির হয়ে গেছে। এক শরিক এই ভান্ডারটি ভাড়া দিয়েছেন আমাকে। সব-ই ভালো শুধু ইলেকট্রিসিটি-ই নেই।

–গরমের সময়ে কী করেন?

–গরমের সময়ে দুপুরবেলা তো অফিসেই কেটে যায় সপ্তাহে ছ-দিন। যখন ফিরি তখন আর গরম থাকে না। তা ছাড়া খুব পুরুমাটির দেওয়াল তো! গরম এবং শীতও এমনিতেই কম লাগে। গরমকালে মনে হয় এয়ারকণ্ডিশানড আর শীতকালে মনে হয় সেন্ট্রালি হিটেড।

–রাতের বেলা ভয় করে না?

–কীসের ভয়? আমার কী আছে হারাবার মতো? কোন চোর সিঁদ কাটবে আমার ঘরে? যা সামান্য সঞ্চয় তা তো ব্যাঙ্কেই থাকে।

--চোর সিঁদ কাটবে কী কাটবে না, তা কে বলতে পারে? চোরেরও তো নানারকম হয়।

–কোনো চোরের-ই আমার ঘর থেকে কিছু নেওয়ার নেই।

–সেকথা তো চোরেরাই জানবে। আপনি-আমি জানব কী করে?

শীতের দুপুরের গায়ের একটি নিজস্ব গন্ধ আছে। কাঁচাপথের ধুলোর গন্ধ, শালবনের গন্ধ, নদীর গন্ধ আর মধ্যদিনের রোদের গন্ধ মিলেমিশে যাওয়ায় কেমন এক আচ্ছন্নতা বোধ করছিল তৃষা।

সাইকেল-রিকশাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল ঋক। বলল, বকশিশ দিয়ে দেব। তারপর নিজে নামতে নামতে বলল নামুন। এখানে এই এক মুশকিল। ওই মোড় অবধি হেঁটে না গেলে সাইকেল-রিকশা পাওয়া যায় না। সাইকেল থাকলে অবশ্য কোনো অসুবিধে নেই।

–বাঃ। কী শান্তি এই জায়গাটাতে! ওটা কী পাখি ডাকছে?

কান খাড়া করে শুনল ঋক। তারপর বলল, আমি জানি না। রাম সিং বলছিল, কালি তিতির। মানে ব্ল্যাক-প্যাট্রিজ।

–সে আবার কী?

–পাখি-ই একরকমের। আমরা আর ক-টি পাখি চিনি।

–মানুষ-ই বা ক-টি চিনি।

তৃষা বলল।

–তা ঠিক। আসুন এইদিকে।

–রাম সিং কে?

–রাম সিং নদীর ওপারে মাইলখানেক দূরের এক গ্রামে থাকে। খেতি-জমিন আছে। ও মাঝে মাঝেই আমার কাছে থেকে যায় রাতটা। কতকিছুর গল্প করে। কত-কী জানে রাম সিং। গ্রামের মানুষেরাই কিন্তু আসল দেশ। আমরা শহরের মানুষেরা দেশের কোনো খবর-ই রাখি না। আমাদের কোনো শেকড় নেই। আমি তো ভাবছি আর মাস ছয়েক চাকরি করার পর রাম সিং-এর গ্রামে গিয়ে আমিও খেতি-জমিন করব। পরের টাকার হিসেব রাখার চেয়ে নিজের হাতে বাজরা, কুলথি, পালং শাক, মুলো জন্মানো অনেক আনন্দের। তা ছাড়া আমার প্রয়োজনও তো সামান্যই। প্রয়োজন হচ্ছে আগুনের মতো। ঘৃতাহুতি দিলেই বাড়ে। আর বাড়ানোর কি শেষ আছে? বলুন?

–তা ঠিক।

তৃষা বলল।

ঋক শালকাঠের এবড়ো-খেবড়ো দরজার তালা খুলল। এ পাশে দু-টি আর ও পাশে দু-টি মাটির ঘর। ভেতরে উঠোন। কুয়ো।

পেছনের দিকের একটি দরজা দিয়ে পেছনের বারান্দার নিয়ে গেল

তৃষাকে ঋক। হুরি নালা নদীটি সত্যিই ছবির মতো। মাছ ধরছে কারা যেন। ছোটো ছোটো খেপলা জাল মাথার ওপর ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে জলে। একজোড়া মাছরাঙা নদীপারের বাজ-পড়া শিমুলের ডাল থেকে ছোঁ মেরে মেরে কুচো মাছ ধরছে নদী থেকে।

ঋক বলল, আসলে বাড়ির চারদিকেই বারান্দা। তার ওপরে মাটির ছাদ। শীতে গ্রীষ্মে দিক বদলাই। সূর্যের যে, অয়নপথ বলে একটা ব্যাপার আছে তা এই বাড়িতে না থাকলে এমন করে বুঝতে পারতাম না কখনোই। আমাদের ছেলেবেলার শ্যামবাজারের গলির সঙ্গে তো সূর্যর খুব একটা ভাব ছিল না!

বাঃ। তৃষা বলল, আপনমনেই।

তারপর বলল, এবারে আপনার ঘর দেখি।

ঘরটা একটু অন্ধকার। তবে জানলাগুলি খুলে দিতেই সব পরিষ্কার হল। দেওয়ালের বড়ো বড়ো কুলুঙ্গিতে ঠাসা বই। বিভিন্ন বিষয়ের বই। তবে কবিতা ও উপন্যাস-ই বেশি। ইংরিজি বইও খুব কম নেই।

–আপনি তো খুব খারাপ লোক। এত বই আপনার আর একটিও পড়তে দেননি কখনো আমাকে! অথচ আমার কাছ থেকে কত বই নিয়ে এসেছেন পড়তে।

ঋক হাসল। ঋকের যে, দু-টি গজদন্ত আছে এবং হাসলে যে, তাকে ভারি সুন্দর দেখায় তা আগে জানত না তৃষা। আসলে ঋককে কখনো হাসতেই দেখেনি এর আগে।

তৃষা বলল, আপনার বাড়িতে খাওয়ার মতো কিছু আছে? এতভালো লাগছে আমার যে, আজ আর শ্রীবাস্তব সাহেবের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানেই দুপুরটা কাটিয়ে দিই।

–সর্বনাশ! আমার চাকরি খেয়ে নেবেন ম্যানেজার। স্যারও ছেড়ে দেবেন না। তা ছাড়া মেয়েদের ব্যাপারে দায়িত্ব অনেক। দোষ হলে আমার-ই হবে। আপনাকে কেউ দোষী করবেন না।

এবার তৃষা হাসল।

বলল, সত্যি দোষ তো আপনার নেই-ই কিছু। যদি মিথ্যে দোষ কেউ চাপিয়ে দেয় তা নিতেও এত ভয়?

–বাঙালির ছেলে বউদি! চাকরি যাওয়ার ভয় যে, বাঘের ভয়ের চেয়েও বেশি। চাকরিটা চলে গেলে নতুন চাকরি জোটাতে লেগে যাবে অনেকদিন। তা ছাড়া আদৌ জুটবে কি না কে জানে?

–জুটবে না কেন? আপনি তো কাজ জানেন।

–কাজ নিশ্চয়ই জানি। কিন্তু কাজ জানার সঙ্গে চাকরি পাওয়ার খুব একটা সম্পর্ক আছে। কি এ দেশে?

–প্রাইভেট সেক্টরে এখনও আছে।

তৃষা বলল।

–তবু, জানাশোনা, কানেকশান ছাড়া কিছুই হয় না।

–আপনি এই চাকরি যদি সত্যিই ছেড়ে দিতে চান তো আমাকে বলবেন। আমার সেজোমামাকে যদি আমি লিখি, তো সেজোমামা এখানেই অন্য চাকরি ঠিক করে দেবেন। কলকাতাতে চান তো কলকাতাতেও।

–আপনার সেজোমামার নাম কী?

–গোপেন মিত্তির।

–বাবাঃ! তিনি তো ভীষণ পাওয়ারফুল লোক। এখানে মস্ত কোম্পানি, রবার্টসন কোম্পানিরও তো, তিনি ডিরেক্টর শুনেছি। খুব-ই ভালো কথা। তবে ঈশ্বর করুন কারও কাছেই কোনো করুণা যেন চাইতে না হয়।

–ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন আপনি? আপনার বয়সি কোনো মানুষ-ই তো করেন না আজকাল।

–মূর্খ ও দাম্ভিক লোক সংসারে চিরদিন-ই ছিল। ঈশ্বরে বিশ্বাসের আবার এখন-তখন কী? সকলের পক্ষে তো সব উচ্চতাতে ওঠা সম্ভব নয়। ঈশ্বরবোধ তো সকলের মধ্যে থাকার কথা নয়।

–যাক গে। আপনি কী খাওয়াবেন বলুন?

–এক্ষুনি ফাস্ট ক্লাস চিড়েভাজা করে দিচ্ছি, কড়াইশুটি আর শুকনো লঙ্কা ভাজা দিয়ে চিনেবাদামও দেব। সঙ্গে ধনেপাতা, কাঁচালঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ আর দুধ দিয়ে ওমলেট। আমি খুব খাঁটি দুধ পাই। রাম সিং ওর গ্রাম থেকে দিয়ে যায়। তবে বর্ষাকালে নদী পেরুনো যখন মুশকিল হয় তখন একটু অসুবিধে হয় অবশ্য।

বিস্ময়ের গলায় তৃষা বলল, আপনি সত্যিই এতসব রান্না করতে পারেন?

গজদন্তে ঝিলিক তুলে খিলখিল করে হেসে উঠে ঋক বলল, এগুলো আবার রান্নার মধ্যে পড়ে নাকি? আপনারা যে, কত কী রান্না জানেন?

--আমি?

লজ্জিত গলায় বলল তৃষা।

–হ্যাঁ। আপনি। মুখে যাই বলুন কে বিশ্বাস করছে। রান্না যে, মেয়েদের মস্ত গুণ! সে আর আমি কী বলব?

লজ্জার শেষ থাকল না আর তৃষার। কিছু বলতে গিয়ে, কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে গেল।

ঋক বলল, আপনি শুধু আমার চাকরিটা বাঁচাবেন। দেখুন, এক্ষুনি স্টোভ ধরিয়ে আপনাকে কেমন খাবার করে দিচ্ছি। সঙ্গে গোরখপুরি চা-ও খাওয়াব।

–সেটা আবার কী চা?

--এলাচ, দারচিনি, তেজপাতা সব দিয়ে। খেয়েই দেখুন না।

তৃষা এবারে হতভম্ব হয়ে গেল।

রিকশাওয়ালা পথ থেকে ক্রমাগত ঘণ্টি বাজাতে লাগল।

ঋক বলল, এক সেকেণ্ড দাঁড়ান। ওকে শান্ত করে আসি।

বলেই, চলে গেল।

ঋক চলে যেতেই, ওর লেখাপড়ার টেবিলে ঝুঁকে পড়ে দেখল তৃষা। দু-টি ফ্রেমে বাঁধানো ফোটো। একটিতে বর্ষীয়ান-বর্ষীয়সী ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলার ফোটো। সম্ভবত ঋক-এর মা বাবার। অন্যটি অতিসুন্দরী একটি মেয়ের। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের স্বল্পআলোতেও মেয়েটিকে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও রূপসি বলে চিনতে ভুল হল না তৃষার। হঠাৎ-ই ওর মনটা বড়ো খারাপ

হয়ে গেল। মনে হল কী করছে ও এখানে? শ্রীবাস্তব সাহেবের বাড়ি না গিয়ে ও এখানে কী করতে এল? কীসের খোঁজে? কীসের লোভে? পাখিরা সব জোড়ায় থাকে। তাদের কারও নীড়েই অন্য পাখির জায়গা নেই। যার যার নীড়ে ঠোকরা-টুকরি, কামড়া-কামড়ি করে অথবা গভীর সুখের নিশ্বাসের নিঃস্বনেই দিন কাটাতে হয়। যার যেমন কপাল। ঋকের চাকরির আগে ওর নিজের-ই একটা চাকরির খুব-ই দরকার। স্বাবলম্বী না হতে পারলে এবং ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন না, হয় তবে এখনও এদেশের মেয়েদের ভারবাহী জানোয়ারের মতোই দিন কাটাতে হয়। সেরকম জীবন ও সইবে না, বইবেও না। ও বুঝে গেছে যে, প্রণতর সঙ্গে তার থাকা হবে না। তার পক্ষে মামাবাড়িতে ফেরার পথও নেই! মা-বাবা, দাদা-বউদি থাকলেও কথা ছিল। তাও আজকাল মা-বাবা ছাড়া আর কারও আশ্রয়েই ফেরা যায় না। অন্যরা সকলেই বোঝা মনে করে। কিছু একটা করতেই হবে তৃষাকে।

চিঁড়েভাজা ওমলেট এবং চা খেয়ে যখন ওরা আবার বেরোল তখন ভরদুপুর। শালগাছেদের ছায়া তাদের পায়ের কাছে মেয়েদের শাড়ির ফলস-এর মতো পড়ে আছে। কিছুক্ষণ পর থেকেই তারা প্রলম্বিত হতে হতে দীর্ঘ হয়ে উঠবে। কাঁচাবোদ কমলালেবুর রসের মতো হবে। আঠা আঠা। তারপর অন্ধকার এসে সেই আঠাকে শুষে নেবে।

সাইকেল-রিকশাটা চলছে ক্যাঁচোর কোঁচোর। এবারে ঋক আর তত

আড়ষ্ট নেই। বরং তৃষার ঊরুর সঙ্গে ওর উরু এখন ছুঁয়ে রয়েছে। এই শীতের দুপুরে অন্য শরীরের মোড়কভরা উষ্ণতা বেশ এক ভালোলাগা এনে দিয়েছে তৃষার বুকে। নববিবাহিত স্বামীর নগ্ন শরীরের ছোঁয়াতেও এমন সিরসির করে না ওর শরীর। কে জানে! কেন এমন হয়। কাউকে ভালো লাগে আর কাউকে লাগে না। কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কারণ যে, মিশে থাকে এই ভালোলাগা-না লাগার মধ্যে বিশ্লেষণ করার সময় বা ধৈর্য তৃষার নেই। হয়তো ক্ষমতাও নেই।

–কী বলবেন স্যারকে? স্যার কিন্তু খুব রাগ করবেন।

হঠাৎ বলল ঋক।

–আপনার স্যার তো সবসময়েই রেগে আছেন। আজ দেখি সেই রাগ তুঙ্গে উঠলে কেমন হয়? মৃদু হেসে বলল তৃষা।

–আমার ভয় করে। যদি আমার ওপর রেগে যান।

–আপনি কীরকম পুরুষ মানুষ। নিজের ওপর বিশ্বাস নেই কেন? আপনার সমস্ত জীবন ই কি আপনার স্যারের রাগ এবং মর্জির ওপর নির্ভর করছে। এমনভাবে বেঁচে লাভ কী?

–তা ঠিক। বেঁচে কি আর আমরা আছি? বেশিরভাগ মানুষ-ই শুধু তার জীবিকাকেই আঁকড়ে আছে এটুলি পোকার মত। যদি কেউ দু-আঙুলে

জোর করে তুলে ফেলে দেয় তাহলেই শেষ। উপোষ করে মরার ভয়ে জীবিকা-ই যে, জীবন নয়– একথাটা ভাবতেও ভুলে গেছি আমরা। তাই ভাবি, আপনার কিন্তু খুব সাহস বউদি!

–কীসের সাহস?

–আপনারা কত গুণ্ডা বদমায়েশকে শায়েস্তা করতে পারেন, নিজের উপার্জনের ভাত বেঁধে খেতে পারেন, অন্য কেউ আপনাদের অপমান করলে বা নিগ্রহ করলে আপনারা তাকে উলটে অপমান করতে পারেন। মারতে পারেন।

–আমরা তো অবলা। পরমুখাপেক্ষী। আমাদের আবার সাহস!

–এটা কিন্তু ঠিক বললেন না। সাহস ব্যাপারটা শরীরের নয়, মনের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি যখন ফ্রান্স দখল করেছিল তখন ফ্রেঞ্চ আণ্ডারগ্রাউণ্ডে কত যুবতী এবং বৃদ্ধা নাম লিখিয়েছিলেন। নিশ্চিত ধর্ষণ এবং মৃত্যু এবং নানারকম পাশবিক অত্যাচারের ভয় থাকা সত্ত্বেও তাঁরা গোপনে কাজ করে গেছেন, খবর চালাচালি করেছেন, ইংলিশ, আমেরিকান, ইটালিয়ান সৈন্যদের আশ্রয় দিয়েছেন, যখন ইনভেশান হল তখন সবরকম অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম করেছেন। তাঁরা কি যেসব সৈন্যরা রাইফেল হাতে লড়াই করেছেন ফ্রন্ট-এ, তাঁদের চেয়ে কিছু কম সাহসী! সেনাবাহিনীর অফিসারদের যখন শিক্ষা দেওয়া হয়, খাড়াকভাসলাতে

কমিশন পাওয়ার আগে তখন তাদের এই কথাটা শেখানো হয়, ফিজিক্যাল কারেজ ইজ দ্যা লিস্ট ফর্ম অফ কারেজ। মনের সাহস-ই আসল সাহস।

–তাই।

নিজের মনে বলল তৃষা। রিকশাটা মুরাদগঞ্জের পথে পড়ল। নির্জনতা হারিয়ে গেল। আবার লোকজন, চিৎকার, ধুলোবালি, পানের পিক, মিষ্টির দোকানের সামনে ফেলে দেওয়া শালপাতার দোনার শীতের দুপুরের উত্তরের হাওয়াতে ওড়াউড়ি, বাসের কনডাক্টর ছোকরার চিলচিৎকার। একটা মারুতি গাড়িকে দেখে পাদানিতে দাঁড়ানো ছোকরা চেঁচিয়ে উঠল, এ ছারপোকা। সরে যা। নইলে টিপে মেরে দেব। সর এখুনি নইলে মর।

হেসে উঠল তৃষা। কিন্তু মাঝপথে ওর হাসি থেমে গেল। ওদের উলটোদিক থেকে প্রণতর ক্যাটক্যাটে নীলরঙা অ্যাম্বাসাডার আসছে। প্রণতর পাশে রামখেলাওন বসে।

গাড়ি দেখেই ঋক রিকশা থামাতে বলল।

প্রণত দূর থেকেই চেঁচিয়ে বলল ভেবেছটা কী? কোথায় গেছিলে তোমরা? তৃষা বলল, যাচ্ছিলাম তো শ্রীবাস্তব সাহেবের ওখানেই। কিন্তু আমার পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হতে লাগল, বমি বমি করতে লাগল। তাই ঋকবাবুর বাড়িতে গিয়ে বমি করে, বাথরুম করে ফিরছি।

–ঋক তোমার বাড়ি কোথায়?

–সুরাইয়াগঞ্জে।

–কে কে আছেন তোমার বাড়িতে?

–আমি একা। ম্যানেজার সাহেব, রামখেলাওন সকলেই জানে।

–অ।

তারপর তৃষাকে প্রণত বলল, তা এখন দয়া করে গাড়িতে ওঠো।

–ইম্পসিবল। আমার যা শরীরের অবস্থা তাতে বাড়ি গিয়েই শুয়ে পড়ব।

--খাবে না কিছু দুপুরে? রান্না তো হয়নি বাড়িতে।

–নাঃ। চিনি, লেবু দিয়ে শরবত করে খেয়ে শুয়ে পড়ব।

–আর কী খাবে! আর কিছু নিজে রাঁধতে পারলে তো খাবে? মুঙ্গলীকে ছুটি দিয়েছ তো! এবেলা?

–হ্যাঁ।

–রিকশা ছেড়ে, এখন দয়া করে গাড়িতে ওঠো বাড়িতে নামিয়ে দিচ্ছি।

–রিকশা করেই চলে যাব। তুমি যাও-না। দেরি হয়ে যাবে না তোমার?

–দেরি যা হবার তা তো হয়েইছে। তার ওপর এমবারাসমেন্ট। প্রত্যেকের স্ত্রী এসেছে। সেলসম্যানেজার, পারচেজ ম্যানেজার, চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট পি. আর. ও., এখানের কমার্শিয়াল ট্যাক্সঅফিসার, ইনকাম ট্যাক্স অফিসার, এস. ডি. ও., এস. ডি. পি. ও. প্রত্যেকেই স্ত্রী নিয়ে এসেছেন, কেবল আমার স্ত্রী-ই....

তৃষা রিকশাতে বসেই শুনল।

–কী হল? নামবে না?

–নাঃ। তুমি যাও।

এবার গলা নামিয়ে বলল প্রণত, কী সিনক্রিয়েট করছ? একজন জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্টের সঙ্গে রিকশায় বসে সারাবাজার ঘুরে কি আমার বদনাম করতে চাও? তোমার মতলবটা কী? এই ঋক! তুমি নেমে রিকশা ছেড়ে দাও।

–না। আমি রিকশাতেই বাড়ি যাব। চলো রিকশাওয়ালা।

–আমি নেমে যাই?

ভয়ের গলায় ঋক বলল।

–আপনি কি পুরুষ মানুষ? আমি আমার স্বামীকে ভয় পেতে পারি, আপনি পাবেন কোন দুঃখে?

–স্যার! প্লিজ পার্ডন মি!

বলল ঋক।

ঘেন্না হল তৃষার ঋকের ওপরে।

বলল, নেমে যান আপনি। আমি একাই চলে যাব। সোজাই তো রাস্তা।

–আমার স্ত্রী কখনো রিকশা করে বাজারে ঘুরবে না।

–বাঃ। তুমি-ই তো বলেছিলে রিকশা করে যেতে।

–বলেছিলাম। রিকশা করে কোনো ডেস্টিনেশনে যাওয়া এক আর এরকম ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো আর এক।

প্রণতর চিৎকারে কিছু উৎসাহী বেকার জুটে গেল মজা দেখতে।

তৃষা কঠিন গলায় বলল, চলো রিকশাওয়ালা।

রিকশাওয়ালার যে-যখন সওয়ারি সেই তখন তার মালিক। সে সওয়ারির কথামতো প্যাডেলে চাপ দিল।

প্রণত বলল রিকশাওয়ালাকে, মারেগা এক ঝাপ্পট।

রিকশাওয়ালা বলল, জবান সামহালকে বাত কিজিয়ে গা। গাড়িপর সওয়ার হুয়া তো নবাব বন গ্যায়া কি আপ? ম্যায় দাঁত তোড় দুংগা আপকি।

–ক্যা বোলা? তুম জানতে হো ম্যায় কওন? আভভি এস. ডি. পি. ও সাহাবকো বোলকে তুমকো ভর দেগা থানেমে।

-কিঁউ? হাম কওসি কসুর কিয়া? বড়া খানদান কি ক্যা এহি হরকত হ্যায়? মিয়াবিবি রাস্তেপর আকর কুত্তেকি মাফিক লড়তে হেঁ।

রিকশাওয়ালা ঘেন্নার সঙ্গে বলল।

–ক্যা বোলা তুমনে?

এবার প্রণত রিকশাওয়ালাকে বলল ঘুসি পাকিয়ে এগিয়ে এসে।

রিকশাওয়ালা ফট করে নেমে দাঁড়িয়ে রিকশার পেছন থেকে একটা সাইকেলের চেইন বের করে হাতে নিয়ে বলল, আপনা জান সামহালকার ঔর আগে বাড়িয়ে গা।

প্রণত কিন্তু মারতে পারল না রিকশাওয়ালাকে শেষপর্যন্ত। রিকশাওয়ালার সংহারমূর্তি দেখে পেছিয়ে গিয়ে বলল, রিকশাওয়ালাসে ম্যায় ক্যা লড়েগা?

হামারা ইজ্জত......

হঠাৎ ঋক বলল রিকশাওয়ালাকে, আররে! ই সাব স্টিভেন কোম্পানিকো মেইনটিনেন্স ইঞ্জিনিয়র হ্যায়। ভারি বড়া সাব।

রিকশাওয়ালা বলল, ছোড়িয়ে তো! হামারা ক্যা আয়াগ্যায়া? নোকরি দিজিয়েগা উনোনে হামারা লেড়কাকো? ফজুল বাঁতে করতে হ্যায় ইনলোঁগোনে। ডরপোক কাঁহাকা। মারনেকা হিম্মত হোত তো তব কুছ সমঝতাথা। আপনা ইজ্জত পর থুক কর আপনা বিবি লেকর ঘর চলা যাইয়ে সাহাব।

এবার ঋকের দিকে ঘুরে বলল, হামারা ভাড়া দে কর মুঝে ছুট্টি কর দিজিয়ে।

ঋক পকেট থেকে একটা ফাটা মানিব্যাগ বের করল।

তৃষা বলল, আমি দিচ্ছি।

প্রণত বলল, কিতনা হুয়া?

–বহত টাইম খাড়াথা উ জঙ্গলমে, হুরিনানাকি পাস। পঁদরো রুপাইয়া দিজিয়ে কমসে কম।

তৃষা ভেবেছিল প্রণত দর করবে। কারণ রিকশাওয়ালা অনেক বেশি

চাইছে। কিন্তু প্রণত দু-টি দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়ে বলল, যাও পাঁচ রুপেয়া বকশিশ। সেলাম করকে লেনা।

রিকশাওয়ালা নিজের সবুজরঙা ছেঁড়া মার্কিনের পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটি সবুজ পাঁচ টাকার নোট বের করে তাতে থু: করে থুথু ফেলে বলল, হামারা সেলাম বহত মাঙ্গা হ্যায়। কমিনে আদমিওঁসে ম্যায় বকশিশ নেহি লেতা হ্যায়। লিজিয়ে, রাখিয়ে ই নোট।

প্রণত কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফস করে নোটটাকে ছিঁড়ে ফেলে ওপরে উড়িয়ে দিল।

তৃষাও ততক্ষণে নেমে দাঁড়িয়েছিল।

রিকশাওয়ালা বলল, আসলি রহিস আদমিকা জবানসে ঔর এতলাক, ঔর তমদুনসে পাত্তা চলতা রহিসি কি। আপ ফালতু আদমি হ্যায়। সিঁফ পইসোসে রহিসি কভভি না আতি হ্যায় জনাব।

হঠাৎ তৃষা বলল, আমি হেঁটেই বাড়ি যাচ্ছি।

–না।

প্রণত বলল।

ঋক ডাকল, বউদি।

তৃষা কারও কথায় উত্তর না দিয়ে শাড়ির আঁচলটা দিয়ে বুক ঢেকে সোজা বড়ো বড়ো পায়ে এগিয়ে চলল।

ঋক বলল, স্যার আমি সঙ্গে যাই।

--নো। তুমি জাহান্নমে যাও। কাল অফিসে তুমি দেখা করবে আমার সঙ্গে আমি এয়ারপোর্ট থেকে ফিরে এলেই।

–ইয়েস স্যার।

.

০৩.

এখন রাত প্রায় দশটা। তৃষা গরম জলে স্নান করে শুয়েছিল কম্বল গায়ে দিয়ে। টিভির ইংরিজি খবরটা বহুদিনের অভ্যেসবশে শোনে তাই সেটা শুনছিল।

মুঙ্গলী অনেকবার খাওয়ার কথা বলেছিল কিন্তু খায়নি তৃষা কিছুই। প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ গাড়ি ঢোকার শব্দ পেল গ্যারাজে। অথচ প্রণতর তো আসবার কথা ছিল না। রাতটা পাটনাতেই কাটাবার কথা ছিল। তারপর-ই ঝনঝন-ক্রিং ক্রিং একটা আওয়াজ শুনতে পেল। মুঙ্গলীকে ডেকে তৃষা বলল, দ্যাখ তো মুঙ্গলী কী হল?

মুঙ্গলী বলল, সাহাব বহত পিকে আয়া হুয়া হ্যায় মেমসাব। হিক বাবুকি সাইকেল থা ফেক দেলিন বড়ি গোসসেসে।

প্রণত ঘরে ঢুকল একটু পর-ই। গাঢ় লাল চোখ। ওর মুখে প্রচন্ড ক্রোধ পুঞ্জীভূত কিউমুলাস নিশ্বাস, মেঘের-ই মতো থমথমে হয়ে জমে ছিল। ঘরে ঢুকেই দরজাটা বন্ধ করে দিল ও। শীতের জন্যে জানলার পর্দা সব টানাই ছিল। জানলাও বন্ধ ছিল। দরজা বন্ধ করেই বিবস্ত্র হয়ে নিজেকে ছুঁড়ে দিল তৃষার দিকে। খাটটা শব্দ করে উঠল।

তৃষা আতঙ্কে উঠে বসল। দু-পা বুকের কাছে গুটিয়ে বলল, না, না। না–আ।

প্রণত যে-ভাষায় কথা বলল তখন তা উচ্চারণ করাও যায় না। বিড়বিড় করে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, ও-ও। বুঝেছি ঋককে দিয়ে...আর স্বামী.....

বলেই, তৃষার ওপরে আবারও ঝাঁপিয়ে পড়ল। তৃষা আর্তনাদ করে বুকের কাছে দু-পা জড়ো করে খুবজোরে একটি লাথি মারল তাঁর পতিদেবতাকে। দেবতা ছিটকে পড়লেন দূরে। তৃষা তাড়াতাড়ি উঠে বেডসাইড টেবিল থেকে পেতলের ফুলদানিটা তুলে নিয়ে বলল, আবার যদি কাছে এসেছ তবে তোমাকে খুন করব আমি।

বলতেই প্রণত বেরিয়ে গেল এবং ফিরে এল গাড়ি টো করার মোটা দড়িটা নিয়ে। দড়িটাকে ফাঁসের মতো করে ছুঁড়ে দিল তৃষার মাথার ওপর

দিয়ে তারপর এক হ্যাঁচকা টানে বেঁধে ফেলল তাকে। খুব-ই লাগল তৃষার। তৃষা ভাবছিল, যা বড়ো সোহাগে, আদরে স্বামীকে দেওয়ার ছিল তা যে, এমনভাবে দিতে হবে তা কে জানত!

প্রণত তৃষাকে দড়িবাঁধা অবস্থায় হেঁচড়ে টেনে বালিশের ওয়াড় খুলে তার দুটি হাত এবং পা বাঁধল। মুখের মধ্যে ঘামের গন্ধমাখা নোংরা রুমাল ঢুকিয়ে দিয়ে তৃষাকে তুলে এনে রকিং-চেয়ায়টার ওপরে বসাল। বসিয়েই আবার বেরিয়ে গেল।

তৃষার এবারে খুব ভয় করতে লাগল। ওকে যখন রকিং-চেয়ারে বসিয়ে গেল তখন তৃষার শরীরে আর কোনো ভয় নেই। শারীরিকভাবে আর উৎপীড়ন করবে না প্রণত। এবার কোনো নতুন মানসিক অত্যাচারের কথা ভাবছে বোধ হয় ও। কিন্তু সেটা কী? ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল তৃষার। রুমাল ঢোকানো থাকাতে এমনিতেও শুকিয়ে যাচ্ছিল গলা।

একটুপর-ই মুঙ্গলীর গলার স্বর শুনতে পেল তৃষা। মুঙ্গলী আর্তচিৎকার করছে না। নীচু গলায় বলছে, নেহি নেহি মেমসাহাবকি সমনা নেহি। ছোড় দিজিয়ে সাহাব। আব যব বলিয়েগা, যাঁহা বলিয়েগা...ম্যায় কভভি না বোলতি!

মুঙ্গলীর এইসব কথা শুনে আত্মারাম কেঁপে উঠল তৃষার। মুঙ্গলী! তার স্বামীর আসল শয্যাসঙ্গিনী তাহলে, ওই সরল শক্ত-সমর্থ মাংসল শরীরের

আদিবাসী মেয়েটি।

মুঙ্গলীকে জোর করে টানতে টানতে এনে প্রণত ঘরে ঢুকল। মুঙ্গলী কাঁদো কাঁদো গলায় বলছিল, ইয়ে ঠিক নেহি হ্যায়। বহত-ই খরাব....। বহত-ই.....

প্রণত বলল তৃষাকে, দ্যাখো তোমার সামনেই মুঙ্গলীকে আমি.... তোমার চেয়ে ও সব দিক দিয়ে সুন্দর। কী আছে তোমার বিদ্যার গুমোর আর বদমাইশি জেদ ছাড়া। তোমার যোগ্য হল ওই জুনিয়র অ্যাকাউন্টেন্ট।

বলেই বলল, আই মুঙ্গলী খোল। খোল শাড়ি। সব খোল।

প্রণতর ক্ষণিক অন্যমনস্কতার সুযোগে মুঙ্গলী দৌড়ে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। পিছু পিছু প্রণতও দৌড়োল।

তৃষা ভাবছিল, ভারি ভালো মেয়ে মুঙ্গলী। ও কী করবে। গরিবি মানুষ, প্রয়োজন আছে, মেয়েদের যা সবচেয়ে বড়ো সম্পত্তি তাই ভাঙিয়ে কিছু করে নেয়, নিরুপায়ে। মেয়েদের নিরুপায়তার স্বরূপ শুধু মেয়েরাই জানে। তবু মুঙ্গলী যদি রাজি হত প্রণত যা বলছিল তা তৃষার সামনেই করতে, তবে তৃষাকে যে, কতবড়ো অপমান করা হত তা মুঙ্গলী মেয়ে বলেই বুঝেছিল।

বাইরে থেকে প্রণত আর ফিরল না। গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শুনল।

ঋকের সাইকেলটাকে চাপা দিয়ে মুড়মুড় করে ভেঙে দিয়ে গাড়িটা চলে গেল। হেডলাইটের আলো কম্পাউণ্ড ঝেটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল। মালি যে, গেট বন্ধ করল সেই শব্দ শুনতে পেল তৃষা। মুঙ্গলীও কিন্তু ফিরে এল না আর। তৃষা জোরে ডাকল মালি-ই-ই। কিন্তু আওয়াজ হল না কোনোব্যথা করছিল গলায়, গালে আর চোখে। তৃষার দু-চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগল। শীতও করতে লাগল খুব। কম্বলটা যে, গায়ে দিয়ে দেয় কেউ এমনও নেই একজন।

অনেকক্ষণ পর বসবার ঘরের মেঝেতে সাবধানি খস খস একটা শব্দ শুনতে পেল তৃষা। কথা না বলতে পেরে বসবার ঘরের আর শোয়ার ঘরের মধ্যের পর্দার দিকে চেয়ে রইল ও। কেউ আসছে ঘরের দিকে। বাইরের কেউ? মালি? ভাল্লুকের মতো রোমশ চেহারা। খুব শক্তি ধরে শরীরে।

বেডরুমে কেন আসছে মালি? মালি কি? পুরুষজাতকে কখনো বিশ্বাস নেই। মা শিখিয়ে দিয়েছিলেন এক বিশেষ দিনে যেদিন ও বড়ো হয়ে গেছিল হঠাৎ। সে বড়ো সুখের অথচ দুঃখের দিন। বড়োভয়ের দিন। মা বলেছিলেন...

মালিই। পর্দা ঠেলে মালি কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল হলুদরঙা স্বচ্ছ নাইটি পরা তৃষার দিকে। পরক্ষণেই লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল। বিড়বিড় করে বলল, হায় ভগবান।

মালি কী ভাবল একটুক্ষণ, তারপর এগিয়ে এসে তৃষার হাত-পায়ের বাঁধন, মুখের রুমাল তারপর দড়িটাও খুলে ফেলল একে একে।

তৃষা মাথা নীচু করে বসেছিল। তখনও হতভম্ব ভাবটা কাটেনি।

মালি বলল, হাতে-মুখে জল দিয়ে নিন মেমসাব।

তারপর তৃষার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, আপনি কী করবেন? কলকাতা যাবেন বাপের বাড়িতে?

–আমার বাপের বাড়ি নেই মালি।

–নেই মানে?

–ওই। না থাকার-ই মতো।

–ওঃ ।

–মুঙ্গলী কোথায় গেছে মালি?

–মুঙ্গলীকে তো সাহাব সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। ম্যানেজারবাবুর বাড়ির পথে গেলেন।–মুঙ্গলী কি খারাপ মেয়ে? মালি? মালি মাথা নীচু করে বলল, খারাপ বলব না। খারাপ ও নয়। মনে হয় সাহাব-ই ওকে খারাপ করে দেন মাঝে মাঝে। ওরা বড়ো গরিব। স্বামীটা রোজগার করতে পারে

না, ওকে আদরও করতে পারে না। গাছ কাটতে গিয়ে পায়ের ওপর গাছ পড়ে ওর দু-টি পা-ই গেছে। তাই মুঙ্গলীর প্রয়োজন অনেকরকম। এবং জরুরি প্রয়োজন সব। সাহাব তার-ই সুযোগ নিচ্ছেন।

–মুঙ্গলীর ছেলে-মেয়ে নেই? আমি কখনো জিজ্ঞেস করিনি।

–না, ওর ছেলে-মেয়ে হবেও না।

তারপর-ই বলল, আপনি এখন কী করবেন মেমসাহেব?

--তুমি আমাকে একটা রিকশা ডেকে দেবে? পাওয়া যাবে রিকশা শীতের এতরাতে?

–তা পাওয়া যাবে। তবে বাজার অবধি হেঁটে যেতে হবে। যদি আপনি বলেন তো যাব ডাকতে। কিন্তু যাবেন কোথায়? এতরাতে? আপনার তো রিস্তেদার কেউ নেই এই মুরাদগঞ্জে।

–না। তা নেই। আচ্ছা মালি, আমি চোখে-মুখে একটু জল দিয়েই আসছি। তুমি। বারান্দাতেই থাকো।

–জি মেমসাব।

বাথরুমের দরজার ছিটকিনি তুলে দিতেই হুহু করে জল নামল তৃষার দু-চোখে। কত স্বপ্ন আর কল্পনা মিশিয়েই এই বাথরুম না রেনোভেট

করেছিল। দেওয়ালের রং, সেই রঙে মেলানো টাইলস, শাওয়ার, শাওয়ায়ের পাশে হালকা সবুজরঙা পলিথিনের আড়াল! কত ভেবেছিল। কী ভেবেছিল, স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে স্নান করবে একদিন শাওয়ারের নীচে। আরও কত কত কৈশোর থেকে জমিয়ে রাখা সব নানারঙা কল্পনা! সব-ই মিথ্যে হয়ে গেল। বড়ো তাড়াতাড়ি সবকিছু মিথ্যে হয়ে গেল। এর পেছনে কি ছটোমামির কোনো হাত ছিল? মাঝে মাঝেই প্রণতর কাছে খামে চিঠি আসে কলকাতা থেকে Personal লেখা। যে লেখে তার হাতের লেখাটি একেবারে ছোটোমামির হাতের লেখার মতো। ছোটোমামা মায়ের থেকে বয়সে অনেক-ই ছোটো ছিলেন। ছোটোমামিও বয়সে তৃষার সমবয়সিই হবে। মেজোমামা নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। মেজোমামার তৃষার ওপর অন্ধ ও অগাধ স্নেহটা ছোটোমামি তার বিয়ের পর থেকে কোনোদিন-ই ভালো চোখে দেখেনি। ছোটোমামার বিয়ে হয়েছে দু-বছর। মামাদের মধ্যে ছটোমামাই একমাত্র Waster। পরিবারের যৌথ ব্যাবসাও দেখে না। শুধু রেসের মাঠ আর মদে টাকা ওড়ায়। অনেক ছোটো, আদরের ভাই বলে অন্য মামারা কিছুই বলেন না। ছোটোমামার বিয়েতেও মামাদের আপত্তি ছিল। একবার পাটনাতে বেড়াতে গিয়ে অজ্ঞাতকুলশীল এই ছোটোমামি, সুন্দরী বৃন্দাকে সঙ্গে করে এনে তোলে ছোটোমামা। চেহারা সত্যিই বেশ ভালো, কিন্তু সেজোমামি বলেছিলেন হাবভাব যেন বাইজির মতো! সেই সৌন্দর্যে কোনো সম্ভ্রান্ততা ছিল না। রেজিস্ট্রি করেই এসেছিল পাটনা থেকে। তাই বিয়ে দিতে হয়।

ছোটোমামির আত্মীয় বলতে শুধু এক মামা। হাজামত-এর মতো হাবভাব তাঁর। কান দুটো বড়ো বড়া। অত্যন্ত ধূর্ত এবং দুশ্চরিত্র মানুষ। চেহারা দেখলেই মনে হয় প্রতি সন্ধেবেলা গাঁজা খান। ওঁকে নিয়ে মামাবাড়িতে বেশ অশান্তিও হয়েছিল। এই ছোটোমামিমা বৃন্দাই প্রণতর সঙ্গে সম্বন্ধ এনেছিল তৃষার। প্রণতর বাবা-মায়ের পরিচয় দিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রণতর আসলে কেউ যে, নন একথা তৃষা বিয়ের অনেক পরে জানতে পেরেছে। আসল বাবা-মা নাকি মতিহারীর এক বস্তিতে থাকেন। প্রণত কোনো দিনও তাঁদের খোঁজ নেয় না। তাঁরা নাকি প্রায় না খেয়েই থাকেন। এসবও তৃষা জেনেছে মতিহারী থেকে তৃষাকে গোপনে লেখা প্রণতর ছোটোবোনের চিঠি থেকে। মাত্র কদিন আগে। একবার সে মতিহারীর একজন লোককে সঙ্গে করে তৃষার সঙ্গে মুরাদগঞ্জে দেখাও করতে এসেছিল। প্রণত তখন ট্যুরে, রাঁচিতে গেছিল দশ-দিনের জন্যে। মেয়েটির মাথায় একটু গোলমাল আছে! তবে ভারি সরল ও বঞ্চিত। মুঙ্গলীকে তার আসল পরিচয় দেয়নি তৃষা। মুঙ্গলী মেয়েটা এমনিতে সরল-ই। আজ তার অন্য রূপ জেনে ভারি আহত বোধ করছিল ও।

মুখ ধুয়ে নাইটি ছেড়ে শাড়ি পরল। যে-শালটা বের করেছিল ক-দিন আগে এবং হাতের কাছে ছিল সেটাই জড়িয়ে নিল। ছোটো অ্যাটাচিতে মামাদের দেওয়া গয়নাগাটি, নিজের ব্যক্তিগত কিছু জিনিস এবং হাজার টাকা, যা বিয়েতে পাওয়া টাকা থেকে ব্যাঙ্কে দেওয়া হয়নি তাই শুধু সঙ্গে নিল। একটি বলপয়েন্ট পেন। তারপর চটি গলিয়ে বাইরে এল।

কৃষ্ণপক্ষর রাত অন্ধকার। কিন্তু ঝকঝক করছে তারারা আকাশময়। একবার মুখ তুলে ওপরে তাকাল। তাকাতেই দু-চোখ আবার জলে ভেসে গেল। দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরল তৃষা। কিছুক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে এসে বসল চেয়ারে। একটি কুকুর কেঁদে যাচ্ছে পথ দিয়ে। জোরে কেউ সাইকেল চালিয়ে তার পাশ দিয়ে চলে যেতেই কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে তাকে ধাওয়া করে গেল। তারপর আবার চুপচাপ। গেটের একটু বাঁ-পাশে চা-শিঙাড়ার দোকানি রাত গম্ভীর হলে শুয়ে পড়ার আগে রোজ তুলসীদাস পড়ে সুর করে। বেশ একটা আমেজের সৃষ্টি হয়। অন্য এক পরিবেশ।

মালি ওর ভাবনার রেশ কাটিয়ে নিয়ে বলল, কাঁহা যাইয়েগা মেমসাব?

–কোনো হোটেল টোটেল নেই? তোমাদের মুরাদগঞ্জে?

–যেরকম হোটেল আছে তাতে একা আওরাতের পক্ষে থাকাটা খুব-ই বিপদের হবে।

না বলে বলল, বিপদ এখানেই বা কম কী!

মামাদের ওপরে, এই দেশের ওপরে, এ দেশের মেয়েদের এই নিদারুণ অসহায়তার কারণে তীব্র এক ঘৃণামিশ্রিত রাগ হল তৃষার। এ দেশে একা একজন মেয়ের মানুষের মতো মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার জন্যে আরও কতদিন যে, অপেক্ষা করে থাকতে হবে তা কে জানে। উইমেনস লিব

শুধু শহরের কিছু উচ্চবিত্ত মেয়েদের শখের পাস-টাইম। গ্রামে-গঞ্জে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কোটি কোটি মেয়েদের যে, কী নিদারুণ লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অত্যাচারের মধ্যে এবং আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তা যদি সেইসব শৌখিন লিবারেশনের প্রবক্তারা একটুও জানতেন!

ভাবল তৃষা।

তবে এখানে সে আর একমুহূর্তও থাকবে না। এই অপমানকর অবস্থার চেয়ে বরং ভেসেই যাবে ভাগ্যের ভরসায়, যেখানে গিয়ে ঠেকে; কিন্তু মরে গেলেও আর কিছুতেই এই বর্বরের সঙ্গে একদিনও ঘর করবে না।

মালি দাঁড়িয়েছিল মেরুন রঙা একটা ছেঁড়া ফুলহাতা সোয়েটার আর ধুতি পরে। খালি পা। ওর শীত করছিল খুব। বুঝতে পারছিল তৃষা।

তৃষা বলল, রিকশা ডাকো মালি। দুটো রিকশা ডেকো।

–দুটো কেন?

–একটাতে আমি যাব। আর একটাতে ঋকবাবুর সাইকেল। সাইকেলটা কি মেরামত হবে?

–বোধ হয় না।

--যাও তবে। ডেকে আনো রিকশা।

–আপনি কি ঋকবাবুর ডেরায় গিয়ে উঠবেন? লোকে কী বলবে মেমসাব?

–লোকে কী বলবে তা নিয়ে আমি আর ভাবি না মালি। এখানে আমি আর থাকব না। ঋকবাবুকে আমি বেশি না জানলেও এটুকু জেনেছি যে, মানুষটি ভালো। তিনি এই বিপদের সময়ে আমাকে পথে বের করে দেবেন না। রাতটা তো কাটুক তারপরে কী করা যায় ভেবে দেখব। কালকে দুপুরে তুমি একবারের জন্যে যদি সুরাইয়াটোলিতে আসো। চেন কি ঋকবাবুর বাড়ি? তাহলে তোমার হাতে তোমার সাহেবকে একটি চিঠি দেব। পারবে দিয়ে আসতে?

–দেখি। বাড়ি আমি চিনি। সে তো বহুত-ই সান্নাটা জায়গাতে। রাতভর একা আওরাত আপনি থাকবেন কী করে সেখানে?

–সব আওরাত-ই একা মালি! পৃথিবীর সব আওরাত-ই আমার মতোই একা। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না। এবারে তুমি যাও। বড়ো দেরি হয়ে যাচ্ছে।

–যাই মেমসাব।

মালি চলে যেতে বারান্দাতে বসে তৃষা ভাবছিল, মালির সঙ্গে এতকথা বলা তার উচিত হয়নি। মালি হয়তো এতকথা বুঝলও না। উলটে কী ভাবল হয়তো ওকে। কিন্তু যে, মানুষের কেউ নেই সে হয়তো কুকুর-বেড়ালের সঙ্গেও কথা কয়। মানুষকে যখন কথায় পায় তখন সে হাওয়ার

সঙ্গে, গাছের সঙ্গে, পথের সঙ্গেও কথা কয়।

রিকশাটা আসতে যতক্ষণ দেরি। তারপর-ই তৃষার জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হবে। আরম্ভটুকুই জানে শুধু সে, শেষটুকু জানে না। ঋক তাকে এতরাতে আদৌ আশ্রয় দেবে কি না কে জানে? রাতটুকু আশ্রয় দিলেও তারপরে কী করবে তা একেবারেই অজানা। অথচ ঋক ছাড়া অন্য কাউকেই তৃষা জানে না এখানে যার কাছে সে যেতে পারে! এত রাতে এত গয়নাগাটি, নগদ হাজার টাকা নিয়ে ওই নির্জনপথে যাওয়া আদৌ উচিত হবে না হয়তো। কিন্তু তৃষার মন থেকে সব ভয় উবে গেছে। কিছুকেই সে আর ভয় পায় না। তার নারীত্বের এমন এক গোপন নরম কুঠুরিতে যে, চরম আঘাত পেয়েছে তার পক্ষে আর কোনো আঘাতকেই আঘাত বলে মনে হবে না যে, সে-বিষয়ে সে নিঃসন্দেহ। ভয় এখন একটাই। ঋক যদি তার চাকরি খাওয়ার ভয়ে তৃষাকে ফিরিয়ে দেয়, আশ্রয় না দেয়! তাহলে কী-যে হবে তা ভাবতে পর্যন্ত পারছে না ও।

কতক্ষণ কেটে গেল কে জানে। ভাবনায় পেলে সময়ের হুশ থাকে না কোনো। মালি যখন দু-টি রিকশা নিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকল, দু-টি রিকশার চার চাকাতে কিরকির শব্দ উঠল কাঁকুরে মাটিতে তখন সংবিৎ ফিরে পেল তৃষা। উঠে দাঁড়িয়েই বলল, চলো।

মালি একটি রিকশাকে গ্যারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে তালগোল পাকানো ঋক-এর সাইকেলটাকে তুলল তাতে। তুলে নিজেও সিটের ওপর উঠে

বসল।

–তুমি যাবে মালি? তোমার সাহাব যদি ফিরে আসেন এরমধ্যে।

–এলে আসবেন।

–তোমার ওপর যদি রেগে যান? যদি ছাড়িয়ে দেন তোমাকে?

–আমি আমার মালিকের চাকর। ভাড়াটের চাকর নই। সাহাব তো মালিকের ভাড়াটে। আর তেমন হলে চাকরি না হয় ছেড়েই দেব। পেটের জন্যে চাকরি করি মেমসাব। যতক্ষণ এই হাতদুটো আছে ততক্ষণ এ চাকরি গেলেও অন্যকিছু করতে পারব। কিন্তু ইনসান-এর মতো না বাঁচলে বেঁচে থেকে লাভ কী? আমার জন্যে আপনি চিন্তা করবেন না।

বাগানের আলোতে মালির শক্ত সুগঠিত শির-ফোলানো হাত দু-টির দিকে তাকিয়ে তৃষা ভাবল ওর যদি অমন দু-টি হাত থাকত! তাহলে ও-ও হয়তো বলতে পারত, আমার জন্যে কারও চিন্তা করার দরকার নেই। যে, যাই বলুক এখনও একজন পুরুষে আর নারীতে অনেক-ই তফাত এই দেশে। কবে যে, তারা সমান হবে!

রিকশা চলেছে। আগে মালির রিকশা, পেছনে তৃষার। দু-পাশের দোকানপাট প্রায় সব-ই বন্ধ। দু-একটি দোকানের প্রায়-বন্ধ ঝাঁপ থেকে আলোর ফালি এসে পড়ছে পথে। দু-একটি সাইকেল যাচ্ছে। রিকশা প্রায়

নেই বললেই চলে। দোতলা বাড়ির মতো উঁচু মাল-বোঝাই মার্সিডিস ট্রাক জোরে হর্ন বাজিয়ে হেডলাইট জ্বেলে ন্যাশনাল হাইওয়ের দিকে ছুটে চলেছে।

স্যুটকেসটি কোলের ওপরে নিয়ে অন্ধকার পথের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে আছে তৃষা। চোখ দুটি মাঝে মাঝেই ভিজে যাচ্ছে, ভেসে যাচ্ছে জলে। কিন্তু রুমাল দিয়ে মোছারও চেষ্টা করছে না ও। জীবন-ই যখন ভেসে গেল তখন ভাসা-চোখের খোঁজ কে আর রাখে।

সুরাইয়াটোলির দিকে মোড় নিতেই অন্ধকার গ্রাস করে ফেলল রিকশাদুটোকে। আগে আগে যাওয়া সামনের রিকশাটাকেও যেন দেখা যাচ্ছে না। ওই রিকশার পেছন দিকে তলায় ঝুলোননা আলোটা আর ওর রিকশায় হ্যাঁণ্ডেলের মাঝে বসানো কেরোসিনের আলোটা যেন অন্ধকারকে আরও বাড়িয়ে দিল।

মাথার ওপরে আঁচলটা তুল দিল তৃষা। শিশির পড়ছে। শিশিরে রিকশার সিট ভিজে গেছে। বড়ো শিমুল, মহুয়া আর ঝাটিজঙ্গল বোধ হয় ছাড়িয়ে এল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। শালবন থেকে ভেজা শালপাতার আর ভেজামাটির মিষ্টিগন্ধ আসছে। নদীর দিক থেকে শেয়াল ডেকে উঠল। প্রথমে একটি। তারপরে অনেকগুলো। রাত এখন প্রায় বারোটা হবে। প্রচন্ড শীত। তাই মনে হচ্ছে রাত দুটো। বিশেষ করে সুরাইয়াটোলির এই রাস্তায়। কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন নেই। দু-টি

বাদুড় উড়ে গেল মাথার উপর দিয়ে সপসপ শব্দ করে। ভয় পেল তৃষা।

মালি সঙ্গে না থাকলে ঋক-এর নিষ্প্রদীপ মাটির বাড়ি এই অন্ধকারে চিনতেই পারত না তৃষা। বাড়ি ফেলে চলে গেল এই পথ বেয়ে কোথায় যে, গিয়ে পৌঁছোত তাও ও জানে না।

রিকশাওয়ালাকে ফিসফিস করে শুধোল, এই পথ কোথায় গেছে?

রিকশাওয়ালা বলল, সুরাইয়াটোলি-র কবরখানায়।

গা ছমছম করে উঠল তৃষার।

.

ততক্ষণে মালি রিকশা থেকে নেমে ঋক-এর বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হিক বাবু। হিক বাবু শো গ্যয়া ক্যা? হিক বাবু! বলে ডাকতে লাগল। ওর রিকশাওয়ালা কিরিং কিরিং করে ঘন্টা বাজাতে লাগল। তার দেখাদেখি তৃষার রিকশাওয়ালাও।

তৃষা বলল, আস্তে। ভাবল, গাঢ়ঘুমের মধ্যে এমন হঠাৎ শোরগোলে বেচারার ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল শরীর খারাপ হতে পারে।

কিছুক্ষণ ডাকাডাকি আর ঘণ্টি বাজানোর পর হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে ঋক দরজা খুলল। অন্য হাতে লাঠি।

মালি বলল, মেমসাব আয়া। রাত হিয়াই বিতানা।

–কওন মেমসাব?

–হামারা মেমসাব।

–কাহে? ক্যা হুয়া?

–সে, উনোনে খুদহি বাতায়েঙ্গি আপকি।

অবাক হয়ে ঋক তৃষার রিকশার দিকে এগিয়ে এল। লণ্ঠনটা তুলে ধরল ওর মুখের কাছে। জলের ধারা চোখ থেকে নেমে দু-গাল বেয়ে বুকের কাছে শাড়ি ভিজিয়ে দিয়েছিল। অবাক হয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইল ঋক। ওর চোখ এড়াল না তা।

তৃষা একবার ওর সাইকেলটার দিকে চেয়ে মালিকে বলল, ক্যায়সে, হুয়া?

মালি বলল, সাহাব গাড়িয়া চড়হা দিয়ে থে।

নিরুত্তাপ গলায় ঋক বলল, কাহে?

–গোসসেসে।

–ও।

বলেই, লাঠিটা আর লণ্ঠনটা মালির হাতে দিয়ে বাঁ-হাতে তৃষার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে ডান-হাতে তৃষাকে হাত ধরে রিকশা থেকে নামাল যত্ন করে। বলল আসুন বউদি। নির্ভয়ে আসুন। আমার বাড়িতে আসার জন্যে দেখলেন তো কত হেনস্থা হল। বলেছিলাম আমি আপনাকে। আগেই বলেছিলাম। কথা তো শুনলেন না।

তৃষা বলল, বউদি নয়, বলুন তৃষা।

একমুহূর্ত থেমে, তৃষার দিকে মুখ ঘুরিয়ে ঋক বলল, হ্যাঁ তাই বলব। অনেকদিন আগে থেকেই বলব ভাবছিলাম।

তৃষা বলল, মালি, তুমি তাড়াতাড়ি যাও। বাড়ি খালি পড়ে আছে। সব খোলা। চুরি হলে

তুমিই দায়ী হবে।

–আপনিই চলে গেলেন মেমসাব! বাড়ি তো খালিই হয়ে গেল। চোরের নেবার মতো আর কী রইল? নমস্তে মেমসাব।

তৃষা ওর হাত-ব্যাগ থেকে একটি কুড়ি টাকার নোট বের করে মালিকে দিল। আর দশ টাকা রিকশাওয়ালাদের। রিকশাওয়ালারাও বলল, নমস্তে মেমসাব।

তারপর রিকশা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। রিকশা দু-টির পেছনে দুলতে থাকা লালচে আলো দু-টিকে অন্ধকার আর কুয়াশা ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিল। আকাশে মেঘ করেছে। নদীর দিক থেকে কনকনে হাওয়া আসছে।

ঋক বলল, ভেতরে চলো।

তৃষা একটু অবাক হল। ঋক তাকে শুধু তুমি বলে সম্বোধন করল বলেই নয়, ঋক-এর গলার স্বরে এক দারুণ আত্মপ্রত্যয় ঝরে পড়ল বলে। আজ দুপুরবেলায় ঋক বা যে-ঋককে সে তিনমাস ধরে চিনত, বিয়ের পর যখন প্রথম মুরাদগঞ্জে ওরা এল তখন যে-ঋক পাটনা স্টেশনে ওদের রিসিভ করতে এসেছিল রামখেলাওনের সঙ্গে, সেইসব ঋক-এর সঙ্গে এই ঋক-এর কোনোই মিল নেই। একজন মানুষের মধ্যে যে, কতজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। এইমুহূর্তের তৃষার সঙ্গে আজ সন্ধেবেলার তৃষার কোনো মিল নেই। ঋক বলল, কিছু খাবে?

–একটু জল।

–এই ঠাণ্ডাতে জল? চা করি একটু? তোমার এই মধ্যরাতের অভিসারের রহস্যটা শুনতে শুনতে চা হয়ে যাবে।

–আমি যে, কম্বল-টম্বল কিছু নিয়ে আসিনি। বিছানা!

–সব হয়ে যাবে। সেসবের জন্যে চিন্তা করতে হবে না তোমাকে।

রান্নাঘরে চলো। আমি চায়ের জলটা গরম করি ততক্ষণে তুমি বলো তো কেন এই মাঝরাতে চলে এলে এখানে।

তৃষার বলতে ইচ্ছে না করলেও ওকে বলতে হলই। ওই ঘটনা বা ঘটনাবলির কথা বলতে গিয়ে তৃষার নিজের কানকেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। বড়ো ঘেন্না হচ্ছিল নিজের ওপর। এবং তা শুনতে শুনতে ঋক-এর চোয়াল শক্ত হয়ে এল। স্টোভের সামনে উবু হয়ে বসা ঋকের টকটকে ফর্সা গাল, চোয়াল এবং চিবুকে আগুনের লাল আভা লেগে আশ্চর্য দেখাচ্ছিল ঋককে। মনে মনে খুব খুশি হল তৃষা। এই আপাত লাজুক, চাকরি হারাবার ভয়ে সদাই ভীত মানুষটিকে চিনতে ভুল করেনি তাহলে ও।

তৃষার হাতে চায়ের কাপটি দিয়ে ঋক বলল, আশ্চর্য! তুমি যা বললে তা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। স্যার মানুষটা কিন্তু খারাপ না। মদ-ই খেয়ে ফেলল ওঁকে। আর লোভ। ভাবলে কষ্ট হয়। চোখের সামনে কত ভালো ভালো মানুষ এই লোভে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বলল, ভাগ্যিস আমি ওখানে ছিলাম না। থাকলে প্রণতবাবু মার্ডার হয়ে যেতেন আমার হাতে। যাই বলো, তুমি দুপুরে আমার এখানে জোর করে না এলে এতসব ঘটত না কিন্তু। আমি খুবই লজ্জিত, বিব্রতও। তোমার এতবড়ো ক্ষতি করে দিলাম।

–হয়তো আজ ঘটত না, কিন্তু এরপরে, ছ-মাস পরে একবছর পরে বা দু-বছর পরে ঘটতই। এতবড়ো একটা ভুলকে আরও এতদিন বয়ে বেড়ানোর চেয়ে কি এই ভালো হল না? তার সত্য প্রকৃতি তো চাপা থাকত না! কী বলো?

–তা অবশ্য ঠিক। তবে আমি কোনো মানুষকেই খারাপ বলে মানতে রাজি নই। এভরিবডি হ্যাঁজ হিজ সানি সাইডস।

একটু চুপ করে থেকে ঋক বলল, আমি ভাবতেও পারছি না যে, নিজের স্ত্রীকে গাড়ি টো করার দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে তার চোখের সামনে নোকরানির সঙ্গে সংগমে প্রয়াস করার মতো রুচির মানুষ সত্যিই থাকতে পারে। আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ির কাছেই একজন মোটর ভেহিকেলস ইন্সপেক্টর ছিলেন, তাঁর সম্বন্ধে এইরকম ব্যবহারের গুজব শুনতে পেতাম বড়োদের মুখের কানাঘুসোয়। কিন্তু গুজব তো গুজব-ই। সত্যিই যে, এমন কেউ করতে পারে, শিক্ষিত কোনো মানুষ, তা ভাবতে পর্যন্ত পারছি না আমি।

চায়ের কাপ দু-টি গরম জলে ধুয়ে রেখে একটি বোতলে গরম জল ভরে নিল ঋক। তারপর বলল চলো, নতুন চাদর আর বালিশের ওয়াড় বের করে দিচ্ছি। তুমি আমার চৌপাইতেই শুয়ে পড়ো। আমার লেপের নীচেই শোও আজ। আমার শরীরের গরমে গরম হয়ে আছে। কাল থেকে একটা পাকাঁপোক্ত বন্দোবস্ত করা যাবে।

–তুমি কোথায় শোবে?

–আমি রান্নাঘরেও শুতে পারি।

–সে কী? মাটিতে?

–খড় বিছিয়ে নেব।

–না, না সে কী।

–কোনার ঘরে খড় রাখাই আছে, পেছনের দিকে ছাদ মেরামত করার জন্যে। ঘরের তো কোনো অভাব নেই আমার প্রাসাদে।

–না না। আমার ভয় করবে একা ঘরে শুতে। এই নির্জন বাড়ি তার ওপর আবার মাটির।

–তাহলে ওই ঘরেই শোব এখন দরজা আগলে। তুমি চলো, আগে চাদর আর বালিশের ওয়াড়টা বদলে দিই।

–এতরাতে ওসবের কী দরকার! থাক না। কাল-ই যা করার কোরো।

–ঘুম পেয়েছে? তা তো পাবেই। বাজল ক-টা?

–দেড়টা। –দেড়টা! ও বাবা। তাহলে তুমি শুয়েই পড়ো। জামাকাপড়

বদলালে বদলে নাও। আমি দরজাটা টেনে দিয়ে যাচ্ছি কোণের ঘরে খড় আনতে।

তৃষার খুব উত্তেজনা বোধ হচ্ছিল। এই উত্তেজনা প্রণতর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার উত্তেজনার থেকেও বেশি। ও শাড়ি ছাড়বে না ঠিক করল। ঋক-এর সঙ্গে একই ঘরে শুলে নাইটি পরে শোয়া চলবে না। আলাদা ঘরে শোয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারলে তখন দেখা যাবে। ঘরের কোণে একটি লণ্ঠন রাখা আছে, ফিতে নামানো। মিটমিট করে জ্বলছে সেটা। ব্রেসিয়ারটা শুধু ঢিলে করে নিয়ে তৃষা আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ল ঋক-এর লেপের তলাতে, চৌপাইয়ে। সত্যিই ওর শরীরের গরমে গরম হয়ে আছে বিছানা এবং লেপ। মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে একটা লেপ থেকে বালিশ থেকে। আতরের গন্ধ। বালাপোশে যেমন থাকে। কী আতর কে জানে! কখনো ঋক-এর এতকাছেও আসেনি যে, আতরের গন্ধ পায়। ঋক যে, আতর মাখে তা জানত না তৃষা। আতরের গন্ধ ও সইতে পারে না। প্রচন্ড তীব্র লাগে। কিন্তু আজ কেন যে, ভালো লাগছে কে জানে! নিশ্চয়ই আতরের অনেক রকম আছে।

ও তখনও পুরোপুরি শোয়নি এমন সময় একটা গাড়ির হেডলাইটের তীব্র আলোর ঝলক এসে পড়ল ওর মুখে জানলার ফুটো-ফাটা দিয়ে। তারপর-ই গাড়িটা হর্ন দিল বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে।

ঋক দরজায় টোকা দিল। তারপর দরজা একটু ফাঁক করে বলল, তুমি

শুয়ে থাকো ভয় নেই, আমি আসছি।

লাঠি আর লণ্ঠন হাতে দরজা খুলল ঋক।

অত্যন্ত ক্রুদ্ধস্বরে প্রণত বলল, হাউ ডেয়ার ইউ ঋক। তুমি আমার ওয়াইফ-এর সঙ্গে রাত কাটাচ্ছ?

–আমি আপনার স্ত্রীকে রাতের মতো আশ্রয় দিয়েছি।

–আশ্রয় দিয়েছ মানে? হু দ্যা হেল আর ইউ?

–প্রণতবাবু, বিহেভ ইয়োরসেল্ফ। আপনি তৃষার সঙ্গে যে, ব্যবহার করেছেন তারপরেও কৈফিয়ত চাইবার মতো নির্লজ্জতা আপনার আছে?

–আমাকে স্যার বলে অ্যাড্রেস করো।

করতাম-ই তো বরাবর। আর করব না।

–আই উইল স্যাক ইউ।

–প্লিজ স্যু।

–তুমি আমার স্ত্রীকে ইলোপ করেছ।

–এতরাতে এবং এই শীতে আপনার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না।

আপনি দয়া করে চলে গেলে ভালো হয়।

–চলে যাব? ইউ স্কাউড্রেল। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তুমি শুয়ে থাকবে আর আমি চলে যাব? এমন সময় ঋক-এর পাশে এসে দাঁড়াল তৃষা। বলল, আমি তোমার স্ত্রী নই।

–তার মানে? আমি থানায় যাচ্ছি। আমি অ্যাডলটারির কেস করব।

–করো। কোর্টে যা বলার বলব আমি। এখন চেঁচামেচি না করে চলে যাও। একা শুতে ভয় পাও তো মুঙ্গলীকে ডেকে নিয়ে।

–শাট আপ।

–এবারে আপনি গেলে আমি খুশি হব প্রণতবাবু।

–না গেলে?

ঋক ডান হাতের ছ-ফিট লম্বা তেলমাখানো লাঠিটা দেখাল।

তারপর বলল, আমি একা নই। আমার বাড়ির ভেতরে আমার চার-পাঁচজন বন্ধু আছে। প্রয়োজনে......

–আচ্ছা! তাই?

–হ্যাঁ। নিজের সম্মান নিজের কাছে রাখবেন প্রণবাবু। এখন সম্মান নিয়ে দয়া করে বাড়ি ফিরে যান। কাল আপনার সঙ্গে কথা বলব অফিসে। আর আপনি যদি তৃষার সঙ্গে কথা বলতে চান এবং তৃষাও বলতে চায় আপনার সঙ্গে তাহলে কাল এখানেই এসে কথা বলবেন।

তৃষা বলল, আমার আর কোনো কথা নেই ওর সঙ্গে।

–কথা নেই?

খুব অবাক ও ব্যথিত গলায় বলল প্রণত!

–না। নেই।

বলেই তৃষা ভেতরে চলে গেল।

ঋক বলল, গাড়িটা দেখে ব্যাক করবেন, একটা গাড়া আছে রাস্তার ডানপাশে।

তারপর বলল, গরিবের সাইকেলটা না ভাঙলেও পারতেন।

প্রণত পুরো ব্যাপারটা যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না তখনও। যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। হাত তুলল ও। কী বলবে ভেবে না পেয়ে বলল, গুড নাইট।

ঋক বলল, গুড নাইট। সাবধানে যাবেন। আস্তে। রাস্তা ভালো নয়। তা ছাড়া কুয়াশা হয়েছে খুব।

প্রণত উত্তর না দিয়ে গাড়ি ব্যাক করে সত্যিই খুব-ই আস্তে আস্তে চলে গেল। টেইল লাইটের লাল আলোদুটো ক্রমশ ছোটো হয়ে আসতে লাগল। পথ এবং দু-পাশের জঙ্গলকে আলোর বৃত্তে উদ্ভাসিত করে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা শব্দ করতে করতে খুব-ই আস্তে আস্তে চলে যেতে লাগল। বুশ কেটে গেছে বলে ক্যাঁচক্যাঁচ আওয়াজ করছিল গাড়িটা।

–এত আস্তে কেন যাচ্ছে?

তৃষা বলল পাশ থেকে। আসলে, ভাবছে প্রণত। ভাবনার এই তো শুরু। তৃষা বলল।

–আরে তুমি ভেতরে যাও। ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এখানে ভীষণ-ই ঠাণ্ডা। তৃষা হাসল। বলল, আমার কিন্তু একটুও লাগছে না।

–চলো।

ভেতরে ঢুকে তৃষা বলল, তোমার বাড়িটাতে কিন্তু একটুও শীত নেই।

ঋক বলল, আছে, আছে। প্রথম দিন এলে সব জায়গাকেই ভালো লাগে। প্রথম প্রথম সব মানুষকেই।

.

০৪.

শীতের রাতের অন্ধকারে এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালিয়ে মত্ত অবস্থায় যখন বাড়ির দিকে ফিরছিল প্রণত তখন তার মাতলামি প্রায় উবে গেছিল। নিজের ওপর বড়ো ঘেন্না হচ্ছিল ওর। আজ ঋকের মতো একজন সাবঅর্ডিনেট, যে, একদিন ওকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে, সম্মান করে কথা বলেছে, স্যার স্যার করেছে সবসময়-ই, সে কেমন আশ্চর্য ব্যবহার করল, ওই ঋক-এর মধ্যে যে, এই ঋক ছিল তা কখনো দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি আগে। ওই পুরোনো ঘাড় গোঁজা, চোখের জল-ফেলা, নরম অভিমানী তৃষার মধ্যেও যে, এই তৃষা ছিল তাও। কখনো ভাবেনি। একজন মানুষের মধ্যে সত্যিই অনেক মানুষ থাকে। এবং ঠিক কোন সময়ে যে, কোন মানুষটি তার পুরোনো খোলস ছেড়ে ফেলে ঝকঝকে নতুন চেহারা নিয়ে বেরিয়ে এসে পরিচিতদের চমকে দেয় তা আগের মুহূর্তেও জানা যায় না।

নিজের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল প্রণতর। এইসব কিছুর মূলে তার লোভ, এবং অন্য দু-জন মানুষের প্ররোচনা। একজন ম্যানেজার শ্রীবাস্তব। সে এর আগেও কৃপালনী বলে আর এক কলিগের স্ত্রীকেও বশ করেছিল এমনভাবে, কৃপালনীকে দিয়েই। কৃপালনীকে আত্মহত্যা করে মরতে হয় এই মুরাদগঞ্জেই। বাড়ির কম্পাউণ্ডের তেঁতুলগাছ থেকে সে গলায় দড়ি

দিয়ে ঝুলেছিল। আর তার সুন্দরী স্ত্রী অনিতা পাগল হয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। এক-ই লোভ দিখেয়েছিল শ্রীবাস্তব তাকে। তৃষাকে তাকে দিলে প্রণতকে ম্যানেজার করে দিয়ে সে লক্ষৌ বা এলাহাবাদে চলে যাবে। প্রণত তখন মা আর বোনকে নিয়ে আসতে পারবে নিজের কাছে। মাইনে বাড়বে তিনগুণ।ক্ষমতা। ঘুস। বোনটার মাথার চিকিৎসা করানো দরকার। বাড়ি ছেড়ে নাকি আজকাল পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গা থেকে শাড়ি খুলে যায়। গরিব পাড়ায়ও খারাপ লোকের অভাব নেই। একবার তো এক শেঠ ফুসলিয়ে ফাসলিয়ে খারাপ পাড়ায় নিয়ে গিয়ে তোলবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ও কী করবে? যা মাইনে পায় তাতে নিজের-ই ভালো করে চলে না। তার ওপর স্ট্যাটাস বাড়িয়ে ফেলে এখন ছুঁচোর হাতি গেলার অবস্থা। ভালো করে চলা মানে, এমন বাড়িতে থেকে, গাড়ি চড়ে, প্রতিসন্ধ্যায় মদ খেয়ে, শনিবার রবিবার তিনপাত্তি খরচ করে, তার জামাকাপড়, ঠাট-বাট, মালি, মুঙ্গলীর মাইনে সব নিয়ে যা খরচ পড়ে তা ঘুস না পেলে মেটানো যায় না। আর এই ঘুস যা খায় তার অর্ধেকটা তুলে দিতে হয় শ্রীবাস্তবের হাতে। কারণ তার অজ্ঞাতসারে ঘুস খেলে চাকরিটাই চলে যেত অনেকদিন আগে। তারপর মুঙ্গলী যা মাইনে পায় সেটাই তো সব নয়। মাসে চার-পাঁচশো টাকা ওকেও ধরে দিতে হয়। অভাবের সংসার। অকর্মণ্য স্বামী। কিছু টাকা প্রতিমাসে দিতে হয় বৃন্দার মা বাবাকেও। বৃন্দার মা-ই নষ্ট করেছে সবচেয়ে প্রথম তরুণ আদর্শবাদী অতি অল্পে সন্তুষ্ট এই প্রণতকে। প্রণত এরকম ছিল না। সুন্দরী মাথা মোটা, কিন্তু চরম দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন বৃন্দাকে পোষা সাপের মতো লেলিয়ে

দিয়েছিল বৃন্দার-মা একজন যুবকের তারুণ্য, সততা, চরিত্র সব সুন্দর স্বপ্ন চিবিয়ে খাওয়াতে। শরীর বড়ো সাংঘাতিক। বিশেষ করে পুরুষের শরীর। এবং একটা বয়সে শরীরের দাস হয়ে কত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, সর্বার্থে চমৎকার মানুষ-ই যে, নিজেকে কত কুকর্মের শরিক করে তোলে, নিজেকে কীভাবে নষ্ট করে ফেলে, তার প্রমাণ প্রণত নিজে। প্রণতর সঙ্গেই হয়তো বিয়ে হত বৃন্দার। মানে না করে উপায় থাকত না। এমন সময় প্রণতর চেয়ে এমনকী শ্রীবাস্তবের চেয়েও ভালো মুরগি পেল বৃন্দার মা, তৃষার ছোটোমামা কুভলু যখন ফুর্তি করতে এল পাটনাতে। প্রণত, শ্রীবাস্তব সব তখন পাটনাতেই পোস্টেড ছিল। বৃন্দার বিয়ের পর বৃন্দা বুঝেছিল যে, কোনোক্রমে কুভলুকে ছেড়ে ও বাড়ির সবচেয়ে সচ্ছল, বিপত্নীক, উদার, একা মেজোমামা, বিপ্রদাসকে একবার হাত করতে পারলে বাকি জীবনে আর কিছু চাইবার থাকবে না। আর পুরুষের চরিত্র যতই লখিন্দরের বাসরঘরের মতো লোহা দিয়ে নিচ্ছিদ্র করে তৈরি হোক-না-কেন তাতে সাপের প্রবেশ করার মতো উপায়ও থাকে। সবসময়ই থাকে। বৃন্দার মতো কিছু মেয়ে জানে যে, সংসারে অসম্ভব বলে কিছুই নেই এবং পুরুষমাত্রই কাঁচের বাসনের চেয়েও বেশি ভঙ্গুর। উপোসি। নিজেদের গাম্ভীর্যর আর ব্যক্তিত্বর মুখোশ পরে কোনোক্রমে নিজেদের বাঁচিয়ে ফেরে তারা। যে, পুরুষ বাইরে থেকে যত রাশভারী, যত গম্ভীর, যত চরিত্রবান, সে ভেতরে আসলে ততই ঠুনকো। খারাপ মেয়ে বৃন্দাকে তার খারাপতর মা এসব সহজ পাঠ যৌবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে রেখেছিল। বেড়ালে যেমন করে ইঁদুর ধরে তেমন করে খেলিয়ে এইসব

শিকার ধরতে হয়। সময় লাগে, ধৈর্য লাগে। কিন্তু জেদ থাকলে ধরা নিশ্চয়ই যায় কোনো-না-কোনো সময়ে।

তৃষার মেজোমামার সবচেয়ে আদরের পাত্র ছিল মা-মরা তৃষা। সকলেই জানত যে, মেজোমামা বিপ্রদাসের সব সম্পত্তি নিঃসন্তান তিনি তৃষাকেই দিয়ে যাবেন। সুতরাং, তৃষাকে সরিয়ে দেওয়াই শুধু নয়, তৃষাকে হয় পাগল প্রতিপন্ন করা, নয় একেবারে পৃথিবী থেকে মুছে দেওয়ার চক্রান্তে বৃন্দা লিপ্ত হয়েছিল শ্রীবাস্তব আর প্রণতর সঙ্গে, তৃষার বন্দোবস্ত করতে করতে বৃন্দা নিজেই বিপ্রদাসকে কবজা করে তার অঙ্কশায়িনী হতে যে, পারবে সে-বিশ্বাস বৃন্দার ছিল। পঞ্চাশোর্ধ্ব পুরুষেরা এসব ব্যাপারে বড়ো অসহায় হয়ে পড়ে। একটু কার্নিক মারলেই তাদের ঘুড়ি ভো-কাট্টা হয়ে যায়। ছেনালি এবং কামকেলির সবরকম কলাই তার রপ্ত ছিল। কীভাবে শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোকের মেয়েরা স্ত্রী হিসেবে স্বামীদের অনেকভাবে বঞ্চিত করে রেখে স্বামীদের হারায় তা বৃন্দা জানত। এবং সেইসব মেয়ের অপূর্ণতাই ছিল বৃন্দার পূর্ণ হওয়ার সুযোগ। পুরুষমাত্রই জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে অত্যন্ত আদিম, গুহামানব এখনও। সেই ক্ষণিক গুহামানবের সঙ্গে গুহামানবী হয়ে খেলতে না পারলে পুরুষের মধ্যে ধীরে ধীরে একধরনের অবসন্নতা, ক্লান্তি, বিরক্তি, একঘেয়েমি জমে ওঠে যা পরে তাকে তিল তিল করে ফুরিয়ে দেয়। জীবনের কিছু কিছু আপাতস্থূল ব্যাপার থাকে, যা সমস্ত সূক্ষ্মতার ধারক ও বাহক। একথা যে-পুরুষ ও নারী না বোঝে তারা একদিন মর্মান্তিকভাবে ঠকে যায়। আর

যখন বোঝে তখন বড়ো দেরি হয়ে যায়।

বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। অন্য অনেক অবাস্তব ভাবনাতে ডুবে গেছিল প্রণত। পাঁচ-মাইল স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিল বোধ হয়। অনেকদূর অবধি চলে গেছিল মনে মনে। বাড়িতে গাড়িটা ঢোকাতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। তৃষা নেই অথচ বেডরুমের বেডসাইড ল্যাম্প দুটো হালকা হলুদরঙা শেডের নীচে জ্বলছে। যেমন রোজ জ্বলে। এমনটি ও চায়নি আসলে। নিজেকে যে, কোন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে সেকথা ভেবে বড়ো ঘেন্না হল ওর নিজের ওপর। গাড়িটা গ্যারাজ করল। গাড়িটাও তৃষার মেজোমামার দেওয়া।

আর রাতে ঋকের সাইকেলটা অমন করে ভাঙা একদমই উচিত হয়নি প্রণতর। বুঝল ও লজ্জা হল। এই ঋককে দেখে ওর নিজের কথা মনে পড়ে যায়। চাকরিতে ঢোকার দু-বছর অবধি ও-ও ঠিক ঋক-এর মতোই ছিল। সরল, আদর্শবাদী। ঋক আজকে যখন লাঠিটা দেখিয়েছিল প্রণতকে, তখন প্রণতর মনে যেমন আঘাত লেগেছিল, যতখানি অপমানিত হয়েছিল ও ঠিক ততখানি আনন্দিতও হয়েছিল। ওর হঠাৎ-ই মনে হয়েছিল এই প্রণতর সামনে পুরোনো প্রণত দাঁড়িয়ে আছে যেন।

গাড়িটা লক করে বাড়ির মধ্যে ঢুকল। দু-চোখ জলে ভরে এল প্রণতর। বড়ো শীত করছে আজ। পুরোনো দিনের ভালোতর, স্বাভাবিকতর উষ্ণতার দাঁড়ে ফিরে যেতে চাইছে যেন অনেকদিন জলে-থাকা কোনো

উভচর পাখি। কিন্তু তার জন্যে কোনো গাছ নেই, ডাল নেই। নিজে হাতে সেই উষ্ণতার স্থলের আশ্রয় সে-ই ছিন্নভিন্ন করেছে।

জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে ভাবছিল প্রণত যেকোনো মানুষ-ই বোধ হয় জন্ম থেকেই খারাপ হয় না। তাকে তার পরিবেশ, তার পরিজন, তার বন্ধুবান্ধব, তার পরিচিতির মন্ডলী এবং আরও পরে তার চামচেরা তাকে খারাপ করে দেয়। তার জীবনসঙ্গিনী অথবা সঙ্গীও করে। একজন মানুষের অতিবড়ো হওয়ার লোভের মধ্যেই বোধ হয় তার ধ্বংস হয়ে যাওয়ার বীজ নিহিত থাকে, তা সে যতবড়ো অর্থবান, ক্ষমতাবান বা যশস্বী যাই হতে চাক না কেন। আসলে যার বীজ যেমন, জীবনে ফল তেমন-ই হয়। তার চেয়ে বড়ো হতে চাইলে সেটা হয়ে যায় খোদার ওপর খোদকারি। সেই বড়োত্ব থাকে না বেশিদিন। প্রথম থেকেই ও খারাপ ছিল না বলেই আজকে প্রণত তা বুঝতে পারছে। বড়ো অসহায় লাগছে।

মুঙ্গলীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছিল। এই মেয়েটিকে সে নষ্ট করেছে, মুঙ্গলী তাকে নষ্ট করেনি। তবে নষ্ট করেছে বলবে কেন? এ পৃথিবীর সব সম্পর্কই লেনদেন-এর। মুঙ্গলী অনেক নিয়েছে তার কাছ থেকে। প্রতিমাসেই নেয়। তার বদলে ও যা দেয়, তারজন্যে খুব একটা অপরাধবোধ করে না প্রণত। ঋক ঠিক-ই বলে অ্যাকাউন্ট্যান্সির বাড়া সায়ান্স নেই। একটা ডেবিট হলেই একটা ক্রেডিট হতে হবে।

প্রণত ডাকল, মুঙ্গলী।

মুঙ্গলী ওর র‍্যাপার জড়িয়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে এল।

প্রণত বলল, শিগগির আয়, ঢাক লেপের নীচে। শীত করছে আমার। ওরা দুজনেই জানে যে, একে আদর বলে না। আদর করা কাকে বলে তা কোনোদিন শেখার অবসর-ই হয়নি প্রণতর।

ভয় পেয়েছিল আসলে প্রণত। নানারকম ভয়। অপমান তো আছেই। আজ মুঙ্গলীকে আদর করতে করতে নিজের প্রতি ঘেন্নায় প্রণতর দু-চোখ জলে ভরে এল। মুঙ্গলীরও তাই। তবে দু-জনের কারণগুলো বিভিন্ন।

ঋক তাকে আজ লাঠি দেখাল বলেই, সে মাথা নীচু করে ফিরে এল! দুপুরে রিকশাওয়ালাদের কাছ থেকেও সে ভীরুর মতো মাথা নীচু করে ফিরে এসেছিল। ওরা বলেছিল ঘৃণার সঙ্গে, ডরপোক। একজন গাড়িওয়ালা মানুষের সঙ্গে পথের রিকশাওয়ালার এরকম ব্যবহার আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগে ভাবা পর্যন্ত যেত না। তখন যে-লোকই গাড়ি চড়ত সে সমাজে সম্মানিত ছিল। তার গাড়ি তাকে কোনো বিশেষ সম্মান দিত না। কিন্তু সকলেই জানত যে, গাড়ি যে-মানুষ চড়ে তার সম্মান পাওয়ার মতো অন্য গুণপনা নিশ্চয়ই আছে। আজকে চোর, বদমাশ, অশিক্ষিত, ব্যাবসাদার, মেরুদন্ডহীন অসৎ চাকুরে, স্মাগলার সকলের-ই গাড়ি আছে। তাই গাড়িচড়া লোকদের সম্মান করা তত দূরের কথা সাধারণ মানুষে আজকার তাদের অসম্মান-ই করে। আর যাঁরা সত্যিই সম্মানিত তারাই পড়েন মুশকিলে। প্রণত জানে যে, সে সম্মানের

যোগ্য নয়। আজকে রিকশাওয়ালাদের সামনে তার ব্যবহার রিকশাওয়ালাদের ভবিষ্যতে গাড়িচড়া মানুষদের প্রতি আরও দুর্বিনীত করে তুলবে যে, সে-বিষয়ে সে নিশ্চিত।

মুঙ্গলী চলে গেল। শরীরের গ্লানি, উত্তাপ অথবা শীতার্ততা ক্লান্তি অপনোদিত হল ঠিক-ই কিন্তু প্রণতর মনের মধ্যে আজকে ঝড় চলছে। বৃন্দার কথায় আর তার নিজের অসীম লোভে সে তৃষার জীবন তো নষ্ট করলই নিজের জীবনটাও নষ্ট করল।

ঘুম এল না। ও উঠে বসে চিঠি লেখার প্যাড ও কলম নিয়ে এল। কে জানে বৃন্দার কোনো চিঠি তৃষার হাতে পড়েছে কি না! খুলে যদি পড়ে থাকে, তবে তো কিছুই আর জানতে বাকি নেই। তবে বৃন্দা প্রতিচিঠিতে নম্বর দিত প্রণতর বিয়ের পর থেকে। যাতে কোনো চিঠি মিসপ্লেসড হলে প্রণত বুঝতে পারে। কোনো চিঠি তো মিসপ্লেসড হয়নি!

অনেকক্ষণ কলম কামড়ে তারপর প্রণত লিখল,

মুরাদগঞ্জ

তৃষা, মাই ডার্লিং,

আমি যাহা করিয়াছি তাহার জন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। প্লিজ আমাকে শেষবারের মতো ক্ষমা করিয়ো।

যাহা ঘটিয়াছে, তাহা ভুলিয়া গিয়া সবকিছু আবার নতুন করিয়া শুরু কি করা যায় না? আমাকে শেষবার সুযোগ দিয়া দ্যাখো। প্লিজ।

তোমাকে আমার অনেক কিছুই বলিবার আছে। আমি অনেকপ্রকার অন্যায় করিয়াছি। তোমাকে সবকিছুই বলিব। কিছুমাত্রই বাকি না রাখিয়া। আমার অপরাধ স্বীকার করার পরও তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো তাহা হইলে আমি তোমাকে জোর করিব না। তোমার জীবন হইতে মুছিয়া যাইব।

মালির হাতে এই চিঠি পাঠাইতেছি। মালির হাতেই উত্তর দিবে। উত্তর পাইবামাত্র আমি গিয়া তোমার-ই গাড়ি করিয়া তোমাকে লইয়া আসিব।

–ইতি ক্ষমাপ্রার্থী প্রণত

পুনশ্চ-তোমাকে আমি আমার মতো করিয়াই ভালোবাসিয়াছিলাম, এইবারে তোমার মতো করিয়া, মানে তুমি ভালোবাসা বলিতে যাহা বোঝো, তেমন করিয়াই ভালোবাসিব। যদি সুযোগ দাও।

৪-৮. রাত প্রায় ভোর

০৫.

রাত বোধ হয় প্রায় ভোর হয়ে এল। নদীর দিক থেকে কী একটা পাখি ডাকছে থেকে থেকে। শেয়াল ডাকল একসঙ্গে অনেকগুলো। পাশ ফিরে শুল তৃষা। পরপুরুষের বিছানা, লেপ, বালিশে অনভ্যস্ত কিন্তু স্নিগ্ধগন্ধে এবং পরপুরুষের শরীরের ওম-এর উষ্ণতামাখা বিছানাতে যে, শুয়ে আছে একথা ভাবতেই ভীষণ উত্তেজিত বোধ করছিল ও। ওর পায়ের কাছে দরজা আগলে একবোঝা খড়ের ওপরে একটি ব্যাগ মাথায় দিয়ে নিজের গায়ের পুরু দেহাতি ধূসররঙা আলোয়ানটা জড়িয়ে গুঁড়িশুড়ি মেরে শুয়ে আছে ঋক। ফিতে-কমানো। লণ্ঠনের মৃদু আলোটা এসে ঋক-এর মুখের একপাশে পড়েছে। কোনো দেবশিশুর মুখ বলে মনে হচ্ছে যেন। তার গায়ের পাশে শোয়ানো আছে লাঠিখানা।

আবারও পাশ ফিরল তৃষা। এ রাতে কতবার সে পাশ ফিরল! ঋক

অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আসলে ঘুমোচ্ছে কি? শুয়ে থাকা মানুষকে দেখে মনে হয় যে, তারা ঘুমোচ্ছে। তারা যে, ভাবনার গভীরে ডুবুরির মতো ডুব দিয়ে বেড়াচ্ছে, তা তাদের শান্ত আপাত ঘুমন্ত মুখ দেখে বোঝার উপায় থাকে না।

ঘরের উষ্ণতা যেন, বেড়ে গেছে মনে হল। ওর বন্ধচোখের সামনে, কে যেন গলানো কাঁসার ঝরনা ঝরাচ্ছে। আস্তে আস্তে চোখ মেলল তৃষা। প্রথমে কিছুক্ষণ বুঝতে পারল না কোথায় আছে ও। ও কোথায়? দেখল পায়ের দিকের পুবের জানলাটা খুলে দিয়ে গেছে ঋক। পুবের জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে তার লেপের ওপরে। ঝকঝকে নীল আকাশ। এমন আকাশ কলকাতা তো দূরস্থান মুরাদগঞ্জেও দেখা যায় না।

খুব-ই ভালো লাগছিল। উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পরক্ষণেই লজ্জা হল খুব। প্রণতর কথা মনে হওয়ায় কাঁটা বিঁধল মনে। সে তার বিবাহিত স্বামী। ধড়মড়িয়ে উঠে ব্রেসিয়ারটা আবার টাইট করে নিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে লেপটাকে ভাঁজ করল। এদিক-ওদিক তাকাল বেডকভারের খোঁজে। দেখতে পেল না। দেখল কাল রাতের খড়-এর একটি কুটোও ঘরের মেঝেতে পড়ে নেই। সবকিছু নিড়িয়ে নিকিয়ে নিয়ে গেছে ঋক। বাইরে এসে দাঁড়াতেই মন ভরে গেল কমলালেবুর মতো সকালবেলার আলোয়, নীল বেনারসির মতো আকাশের নীলে, নদীর গন্ধময় শব্দে। গেরুয়া পাল তুলে ছোট্ট নৌকো চলেছে মন্থর গতিতে। নদী বেয়ে।

এমন সকালে ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে খুব কেজো করে তুলতে ইচ্ছে যায়। মনে হয় তৃষার যে, ও ভীষণ-ই কাজের লোক হয়ে উঠবে। শঙ্খদার কবিতা মনে পড়ে যায়। শঙ্খ ঘোষের–

আলো একপাশে থাকে সে আলোর ভিতরে থাকে না।

–তারপর কী যেন! আমার স্মৃতিশক্তি ভারি দুর্বল। দুর সব ভুলে যাই।

বলল ঋককে।

–কার কবিতা?

–শঙ্খদার।

–ভোর?

–হ্যাঁ হ্যাঁ ভোর। তুমি জান?

আলো একপাশে থাকে, সে আলোর ভিতরে থাকে নাজল তাকে ডাক দেয়, মাটি তার পায়ে পায়ে হাঁটের কোনো দুঃখ নেই, আজ তার ভার আছে শুধু।একাকার হয়ে আছে তার সব দিন আর রাতেপ্রতিবিম্ব নিয়ে আজ একা একা দূরে গিয়েছে সেসুন্দর যেখানে এসে জীবিকার সীমায় মিশেছে।তুমি তাকে একা বলো? স্বচ্ছতার কতদূর একা?সে দেখে দিগন্তময় স্থির তার ভবিতব্যরেখা ভবিতব্যরেখাঢেউয়ের উপরে ঢালে

আলো, সেই আলো পাশে থাকেআমিও তো কাজ চাই, কাজের ভিতরে পাব তাকে।

–বা : কী সুন্দর আবৃত্তি করো তুমি ঋক!

–কবিতা ভালো হলে আবৃত্তি ভালোই হয়। আর কবিতাই যদি ভালো না হয় তবে মিছিমিছি জুয়ারি দিয়ে কথা বলে আঁতেলশ্রেষ্ঠ হয়ে আবৃত্তি করলেও তা কবিতা বা আবৃত্তি দুটোর কিছুই হয় না।

তারপর বলল, মুখ-চোখ ধুয়ে নাও। চা করছি, চা খাও। রাম সিং এসেছিল। তোমার জন্যে ভালো ঘি আর দুধ নিয়ে আসতে বলেছি। সরও নিয়ে আসবে। আমি বেরিয়ে যাওয়ার পর সদর দরজা বন্ধ করে তুমি এই উঠোনের ওই কোনাতে পাটি পেতে শুয়ে সান-বেদিং করো, মুখে সর মেখো, সারাশরীরে খাঁটি কাড়ুয়া তেল মাখো। তোমাকে কেউ-ই দেখবে না। দেখতে পারে, শুধু একটি দাঁড়কাক। সে মাঝে মাঝে দেওয়ালটার ওপরে বসে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাবে। আর দেখবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকা চিল আর হঠাৎ আকাশের নীলে সবুজ ঝিলিক মেরে চলে-যাওয়া টিয়ার ঝাঁক। একটা টিকটিকি আছে বটে সেও দেখতে পারে। সুন্দর জিনিস দেখতে তো কোনো দোষ নেই। দেখলে, সৌন্দর্য পরিপ্লুত হয়।

–এখানে জল কোথায় পাব?

–সব বন্দোবস্তই হয়েছে। কুয়ো তো আছেই। তোমার জন্যে একজন

দাসীও ঠিক করে দিয়েছে রাম সিং। তার নাম লালপাতিয়া। রাম সিং-এর গ্রাম থেকে আসবে সে। তোমার সকালের নাস্তা আর স্নান হয়ে গেলে তোমার সঙ্গেই থাকবে, তোমাকে নিয়ে নদী পেরিয়ে বাজরা আর মটরছিম্মির সবুজ কাড়ুয়া আর সরগুজার হলুদ খেতের পাশ দিয়ে দূরের গ্রামে বেড়িয়ে আসবে। এই শালবনের গভীরেও যেতে পারে। লালপাতিয়া তোমাকে রান্না করে দেবে। চাও তো তার কাছ থেকে রান্না শিখেও নিতে পারো। লিট্টি খেয়েছ কখনো? ছাতুর লিটি। কোত্থেকেই বা খাবে তুমি! কলকাতার মেয়ে তো! লিটি খুব গরম। এই শীতকালেই খেতে হয়। বলব লালপাতিয়াকে, বানিয়ে দেবে।

এমন সময় দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল।

ঋক গিয়ে দরজা খুলল।

বলল কা হো মালি ভাইয়া? ক্যা বাত।

–খাত ভেজিন সাহাব, মেমসাহেবকো লিয়ে।

–তো আও। আর আও। বইঠো। চায়ে পিয়েগা মালিভাই? তুরন্ত বন যায়গা। শীতে বেঁকেছিল মালি ছেঁড়া পুরোনো সোয়েটারে। মাথা নোয়াল। চিঠিটা হাতে নিয়ে মালিকে উঠোনের রোদে বসিয়ে ঋক বলল তৃষাকে, এই যে তোমার চিঠি!

–জবাব লেকে যানা হোগা। সাহাব বোলিন।

মালি বলল।

ঋক বলল, তুমি ঘরে গিয়ে আমার লেখাপড়ার টেবিলে বসে জবাব লিখে দাও। খারাপ বা রাগের কথা লিখো না। রাগটাগ সব কাল রাতের সঙ্গেই মরে গেছে তোমার জীবন থেকে। এ কথা জেনো। ভুলে যেয়ো না। রাগ দুর্বলের রিপু।

একবার তাকাল তৃষা ঋক-এর দিকে। তারপর চিঠিটা নিয়ে ঘরে গেল।

বার বার পড়ল চিঠিটা। বিশ্বাস হল না তৃষার যে, প্রণত এরকম চিঠি লিখতে পারে। মনটা খারাপ হয়ে গেল বড়ো। কিন্তু কিছু করারও নেই। কী লিখবে উত্তরে? লিখলে যে, অনেক কথাই লিখতে হয়, অনেকদিন ধরে লিখতে হয়। তা তো সম্ভব নয় এখন। মালি বসে আছে এখুনি উত্তর নিয়ে যাবে। চিঠিটা হাতে নিয়ে বোকার মতো অনেকক্ষণ বসে রইল তৃষা।

ঋক শঙ্খদার কবিতা সকালবেলায় আবৃত্তি করে তৃষার মধ্যে বহুদিন বন্ধ হয়ে থাকা কবিতার উৎসমুখ খুলে দিয়েছে যেন। একসঙ্গে বহুকবিতা মনে আসছে। জীবনে আনন্দের কত কী ছিল, আছে; ভুলেই ছিল এতদিন।

তৃষা লিখল–

সুরাইয়াটোলি

২৩-১২-৮৮

প্রণত, ভীতিভাজনেষু,

মাটি খুব শান্ত, শুধু খনির ভিতরে দাবদাহহঠাৎ বিস্ফারে তার ফেটে গেছে পাথরের চাড়। নিঃসাড় ধূলায় দাও উড়িয়ে সে লেখার অক্ষর।যে লেখায় জ্বর নেই, লাভা নেই, অভিশাপও নেই।

তুমি তোমার মতো বাঁচো। আমাকেও বাঁচাতে দাও আমার মতো করে।

সুখী হও। আমাকে ভুলে যাও। তুমি বড়োদেরি করে ফেললে, এখন আর কিছু করণীয় নেই, আমার মেজোমামা তোমাকে যা কিছু দিয়েছিলেন যৌতুক হিসেবে তা তোমার-ই। আমি কিছু চাই না সেই যৌতুকের।

ভালো থেকো।

ইতি–তৃষা

মালির চা খাওয়া হলে চিঠিটা খাম বন্ধ করে তার হাতে দিল তৃষা।

–মালি বলল, মাঝে মাঝে আসব মেমসাব।

–নিশ্চয়ই আসবে। মুঙ্গলী কেমন আছে?

–কাল রাতে তো এখান থেকে ফিরে গিয়ে সাহাব তাকে ডেকে নিলেন। সাহাবের সঙ্গে শুয়েছিল।

–আহা। শুক। শুক। কাল যে, বড়ো শীত ছিল রাতে। সকলেই সুখে থাকুক।

তৃষা বলল। মালি বোকার মতো মুখ করে চলে গেল।

ঋক স্নান করে নিয়েছে ততক্ষণে। আলুর চোকা আর পরোটা প্রায় বানিয়ে ফেলেছে নাস্তা হিসেবে। তৃষাকে বলল, স্নানঘরে টুথপেস্ট আছে। তোমার ব্রাশ যদি না এনে থাকে তো আমি বেরোচ্ছি নিয়ে আসব। আর কী কী আনতে হবে? তা মুখ ধুয়ে এসে জলখাবার খেয়ে বরং আমাকে একটা লিস্ট করে দাও।

–আমি তোমার সঙ্গে যাব।

–না। আজ নয়। আজ চান-টান করো। কাল রাতের গ্লানি অপমান, কষ্ট, চোখের জল সব ধুয়ে ফ্যালো। নতুন জীবন শুরু করবে আজ থেকে। আজ থেকে আলাদা ঘরেও শোবে লালপাতিয়ার সঙ্গে। যদি ডিভোর্স নিতে

চাও, উকিলের সঙ্গে কথা বলতে চাও তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসব।

–একসঙ্গে তুমি এতকিছু বলো যে, আমি বুঝতে পারি না।

তৃষার মুখে কিছুক্ষণ রইল ঋক। তারপর বলল, আচ্ছা। ভবিষ্যতে আস্তে আস্তে কথা বলব।

বলেই বলল, আর শোনো। তোমার যাঁরা গার্জেন তাঁদের এক্ষুনি একটা টেলিগ্রাম করা দরকার। তোমার গার্জেনদের নাম-ঠিকানা আমাকে লিখে দাও।

–মানে মামাদের?

–মামারা যদি গার্জেন হন তবে মামাদের-ই!

--আমার গার্জেন...

ঋক তৃষার মুখের দিকে চাইল। তৃষা বুঝল যে, ঋক বোঝাতে চাইছে সে তার গার্জেন নয়, হতেও চায় না।

ভীষণ ভয় করতে লাগল তুষার। কী যে বলবে, ভেবে পেল না।

ঋক বলল, ঠিকানাটা?

দিচ্ছি লিখে।

মেজোমামার নাম ঠিকানা নিয়ে ঋক চলে গেল। তার আগেই লালপাতিয়া এসে গেছিল। তাকে সব বলে গেল যাওয়ার আগে ঋক। রাম সিং লালপাতিয়ার হাতে কিছু টাটকা আনাজপাতি, ডিম এবং একজোড়া ছোটো দিশি মুরগাঁও পাঠিয়েছিল। কিন্তু বেরিয়ে যাওয়ার আগে ঋকের মনোভাবে খুব-ই বিস্রস্ত হয়ে পড়ল তৃষা। ঋককে এই প্রথমবার কাল দুপুরের পর থেকে বড়ো আশ্চর্য ঠেকল ওর চোখে।

ঋক চলে যেতেই ঘরে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ল তৃষা। তারপর চান-টান না করেই মেজোমামাকে একটি চিঠি লিখতে বসল।

সুরাইয়াগঞ্জ

পূজনীয় মেজমামা,

আমি কাল রাতে প্রণতর বাড়ি থেকে চলে এসেছি। এসে উঠেছি ওদের-ই অফিসের একজন অ্যাকাউন্টেন্ট ঋক রায়ের বাড়িতে। কেন এসেছি তা তোমাকে চিঠিতে জানাতে পারছি না, কিন্তু তুমি সব শুনলে বুঝবে যে, আমার কোনো উপায় ছিল না। আমার বড়ো বিপদ মেজোমামা। তুমি যদি একদিনের জন্যেও আসতে পারতে তবে বড় ভালো হত, নইলে আমার ভেসে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমার সঙ্গে হয়তো আর কখনোই এ-জীবনে দেখা হবে না। অন্য মামাদেরও আমার কথা বোলো।

ইতি ভীতা তৃষা

আমার ঠিকানাঃ

প্রযত্নে ঋক রায়, সুরাইয়াগঞ্জ, ভায়া মুরাদগঞ্জ, জেলা পাটনা, বিহার।

পুনশ্চ- যদি আসো তো একা এসো। ছোটোমামা বা ছোটোমামিমা যেন না আসে সঙ্গে।

চিঠিটা Speed-Post-এ পাঠাতে হবে। চান-টান পরে হবে! লালপাতিয়া বলল, পোস্ট অফিস মুরাদগঞ্জে। এদিকে কোনো পোস্ট অফিস নেই! ইতিমধ্যে রাম সিং এসে হাজির। সে বাজারেই যাচ্ছিল। আজকে ঝামার-এ হাটও আছে। বিকেলে হাট করে ফিরবে। রাম সিংকে টাকা দিয়ে স্পিডপোস্ট-এর ব্যাপারটা বুঝিয়ে চিঠিটা ওকে দিয়ে পাঁচটা টাকা দিয়ে অনুরোধ করল তার কাজটি যেন এক্ষুনি সে করে। রাম সিং পাঁচ টাকাটা ফেরত দিয়ে বলল, আপনি ঋকবাবুর মেহমান। আপনার কাছে টাকা আমি নিতে পারব না। ওঁর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বকশিশ-এর নয়।

লজ্জা পেয়ে ক্ষমা চাইল তৃষা। রাম সিং চলে গেলে অনেকক্ষণ উঠোনে রোদের মধ্যে থামে হেলান দিয়ে বসে রইল– কী করল, কী করবে এইসব ভাবতে ভাবতে। রোদ তার চোখের পাতার মধ্যে লাল-নীল দেশলাই জ্বেলে দিল। রোদ জ্বলতে লাগল, সময়ও জ্বলতে লাগল, গলতে

লাগল তৃষাও।

.

০৬.

প্রণত অফিসে আসেনি। ঋক অফিসে গিয়েই জানল। তারপর নিজের কাজ কিছুটা গুছিয়ে ম্যানেজার সাহেবের কাছ থেকে ছুটি নিল বাকি দিনের।

–কী ব্যাপার রায়?

–আমার ব্যক্তিগত কাজ আছে স্যার।

–ক্যাজুয়াল লিভ কাটা যাবে একদিন।

–নেবেন কেটে স্যার।

–ওক্কে।

সাইকেলটা এখনও মেরামত করতে দিতে পারেনি। অসুবিধে হচ্ছে খুব-ই। ব্যাঙ্কে গিয়ে কিছু টাকা তুলল। তারপর হেঁটে হেঁটেই চলল প্রণতর বাড়ির দিকে।

উইক-ডে। বেলা বারোটা বাজে। চারদিকে কর্মব্যস্ত মানুষদের ছোটাছুটি। ধুলো উড়ছে উত্তরের হাওয়ায়। গমগম করছে বাজার এলাকা। তা পেরিয়ে এসে প্রণতর বাংলোর পথে পড়ল এবারে। যখন গেট খুলে বাংলোতে ঢুকল তখন কাউকেই দেখা গেল না। মালিকেও নয়। বারান্দায় উঠে এদিক-ওদিক তাকিয়েও কাউকে দেখতে পেল না। তখন ডাকল মালি বলে।

মালি পেছন দিক থেকে দৌড়ে এল। এবং ঋককে দেখে অবাক এবং আতঙ্কিত গলায় বলল, আপ?

–সাহাব নেহি হ্যায় ক্যা ঘরমে মালি?

–হ্যায়, হ্যায়। পিছুকা বাগানমে বৈঠকর পি রহা হ্যায়। আভভি হুয়া আপকি যানা ঠিক নেহি হোগা।

–কাহে না ঠিক হোগা?

বলে, ঋক বাংলোটা ঘুরে পেছন দিকে পৌঁছোল। একটা চেরিগাছের ছায়ায় বেতের চেয়ারে বসে বেতের টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল রেখে টেবিলের ওপর দুটি পা তুলে দিয়ে হাতে গ্লাস নিয়ে হুইস্কি খাচ্ছে প্রণত। বোতলের অনেকখানিই খালি হয়ে গেছে।

ঋক বলল, স্যার!

–কে? কে?

চমকে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে চাইল প্রণত।

–আমি ঋক স্যার।

–ঋক! তুমি? এসো এসো। হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। বোসো। খাবে নাকি? ও তুমি তো এসব খারাপ জিনিস খাও-টাও না।

–কে বলেছে খাই না? কখনো-সখনো খাই। আপনার সঙ্গে আজ খাব স্যার।

--খাবে? মাই প্লেজার। তবে আমাকে আবার স্যার স্যার করছ কেন? কাল রাতে তো প্রণতবাবু বলছিলে। আমি বলব, বাবুটাও কর্তন করো। শুধুই প্রণত বলো। চাকরির সম্পর্কটা কোনো সম্পর্ক নয়।

–মালি। ও মুঙ্গলী!

মুঙ্গলী বোধ হয় রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল, সাহাব।

–ঔর এক গ্লাস লাও।

–জি সাহাব।

–ঔর ওমলেট লাও বাদমে। দো।

মুঙ্গলী ঋককে দেখে একটু অবাক হল। বলল, আপ? হিক বাবু? বলেই, গ্লাসটা রেখেই পালাল।

–কিছু বলতে এসেছ আমাকে ঋক?

–না। শুনতে।

ঋকের গ্লাসে হুইস্কি ঢেলে দিতে দিতে প্রণত বলল, সে তো অনেক কথা। তা ছাড়া তুমি শুনেই বা কী করবে! তোমার উপকারও আমি করতে পারব না, আমার উপকারও তুমি নয়।

–আমি হয়তো আপনার উপকার করতে পারি।

–তুমি আমাকে তুমিই বোলো। আমি যখন এতদিন পদাধিকার বলে তুমি বলে এসেছি, তুমি বন্ধুত্বের দাবিতেই বলো। নাও খাও। চিয়ার্স।

ঋক বলল চিয়ার্স গ্লাস তুলে। তারপর বলল, আপনার চিঠির উত্তরে....!

–তুমি করেই বলো। আমাদের সম্পর্কটা এমন প্রায় সতীনের মতো।

–তুমি ভুল করছ প্রণতদা। তোমার স্ত্রীর হাতেও আমি হাত দিইনি। তোমার স্ত্রী তোমার ই আছে। তোমার চিঠির উত্তরে কী লিখেছিল তৃষা?

–তুমি জানো না?

–না। আমি তখন ওর জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছিলাম!

–তুমি! মাই গুডনেস। এত গুণের লোক বলেই না!

ঋক হাসল। কী লিখেছিল তৃষা?

লিখেছিল যে, দেরি হয়ে গেছে আমার। আর কিছু করণীয় নেই। তার সঙ্গে কে এক কবি শঙ্খ ঘোষ-এর কবিতা কোট করে দিয়েছিল। আমি ভাই ওসব কিছুই বুঝি না। আরও গন্ডগোল হয়ে গেল। কী যে বলতে চেয়েছে তাও বুঝলাম না। কবিতা-টবিতা কি আমার জন্যে?

হুঁ। ঋক বলল হুইস্কিতে চুমুক দিয়ে।

প্রণত অবাকচোখে ঋককে দেখছিল। বলল, কাল রাতে যখন লাঠি হাতে নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছিলে তখন অবাক হয়েছিলাম। এখন আরও অবাক হচ্ছি। তুমি রাতারাতি ভীষণ-ই বদলে গেছ ঋক। আনথিংকেবল।

–তুমি-ই বদলে দিয়েছ। তুমি নিজেও কি রারারাতি বদলাওনি প্রণতদা? তুমি কাল রাতে যা করেছ, মানে যে-ব্যবহার তৃষার প্রতি; তাতে তুমি যে, রাতারাতি বদলে গেছ সে সম্বন্ধেও তো সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

–আমি? হ্যাঁ। তা বলতে পারো। তবে আমি নই। এই অ্যালকোহল। কাল

মদ আমাকে খেয়েছিল ঋক! কালকে আমি মানুষ ছিলাম না। আজকাল আমি প্রায়-ই যা বলি, যা করি তা আমার বলা বা করা নয়। আমার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমি মদেই নষ্ট হয়ে গেলাম একেবারে। কিছুতেই থামতে পারছি না। সত্যিই আমি যা করেছি তার ক্ষমা নেই। সে জন্যে আমি লজ্জিত। আমি তৃষার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতে রাজি আছি, যদি তুমি তৃষাকে ছেড়ে দাও।

–বাঃ। হাসল ঋক। বলল, ধরলামই-বা কখন যে, ছাড়ব? তুমি পাগল। কাল রাতে আমি তোমার ট্রাস্টির মতো তৃষাকে সযতনে রেখেছি। তার ওপরে আমার কোনো দাবি নেই। তবে অস্বীকার করব না, তৃষাকে আমার প্রথম দিন থেকেই খুব ভালো লাগে। সেই যেদিন পাটনা জংশনে তোমাদের আনতে গেছিলাম। কিন্তু ভালো লাগলেই বা কী। ভালো লাগাতে অনেক রকম হয়। সব ভালো লাগাকেই যে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ছকে বেঁধে ফেলতেই হবে তার কি মনে আছে? তোমার স্ত্রী হিসেবেও তো তাকে আমার ভালো লাগতে পারে। তুমি ও সে দু-জনেই তো আমাকে বন্ধুর মতো ভালোবাসতে পারো সমানভাবে কি? পারো না?

–সুস্থ কোনো সম্পর্কর কথাই ভাবিনি ঋক এতদিন। তাই তৃষাকে এত কষ্ট দিয়েছি। নিজেও বড়ো কম পাইনি। তোমার কথা ভেবে দেখবার।

–আসলে ব্যাপারটা কী স্যার জানেন?

–আঃ ঋক।

–ও। ব্যাপারটা কী জানেনা প্রণতদা? তুমি আরও চাই আরও চাই-এর দলে পড়ে গেছ। তুমি একা নও। তোমরাই এখন দলে ভারী। তোমাদের কারও পেছনে একবারও চাইবার অবকাশ নেই। ভালো আসবাব, ভালো ফার্নিশিং, ভালো গাড়ি, ভালো মদ, ভালো স্ত্রীর উপরি এক বা একাধিক নারী, কালার টি. ভি., ভি. সি. আর, এয়ারকণ্ডিশনার এই গেল তালিকা। গত মাসে রিডার্স ডাইজেস্ট-এ পড়ছিলাম, Quotable quotes-এ যে When we have provided against cold, hunger and thrist, all the rest is but vanity and excess কথাটা বড়ো ভালো লেগেছিল। সুখ, প্রাচুর্যর মধ্যে, আধিক্যের মধ্যে কোনো দিন-ই ছিল না প্রণতদা। সুখ ছিল তোমার মনে। আমার মনে। নিজের মনে তাকিয়ে দেখার অবকাশ হয়নি কখনো তোমার। চিরদিন বাইরের দিকে চোখ ছিল, ভেতরে কখনোই চেয়ে দ্যাখোনি। তৃষা অত্যন্ত অন্তর্মুখী, সুন্দরী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষিতা মেয়ে। ও তোমাকে ডিভোর্স করে নিজে স্বাবলম্বী জীবনযাপন করতে পারে সহজেই। হাজার ছেলে দৌড়ে এসে ওকে বিয়েও করবে। তোমার দয়ানির্ভর সে নয়। কিন্তু তুমি যদি তৃষাকে হারাও তবে আর কখনোই তৃষার মতো অন্য কাউকেই পাবে না।

–আসলে বৃন্দা.....

–বৃন্দা কে?

–তৃষার ছোটোমামি।

–এসব কথা আমাকে বলার দরকার নেই। তৃষার সঙ্গে বসে দু-জনের সব ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করে নিয়ো। আমি সব সাহায্য করব। আমাকে আর একটা হুইস্কি দাও।

মুঙ্গলী ওমলেট নিয়ে এল।

প্রণত ঋককে আর একটা ড্রিঙ্ক ঢেলে দিল।

ঋক বলল, আজ সন্ধে লাগতেই তুমি স্নান করে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে এবং শাল গায়ে দিয়ে আমার মাটির কুটিরে আসবে। গাড়ি নিয়ে এসো না। ও সব আড়ম্বর ওখানে মানায় না। যে রিকশা নিয়ে যাবে তাকেই বলে দেবে কালকে সকাল সাড়ে সাতটাতে আসতে। নিয়ে যাবে। তোমাকে। রাতটা তোমার স্ত্রীর সঙ্গেই কাটাবে।

–সে কি আমার মুখ আর দেখবে? মনে হয় না ঋক।

–সে তুমি ছেড়ে দাও আমার ওপরে। কিন্তু এই তোমার শেষ সুযোগ। ক্ষমা চাইবার, প্রায়শ্চিত্ত করার। এইটা শেষ করেই আমি উঠব। আমার অনেক কাজ আছে। ভালো করে স্নান করে সুন্দর করে সেজে, সুগন্ধি মেখে যেয়ো। মনে কোরো, অভিসারে যাচ্ছ। আবারও বলে গেলাম।

প্রণত অবাক হয়ে চেয়েছিল ঋকের মুখের দিকে।

বলল, তোমরা দু-জনে কি আমাকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দেবে? মতলবটা কী বলো তো! আমি যা করেছি গতরাতে তৃষার সঙ্গে, তোমার সঙ্গে তারপরে তোমার এই ব্যবহার রীতিমতো রহস্যময় বলেই মনে হচ্ছে।

–জীবন তো রহস্যময় হবেই প্রণতদা। জীবনের মতো এমন গভীর-গোপন মালটিডাইমেনশনাল রহস্য আর কী আছে?

–ঋক! তোমার এই তুমিকে এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

–জীবনের মধ্যেই। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা পড়োনি?

রাতের সব তারাই আছে।দিনের আলোর গভীরে।

–আমার মধ্যেই ছিলাম। দেখতে পাওনি শুধু।

–না। কোনো কবিতা-টবিতা পড়িনি বলেই তো তোমার তৃষার সঙ্গে বনিবনা হল না।

–তৃষা আমার নয়। তবে জীবনে সুখী হতে হলে, সম্পূর্ণ মানুষ হতে হলে, মেয়েদের বুঝতে হলে একটু কবিতা-টবিতা পড়া দরকার। কবিতা না পড়লে মানুষের মনুষ্যত্ব অপূর্ণ থেকে যায়।

কিছুক্ষণ বোকার মতো চেয়ে থাকল প্রণত ঋক-এর মুখের দিকে।

ঋক বলল, উঠলাম। এবার গিয়ে শুয়ে পড়ো প্রণতদা। ভালো করে এক লম্বা ঘুম দিয়ে নিয়ে উঠে চান-টান করে চলে এসো। তোমাকে নতুন জীবন দেব। কথা দিলাম। তুমি বদলে কিছু দাও আর নাই দাও।

.

০৭.

ফেরার সময়ে একটু ঘুর হলেও খাদি গ্রামোদ্যোগ-এ গিয়ে একটি ডাবল-বেড বেডশিট এবং বেডকভার কিনল ঋক। তারপর রাবড়ি কিনল পাঁড়ের দোকান থেকে, মুসলিম-এর দোকান। থেকে এককেজি পাঁঠার সিনা, বাজার থেকে লেড়ো বিস্কুট। তারপর এসব নিয়ে একটি রিকশা নিয়ে বাড়ির দিকে চলল।

তৃষার সারাদিন আজ বড়ো আনন্দে কেটেছে। লালপাতিয়া বলেছিল, দিদি তোমাকে ভালো করে তেল মাখিয়ে দিচ্ছি। সর মাখিয়ে দিচ্ছি মুখে। তারপর কুয়ো থেকে জল তুলে তোমাকে চান করিয়ে দেব। রোদে বসে থাকবে তুমি। লজ্জা কীসের। আর তুমি ছাড়া এখানে আর কেউ তো নেই।

তাই করেছে তৃষা। এত টাটকা লাগছে নিজেকে তা বলার নয়।

দুপুরে লালপাতিয়াই বেঁধেছিল। বাসমতী চালের ভাত, সোনামুগের ডাল মধ্যে তিন-চার রকমের শাক দিয়ে, বেগুন ভাজা, নদীর কুচোমাছের ঝাল, পুদিনার চাটনি। ঘরে ছিল লেবু আর আমলকীর আচার। ভাতের মধ্যে রাম সিং-এর গ্রামের খাঁটি ঘি ফেলে দিয়েছিল। আঃ খাবার না যেন অমৃত। এমন-ই ঘি যে, ডান হাতে এখনও তুড়ি দিতে পারছে না সাবান দিয়ে ধুয়েও।

সারাদুপুর পেছনের বারান্দার রোদে বসে নদীর দিকে চেয়ে থেকেছে। আর লালপাতিয়ার কাছে গান শুনেছে তাদের গ্রামের, রাম সিং-এর এবং তাদের ঋকবাবুর। কখন যে, বেলা পড়ে এসেছে মেছোবকেরা শান্ত ভড়ানে জঙ্গলের ভেতরে তাদের ডেরায় ফিরে গেছে, পশ্চিমের আকাশে সিঁদুর খেলে সূর্য চলে গেছে তা খেয়াল-ই হয়নি। লালপাতিয়া মুচমুচে কুচো নিমকি আর চা করে এনে বলেছে, এবারে ঘরে চলো দিদি। ঠাণ্ডা ধরে নেবে।

ওরা ঘরে আসতে-না-আসতেই ঋক এসে হাজির। লালপাতিয়াকে বলেছে, কাঁধের থলি নামিয়ে রেখে, শিগগির আদা, পেঁয়াজ, রসুন আর পেঁপে বেটে সেই রসে এই সিনাগুলো ভিজেয়ে রাখ লালপাতিয়া। রাতে রাম সিং আর আমার আর একজন মেহমান খাবে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে এসেই ভুনি খিচুড়ি চাপাব। আলু আর বেগুন কাটবি ভাজার জন্যে। শুকনো লঙ্কা বের করবি। মনে আছে তো কোথায় রাখা আছে? ওই

ঝোলানো হাঁড়িটার মধ্যে। কী রে?

–মনে আছে বাবু।

বলে, হেসেছে লালপাতিয়া।

–কেমন কাটল দিন? তৃষা?

–দারুণ। এক অন্য দিন। ভারি ভালো লাগল।

–জীবনের প্রত্যেকটি দিনকেই অন্যদিন যারা করে তুলতে পারে তাদের জীবন। কখনোই পুরোনো হয় না। তোমার জীবনও পুরোনো হবে না।

–আমার আবার জীবন! আছেটা কী? সব শেষ।

–বলো কী তুমি! এই তো সবে শুরু।

সারাদিন-ই আনন্দে কেটেছে তৃষার কিন্তু মনের মধ্যে একটিই প্রশ্ন বারবার কাঁটার মতো বিঁধেছে। ঋক-এর টেবিলে যে-মেয়েটির ছবি সে দেখেছে সে মেয়েটি কে? লালপাতিয়াকে জিজ্ঞেস করতে পারত কিন্তু লজ্জা করেছে। তা ছাড়া লালপাতিয়া হয়তো জানেও না।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে জামকাপড় ছেড়ে খদ্দরের পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরে, গরম দেহাতি কাপড়ের জহরকোট পরে ঋক কাজে লেগে গেছে।

তৃষাকে বলেছে, ভালো করে সাজাতে হাত-পা মুখ ধুয়ে নিয়ে। ঋকের গণ্যমান্য অতিথিকে খেতে বলেছে সে আজ। আলাপ করিয়ে দেবে তৃষার সঙ্গে। খুব ভালো লাগবে তৃষার।

তৃষা যখন হাত-মুখ ধুতে গেছে স্নানঘরে, সেখানে লালপাতিয়া কেরোসিনের টিনে করে জল তুলে রেখেছিল; তখন ঋক, লালপাতিয়ার সাহায্যে পেছনের দিকের ঘরে অনেক পোয়াল এনে প্রায় একহাত উঁচু করে দু-জনের বিছানা করেছে। তার ওপর পেতে দিয়েছে নতুন কেনা ডাবল বেডের চাদর। ঢেকে দিয়েছে বেডকভার দিয়ে। নতুন ওয়াড় পরিয়ে দেওয়াল-আলমারি খুলে দু-টি বালিশ বের করে পেতে দিয়েছে এবং পাছে বিছানা ঠাণ্ডা হয়ে যায় তাই নতুন লেপ বের করে তাতে পাতলা মার্কিনের ওয়াড় পরিয়ে তা দিয়ে বালিশ এবং বিছানাও ঢেকে দিয়েছে। লালপাতিয়াকে বলেছে ওই ঘরের কোণে-কাঠকয়লার আগুনের মালসা রেখে দিতে যাতে গরম হয়ে থাকে ঘর। আর এই ঘরের বিছানা সম্বন্ধে কিছু বলতে মানা করেছে তৃষাকে। পেছনের বাগান থেকে লাল আর হলুদ গোলাপ তুলে এনে পাপড়ি ছড়িয়ে দিতে বলেছে তাকে লেপের নীচে।

তৃষা মুখ-হাত ধুয়ে ঋকের ঘরে গিয়েই সেজেগুজে এসেছে। একটি মেরুনরঙা সিল্কের শাড়ি পরেছে। লণ্ঠনের আলোয় ওকে একটি মসৃণ উজ্জ্বল প্রজাপতির মতো দেখাচ্ছে। লণ্ঠনের আলো বিজলি আলোর চেয়ে

অনেক-ই ভালো। যেটুকু দেখবার দেখায়, যেটুকু দেখাবার নয়, লুকিয়ে রাখে। অনেক রোমান্টিক। কোনো বিদেশি পারফিউম মেখেছে। তার গন্ধে ঋক-এর মাটির ঘরবাড়ি ম-ম করছে।

একবার জোরে নাক টেনে নিশ্বাস নিয়ে ঋক বলল, আহা রোজ যদি এমন সুগন্ধে ভরে যেত আমার এই গোবর-লেপা ঘর-বাড়ি।

তৃষা মুখ তুলে বলতে গেছিল তুমি ইচ্ছে করলেই ভরে যেতে পারে। কিন্তু বলতে গিয়েও বলল না। ঋক পরক্ষণেই গেয়ে উঠেছে ওহে সুন্দর মম গৃহে আজি পরমোৎসব রাতি, ওহে সুন্দর।

হেসেছে তৃষা।

মানুষটিকে ও ঠিক বুঝতে পারছে না। কাল রাতে বুঝেছিল। ভেবেছিল যে, বুঝেছিল। কিন্তু সকাল থেকেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ঋক যখন চা খেল তখন তৃষা আর লালপাতিয়াও আর একবার করে খেল। এমন শীতে চা সবসময়ই আনন্দর। ওরা যখন চা খাচ্ছে তখন রাম সিং এল। বলল আমার চা?

লালপাতিয়া হেসে বলল, আছে। রাম সিং চা খেয়ে লণ্ঠন আর ছুরি হাতে করে পেছনের দরজা খুলে মুরগি দুটোকে নিয়ে নদীর দিকে চলে গেল বানিয়ে আনবে বলে।

–ভুনি খিচুড়ি, আলু বেগুন আর শুকনো লঙ্কা ভাজা, পাঁঠার সিনা ভাজা ক্র্যাম দিয়ে; আর মুরগির কষা মাংস। ভালো হবে না?

–তুমি বড়ো খাদ্যরসিক।

তৃষা বলল।

–জীবন-রসিক মাত্রই খাদ্যরসিক। ভালো খাওয়া, ভালো গান, ভালো কবিতা, ভালো পোশাক (দামি নয়), ভালো সুগন্ধ, ভালো ভালোবাসা এই সবকিছু নিয়েই তো জীবন। একের সঙ্গে অন্যের যে, অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। তোমাকে কিন্তু রান্না শিখে নিতে হবে তৃষা। রান্না, মেয়েদের একটি মস্ত গুণ। যে-মেয়েরা একথাটা জানে না তারা ভুল করে। দিন-রাত হেঁসেল ঠেলার কথা বলছি না। প্রয়োজনে এবং শখে রান্না যে-মেয়ে করে না সে পুরোপুরি মেয়েই নয়।

তৃষা হেসে উঠল। বলল, মেয়েদেরও এক নতুন ডেফিনেশান শুনছি।

ঠিক সেই সময়ে একটি সাইকেল রিকশার ঘণ্টা শোনা গেল এবং বাইরের লোহার হুড়কোতে কে যেন শব্দ করল।

ঋক বলল, ওই বোধ হয় আমার অতিথি এল। তৃষা কিছু বলার আগেই ঋক উঠে দরজা খুলতে গেল। অর্ধেক পথ গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, আমাকে তুমি ভালোবাসো? তৃষা?

তৃষা কথা না বলে, মাথা নোয়াল, খুব-ই লজ্জা পেয়ে।

–আমার অতিথির সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার কোরো তাহলে।

বলেই, দরজার কাছে গিয়ে দরজা খুলে বলল, এসো এসো। আমার কী সৌভাগ্য! তৃষা লণ্ঠনের আলোতে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লম্বা, চওড়া সুপুরুষ মানুষটিকে চিনতে পারল না প্রথমে। পরক্ষণেই চিনতে পেরে একদৌড়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল। যে-ঘরে (ঋকের ঘরে) তৃষা গেল সেই ঘরেই প্রণতকে নিয়ে ঋক ঢুকল এসে। বলল, তৃষা ইনি একজন বন্ধু আমার, দাদা স্থানীয়। নতুন মানুষ। এঁকে তুমি চেনো বলে জানো বটে, আসলে কিন্তু চেনো না। ভালো করে আজ আলাপ করিয়ে দেব বলেই নেমন্তন্ন করেছি।

তৃষা বলল, রাগত স্বরে, আমি এর কোনোই মানে বুঝছি না।

প্রণত মুখ নীচু করে অপরাধীর মতো বলল, আমিও কিন্তু না। এসব ঋক-এর কারসাজি।

ঋক হেসে বলল, আমিও বুঝিনি কিন্তু পরে হয়তো বুঝব। এখন এসব কথা ছেড়ে আমরা অন্য কথা বলি। প্রণতদা তুমি তৃষার গান শুনেছ কখনো? শুনতে চাওনিও তো কখনো? কবিতা? আর তৃষা তুমি প্রণতদার মুখে তাঁর অফিসের কলিগদের গল্প শুনেছ কখনো? হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে তোমার।

তৃষা আড়ষ্ট হয়েই ছিল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। প্রণতও মুখ নীচু করে অপরাধীর মতো বসেছিল। লণ্ঠনের আলোতে ওদের দুজনের ছায়া পড়েছিল মাটির দেওয়ালে। ওদের আসল মাপের চেয়ে অনেক বড়ো হয়ে।

ঋক বলল, এক কাজ করো। এখনও শিশির পড়া আরম্ভ হয়নি। তোমারা এই লণ্ঠনটি নিয়ে আমার বাড়ির শালবনের পথে একটু হেঁটে এসো। দু-জনেই মাথা ঢেকে নিয়ে কিন্তু। আমার রান্নাটা ততক্ষণে আমি এগিয়ে নিই। কেমন?

বলেই ডাকল, লালপাতিয়া। যা তো বোন, সাহেব মেমসাহেবকে লণ্ঠনটা নিয়ে এগিয়ে দে। শালবনের পথটা দেখিয়ে লণ্ঠনটা দিয়েই ফিরে আসবি। অনেক কাজ আছে আমাদের।

রাম সিং ফিরে এল লালপাতিয়া ফেরার আগেই।

রাম সিং বলল, যা করার চেষ্টা করছ তা কি পারবে?

–না পারি, চেষ্টা করতে ক্ষতি কী বলো? দু-টি অমূল্য জীবন বেঁচে যাবে। মওত তো অনেক রকমের হয়। এ তো জীবন-মরণের ব্যাপার। অমিল থাকে না কোন মিয়া-বিবির মধ্যে? তা বলে সবাই যদি কথায় কথায় একে অন্যকে ছেড়ে যেত।

প্রণত বলল, তৃষাকে, এই! আমাকে কি কোনোরকমেই ক্ষমা করা যায় না?

–না।

তৃষা বলল।

–আমি জানি। তুমি আমি হলেও আমাকে ক্ষমা করতাম না। আসলে তোমাকে আমার অনেক কিছু বলার ছিল তোমার ছোটোমামির কথা, ম্যানেজার শ্রীবাস্তবের কথা, মুঙ্গলীর কথা।

–আমার শোনার আর ইচ্ছে নেই কোনো। বললে তো অনেক আগেই বলতে পারতে।

--একটা শেষ সুযোগ দিয়ে দেখলে পারতে! সুযোগ দিলেই যে, ক্ষমা করতে হবে এমন কোনো মানে নেই।

–এই ঋক মানুষটা মোটেই সুবিধের নয়। কাল যাকে লাঠি হাতে মারতে গেল আজ তাকেই নেমন্তন্ন করে আনবার মানে কী? আমি তো কিছু বুঝেই উঠতে পারছি না।

–আমিও সে কথাই ভাবছি। লোকটা সুবিধের কি না জানি না তবে, লোকটার চরিত্রের রকম সম্বন্ধে আমারও সন্দেহ হচ্ছে। যে, কাল আমার

স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করল সেই আজ আমার কাছে তাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে উদগ্রীব।

–সহবাস করল মানে কী? কী বলতে চাইছ তুমি? সকলেই কি তোমার মতো? তুমি এই যদি বলতে পারলে, তবে বলতেও পারে যে, লালপাতিয়ার সঙ্গেও ঋক-এর কোনো, সম্বন্ধ আছে। তোমার মন তো নয়। আস্তাকুঁড়।

-তা বলছি না। তবে কিছু থাকলেও দোষের কী? বেশ তো মেয়েটি।

–ছি : তোমার নজর-ই নোংরা।

–হয়তো। তবে তোমার-ই হাতে নিজেকে সঁপে দেব এবারে। তুমি যেমন করে গড়ে নেবে....

–যাক। আর যাত্রা করতে হবে না।

–কী সুন্দর গন্ধ বেরোচ্ছে একটা না? জঙ্গলের?

–বাবাঃ কোন দিকে সূর্য উঠল। এসবও তোমার নাকে যায়? জঙ্গলের গন্ধের সঙ্গে আমার পারফিউমের গন্ধও আছে।

–তোমার শরীরের গন্ধও।

–থাক।

–আকাশভরা কত তারা।

–বাবাঃ ভূতের মুখে রামনাম। তা তারা তো তোমার বাড়ির আকাশেও আছে। কোনোদিন দেখেছিলে কি?

–না। এবার থেকে দেখব।

–একা বসে দ্যাখো। মালি আর মুঙ্গলীকে সঙ্গে নিয়ে।

–না। তোমার সঙ্গেই দেখব।

–তুমি একটা মানুষ-ই নও।

–মানুষ ঠিক-ই, তবে বেশিদিন বোধ হয় বনমানুষ থেকে মানুষ হইনি। নানারকম ব্যাপার এখনও বড়ো প্রবল।

–কীরকম?

–যেমন শরীর।

--তুমি একটি পার্ভার্ট। স্ত্রীর শরীর না চেয়ে তুমি নোকরানির শরীর চাও।

–হ্যাঁ। চেয়েছিলাম। অনেক নির্ঝঞ্ঝাট বলে। তোমাকে অনেক কথা বলার

ছিল। কিন্তু তুমি আমার নতুন বউ, তোমাকে সুন্দর র্যাপিং পেপারের মোড়ক খুলে দেখিনি পর্যন্ত। আমি সত্যিই অমানুষ! সব পাপ ক্ষালন করে দেব দেখো। তোমাকে আমি ভালোবাসি তৃষা।

-ফুঃ। ভালোবাসা!

–বিশ্বাস করো, কাল রাতের আগে একথা আমি নিজেও জানতাম না। আজ সারাদিন কী যে, কষ্টে কেটেছে আমার, কী যে অনুশোচনা, গ্লানি–কী বলব তোমাকে।

–থাক। ওসব কথা। আমার নাক দিয়ে জল গড়াচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা বাইরে।

প্রণত পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে তৃষার নাক মোছাতে গেল! তৃষা ছোঁ মেরে রুমালটা নিয়ে নিজেই মুছে বলল, আদিখ্যেতা কোরো না বেশি বেশি বলে রুমালটা ফেরত দিল।

ওরা ফিরতই রাম সিং দরজা খুলে দিল। শুনল রান্নাঘর থেকে দরাজ গলায় গান গাইছে ঋক–

এলো যে শীতের বেলাবরষ পরে, এলো শীতের বেলা। .....বাহিরে কাদের পালা হইবে সারাআকাশে উঠিবে সন্ধ্যাতারাআসন আপন হাতে পেতে রেখো আঙিনাতেঅতিথি আসিবে রাতে তাহারি তরে।

–এসো এসো। বাঘ-টাঘ সামনে পড়েনি তো!

প্রণত বলল, এ জঙ্গলে শেয়াল থাকলেই বেশি, তার বাঘ।

আর বাঘ সত্যি সত্যিই আর কজনের সামনে পড়েছে আজ অবধি। সব-ই তো কল্পনার বাঘ। স্বপ্নের পোলাউতে যেমন, ঘি ঢালতে কষি করতে নেই দুঃস্বপ্নের বাঘের সাইজেও তেমন কার্পণ্য করতে নেই। এ পর্যন্ত ছোটোবাঘও কেউ কি দেখেছে? শুনেছ কারও মুখে?

–তা ঠিক। বেশ মজার মজার কথা বলেন আপনি ঋকবাবু।

–আমাকে তুমি তুমিই বোলো। যেমন বলছিলে! প্রণতদা তো ঘরের লোক। তার সামনে লজ্জা কী!

তারপর-ই বলল, ঠাণ্ডা লাগিয়ে এসেছ তো! এই দ্যাখো ঠাণ্ডার ওষুধও এনে রেখেছি। তৃষাকে একটু গরম জল দিয়ে দিচ্ছি। আর আমি আর প্রণতদা এমনিই জল দিয়ে খাব।

–কী?

চোখ বড়ো বড়ো করে বলল তৃষা।

–ব্রাণ্ডি। ঠাণ্ডার যম।

–তুমি মদ খাও?

–খাই বই কী! তুমি মিছেই প্রণতদাকে দোষ দাও। আজকাল মদ খায় না কে? তবে প্রণতদা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি করে ফেলে এই যা। এবার থেকে করবে না শুনতে পাচ্ছি।

–কে বলেছে তোমাকে?

তৃষা বলল।

–শুনতে পাচ্ছি। এই নাও তৃষা। একটু একটু করে চুমুক দাও। আড়ষ্টভাবটা চলে যাবে। শীতও পড়েছে। বড়োদিনও এসে গেল। আমাদের মতো কেরানিদেরও বড়োদিনে একটু কেক খেতে আর মদ খেতে হয়। সাহেবদের কাছে শিক্ষা। বুঝলে না। কই গেলে রাম সিং? কই এসো। তুমি-ই বা বঞ্চিত হও কেন? এই লালপাতিয়া তুই খেয়ে-দেয়ে শোয়ার সময়ে এক চুমুকে খেয়ে নিবি। ঘুম ভালো হবে। তোর জন্যেও রেখে দেব। ভাবিস না।

চিয়ার্স বলল ঋক। তারপর বলল, কই তৃষা খাও। তৃষা অবাক হচ্ছিল। মদ ব্যাপারটার মধ্যে ও চিরদিন-ই একটি গর্হিত অপরাধ লক্ষ করেছিল। আজ ঋক ব্যাপারটাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে এমন জল-ভাত করে দিল বলে সত্যিই আশ্চর্য হচ্ছিল।

বলল, জীবনে কোনোদিনও খাইনি।

এই কথাটা শুনলেই আমার হাসি পেয়ে যায়। জীবনে বিয়ের আগে কোনোদিনও একটা জিনিস করেছিলে? অবশ্য না–করে থাকলে আমি জানি না।

ঋক ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলল।

প্রণত হো হো হো করে হেসে উঠল।

তৃষা কথার মানেটা একটু পরে বুঝল। বুঝেই লজ্জায় লাল হয়ে গেল। বলল, এত অসভ্য না।

নাও, এবার খাও। স্বামী-স্ত্রীর জীবনের সঙ্গী হবে, স্ত্রী স্বামীর। দূরে দূরে ছেড়ে ছেড়ে থাকে বলেই আমাদের দিশি দম্পতি একে অন্যকে পরিপূর্ণভাবে পায় না। কিটসন সাহেবকে দ্যাখোনি প্রণতদা? স্বামী-স্ত্রী যেন একে অন্যকে পলকে হারায়। স্বামী যা করতেন স্ত্রীও তাই করতেন। নইলে কীসের জীবনসঙ্গিনী?

–তা বলে মদ খেতে হবে?

তৃষা বলল।

–একে মদ খাওয়া বলে না। সোশ্যালড্রিঙ্কিং এর নাম। আমার কথা

শোনো। দু-জনে মিলে একসঙ্গে গল্প করতে করতে, গান শুনতে শুনতে, কবিতা পড়তে পড়তে একটু খেলে ক্ষতিই বা কী? বাইরে খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে খাওয়া অনেক ভালো। স্ত্রী না খেলে স্বামী মদ্যপদের পাল্লায় পড়ে রোজ-ই দেরি করে বাড়ি ফিরবে। আর মাতাল মানুষ আর কাটনেওয়ালা জানোয়ারের তফাত কী আছে বলো?

–তোমার খিচুড়ির গন্ধটা বেশ ছেড়েছে।

প্রণত বলল কী বলবে ভেবে না পেয়ে।

–এখন-ই কী? যখন খাবে, তখন বুঝবে। চলো। বাকিটা রাম সিং ভাই আর লালপাতিয়া সামলে নেবে। আমরা আমার ঘরে গিয়ে বসি। একটু আড্ডা মারা যাক।

রাত প্রায় সাড়ে দশটা এখন। ওদের খাওয়া-দাওয়া শেষ। তৃষা দুটো বড়ো ব্রাণ্ডি খেয়েছে গরম জলে। প্রণতর প্রতি বিরূপতা যেন অনেকখানি কেটে গেছে। তবে তার প্রধান কারণ ঋকের মজার মজার কথা, গান, কবিতা। ঋক যেখানে থাকে সেখানে কারও ব্যাজার মুখে থাকার উপায় নেই।

প্রণত বলল, এবার একটা রিকশা ডেকে দিতে হয় ঋক!

–রিকশা? রিকশা এখানে কোথায় পাবে? রিকশা ডাকতে হলে সেই

মুরাদগঞ্জের মোড়ে যেতে হবে। গাড়ি থাকতে গাড়িখানা নিয়ে এলে না কেন? পরস্ত্রীর বোঝা আর আমার বইতে হত না! মিয়া-বিবিকে একসঙ্গে তুলে দিতাম গাড়িতে। তোমার গাড়িখানা কি কেবল-ই গরিবের সাইকেল ভাঙার জন্যে? ওরা সকলেই হেসে উঠল। প্রণত বলল, তোমাকে আমি একটি অটো সাইকেল কিনে দেব।

–হ্যাঁ! আমি নিলে তো! পায়ে বাত হবে। সাইক্লিং ইজ আ ভেরি গুড এক্সসারসাইজ।

–আমি এখন যাব কী করে? ঋক?

—তুমি যে, এখান থেকে একা যাবে তা তো হবে না। রাত নটার পর থেকে এই রাস্তা একটা পাগলা শেয়ালের টেরিটোরি হয়ে যায়। কাল আসা-যাওয়ার পথে দ্যাখোনি তাকে?

-না তো!

–কোথায় যাবে এতরাতে। আর তোমার রিকশা ডাকতে গিয়েই বা কে নিউমোনিয়া বাধাবে! জলে তো আর পড়োনি। আমার আবার ভীষণ ঘুম পেয়ে গেছে। যা গেল না সারাটা দিন!

তা ঠিক। তৃষা বলল।

–আই অ্যাম সরি ঋক।

–আর কথা না বাড়িয়ে এবারে এসে দেখি। বিছানা পর্যন্ত পেতে রেখেছি।

–সে কী! কোথায়?

তৃষা অবাক হয়ে বলল।

–এসোই না।

–আমি কিন্তু কাল যেখানে শুয়েছিলাম সেখানেই শোব।

তৃষা বলল।

–আমি কি তাহলে প্রণতদার মতো একজন আধোচেনা ধুমসো পুরুষমানুষকে জড়িয়ে ধরে রাত কাটাব। ওসব হচ্ছে না।

তারপর-ই গলা নামিয়ে ঋক বলল, তৃষা কথা শোনো। ডোন্ট ক্রিয়েট আ সিন। ওরা আছে না। কী ভাববে!

ঘরে একটি লণ্ঠন ফিতে কমিয়ে রেখে ঋক বলল। প্রণতদাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে তৃষা। যদি রাতে যান। খাবার জল রইল জাগে। গ্লাস। আর এই দ্যাখো, সব নতুন। বলেই লেপটা তুলে দেখাল। লাল আর হলুদ গোলাপের পাপড়ি ছড়ানো বেডশিটের ওপর।

–দেখছ! কী পাজি!

তৃষা বলল।

–বেডশিটটা তো আর তুলোর না। নীচ থেকে ঠাণ্ডা তো উঠবেই। তোশক-টোশক তো নেই। তারপর গলা নামিয়ে বলল, দু-জনে দু-জনকে যতটুকু গরমে রাখতে পারো ততটুকুই গরম। ওক্কে গুড নাইট। আমি শুতে চললাম। আমার ঘর থেকে তোমার স্যুটকেসটা দিয়ে যাচ্ছি তৃষা। যদি কোনো কিছুর দরকার হয়। ও একটা কথা শোনো প্রণতদা।

বলেই, প্রণতকে উঠোনে ডেকে এনে ঋক বলল, বিয়ে তো আমি করিনি কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে, দম্পতির সব ঝগড়া বিছানাতেই মিটে যায়।–কথাটা যে সত্যি তা প্রমাণ করো।

.

০৮.

এখন বেলা আটটা। ঋকের স্নান হয়ে গেছে। নাস্তাও হয়ে গেছে। তৃষাদের জন্যে নাস্তার বন্দোবস্ত করে অফিসে বেরোল ঋক। ও ঘরের দরজা এখনও খোলেনি। রোদ ঝলমল। আকাশের দিকে চেয়ে মনটা ভারি প্রসন্ন লাগল ঋকের। বহুদিন এত ভালো লাগেনি ওর।

বেরোবার সময়ে রাম সিংকে বলে গেল মুরাদগঞ্জের মোড় থেকে রিকশা ডেকে এনে দু জনকেই তুলে দিতে সব মালপত্র দিয়ে। অফিস-ফেরতা ওঁদের বাড়ি গিয়ে দেখা করবে ঋক। অফিসেও বলে দেবে যে, সাহেব আজও অফিসে যাবেন না। আর একটা কথা রাম সিং। লালপাতিয়াকে সঙ্গে করে তুমি রাতে নিয়ে যাবে সাহেবের বাংলোয়। ওখানেই থাকতে হবে ওকে কিছুদিন। আমার মুখ চেয়ে। যতই কষ্ট হোক ওর গ্রাম ছেড়ে থাকতে।

শিশিরভেজা শালবনের পাতায় পাতায় রোদ পড়ে লক্ষ হিরের মতো ঝলমল করছে দু দিক। জোরে নিশ্বাস নিলে এখনও নাকে ব্যথা করে এমন ঠাণ্ডা। একটা নীলকণ্ঠ পাখি পাতা থেকে শিশির ঝরিয়ে আকাশের নীল আর রোদকে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে তার প্রাণের অকলুষ উৎসারে ডাকতে ডাকতে চলে গেল নীদর দিকে। ভেজা ধুলোর গন্ধ উঠছে চারপাশ থেকে। নদীর গন্ধ ভাসছে থম-ধরা সকালে। হাওয়াটা এখনও শুরু হয়নি। বেলা বাড়লে শুরু হবে। বনে বনে উশখুশ উশখুশ। ঝরা পাতা উড়বে এদিকে ওদিকে উত্তরের হাওয়ায়।

কোনো মানুষকেই খারাপ বলে কখনো ফেলে দিতে নেই। ঋক আবার বলল মনে মনে। লণ্ঠনের আলোতে যেমন সব দেখা যায় না মুখের কিছুটা অন্ধকার থাকে, আমাদের চোখের আলোও তেমন-ই। আসলে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আলোকিত দিকটুকুই বেশি অন্ধকার দিকের

চেয়ে। জীবনকে দেখতে, অন্যকে দেখতে আজকের সকালবেলার আলোর মতো আলো চাই।

কী করছে এখন তৃষা কে জানে? হয়তো প্রণতদাকে জড়িয়ে ধরে আশ্লেষে ঘুমোচ্ছ। আসলে কাল-ই ওদের ফুলশয্যার রাত গেছে। বিয়ের বহুদিন পরে এল।

কে জানে কী বলবে তৃষা আজ যখন দেখা হবে ওদের বাড়িতে রাতে? ওর প্রিয়কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা আবৃত্তি করেই বলবে কি?

নিচু হয়ে এসেছিল যে মানুষ অপমানে, ঘাতেঝরে গিয়েছিল যার দিনগুলি প্রহরে উজানেতারই কাছে এসে ওই পাঁজরে পালক রেখেছিলেতোমার আঙুলে আমি ঈশ্বর দেখেছি কাল রাতে।

ঝাঁকি দর্শন

১-২. টিকলু

ঝাঁকি দর্শন – উপন্যাস – বুদ্ধদেব গুহ

০১.

আমার নাম টিকলু।

জীবনে যারা সফল, আমি অনেকেরই মতো; তাদের দলের নই। পড়াশুনোয় আমি মাঝামাঝি ছিলাম। চাকরির বিজ্ঞাপন দেখে যে, লক্ষ লক্ষ লোক পে-অর্ডার ভরে, অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম জমা দিয়ে এ দরজা থেকে ও দরজায় ঘুরে বেড়িয়ে যৌবনের জীবনীশক্তির প্রায় সবটাই অলক্ষ্যে ও নিঃশেষে খরচ করে ফেলে আমি তাদেরই একজন। আমার স্টেট ব্যাঙ্কে চাকরি হয়নি, হয়নি ইনকাম ট্যাক্সে। সরকারি, আধা-সরকারি এমনকী বেসরকারি কোনো প্রতিষ্ঠানেও কোনো চাকরির মতো চাকরি আমার আজ অবধি হয়নি।

আমার বয়স প্রায় তিরিশ হতে চলল।

আমরা তিন ভাই এক বোন। দিদি বড়োজামাইবাবু কৃতী পুরুষ। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বড়োচাকরি করেন তিনি, উর্দিপরা টুপি-চড়ানো ড্রাইভার তাঁর গাড়ি চালায়। দিদির একমাত্র কাজ শপিং করা। এবং দু-জনেরই কাজ আমি যে, একটা অপদার্থ, কুঁড়ে, হতভাগা এ সম্বন্ধে আমাকে অবহিত করা।

আমার বড়োদাদা প্রায় আমার-ই মতো কুঁড়ে। আমি যে, কুঁড়ে– একথা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু এই কুঁড়েমিটা কিছু করতে চেয়েও কিছু করতে না পারার কারণে। অব্যবহৃত তানপুরার ওপরে যেমন পরতে পরতে ধুলো জমে, তেমনি করে পরতে পরতে আমার অস্তিত্বর ওপর কুঁড়েমি বসে গেছে। একদিন বা এক-শো বছরের চেষ্টাতেও সে-ধুলো, সে আস্তরণ আর উঠবে না।

আমি যদি তানপুরা হতাম, তবে দোকানে দিয়ে আমরা খোলনলচে বদলে, নতুন করে রং করে, মরচে-পড়া তার-টার সব বদলে নিলে আমি হয়তো আবার কোনো সুন্দর সুর-সোহাগি আঙুলে দারুণ বাজতাম। কিন্তু আমি যে, একজন মানুষ। আমার খোলনলচে বদলাবার, নিজেকে নতুন করে রং বা বার্নিশ করার উপায় নেই কোনো।

বাবা অবস্থাপন্ন ছিলেন। ছেলেবেলায় বড়োলোকির মধ্যে মানুষ

হয়েছিলাম। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর আমরা গরিব। বাবার অন্য অনেক ব্যাবসার মধ্যে একটা চা-এর দোকান ছিল, ভালো রাস্তায়, ভালো পাড়ায়; দাদা সেই দোকানে সকাল-বিকেল যায়–দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। দোকানদারিতে যে, ব্যবহারের চাকচিক্য লাগে ও সদাসর্বদা জাগ্রত দৃষ্টির দরকার হয় আমার ঘুমকাতুরে দাদার তার কিছুই ছিল না।

আমার বউদি খুব ভালো। সুন্দরী, সুরচিসম্পন্না; ভারি ভালো মেয়ে। আমার দাদার হাতে পড়ে বউদির বড়োই হেনস্থা। তার কোনো শখ-ই এ জীবনে পূরণ হয়নি। হবে না। আমার বউদির সঙ্গে আমার একটা বাবদে মিল ছিল। রুচির বাবদে। চরিত্রের নরম দিকটার বাবদে। ফলে, ভ্যাগাবণ্ড আমি ও আমার বউদির মধ্যে কখন যে, অনবধানে একটা সখ্যতা গড়ে উঠেছিল; একে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সমবেদনা সব মিলেমিশে কবে কখন কোন মুহূর্তে যে, বউদিকে আমি এবং বউদি আমাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম ও ভালোবেসেছিল তা আমরা কেউ-ই বুঝতে পারিনি।

আমাদের পরিবারে আমার ছোটোভাই একমাত্র তালেবর। সে বিদেশি কোম্পানিতে একটা মোটামুটি চাকরি করত, ছেলেবেলা থেকেই ফটফট করে ইংরিজি বলত, ইংরিজি গান গাইত। আমাদের পরিবারের সেই কর্তা ছিল বলতে গেলে।

আমার সঙ্গে বউদির সম্পর্কটা আত্মীয়স্বজন সকলেই জানতেন–কিন্তু বেচারি-বউদি ও হতভাগা-আমি জীবনের আর সমস্তক্ষেত্রে এমন-ই বঞ্চিত

ছিলাম যে, আমাদের একে অন্যের কাছে থেকে এই সামান্য প্রাপ্তিতে কেউই আপত্তি করত না। দাদার মানসিকতায় ভালোবাসা, শখ, রুচি এইসমস্ত ব্যাপারগুলোই সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। তাই আমাদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো মস্তিষ্ক ও হৃদয় কোনোটাই তার ছিল না। দিনে-রাতে চোদ্দো ঘণ্টা ঘুম এবং খাওয়ার সময় খাওয়া পেলেই সে সুখী ছিল। জীবনে ডাল-ভাত শাড়ি-শায়া ছাড়াও যে, বেঁচে থাকতে হলে একজন নারীর অন্যকিছুর প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন থাকে; তা বোঝার মতো ক্ষমতা দাদার ছিল না।

মনে হয়, বোঝার ইচ্ছেও ছিল না।

বউদির ছেলে-পিলে হয়নি। ডাক্তাররা বলেছেন, হবেও না। তাই আমার ওপরে বউদির মনের অপত্য স্নেহ ও প্রেম সমস্তই বড়ো নরমভাবে বর্ষিত হত। আমার জীবনে বউদিই একমাত্র আনন্দ ছিল।

যখন-ই মাঝেমধ্যে একমাস দু-মাসের জন্যে কোনো একটা কাজ পেতাম– যে-কাজকে অ্যান অ্যাপলজি ফর আ জব বলাই ভালো–সেই টাকা দিয়ে বউদিকে শাড়ি কিনে দিতাম। কোনো হুহু-হাওয়া গরমের সন্ধেয় হয়তো বউদির জন্যে এক প্যাকেট ধূপকাঠি বা একগোছা রজনিগন্ধা নিয়ে আসতাম।

আমার কাছ থেকে বউদির কোনো দাবি ছিল না, আশাও না। আমারও

একটু সমবেদনা বা ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই পাওনা ছিল না বউদির কাছ থেকে। আমাদের সম্পর্কটা আশ্চর্যরকম পবিত্র ছিল, যদিও তা যেকোনো মুহূর্তে অপবিত্র হতে পারত। হতে পারত, অথচ হয়নি বলেই যেন, সেই সম্পর্কের একটা আলাদা দাম ছিল, মোহ ছিল আমাদের দু জনেরই কাছে।

শরীর বড়োস্থূল। শরীর এসে পড়লেই বোধ হয় অধিকাংশক্ষেত্রে ভালোবাসার সূক্ষ্মতা মরে যায়। বউদির যে, কিছু অদেয় ছিল আমাকে এমন নয়। কিন্তু সে-কথা দু-জনেই মনে মনে জানতাম বলেই হয়তো কেউই তা পাওয়ার বা দেওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করিনি।

আমার তালেবর ছোটোভাইয়ের বিয়ে হল এক বড়োলোকের মেয়ের সঙ্গে। তার বিয়ের পর-ই আমার ভাদ্র-বউ, ভ্যাগাবণ্ড ভাসুরঠাকুর ও তার বউদির মধ্যে এমন ভাবটা ভালো চোখে দেখল না। নানারকম কথা উঠতে লাগল। সেই থেকেই, নিজের ও বউদির দুজনের সম্মানের জন্যেই আমি কলকাতার বাইরে বাইরে কাটাতে লাগলাম। যেকোনো একটা কাজ পেলেই তা নিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসতাম বাইরে। কানাঘুসো থেকেও বাঁচতাম; আবার অনেক অনেক দিন পর, বাইরে থেকে ফিরে এসে, বউদির সঙ্গ, বউদিকে দেখতে পেয়ে খুব ভালোও লাগত।

পাটনায় কাটালাম কিছুদিন। শিলিগুড়ি, মাল, কৃষ্ণনগর-বাঁকুড়া, যেকোনো কাজে যে কেউর ডাকে অমনি চলে যেতাম, যেকোনো মাইনেয়! এমনকী

বেগার খাটতেও!

সবে বাঁকুড়া থেকে ফিরেছি দিনকয় হল, এমন সময় আমার মামাতো ভাই শশী একদিন এসে হাজির।

শশীর চেহারাটা খুব সুন্দর ছিল। আমার বড়োমামা একসময় কলকাতার শীর্ষস্থানীয় ক্লাবের হর্তাকর্তা ছিলেন, তারপর ফুটানির অনেক ফোটো ও বাড়ি মর্টগেজ রেখে তিনি মারা যান। শশী তার পিতৃবন্ধুদের ধরে সেই ক্লাবেই স্টুয়ার্ডের চাকরি পায় সুন্দর চেহারার গুণে। আমরা দু-জনে একসঙ্গে পড়তাম। শশী আমাকে খুব পছন্দ করত। ও সিরিয়াসলি নানারকম চাকরির চেষ্টা করত আমার জন্যে।

শশী একদিন সকালে এসে বলল, তোর একটা দারুণ চাকরি ঠিক করেছি তোকে আইডিয়ালি স্যুট করবে।

–কীসের চাকরি?

সন্দিগ্ধ গলায় শুধোলাম আমি।

কারণ এর আগে অনেক চাকরি-চাকরি খেলা খেলোম, পঞ্চাশ-একশো টাকা মাইনেতেও–। কিন্তু হয় মাইনে কম, নয় মালিক মনোমতো নয়, নয়তো নিজের কুঁড়েমির জন্যে কোনো চাকরিও টেকাতে পারলাম না। আমার কুষ্টিতে কোথাও স্থির হয়ে বসা লেখা ছিল না।

আমি কিছু বলার আগেই শশী বলল, এমন মালিক পাবি না। একেবারে রাজা লোক। অংশুমান মিত্তিরকে কলকাতায় সবাই চেনে। সকলে ডাকে স্যার এ এম।

–স্যার মানে? নাইটেড নাকি? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

তারপর বললাম, বাহাত্তুরে বুড়ো বুঝি? পুরোনো স্যারেরা কি আজও আছেন? ভারতীয় গন্ডারের মতো তাঁরাও তো নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে।

শশী একটা সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, আরে না, না, স্যার ঠাট্টা করে বলে লোকে। বয়স কত হবে? বড়োজোর পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ। কিন্তু এমন সত্যি ঠাট্টা আর হয় না। ক্লাবে তো কত অ্যান্টিক হয়ে-যাওয়া রাজা-মহারাজা,রায়-সাহেব, রায়-বাহাদুর দেখি, কিন্তু এমন দিলদার লোক আর কখনো দেখিনি।

আমি বললাম, লোকে বলে, বড়োমামাও এমনিই দিলদার ছিলেন।

শশী সিগারেটে একটা জোরে টান দিয়ে আমাকে তার চোখের চাবুক মেরে বলল, ছিলেন। কিন্তু দিলদারি করতে গিয়ে গুচ্ছের ছেলে-মেয়েকে পথের ভিখিরি করে রেখে স্বর্গে যান তিনি। স্যার এ এম-এর সঙ্গে আমার স্বর্গত পিতৃদেবের তফাত এইটুকুই।

আমি শুধোলাম, চাকরিটা কীসের?

শশী চোখে-মুখে উৎসাহ ঝরিয়ে বলল, হাউসকিপিং-ম্যানেজারের।

অবাক হয়ে শুধোলাম, সেটা আবার কী?

–মানে বুঝলি না? মানে ঘর-গেরস্থালি দেখাশোনার চাকরি। কলকাতায় নয়, সাঁওতাল পরগনায়।

আমি তখনও ভাবছিলাম।

বললাম, অংশুমান মিত্তিরের স্ত্রী নেই?

-থাকবেন না কেন?

জোরের সঙ্গে বলল শশী।

তারপর বলল, নিশ্চয়ই ওঁর ঘর-গেরস্থালির ব্যাপারটা এমন-ই কমপ্লিকেটেড যে, মেমসাহেবের পক্ষে এটা সেটা ম্যানেজ করে ওঠা মুশকিল।

যাই-ই হোক আজ সন্ধে সাতটার সময় সাহেবের সঙ্গে তোর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। তোকে সাড়ে ছটায় নিয়ে যাব। আজ আমার অফ-ডে। তৈরি হয়ে থাকিস কিন্তু।

এই অবধি বলে, সিগারেটটা শেষ করেই শশী বলল, এবার পালাই,

নমিতার সঙ্গে দুপুরে সিনেমা যাব।

আমি হাসলাম। বললাম এবার শাঁখা-সিঁদুর লাগা। কতদিন আর ছুপকে-ছুপকে চালাবি?

শশী বলল, শাঁখা-সিঁদুর লাগালেই তো থোড়-বড়ি-খাড়া খাড়া-বড়ি-থোড়। যতদিন ছুপকে-ছুপকে চলে, ততদিন-ই তো মজা। আমি বাবা ছুপা-রুস্তম-ই থাকতে চাই– যে-ক দিন পারি।

শশী ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় ওর স্কুটার নিয়ে এসে হাজির।

আমিও তৈরি ছিলাম। শশী স্যুট পরতে মানা করেছিল। বেঁচে গেলাম। ইন্টারভর জন্যে সেজোকাকার কাছ থেকে চেয়ে-আনা, পুরোনো একটা স্যুট অল্টার-টল্টার করে নিয়ে ইস্ত্রি করিয়ে রাখতাম। কিন্তু এই পুরোনো স্যুটটাও বোধ হয় সেজোকাকা ভালো মনে দেননি। এ স্যুট পরে গিয়ে একটা চাকরিও আমার এপর্যন্ত হয়নি। তাই স্যুটটা পরতে হবে না জেনে আশ্বস্ত হলাম।

শশীর স্কুটার মে-ফেয়ারে একটা বিরাট মালটি-স্টোরিড বাড়ির সামনে গিয়ে থামল।

স্কুটারটা পার্ক করিয়ে, ঘড়ি দেখে নিল শশী একবার। একেবারে রাইট-অন-টাইমে। তারপর লিফটের সামনে গিয়ে বোতাম টিপল।

লিফটটা নামতে-না-নামতে, আমাদের পাশ থেকে কে যেন বলে উঠলেন, একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় এসেছ দেখছি।

পাশে তাকিয়েই চমকে উঠলাম আমি।

গ্রেগরি পেক কবে থেকে বাংলা শিখলেন?

অপলকে তাকিয়ে রইলাম–ভদ্রলোকের দিকে। হুবহু গ্রেগরি পেকের মতো দেখতে এমনকী চুলটা পর্যন্ত–শুধু গায়ের রংটা অতখানি ফর্সা নয়। সাড়ে ছ-ফুট লম্বা। এমন বাঙালি তো আগে দেখিনি।

ভদ্রলোককে দেখেই, শশী হাতজোড় করে নমস্কার করে নিল, এই আমার ভাই স্যার!

স্যার এ.এম, প্রতিনমস্কার করলেন আমার নমস্কারে।

ইতিমধ্যে লিফট এসে গেল। লিফটে উঠে দশতলায় পৌঁছোলাম।

দশতলায় পৌঁছে সাহেব নিজের ফ্ল্যাটের সামনে এসে বেল টিপলেন।

বেয়ারা এসে দরজা খুলল–পেছন-পেছন বাঘের মতো দেখতে একটা ফিকে-হলুদ অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

টাইয়ের নটটা ঢিলে করে কোটটা বেয়ারার হাতে দিয়ে সাহেব বললেন,

বলো শশী।

শশী ও আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহেব বললেন, বোসো বোসো। কী খাবে বলো? গরম না ঠাণ্ডা?

শশী বলল, ঠাণ্ডা।

সাহেব বেয়ারাকে বললেন, বউরানিকে খবর দে, কোকাকোলা মিষ্টি সব নিয়ে আয়।

তারপর বউরানি আসার আগে সাহেব আমার দিকে চেয়ে বললেন, কাজটা কী শুনেছ তো?

ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস আছে পুরোপুরি বিধান রায়ের মতো–অচেনা লোককে তুমি বলতে একটুও আটকায় না এবং এমনভাবে তা বলেন যে, যাকে বলা হল তার কিছু মনে করারও থাকে না।

আমি বললাম, পুরোটা শুনিনি।

-তবে শোনো।

বলেই, সাহেব বললেন, ঝোলে-ঝালে-অম্বলে সবকিছু করতে হবে। দরকার হলে মালও বইতে হবে। কখনো-কখনো সারারাত কাজ করতে

হবে। একসঙ্গে আটচল্লিশ ঘণ্টা ননস্টপও কাজ করতে হতে পারে যখন আমার গেস্ট-টেস্ট থাকবেন। যখন কাজ থাকবে না, তখন ঘুমোতে পারো। মানে নিয়মকানুন কিছু নেই। য্যায়সা কাজ ত্যায়সা ডিউটি। তোমাকে কতগুলো দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হবে–কেউ খবরদারি করবে না তোমার ওপর–এক বউরানি ছাড়া। নিজের দায়িত্ব বুঝে সব কাজ নিজেকে করতে হবে–নিজের ইনিসিয়েটিভে।

মাথা নাড়ছিলাম। আর মনে মনে ভাবছিলাম, কাজের ফিরিস্তি তো শুনছি, এখন মাইনের কথাটা শুনি। এরকম বড়ো বড়ো সাহেব আমি এপর্যন্ত অনেক দেখেছি। কাজের বেলা শোলে আর মাইনের বেলা অ্যাড-শর্টস।

আমার চোখের ভাষা হয়তো সাহেব বুঝে থাকবেন। ভদ্রলোককে দেখেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে হল।

সাহেব বললেন, পাঁচশো টাকা মাইনে পাবে–তার সঙ্গে খাওয়া পাবে, থাকার কোয়ার্টার্স। মাসে তিনদিনের জন্যে কলকাতায় আসার ছুটি পাবে। ট্যাঁ-ফো করলে চলবে না, কোনো অজুহাত চলবে না। খাটতে পারবে কি না ভালো করে চিন্তা করে নিয়ে জানিয়ো। কাজের বেলা কোনো ফাঁকি বরদাস্ত করব না আমি।

খাওয়া-দাওয়া সমেত পাঁচ-শো টাকা আমার কাছে অনেক টাকা কিন্তু আমি বাঙালির ছেলে–খাটনিটা জোর হলে আমার একটু অসুবিধে। হালকা

খাটুনি, ফাঁকি মারার সুযোগ বেশি অথচ মাইনে ভালো এমনি চাকরি হলে আমার পোয় কিন্তু ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্বটা এমন-ই ও মাইনের অঙ্কটা এতই লোভের যে, বার বার মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানানো ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করণীয় রইল না।

এমন সময় বউরানি এলেন। বউরানির মতোই দেখতে। চাঁপাফুলের রং যেন ফুটে বেরোচ্ছে। মুখে একটি প্রশান্ত অথচ ভাবিত ভাব। খুব আস্তে কথা বলেন, আস্তে হাঁটেন, নরম করে তাকান। রানির মতোই নরম মোম-মোম। একটু মোটার দিকে চেহারা।

বউরানি আসতেই স্যার এ. এম বললেন, এই যে ভ্রমর, তোমাকে যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম, এই-ই সেই শশী–আর শশীর কাজিন–হ্যাঁ, তোমার নাম কী যেন?

আমি বললাম, যবন-দমন দত্ত।

বড্ড বড়োনাম। সাহেব বললেন।

তারপর বললেন, বাড়ির নাম কী?

টিকলু। বললাম আমি।

ফার্স্ট-ক্লাস। সাহেব বললেন।

তারপর বউরানির দিকে চেয়ে আমার সামনেই বললেন, পছন্দ ভ্রমর?

বউরানি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানালেন।

সাহেব বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওখানে গিয়ে পৌঁছেলেই কাজকর্ম–মানে জুতো-সেলাই থেকে চন্ডীপাঠ সব-ই একে একে শিখে নেবে। আরও অনেক লোকজন আছেন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর বললেন, ভালো করে কাজ করে আমরা বাঙালিরা যে কুঁড়ে ফাঁকিবাজ, এই অপবাদটা ঘুচাও তো দেখি সকলে মিলে।

আমি চুপ করে রইলাম।

তারপর কোকাকোলা আর মিষ্টি খেয়ে আমরা যখন উঠলাম, তখন সাহেব বললেন, আগামী শুক্রবার রাতে এখান থেকে রওনা হবে। রাত দশটা পনেরোতে গাড়ি। হাওড়া থেকে। আমিও ওই গাড়িতেই যাব। আর যা কথা হওয়ার তা ওখানেই হবে। তোমার টিকিট আমি শশীর হাতে দিয়ে দেব। মঙ্গল বুধের মধ্যেই, ক্লাবে।

তারপর বললেন, ঠিক আছে?

–হ্যাঁ স্যার।

নমস্কার করে বললাম আমি। তারপর বউরানিকে নমস্কার করলাম।

শশী বলল, চললাম স্যার।

এসো। বলেই, সাহেব ভেতরে চলে গেলেন জামাকাপড় ছাড়তে।

লিফটে শশী বলল, কেমন বুঝলি?

-কাজটা খুব ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।

শশী বলল, তোর বসকে আমি চিনি। তোর ঝামেলা বসকে নিয়ে হবে না; হবে বউরানিকে নিয়ে।

আমি চমকে উঠে বললাম, কেন একথা বলছিস?

শশী বলল, একে রাজার মেয়ে, রাজার স্ত্রী, তার ওপর কেমন মুডি-মুডি দেখলি না। ওঁর মন বুঝে চলতে পারলেই তোর চাকরি খায় কোন শালা। কিন্তু আমরা চাষাভুসো লোক; রাজা-রাজড়াদের মুড বোঝা মুশকিল।

দেখাই যাক। বললাম আমি।

শশী বলল, জয় সাঁইরাম।

ইদানীং শশী এবং মামাবাড়ির সকলে সাঁইবাবার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছে। ওর চাকরিতে উন্নতি হয়েছে, নমিতার সঙ্গে প্রেম গাঢ় হয়েছে, ওদের বাড়িতে মাসিমার ঘরে সাঁইবাবার ফোটোর ওপর বিভূতি জমেছে।

আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, জয় সাঁইরাম।

চাকরিটা এ যাত্রা টিকে গেলে সাঁইবাবার দয়াতে টিকবে–ভাবলাম আমি।

.

০২.

সবে পুব আকাশে আলোর রেখা ফুটেছে। চারদিক দেখা যায়। কিন্তু সূর্য ওঠেনি। এমন সময় মিথিলা এক্সপ্রেস ট্রেনটা স্টেশনটাতে ঢুকল।

থ্রি-টায়ারের ওপরতলা থেকে রবারের বালিশটা ফাঁপিয়ে নিয়ে, সুজনি সমেত সড়াৎ করে নেমে এলাম। তারপর সুটকেসের মধ্যে ফেঁসে-যাওয়া বালিশ ও সুজনি পুরে নিয়ে, সুটকেসটা হাতে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ালাম।

তাকিয়ে দেখি, ফার্স্টক্লাসের সামনে গন্ধমাদন পর্বত নেমেছে। বিরাট-বিরাট চ্যাপটা করে ভাঁজ করে রাখা পিচবোর্ডের প্যাকিং বক্স, টিউব লাইট, বাক্স, প্যাঁটরা, পোঁটলা-পুটলি, সাহেব, মেমসাহেব এবং আরও একটি দম্পতি।

এমন মালিকের চাকরি করে আরাম। ভিড়ের মধ্যেও এ মালিক কখনো হারিয়ে যাওয়ার নয়। লক্ষ লোকের মধ্যেও সাহেবের সাড়ে ছ-ফিট চেহারা সকলের মাথা ছাড়িয়ে থাকবে।

কুলির প্রসেশানের পেছনে পেছনে ওভারব্রিজ পেরিয়ে দেখি একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি, একটা স্কুটার-টেম্পো এবং টাঙার সারি দাঁড়িয়ে।

সাহেব একজন রোগা-সোগা কালো-কালো ভদ্রলোককে ডাকছিলেন, ভজন, ভজন বলে। বোঝা গেল, সেই ভজনবাবু মালপত্র তদারকি করে সামলে-সুমলে নিয়ে আসবেন।

সাহেবরা আগেই চলে গেলেন গাড়িতে যাওয়ার আগে ভজনবাবুর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়ে গেলেন সাহেব।

বললেন, এর নাম টিকলু। আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

স্কুটার-টেম্পো এবং টাঙাবাহিনী আগে রওনা করিয়ে দিয়ে শেষের টাঙায় আমাকে নিয়ে ভজনবাবু উঠলেন।

টাঙা ছাড়তেই বললেন, সামনের দিকে চোখ রাখবেন একটু–টাঙাগুলো মাল ছড়াতে ছড়াতে যাবে–প্রতিবারই এমন-ই হয়। আর আমরা সেগুলো কুড়োতে কুড়োতে যাব। সেজন্যেই আমাদের টাঙায় মাল বলতে আমরা শুধু দু-জনই আছি।

বলেই, পকেট থেকে নস্যির ডিবে বের করে একটিপ নস্যি নিলেন।

বললেন, বে-শাদি হয়েছে?

-আজ্ঞে না।

–তবে তো মুশকিলে ফেললেন। দেখবেন, পানুই-এর ক্যাজুয়ালটি হবেন না আবার।

–আজ্ঞে?

আমি না বুঝতে পেরে শুধোলাম।

ভজনবাবু উত্তর দিলেন না।

টাঙা একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, ভজনবাবু বললেন, জিলিপি-শিঙাড়া

খাবেন। গরম-গরম ভাজছে।

বলেই, টাঙা থেকে একলাফে নেমে গিয়ে একঠোঙা জিলিপি-শিঙাড়া নিয়ে এলেন।

আমার সামনে ধরে বললেন, খান।

বললাম, মুখ ধুইনি।

ধমক দিয়ে ভজনবাবু বললেন, থামুন তো মশাই। জীবনে কখনো কি মুখ

না ধুয়ে কিছু খাননি? যা-কিছু খেয়েছেন, সব-ই মুখ ধুয়ে? খান, খান, এমন স্বাদের জিলিপি-শিঙাড়া হয় না আর।

–ভজনবাবু আমার ইমিডিয়েট বস। কিছু কথাবার্তা বলতে হয়–তাই-ই বললাম, আপনি কি এখানে অনেকদিন?

-ইয়েস। জন্ম থেকে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন ভজনবাবু।

আমি আবার শুধোলাম, পরিবার-টরিবার এখানেই?

-ইয়েস। ঝামেলা এড়াবার জন্যে আমি ডি-অ-এস বিয়ে করেছি।

-মানে?

জিলিপি-মুখে আমি বোকার মতো শুধোলাম।

ভজনবাবু বললেন, ইয়েস, ডটার অব দ্য সয়েল। আমি সাঁওতাল মেয়ে বিয়ে করেছি। থার্ড ওয়াইফ। ফাস্টক্লাস আছি মশাই। আমার বিধবা মা আমার কাছে এসে রয়েছেন, আমার ওয়াইফ তাঁর যা সেবাযত্ন করছে তা দেখলে বামুনের মেয়ে ভিরমি খাবে।

বলেই, বললেন, আজকাল অবশ্য শহরের শিক্ষিত লোকেদের ঘরেই

এসব উঠে গেছে বরং গ্রামের লোক, উপজাতিদের মধ্যে এখনও ভালোটুকু আছে।

আমি শুধোলাম, ছেলে-পেলে?

–নান। ভবিষ্যতে মে বি।

তারপর জিলিপি খেতে খেতে শুধোলেন, আমাদের সাহেবকে কতদিন জানেন?

বললাম, পাঁচদিন আগে পাঁচ মিনিটের জন্যে প্রথম দেখা।

এ্যাই সেরেছে। বললেন, ভজনবাবু।

তারপর বললেন, কোথায় কাজ করতে এয়েছেন জানেন কি?

আজ্ঞে না। আমি বললাম।

তারপর ভয় পাওয়া গলায় বললাম, ভালো করিনি?

-মোটেই না মশায়। পাগল হয়ে যাবেন, বে-থা করেননি, এখনও খাদ্য-খাদক ভূত ভবিষ্যৎ আছে, পাগলের পাল্লায় পড়ে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবেন। এ তো একটা পাগলাগারদ। এই ভজন ভড় বলেই কোনোক্রমে টিকে রয়েছে এখানে।

ঘাবড়ে গিয়ে বললাম, কেন, উনি কি পাগল নাকি?

–সার্টেনলি ইয়েস। কোনো সন্দেহই নেই তাতে। আমি যে এখনও পাগল হইনি, তার কারণ আমার বাবা পাগল ছিলেন। আমারও পাগল হওয়ার কথা ছিল। পাগলে-পাগলে কাটাকুটি হয়ে গিয়ে আমি বেঁচে গেছি। কিন্তু আপনার বাঁচার কোনোই চান্স নেই।

টাঙাটা একটা লেভেল ক্রশিং পেরোল।

ভজনবাবু তারস্বরে চেঁচালেন, ওরে ও জংলি, সামান গিড় গিয়া।

সামনের টাঙা থেকে একটা পুটলি গড়িয়ে রেললাইনের ওপর পড়েছিল। জংলি নামক একটি খোঁড়া ছেলে খুঁড়িয়ে নেমে সেটাকে উদ্ধার করে আবার যথাস্থানে রাখল।

রেললাইনটা পেরোলে পর আমি বললাম, আচ্ছা! আমার কাজটা কী?

ভজনবাবু প্রচন্ড শক পেলেন।

বললেন, কাজটা কি এখনও জানেন না? আজব লোক মশায় আপনি।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনি কি জানেন যে,সাহেবের একটি চিড়িয়াখানা আছে। তাতে নেই, এ হেন জানোয়ার, পাখি নেই। গ্রিনহাউস আছে–তাতে রকমারি গাছগাছালি। ডেয়ারি আছে, পোলট্রি আছে। সে-

পোলট্রিতে দিনে দু-হাজার ডিম হয়। সাহেবের নিজের বাড়ির মধ্যে আবার জাপানি-বাড়ি, হাওয়াইয়ান বাড়ি, কামাচ কাটকান-বাড়ি, শান্তিনিকেতনি বাড়ি আছে। গাছে গাছে হ্যামক আছে, গাছে চড়ে জিরোবার জায়গা আছে, আফ্রিকায় চিতাবাঘেরা যেমন জিরোয়। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আপনার জামগাছে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে যেতে ইচ্ছা হবে। আর লোকজন? প্রায় জনা তিরিশ লোক কাজ-ই করে এই কুরুক্ষেত্রে। তাও একটি চিড়িয়াখানা।

আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। হাউসকিপিং ম্যানেজারের যে, চিড়িয়াখানার ম্যানেজারি করতে হবে, তা ঘুণাক্ষরেও জানা যায়নি। এ আমার কী সর্বনাশ করল শশী!

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, তাহলে তো সর্বনাশ হল!

জিলিপির ঠোঙাটা সজোরে ছুঁড়ে ফেলে ভজনবাবু বললেন, ইয়েস। সার্টেনলি। এতবড়ো। সর্বনাশ যেন কারোর-ই না হয়।

কিছুক্ষণ বাদে টাঙার প্রসেশন একটি বন্ধ লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

দেখলাম হিন্দিতে লেখা আছে চিড়িয়াখানা শনিচ্চর ঔর এতোয়ার কি দিন বন্ধ রহেগি।

ভজনবাবু টাঙা থেকে লাফিয়ে নেমে চিৎকার করতে লাগলেন, রামস্বরূপ গেট খোলো; গেট খোলো।

লম্বা-চওড়া এক গ্লুফো দারোয়ান এসে ঠেট হিন্দিতে শুধোল, গেটপাস?

ভজনবাবু বললেন, তুমহারি গুষ্টিনাশ। সাহাবকা সামান লে আয়া হ্যায়, হামকা শ্বশুরাল মে ঘুষতা হ্যায়? জলদি খোল গেট।

আমি অবাক গলায় বলাম, গেট-পাস কীসের?

-আরে গেট দিয়ে মোরগা, আণ্ডা, মায় গোরু-বাছুর অবধি হাওয়া হয়ে যাচ্ছিল, সাহেবের পেয়ারের লোকেরাই করছিল। তারপর একবার রাস্তার ষাঁড়েরা প্রসেশান করে ঢুকে পড়েছিল।

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম, কেন?

ভজনবাবু বললেন, আরে এখানে লাল লাল বিলিতি মেমসাহেব গোরু আছে কত্ত ডেয়ারিতে! তবে? বিপত্তি কি একটা? তাই সাহেব এই ব্যবস্থা করেছেন। যতবার ঢুকবে বেরুবে ততবার-ই গেটপাস। এ ব্যাটা দারোয়ান অবশ্য নতুন, এখনও ভজন ভড়ের স্ট্যাটাস সম্বন্ধে জ্ঞান হয়নি।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি তক্ষুনি মনস্থির করে ফেললাম, এই যে ঢুকলাম, আর বেরুচ্ছি না।

গেট খুলতেই, সামান নামিয়ে নেওয়া হল। ভাড়াগাড়ির ভেতরে ঢোকা নিষেধ। গেটে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলাম যে, এ একটা যে-সে জায়গা নয়। লাল মোরামের পথ চলে গেছে অনেক দূরে-ভেতরে। দু-পাশে কত যে গাছ, কত যে লতা, কত পাথরের মূর্তি, কাঠের কাজ, গাছে-গাছে বাতি ঝুলছে, পথের দু-পাশে–সবুজ বালব লাগানো আছে তাতে।

দূর থেকে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে। সামনের দিকে রঙিন টাইল বসিয়ে ফ্রেসকো করা হয়েছে।–। বাড়ির মাথায় লাল খাপরার সুন্দর ডিজাইন। সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির ছাপ চারদিকে পরিপুষ্ট।

চোখ জুড়িয়ে গেল।

আস্তে আস্তে ভেতরে এগিয়ে গেলাম।

বাড়ির কাছে আসতেই দেখি মেমসাহেব ইতিমধ্যে একপাল দেহাতি ছেলে নিয়ে পাঠশালা বসিয়েছেন। গোলাকৃতি মার্বেলের টেবিলে আমগাছের ছায়ায়–চতুর্দিকে বসার বেতের চেয়ার–তাতে নানারঙা গদি আঁটা।

মেমসাহেব বলছেন, বোলো, অ। বোলো আ। বোল্লো বাচ্চে।

পড়াশুনা এগোতে-না-এগোতেই দেখি বালতি করে একজন লোক গরম দুধ আর ডিমসেদ্ধ এনে ছেলেগুলোকে খাওয়াতে আরম্ভ করল।

তারা ডিমসেদ্ধ-ভরা মুখে গবগবে গলায় বলতে লাগল, অ, আ। ডিমের হলুদ-কুসুম লাগা দাঁত বের করে বলল, ই-ই।

এমন সময় সাহেবের গলা শোনা গেল।

বাড়ির সামনে ধাপে ধাপে সিঁড়ি উঠে গেছে। ঝোলানো টবে-টবে অর্কিড ঝুলছে। তার সামনে মিউজিক্যাল টাইম। বাজনা। হাওয়ায় দোলাদুলি করে টুংটাং শব্দ হয়। সেই বাজনাগুলো সারি করে লাগানো আছে।

সাহেব বলছেন, মধ্যের অতগুলো বাজনা কোথায় গেল?

ভজনবাবু স্মার্টলি উত্তর দিলেন, চুরি হয়ে গেছে সাহেব।

সাহেব বললেন, নাইটগার্ড কী করছিল?

ভজনবাবু বললেন, সে তো নিজেকেই নিজে ধমকে বেড়ায় সারারাত। চোরেরা তার ধমক শুনলে তো! তা ছাড়া, চুরি নাইটে হয়নি স্যার ডে-তে হয়েছে। কিন্তু চোর ধরা পড়েছে। রোহিণী বস্তির দুটো ছেলে। তাদের ধরে রামস্বরূপ গাছে বেঁধে রেখেছে। কাল-ই বিকেলে ধরা পড়েছে।

সাহেব বললেন, কখন থেকে বেঁধে রেখেছে?

কাল বিকেল থেকে।

কী অন্যায়। কী অন্যায়। সাহেব বললেন।

তারপর বারান্দার সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, এখুনি তাদের নিয়ে এসো, দুধ খাওয়াও। আহা! বেচারিদের এমন করে কষ্ট দেয়?

সাহেবের গলার স্বরে চুরির দায়ে ধরা-পড়া বজ্রসেনের প্রতি শ্যামার যে দরদ, সেই দরদ ই যেন ঝরে পড়ল।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়েছিলাম।

সাহেব ডাকলেন, মেহবুব, মেহবুব।

একটি অল্পবয়সি ছেলে আমার চেয়ে অনেক ভালো পোশাক পরে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। ছেলেটি খুব স্মার্ট। পরে জেনেছিলাম, সাহেবের খাস বেয়ারা।

সাহেব বললেন, মেহবুব, চোররা কোথায়? নিয়ে এসো।

পরক্ষণেই আমাকে বললেন, টিকলু যাও তো ভাইডি, মেহবুবের সঙ্গে নিয়ে চোরদের নিয়ে এসো।

মেহবুবের পেছন-পেছন গিয়ে দেখি ইউক্যালিপটাস গাছের গুঁড়িতে বাঁধা দুটি বছর বারো- তেরোর ছেলে মাথা নুইয়ে আধ-ঘুমন্ত অবস্থায় লেপটে

আছে গাছের সঙ্গে।

দড়ি খুলে আমি ও মেহবুব যখন সাহেবের কাছে তাদের নিয়ে এলাম, তখন সাহেবের রাগ কে দেখে? চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করলেন উনি।

বললেন, এক্ষুনি এদের দুধ খাওয়াও।

তারপর মেমসাহেবকে বললেন, ভ্রমর, এদের একটু ওমলেট আর টোস্ট করে দিতে বলো রামকে।

মেমসাহেব সাহেবের মুখের দিকে একবার অপাঙ্গে চেয়ে, পড়ুয়াদের ছেড়ে উঠে গেলেন ভেতরে।

দুধ এবং খাবার খাইয়ে চোরদের গায়ে জোর করিয়ে নেওয়ার পর সাহেব বললেন, ভাই, কাজটা কি তোমরা ভালো করলে? চুরিই যদি করলে তো সবগুলো বাজনাই চুরি করলে না কেন? অর্ধেক নিয়ে গেলে, তোমাদের বাড়িতেও ভালো বাজবে না, আমার বাড়িতেও তাই। তার চেয়ে বাকিগুলোও খুলে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। নয়তো যেগুলো নিয়ে গেছ, সেগুলো ফেরত দিয়ে দাও আমাকে। বাজনা বাজা নিয়ে কথা–তোমাদের ঘরেই বাজুক, কী আমার ঘরেই বাজুক, ভালো করে বাজবে তো?

চোরেদের মধ্যে একটি ছেলে পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটতে-খুঁটতে বলল, বাজনা শোনার জন্যে আমরা চুরি করিনি–টাকার জন্যে করেছিলাম।

গাঁয়ের এক দোকানে দশ টাকা দিয়ে ওগুলোবেচে দিয়েছি।

–টাকা দিয়ে কী করলে?

-খেলাম সাহেব। বাড়িতে বাবা-মায়ের বেমার। নোকরি-ধান্দা নেই। তাই চুরি করেছিলাম।

সাহেব ডাকলেন, ভজন।

ভজনবাবু এগিয়ে এলেন।

সাহেব বললেন, এক্ষুনি পনেরা টাকা দিয়ে কাউকে ওদের সঙ্গে পাঠাও। আমার বাজনাগুলোর কাছে বিক্রি করেছে ওরা, তার কাছ থেকে আবার কিনে নিয়ে আসুক। আর এ ছেলে দুটোর কাজের দরকার–আজ থেকে এদের চাকরির বন্দোবস্ত করো।

চাকরি খালি নেই। ভজনবাবু বললেন।

–খালি করো।

কাকে ছাড়াব?

-আহা ছাড়াবে কেন?

-তাহলে ওদের কোন কাজের জন্যে বহাল করব?

কোনো কাজ নেই?

–না সাহেব।

-তাহলে ওরা আমার লনে জল দেবে। গরম পড়ে গেল–এখন জল দেওয়ার লোকের দরকার। মালিরা ফুলগাছ দেখাশোনা করেই সময় পায় না–এরা লন দেখাশোনা করবে। দিনমজুর হিসেবে এরা আজ থেকে বহাল হল।

ভজনবাবু বললেন, আচ্ছা স্যার।

সাহেব এই বন্দোবস্ত করে, বাড়ির ভেতরে গেলেন।

ভজনবাবু বললেন, টিকলুবাবু, আপনি এদের সঙ্গে যান। নিজকানে সব শুনলেন তো! এই নিন পনেরো টাকা।

বলেই, বুকপকেট থেকে পনেরো টাকা বের করে আমায় দিলেন।

তারপর গলা নামিয়ে বললেন, কেমন বুঝছেন? চোরের এমন শাস্তি কোথাও শুনেছেন, না পড়েছেন?

আমি জবাব না দিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে চললাম।

এই হল আমার নতুন চাকরির প্রথম অফিসিয়াল অ্যাসাইনমেন্ট।

টাঁড় পেরিয়ে ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে ছেলে দুটো বলল, নেহাতই পেটের দায়ে চুরি করেছি। নইলে এ পাগলাসাহেবের বাড়ির কোনো জিনিস বাইরে পড়ে থাকলেও আমরা কেউ নিই না। পাগলা সাহেব মানুষ নয়; দেবতা।

মানুষ যে নন মনে মনে, আমারও তেমন একটা সন্দেহ হচ্ছিল। তবে ভূত-প্রেত না দেবতা সে-বিষয়ে এখনও নিঃসংশয় নই।

ভাগ্যি ভালো, বাজনা যার কাছে বিক্রি করেছিল, সে পেতল ভেবে কিনেছিল। পনেরো টাকা পেয়ে সে খুশি হয়েই সেগুলো দিয়ে দিল।

ছেলে দুটোকে নিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর ফিরে আসতেই দেখি সাহেব একটা লালরঙা স্যুট-প্যান্ট পরা বাঁদরের হাত ধরে বাড়ির সামনের বাগানে পায়চারি করছেন আর তার সঙ্গে অনর্গল গল্প করছেন।

আমি ব্যাপার দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ সাহেব আমাকে দেখেই মেহবুবের ওপর রেগে উঠে হুংকার দিয়ে বললেন, এ্যাই! টিকলুবাবুকে কোয়ার্টার দেখিয়ে দাও, নাস্তা-পানির বন্দোবস্ত করো।

তারপর আমাকে বললেন, যাও টিকলু, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে-দেয়ে ঠিক ন-টার সময় এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

মেহবুবের সঙ্গে আমার কোয়ার্টারে যাওয়ার সময় পথে ভজনবাবুর সঙ্গে দেখা। একটা ছোট্ট টবে-লাগানো অর্কিডকে প্রেমিকার মতো বুকে আঁকড়ে ধরে কোথায় যেন চলেছেন।

ভজনবাবু বললেন, বুদ্ধকে দেখেছেন?

-কে বুদ্ধ?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

-ওই যে বাঁদরটা। ওর বউয়ের নাম ছিল গোপা। গোপা মারা যাওয়ার পর বউয়ের শোকে ওর টি-বি হয়েছে। তাই সাহেব ওকে নিজে অতযত্ন করেন।

আমি বললাম, কিন্তু বাঁদরের গায়ে স্যুট কেন? এ কি সাহেবের শখ?

ভজনবাবু আমার দিকে এমন মুখ করে তাকালেন যেন, আমি একেবারেই অর্বাচীন।

বললেন, কখনো কোনো বাঁদরকে দন্ডায়মান অবস্থায় দেখেছেন? ওদের যন্ত্রপাতি তো সব মানুষের মতো। বড়োঅশ্লীল দেখায়। স্যুটটা শখে নয়,

প্রয়োজনে। আমরা তো চিরদিন বাঁদরদের চার পায়ে বুকে হাঁটতেই দেখেছি-বাঁদর মানুষের হাতে-হাত রেখে হাঁটলে এইসব ডিফিকাল্টি হয়।

তারপর একটু থেমে বললেন, এখানে মেমসাহেব থাকেন, সাহেবের গেস্টদের মধ্যে কত মহিলা থাকেন–তাদের সামনে বাঁদরকে অমন বেলেল্লাপনা করে ঝুলঝুল করে ঘুরতে দেওয়া যায় না।

বাঁদরকে স্যুট পরাবার অকাট্য যুক্তিটা মানতেই হল।

মেহবুব আমার কোয়ার্টারে এনে আমাকে পৌঁছে দিল।

ছিমছাম, দুটো ঘর, বাড়ির সামনে পেঁপে গাছ কয়েকটা, চারধারে বড়ো বড়ো গাছ নানারকম পাখি ডাকছে। বেশ পছন্দ হল কোয়ার্টার।

আমি বললাম, রান্না-বান্না করার জায়গা নেই?

মেহবুব বলল, সাহেব তো বলেছেন আপনি বাড়িতেই খাবেন চারবেলা। রাম বাবুর্চি আছে, অশোক আছে-সাহেব মেমসাহেবদের জন্যে যা রান্না হয় আপনিও তাই-ই খাবেন। আমি বেয়ারা। সাহেবের খাস-বেয়ারা।

বুঝলাম, কমিশনারের পি-এর মতো মেহবুবকেও একটু খাতিরে রাখতে হবে। নইলে এই পাগলাসাহেবের কাছে কখন চাকরি নট হয়ে যায় কে জানে!

বাথরুমে গিয়ে, হাত-মুখ ধুয়ে, জামা-কাপড় ছেড়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিলাম, রাতে ট্রেনে ভালো করে ঘুম হয়নি, এমন সময় একটা কালো-কালো পনেরো-ষোলো বছরের ছেলে এসে ডাকল আমাকে। বলল, নাস্তা লাগা দিয়া।

তারপর বলল, রোজ সকালে আপনাকে এখানে বেড-টি দিয়ে যাব। সকাল নটায় বাড়িতে এসে বাবুর্চিখানায় নাস্তা করে নেবেন, দুটোয় দুপুরের খাওয়া, বিকেলে পাঁচটায় চা, রাত দশটায় রাতের খাওয়া।

তারপর বলল, চলুন।

আমি শুধোলাম, তোমার নাম কী?

-আমার নাম অশোক।

বেশ মিষ্টি কাটা-কাটা চোখ-মুখ।

শুধোলাম, তুমি কি সাঁওতালি?

-না আমি বিহারি।

–কী যেন বললে, তোমার নাম? অশোক?

-না, আমার আসল নাম আসোয়া, রানিমা আমার নাম দিয়েছেন অশোক।

এখানে সকলের নাম রানিমাই দিয়েছেন। আপনার নামও দেবেন।

-মানে? আমার নাম আমার থাকবে না?

অশোক হাসল মিষ্টি করে। বলল, বোধ হয় না। সাহেব ঠিক-ই আপনার নামেই ডাকবেন। কিন্তু মেমসাহেব আড়ালে অন্য নামে ডাকবেন।

আমি নার্ভাস হয়ে গিয়ে বললাম, ভজনবাবুর কী নাম?

দাঁড়কাক। অশোক বলল।

অ্যাঁ? আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম।

আর আমার নামও দিয়ে ফেলেছেন নাকি?

অশোক হাসল। বলল, হ্যাঁ।

কী? কী? আমি উদগ্রীব গলায় শুধোলাম।

অশোক বলল, পাতিকাক।

–কেন? পাতিকাক কেন?

–দাঁড়কাকের অ্যাসিস্ট্যান্ট বলে।

অশোক বলল।

–আহা! বউদি আমার এমন হেনস্থা জানলে হয়তো আমাকে এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে চলে। আসতে বলত কলকাতায়। কিন্তু এসে-অবধি এই চিড়িয়াখানার ব্যাপার-স্যাপার এতই ইন্টারেস্টিং লাগছে যে, এই আমার তিরিশ বছরের জীবনে এই-ই প্রথমবার মনে হচ্ছে যে, চাকরিতে এবার আমার মন লেগেছে। আমি হলাম গিয়ে ভার্সেটাইল জিনিয়াস-কোনো এক-ই কাজ কি আমার ভালো লাগে? এইরকম বিভিন্নমুখী কাজ তো আমার-ই জন্যে!

নাস্তা করা হলে সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বললেন, চলো টিকলু, তোমাকে তোমার কাজের জায়গা ঘুরিয়ে দেখাই।

সাহেবের সঙ্গে যে দম্পতি এসেছিলেন, তাঁরা বাঙালি নন। কোথাকার মহারাজ আর মহারানি। ভদ্রমহিলা দেখতে পাঞ্জাবি-পাঞ্জাবি। ভদ্রলোককে সাহেব গ্রেগরি বলে ডাকছিলেন; আর ভদ্রমহিলাকে পম্পা।

গ্রেগরি সাহেব আমাদের সঙ্গে চললেন।

বললেন, লেট মি হ্যাভ আ স্ট্রল উইথ ইউ।

সাহেব বললেন, কাম এলং।

প্রথমেই আমরা বাড়ির সামনেই একটা জায়গায় এলাম। ওই পাথুরে জমিতে ডিনামাইট দিয়ে পুকুর খোঁড়া হয়েছে ঘোড়ার খুরের আকৃতির। তার ওপর হ্যাঙ্গিং ব্রিজ। অর্কিডে অর্কিডে ও নানা লতা ও ঝোপে ছেয়ে রয়েছে জায়গাটা। সেই জায়গাটার ওপরে, জলের ওপরে বাঁশ দিয়ে তৈরি একটা জাপানি কায়দার বিরাট ঘর। কাঠের টুকরো রং করে দু পাশের পর্দা বানানো হয়েছে। বাঁশের গায়ে হলুদ রং করা। ঘরটাতে উঠতে হলে বাঁশের মজবুত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ঘরের মধ্যে মোটা-মোটা ডানলপিলো মাইসোরিয়ান মিহি মাদুর দিয়ে ঢাকা। জাপানিজ কায়দায় বাঁশের মেঝে।

সাহেব বললেন, জাপানে এইরকম মেঝেকে বলে টাটামি-ফ্লোর। এটা হচ্ছে জাপানিজ টি-হাউস। তবে এখানে চা খাওয়া হয় না, আমার গেস্টরা দুপুরে বিয়ার খান। গরমের দিনে রাতে গল্প-টল্প করেন। হানি-মুনিং কাপল এলে রাতে শোন।

দেখলাম, দু-দিকে, বিশেষ করে, পশ্চিমের দিকে চিক ফেলা আছে। সুন্দর রং করা। যাতে পশ্চিমি লু না ঢুকতে পারে ঘরে। দেওয়াল থেকে টেবিলফ্যানও ঝুলছে দু-পাশে। আলোও আছে। কোনোকিছুর-ই ত্রুটি নেই।

সাহেব বললেন, এই ঘর ভালো করে যত্ন করে রাখবে। বাঁশের মিস্ত্রি এখানে আছে। পার্মানেন্ট স্টাফ। যখন যা মেরামতের দরকার তাকে দিয়ে

করিয়ে নেবে। তার নাম নীলমোহন।

জাপানিজ টি-হাউসের পাশেই একটা ম্যাগনোলিয়া গ্ল্যাণ্ডিফোরা গাছের গুঁড়ির চারদিকে লাগানো সাদা রট-আয়রনের গ্লাসটপের টেবিল, রট-আয়রনের চেয়ার। লেখাপড়ার করার জন্যে।

বাগানের মাঝে মাঝেই গাছগাছালির তলায় নানান বসার জায়গা–নানা ধাঁচের, নানা মাপের, নানা রঙের। গাছে-গাছে হ্যামক ঝুলছে, হ্যামকের সঙ্গে বেঁধে-রাখা বালিশ, যাতে হাওয়ায় উড়ে না পড়ে যায়।

বাঁদিকে আরও কিছুদূর গিয়ে সাহেবের লাইব্রেরি তৈরি হচ্ছে। একটা বড়ো জামগাছের একটা ডালও না কেটে-তার নীচে দোতলা বাড়ি। ছাদটা পুরো কাঁচের। এখনও শেষ হয়নি।

সাহেব বললেন, কার্পেন্টার, রাজমিস্ত্রি সব এখানে পার্মানেন্ট স্টাফ–তুমি শুধু একটু দেখাশোনা করবে–ভজনবাবু একা সময় পান না সব দেখাশোনা করবার। তা ছাড়া চিড়িয়াখানাটা তাঁর-ই দায়িত্বে।

লাইব্রেরি ছাড়িয়ে আর একটু এগোলেই, বাঁদিকে নীল রঙা সুইমিং পুল। সুইমিং পুলের পাশেই একটা মাটির ঘর। তার বারান্দায় বসে একজন দর্জি পা-মেশিন চালিয়ে ঝাঁই-ঝাঁই করে গদির নানা রঙা নতুন কুশানের কভার সেলাই করে চলেছে। এবং ছিঁড়ে-যাওয়া কুশানেরও কভার মেরামতি করছে।

সাহেব বললেন, যখন-ই যে কুশান-এর কভার ছিঁড়ে যাবে, একে বলবে, এ খুলে সেলাই করে দেবে। যেখানে নতুন বানাতে হবে তাও একেই বলবে। এর নাম হামিদ।

আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একটা বিরাট গভীর কুয়ো। তার ওপর লোহার জাল বিছানো। সেই কুয়োর ওপরে বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকো বেয়ে গিয়ে একটা মাটির বাড়ি। সাঁওতালদের বাড়ির মতো দেখতে–কিন্তু দোতলা–মধ্যে স্যানিটারি বাথরুম-টাথরুম সব আছে। বাড়িটা একটা বড়ো তালগাছকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ি তৈরি হয়েছে কাঠের তক্তা দিয়ে তালগাছটিকে ঘিরে ঘিরে।

এক-একটা জিনিস দেখছি, আর এই মানুষটার, আমরা নতুন মালিকের শখ, রুচি, ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমার সেজোকাকা, যিনি ইন্টারভিউর জন্যে আমাকে অপয়া পুরোনো স্যুট দিয়েছিলেন, এবার আমেরিকায় ডিজনিল্যাণ্ডে গেছিলেন–ফিরে এসে গল্প করেছিলেন যে, মানুষের পয়সা, বিজ্ঞান আর কল্পনা এবং পরিশ্রম একসঙ্গে মিললে যে, কী অসাধ্য সাধন করা যায়, তা নাকি ডিজনিল্যাণ্ড-এ না গেলে অনুমান করা মুশকিল। আমি কিন্তু আমার সাহেবের এই চিড়িয়াখানায় এসে ডিজনিল্যাণ্ডের আস্বাদ পেলাম। মানুষটার প্রতি ভক্তি আমার শতগুণে বেড়ে গেল।

হঠাৎ সাহেব আমার দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তুমি ভাবছ, আমার

পয়সা আছে, তাই বাপ-ঠাকুরদার উপার্জন করা পয়সায় আমি ফুটানি করছি। তা কিন্তু নয়। পরে তোমাকে আমার ডেয়ারি, পোলট্রি, এগ্রিকালচারাল ফার্ম সব সময়মতো ঘুরে দেখাব। অত্যন্ত কমপিটেন্ট সব লোক নিয়ে পার্টনারশিপ করেছি তাঁদের সঙ্গে। তাঁরা প্রত্যেকে নিজের নিজের ক্ষেত্রে খুব দক্ষ ও কৃতী লোক। পুরো ব্যাপারটার সাকসেসের মূলে তাঁদের কন্ট্রিবিউশন-ই অনেকখানি। শতকরা ষাটভাগ প্রফিট তাঁরা পান-আমি পাই চল্লিশ ভাগ। ডেয়ারির আলাদা পার্টনার, পোলট্রির আলাদা পার্টনার, এগ্রিকালচারের আলাদা পার্টনার। আমি নিজে যদিও অ্যাকাউন্টেন্ট, তবু নিজের হিসেব আমি নিজে রাখি না তাতে ভুলভ্রান্তি হতে পারে। সবচেয়ে বড়কথা মানুষ নিজের চিকিৎসা নিজে করলে বায়াসড় হয়ে যায়। তাই কলকাতার এক প্রসিদ্ধ অডিটর ফার্ম থেকে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টটেন্ট এসে প্রতি উইক-এণ্ডে আমার সমস্তকিছুর অ্যাকাউন্টস চেক করে যান। উইকলি ট্রায়াল-ব্যালান্স ও প্রফিট-অ্যাণ্ড-লস অ্যাকাউন্ট বানানো হয়। কোথায় কত লাভ হচ্ছে, কী হচ্ছে না, তা ধরা পড়ে। আমার পার্টনারেরা সকলেই দেড় দু-হাজার টাকা মাসে ড্রইং করেন প্রফিটের এগেইনস্টে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, বুঝলে টিকলু, সব-ই নিজে খাব, অন্য কাউকে কিছু দেব না এবং সব-ই একাই করতে পারব এই ভুল ধারণার জন্যেই আমাদের কিছু হয় না।

আমি বললাম, স্যার, কতদিন আগে আপনি এসব আরম্ভ করেছিলেন?

স্যার এ এম বললেন, তুমি আমাকে অংশুদা বলেই ডেকো। স্যার স্যার কোরো না।

তারপর বললেন, আজ থেকে ন-বছর আগে আরম্ভ করেছিলাম। তখন আমার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ।

কথাটা শুনে আমার থুথু ফেলে মরতে ইচ্ছে করল। মানে আজ আমার যে বয়স, প্রায় সে-বয়সে এই মানুষটা একটা এতবড়ো প্রোজেক্ট ভিজুয়ালাইজ করে, ভেবে, নিজে হাতে সব করেছেন। বড়োলোকের শখ হিসেবে নয়, অ্যামেচারিশভাবে নয়, একেবারে প্রফেশনাল কায়দায়। তার ফল : আজ অতলোকের চাকরি হয়েছে এখানে, এতকিছু উৎপাদন হচ্ছে, পাথুরে মাটিতে বছরে দুটো করে ফসল ফলছে।

সাহেব বললেন, তিনটে ক্রপ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু মাটি তো নয় যেন পাথর; কিছুতেই করতে পারছি না। এই পুরো ব্যাপারটা আমি কো-অপারেটিভ বেসিসে ডেভালাপ করছি সত্যিকারের কালেকটিভ প্রচেষ্টা– বুঝেছ টিকলু। আমি দেখিয়ে দেব যে, কাজ করার ইচ্ছা থাকলে করা যায়, অসুবিধে, পাথুরে মাটি, জলকষ্ট, এসব কোনো বাধাই নয়।

তারপর একটু থেমে বললেন, জানো ভাইডি, একবার ইজরায়েলে গেছিলাম, দেখে এলাম। ওরা মরুভূমিতে ফসল ফলাচ্ছে। আমাদের

এতবড়ো দেশ, এত সুন্দর দেশ, আমরা সকলে মিলে যদি মাথা লাগাতাম, হাত লাগাতাম, তবে এদেশ নিয়ে আমরা কীই-না করতে পারতাম!

আমার নতুন মালিকের কথা শুনতে শুনতে আমার ইচ্ছে করল তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। মনে মনে বললাম, শশী! তোর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। এখানে আমি বিনি-মায়নাতেও কাজ করতে পারি। আমার তিরিশ বছরের জীবনে আমি এমন একটা মানুষের মতো মানুষ দেখিনি। আমার বন্ধ্যা, অসফল ভ্যাগাবণ্ড কালো মেঘাচ্ছন্ন জীবনে এই কাজ-ই যেন প্রথম একটা রুপোলি আলোর রেখা। হঠাৎ করে এতদিন বাদে, যৌবন প্রায় শেষ করে এনে বুঝলাম যে, অন্য কেউই কারও জন্যে কিছু করতে পারে না। একজন মানুষ নিজে, সে যদি মানুষের মতো মানুষ হয়, তবে শুধু তার নিজের জন্যেই নয়, নিজের জন্যে করেও, আরও দশজনের বোঝা ও দায়িত্ব সে হাসিমুখে বইতে পারে। ভাবছিলাম, অনেক নোটবই পড়ে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা পাশ করেছি, মরা পাঁঠার গায়ে কর্পোরেশনের ছাপের মতো ইউনিভার্সিটির ছাপ পেয়ে ভেবেছি, কত কীই-না শিখলাম, জানলাম। কেন জানি না, আজ আমার হঠাৎ মনে হল, আজ যা শিখলাম, বুঝলাম, তেমন শেখা, বোঝা বা জানা এতদিনে কখনো জানিনি। আমার বুকের মধ্যে কী যেন একটা অপ্রকাশ্য, অনামা অনুপ্রেরণার অনুরণন শুনতে পেলাম, রক্তের মধ্যে নদীর ঢেউয়ের মতো হঠাৎ ছলাৎ ছলাৎ করে বাজছিল।

সাহেব বললেন, ডেয়ারি, পোলট্রি বা চিড়িয়াখানা নিয়ে তোমার দায়িত্ব বা মাথাব্যথা নেই –তুমি আমার এই বাড়িঘরগুলো ঠিক করে রাখবে। অতিথিদের স্টেশনে গিয়ে রিসিভ করবে, স্টেশনে তুলে দিয়ে আসবে, কোনোরকমের খাতির-যত্নর কমতি না হয় দেখবে। হুইস্কি ফুরিয়ে গেলে, বিয়ার ফুরিয়ে গেলে আমাকে জানাবে। আমার স্টোররুমের চাবি আজ থেকে তোমার হাতে। আমি নিজে থাকলে সব যেমনটি চলে, আমি এখানে না থাকলেও আমার অবর্তমানে সবকিছু ঠিক তেমনটিই চালিয়ো। এই তোমার কাজ। তা ছাড়া তোমার কাছে আমার কিছুই চাইবার নেই।

তারপর একটু থেমে বললেন, এ কাজ তোমার পছন্দ হয়েছে তো? আমাকে, বউরানিকে, পছন্দ হয়েছে তো? কারণ আমাদের পছন্দ না হলে, তুমি কাজ করে আনন্দ পাবে না।

আমি অনেকক্ষণ সাহেবের মুখের দিকে মুখ উঁচু করে চেয়ে রইলাম।

তারপর আস্তে বললাম, খু-উ-ব।

সব দেখানো হয়ে গেলে সাহেব আমাকে বউরানির জিম্মায় দিয়ে অফিসে চলে গেলেন। রীতিমতো অফিস আছে এখানে। টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ক্লার্ক সব নিয়মমাফিক কাজ করছে। এখন সাহেব লাঞ্চ অবধি অফিসে বসেই কাজ করবেন। তারপর বিকেলে পোলট্রি, ডেয়ারি ও এগ্রিকালচারাল ফার্ম দেখতে বেরোবেন।

সাহেব চলে গেলেন।

বউরানি ছায়াঢাকা বারান্দায় বসে কী যেন লেখাপড়া করছিলেন।

বললেন, প্রথম দিন-ই বেশি রোদ লাগিয়ো না, আগুনে পুড়ে যাবে, লু-ও লাগতে পারে। চা খাবে নাকি এককাপ?

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই মেহবুব ট্রেতে বসিয়ে টি-পটে করে চা নিয়ে এল।

বউরানি নিজে হাতে চা বানিয়ে দিলেন।

চা খেতে খেতে বউরানি বললেন, চলো, চা খেয়ে নিয়ে ঘরগেরস্থালি তোমাকে বুঝিয়ে দিই।

আমি বললাম, তার আগে আপনাকে বলি, আপনার দেওয়া নামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

কী নাম?

বউরানি সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন।

আমি বললাম, পাতিকাক।

বউরানির যে-ধরনের সেন্স অব হিউমার, তা বোঝা সাধারণ লোকের কর্ম নয়। নিজে অত্যন্ত রসিক হলে তবেই বউরানির ফন্তুধারার মতো অন্তঃসলিলা রসবোধের হদিশ পাওয়া যায়।

এমন সময় ভেতর থেকে চান-টান সেরে সাহেবের গেস্ট–মহারানি এলেন। একটা ফিকে হলুদ-রঙা বেল-বটস পরেছেন। ওপরে হালকা সবুজ পাঞ্জাবি। দারুণ ভালো ফিগার, খুব বুদ্ধিমতী, সুশ্রী চেহারা।

উঠে দাঁড়ালাম।

বউরানি হাসলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, বিশ্বাসঘাতককে খুঁজে বের করতে হবে।

বউরানি বললেন, পম্পা, চা খাবে এককাপ?

-নো, থ্যাঙ্ক ইউ।

বলেই, চুল-ভরা কাঁধ ঝাঁকিয়ে মহারানিকে ধন্যবাদ জানালেন।

তারপর আমাকে বসতে বললেন।

ভদ্রমহিলা খুব ছটফটে স্বভাবের। একটু পরেই বললেন, হোয়ারস আওয়ার হাজব্যাণ্ডস গান? লেট মি গো অ্যাণ্ড হ্যাভ আ লুক।

বলেই, মহারানি দুড়দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়ে বাগানে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বউরানি অপলকে অপস্রিয়মাণ মহারানির দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর অস্ফুটে বললেন, খুনি।

মানে? আমি আঁতকে উঠে বললাম।

বউরানি বললেন, আমাকে একবার প্রায় খুন-ই করে ফেলেছিল একটু হলে।

আমি উত্তেজিত বোধ করলাম। রাজা-মহারাজাদের ব্যাপার খুন-খারাবি হলেই হল আর কী? কিন্তু আর ঔৎসুক্য দেখানো ঠিক কি না বুঝলাম না।

চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে বউরানি নিজেই বললেন, তবে শোনো সে-গল্প।

এমন সময় বউরানির পাঠশালার এক পোড়ো এসে অন্য পোডড়াদের বিরুদ্ধে নালিশ জানাল–তারা তাকে মেরেছে, তার শ্লেট ভেঙে দিয়েছে, তার পেনসিল কেড়ে নিয়েছে।

বউরানি মেহবুবকে সরজমিনে তদন্ত করতে পাঠিয়ে বললেন, সে প্রায়

বছর পাঁচেক আগেকার কথা। আমার দু-ছেলে জানো তো? বড়ছেলের বয়স একুশ। সে লানডান স্কুল অফ ইকনমিক্সে পড়ে লানডানে-আর ছোটোছেলের বয়স, এগারো–সে পড়ে আজমীরের পাবলিক স্কুলে। আমার বড়োছেলে তখন পরীক্ষার পর এখানে এসে রয়েছে। তোমার দাদা তো তাকে একটা ঘোড়া কিনে দিয়েছেন। ঘোড়া সহিস সব-ই আছে। সে তো ঘোড়া দাপিয়ে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায় পাঁচ-দশ মাইল। এমনি সময়, গ্রেগরি আর পম্পা এল এখানে বেড়াতে।

তারপর একটু থেমে বললেন, দেখতেই পাচ্ছ আমার শরীরে মজ্জার চেয়ে মেদ একটু বেশি। বরাবরই বেশি। পম্পা গলফ খেলে, রাইডিং করে, ঘোড়া দেখে পম্পা তো খোঁড়া সাজল। দিনরাত ঘোড় চেপে বেড়ায়। দু-দিন পর চলে যাওয়ার সময় আমায় বিশেষ করে বলে গেল যে, তুমি রাইডিং কোরো, নির্ঘাত রোগা হয়ে যাবে। বুঝলে টিকলু...

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, পাতিকাক।

বউরানি বললেন, ওই হল। পম্পা চলে যাওয়ার পর আমি ছেলেকে বললাম, হ্যাঁরে, তোর ঘোড়াটা একটু দিবি। আমি রোগা হতাম!

ছেলে বলল, নিশ্চয়ই দেব মা। ঘোড়া চড়ে দ্যাখো। খুব সোজা চড়া। সহিস তোমাকে শিখিয়ে দেবে।

ইতিমধ্যে তোমার সাহেবের দু-জন গেস্ট এসে হাজির। একটু যে,

নিরিবিলিতে ঘোড়া চাপব বা কিছু করব, তা এ-বাড়িতে হওয়ার উপায় নেই। একদিন সকালে সহিস তো ঘোড়াকে সাজিয়ে-টাজিয়ে এনে সিঁড়ির সামনে দাঁড় করাল। ভেবেছিলাম, সে-সময়ে গেস্টরা ঘরের ভেতরে থাকবেন। সে-সময় তাঁরা স্নানও করতে পারতেন, ঘরে বসে দাড়িও কামাতে পারতেন, তা না, তাঁরা চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসলেন। বসে, দাঁড়িয়ে-থাকা ঘোড়াটির দিকে আগ্রহের চোখে চেয়ে রইলেন। কিন্তু, তখন আমি রোগা হব বলে বদ্ধপরিকর। ছোটোবেলায় ঠাকুরের বাণী পড়েছিলুম, লজ্জা মান ভয়–তিন থাকতে নয়। অতএব ঘোড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। কিন্তু উঠি কী করে? ছেলে ও সহিস দু-ধারে দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়। আমার ঘোড়ার প্রতি যত না মনোযোগ ছিল তাদের; আমার প্রতি মনোযোগ ছিল তার চেয়েও বেশি।

আমি বললুম ছেলেকে, একটা চেয়ার আন তো বাবা, উঠি কী করে?

ছেলে একটা চেয়ার নিয়ে এল।

চেয়ারে উঠেও দেখি পা পাই না। তখন তাকে বললুম, একটা পিঁড়ে নিয়ে আয়। ছেলে দৌড়ে বাবুর্চিখানা থেকে পিঁড়ে নিয়ে এল।

সেই চেয়ারের ওপর পিঁড়ে রেখে, অনেক কষ্টে তো ঘোড়ার ওপর চেপে বসলাম।

কিন্তু আমি যেই তার পিঠে বসলাম, ঘোড়া সেই সটান বসে পড়ল। চার-

পা মুড়ে।

ছেলে ও সহিস হাঁ-হাঁ করে উঠল।

পাছে আমি আমার পাখির মতো হালকা শরীরের কারণে লজ্জা পাই, তাই সহিস সঙ্গে সঙ্গে বলল, মেমসাব ইয়ে তো পাঁচ-পাঁচ মন সওয়ারি ইতনি নানসে লে লেতা, আপ তো পাঁচ মন নেহি হ্যায়, আপকো জরুর উঠানে শেকেগা। ভেবে দ্যাখো, বারান্দায় বসা, গেস্টদের সামনে কী হেনস্থা আমার!

তারপর সহিস সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আপ জেরা লাগাম খিঁচিয়ে, ঘোড়া বিলকুল খাড়া হো যায়গা।

ঠাকুরের নাম স্মরণ করেই যেই-না লাগাম টেনেছি, সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া উঠে তো দাঁড়াল, কিন্তু দাঁড়িয়ে খ্যামা দিল না। সামনের পা-দুটো সটান শূন্যে তুলে দিয়ে চিহি চিহি রবে প্রবল প্রতিবাদ করে পেছনের দু-পায়ে ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তারপর? আমি উত্তেজিত হয়ে শুধোলাম।

বউরানি বললেন, তারপর আর কী? ঘোড়াও স্ট্রেট লাইন হয়ে গেল আর আমিও অতউঁচু ওয়েলার ঘোড়ার ল্যাজ গড়িয়ে স্ট্রেট পপাতঃ ধরণিতলে।

ব্যাপারটা পুরো হৃদয়ংগম করার আগেই বউরানি বললেন, বুঝেছ, শাড়ি পরেছিলাম আমি। এমন পড়া পড়লুম যে, কী বলব।

তারপর একটু থেমে বললেন, কিন্তু সেই মেদ, যে মেদ ঝরাবার জন্য ঘোড়ায় চড়তে গেছিলুম, সেই মেদ-ই শেষপর্যন্ত বাঁচাল আমায়। আমার শরীরে মেদ না থাকলে সেদিন আমার হাড়গোড় ভেঙে চুরচুর হয়ে যেত।

একটু থেমে বউরানি বললেন, সেই রোগা হওয়ার প্রথম ও শেষ চেষ্টা।

এই গল্প শেষ হওয়ার পর আমার ওপর গল্পের প্রতিক্রিয়া কী তা না দেখেই বউরানি বললেন, চলো, বাড়িটা তোমাকে ঘুরে দেখাই। আমি আর তোমার দাদার অনুপস্থিতিতে অনেক অতিথি যাবেন-আসবেন, তাঁদের যেন কোনোরকম অসুবিধা না হয়।

একতলায় অনেকগুলো ঘর। দুটো এয়ার-কণ্ডিশানড। অন্যগুলো গুলমার্গ এয়ারকুলার লাগানো। নীচে দু-টি বাথরুম। বাথরুমে ফ্লোর লেভেলের নীচে বাথটাব-কমোড, মায় বিদে পর্যন্ত। আগে আমাদের দেশে বিদে তৈরি হত। আজকাল হচ্ছে।

বাবুর্চিখানা। চাকর-বেয়ারাদের থাকার ঘর–দু-দুটো ফ্রিজ, স্টোর।

বউরানি স্টোররুম খুলে দেখালেন, বিলিতি হুইস্কি, নানারকম দেশি-বিদেশি মদ, সিগার, সিগারেট ও আরও নানারকম জিনিস ভরতি।

ফ্রিজের মধ্যে চিজ, মাখন, ডিম, হ্যাম, সসেজ –সেই হেন জিনিস নেই।

বউরানি আমাকে নিয়ে তারপর দোতলায় উঠলেন।

দোতলা থেকে বহুদূর অবধি দেখা যায়। বাড়ির সামনে দিয়ে মেইন লাইন। ক্ষণে ক্ষণে ট্রেন যাচ্ছে। রেললাইনের ওপারে লাল মাটির খোয়াই চলে গেছে। মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, শালের চারা, ঝাঁটি জঙ্গল, মিলিয়ে গেছে দূরের ছায়াঘেরা সাঁওতালদের গ্রামে, তারপর টিগরিয়া পাহাড়। একটা নদী গেরুয়া শরীরে গরমের সকালে ন্যাতানো সাপের মতো পড়ে আছে।

বউরানি নাম বললেন নদীর; কুতনিয়া।

ওই গ্রামগুলোর নাম কী? শুধোলাম আমি।

বউরানি বললেন, সুজানী। বড়ড়াগ্রামটা। তার চারপাশে ছড়ানো আছে কুকরিবাগ, বদলাডি, বাবুডি সব টিগরিয়া পাহাড়ের কোলে-কোলে।

তারপর বললেন, জানো তো, ওইসব গ্রাম থেকে ছেলে-মেয়েরা রোজ কাজ করতে আসে। ওই সুজানী গ্রামে একটা খুবসুন্দর মেয়ে আছে, সে এখানে কাজ করে। তার নাম পানুই।

পানুই নামটা শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠল।

স্টেশন থেকে আসবার সময় ভজনবাবু যেন কী বলেছিলেন? বে-শাদি করেননি, পানুই এর ক্যাজুয়ালটি না হয়ে যান।

কথাটা মনে পড়ে এতক্ষণে তার মানে বুঝলাম।

মেমসাহেব বললেন, এই পানুইকে নিয়ে তোমার সাহেবের চিন্তা। এতলোকে মেয়েটার পেছনে লাগছে যে, মেয়েটা খারাপ না হয়ে যায়। মেয়েটা নিজে পাজি–তো লোক কী করবে? তোমার সাহেব বর ঠিক করে লোক খাইয়ে শাড়ি-গয়না দিয়ে পানুই-এর বিয়ে দিলেন। কিন্তু হলে কী হয়– সে বরকে ছেড়ে চলে এল।

ওপরেও অনেকগুলো বেডরুম–দু-টি বারান্দা। মানে এই বাড়ির একতলা, দোতলা, জাপানি টি-হাউস, শান্তিনিকেতনি শ্যামলীর মতো মাটির বাড়ি, কামাচ কাটকান, হাওয়াইয়ান সব মিলিয়ে এখানে একসঙ্গে একশো-জন অতিথিও অনায়াসে থাকতে পারেন।

আমি বউরানিকে বললাম, সেকথা।

বউরানি বললেন, থাকতে পারে মানে? থাকেও অনেক সময়।

তারপর বললেন, তোমার চাকরিটা যত সহজ ভেবেছ তত সহজ নয়। তুমি এখানে তিষ্ঠোতে পারলে হয়। তোমার সাহেবের গেস্টদের তো দ্যাখোনি। কতরকম চিজ-ই যে আসে, এই চিড়িয়াখানার জন্তুরাও হার

মানে তাদের কাছে।

আমার মনে হল, ইতিমধ্যেই যেন একটু পাগল-পাগল ভাব লাগছে। চাকরিটা টিকিয়ে রাখতে পারলে হয় শেষপর্যন্ত।

৩-৪. দুপুরের খাওয়া-দাওয়া

০৩.

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে।

সাহেব তাঁর মহারাজা-মহারানি অতিথিদের নিয়ে লাইব্রেরির পাশের গাছতলায় বসবার জায়গায় বসে, অফিসের কাজ শেষ করে এসে কোল্ড বিয়ার খেয়েছেন। পম্পা, মেমসাহেব শ্যাণ্ডি।

বউরানি সাহেব ও সাহেবের অতিথিদের সচরাচর এড়িয়ে চলেন।

তারপর যখন ওঁরা খাওয়ার ঘরে খেতে বসেছেন, আমি রংরুটের মতো দাঁড়িয়ে থেকেছি পাশে, ব্যাপার-স্যাপার দেখবার-বোঝবার জন্যে। কার কী লাগবে না লাগবে তদারকি করার জন্যে।

আজ আমার করার কিছু নেই। কারণ মালকিন ও মালিক উপস্থিত।

ফিজিক্স নিয়ে পড়াশুনা করে, কলেজ-ম্যাগাজিনে বিস্তর কবিতা-টবিতা লিখে শেষকালে খাওয়া-দাওয়ার তদারকির চাকরিতে বহাল হলাম বলে হঠাৎ একবার মনে বড়ো খোঁচা লাগল। পরক্ষণেই সাহেবের উজ্জ্বল দু-টি বুদ্ধিদীপ্ত ও প্রতিভাময় চোখে চোখ পড়েই সব ভুলে গেলাম। সত্যিই মনে হল, এ আমার অনেক ভাগ্য যে, এমন যোগাযোগ শশীর মাধ্যমে ঘটেছে।

অবাক লাগল বউরানির খাওয়া দেখে। বউরানি শুধু ছানা খাচ্ছেন একটু।

রাম বাবুর্চিকে কারণ শুধোলাম ফিসফিস করে। জানা গেল মেদবৃদ্ধির ভয়ে বউরানি আর কিছুই খান না।

খাওয়া-দাওয়ার পর আমি বউ-রানিকে বললাম যে, আপনি যদি ছানা ছাড়া কিছুই না খান, তাহলে আমিও কিছুই খাব না। আপনি ভাত খেলেই আমি ভাত খাব। আপনি যা খাবেন আমিও তাই-ই খাব। এসব একেবারে ভুল ধারণা। রোগা-মোটা সব উত্তরাধিকারের ব্যাপার। কই সাহেব তো মোটা নন। কিন্তু আপনি মোটা। আমি চেষ্টা করেও মোটা হতে পারি না। যার যেরকম স্বাস্থ্য। খোদার ওপর খোদকারি করে লাভ কী?

আবারও বললাম, আজ রাত থেকে দেখবেন বউরানি, আপনি যা খাবেন, আমিও তাই-ই খাব। আমার তাহলে চাকরি করতে এসে কিন্তু না খেয়ে থাকতে হবে।

বউরানি বললেন, এ কী অলুক্ষুণে কথা!

আমি বললাম, অতসব জানি না। যা বললাম, তাই-ই হবে।

প্রথম দিন-ই চাকরিতে বহাল হয়ে এমন মাতব্বরি ও মালকিনের ছানাগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করাটা ঠিক হল কী হল না ভেবে দেখলাম না একবারও। মাতব্বরিটা করে ফেলার পর মনে হল কাজটা ভালো করলাম না।

সাহেব বোধ হয় রাম বাবুর্চি, অশোক ও মেহবুবের কাছে কানাঘুসায় পাতিকাক-বউরানি সংবাদটি শুনে থাকবেন। রাতে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার হবে হে। তুমি বউরানিকে ছানা ছাড়াতে যদি পারো, তবে তোমার অনেক কিছু হবে।

সাহেবকে ঠিক বুঝতে পারছি না। কথাটা কী ভেবে বললেন ও কীভাবে আমার নেওয়া উচিত তা বোধগম্য হল না। তবে ঠিক করলাম, এ ব্যাপার নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করব না।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারন্দায় বসে, বেতের তৈরি সাদা রং করা পা-রাখার জায়গায় পা রেখে সাহেব একটা সিগার খেলেন সকলের সঙ্গে গল্প করতে করতে। তারপর সকলে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যে ঘরে গেলে, নিজে উঠে চললেন লাইব্রেরির কাজ তদারক করতে। যাওয়ার সময় আমাকে বললেন, টিকলু, এবার খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম নিয়ে নাও একটু। পাঁচটার সময় আবার চলে এসো।

তারপর বললেন, বউ-রানি ও মেহবুবের কাছে থেকে যা বোঝার সব বুঝে নিয়েছ তো?

মাথা নাড়লাম আমি।

বাবুর্চিখানার-ই এককোণের একটা টেবিলে আমাকে খেতে দিয়েছিল রাম বাবুর্চি। চমৎকার রান্না। বাড়িতে উড়ে ঠাকুর রাঁধে, মুসুরির ডালে যেন তেলাপোকা-তেলাপোকা গন্ধ বেরোয়। আর রাম বাবুর্চি ভালো বেঁধেছে, সে-যেন মনে হচ্ছে কী একটা অনাস্বাদিতপূর্ব পদ খাচ্ছি।

খেতে খেতে হঠাৎ সিগারেটের উগ্র গন্ধ নাকে এল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, সাহেব এসে বাবুর্চিখানার দরজায় দাঁড়িয়েছেন।

এক পলক আমার থালার দিকে চেয়ে থেকে বললেন, মেহবুব, টিকলুবাবুকে আর একটু মাংস দে। মাংস কি তোদের কম পড়েছে?

তারপর বললেন, তোদের জন্য রেখেছিস তো? দেখি হাঁড়ি।

বলে, নিজেই সটান বাবুর্চিখানায় ঢুকে হাঁড়ি পরীক্ষা করে খুশি হয়ে বললেন, ঠিক আছে। এখন থেকে টিকলুবাবুই বাড়ির ম্যানেজার।

প্রথম-প্রথম ওঁকে একটু দেখিয়ে-শুনিয়ে দিবি–ওঁর কথা মেনে চলবি তোরা। কোনো ঝামেলা যেন না হয়।

তারপর বললেন, ভালো করে খাও। তুমি বড়ো রোগা টিকলু। স্বাস্থ্য ভালো করো। এখানের জল-হাওয়াও ভালো। খাও-দাও-খাটো দেখবে দু-দিনে চেহারা ফিরে যাবে।

বলেই, সাহেব চলে গেলেন আবার অফিসে। এরপর নাকি উনি এগ্রিকালচারাল ফার্মে যাবেন, একটা খুববড়ো মজা-পুকুর নিয়েছেন লিজে, সেই পুকুর কাটা শুরু হবে শিগগির তার তদারকি করে আসবেন একবার।

সব কাজ-ই করে অন্যরা, সাহেব শুধু তদারকি করেন আর ডিসিশান নেন।

এতদিনে বোধগম্য হল কী করে টাটা কী বিড়লা কী আই-সি-আই কোম্পানি বাণিজ্য করে। সব-ই একটা লোক করলে কেউ-ই জীবনে বড়ো হতে পারে না। না, খাটলেও না। ঠিকমতো লোক খুঁজে নিয়ে যার যার হাতে তার তার দাঁড় বুঝিয়ে দিয়ে নিজে হাল ধরে বসে থাকতে হয় শুধু। তবেই জীবনের জলে সাফল্যর নৌকো চলে তরতর করে।

খাওয়া-দাওয়ার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবুর্চিখানার পেছনের পথ দিয়ে কোয়ার্টারে গিয়ে পৌঁছোলাম। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ার ছিল–তাতে পাতুলে বসলাম। কেন–জানি না, এখানে এসে অবধি এই সমস্ত ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভারী ভালো লাগছে। এ জীবনে আমরা কেউই যে

ফালতু নই, ইচ্ছে থাকলে, কল্পনাশক্তি থাকলে বা তা বাস্তবে রূপায়িত করার জেদ থাকলে আমরা সকলেই যে, কিছু-না-কিছু করতে পারি জীবনে কমবেশি, এ কথাটা বোধ হয় এখানে না এলে এমন করে বুঝতে পারতাম না।

সাহেব কলকাতায় এক বিরাট অফিসে পাঁচ হাজারি চাকরি করেন। শশীর কাছে শুনেছি অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে সাহেবের কলকাতার মহলে রীতিমতো নাম আছে। অতবড়ো দায়িত্বশীল কাজ করেও অবসর সময়ে এতবড়ো একটা দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার করা, শুধু তাই-ই নয়, এটা লাভজনকভাবে চালানো, এত লোককে চাকরি দিয়ে, প্রোভাইড করে; যে-সে কথা নয়।

হু-হু করে হাওয়া আসছে টিগরিয়া পাহাড়ের দিক থেকে। হাওয়াটা যেন এক্সপ্রেস ট্রেনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইছে। সঙ্গে বয়ে আনছে শুকনো পাতা, লাল ধুলো, খড়কুটো, পাহাড়ের, মহুয়ার, সাঁওতালি মেয়ের গায়ের গন্ধ। এই হাওয়ায় বসে থাকতে-থাকতে চোখ-মুখ শুকিয়ে ওঠে, ঠোঁট ফেটে যায়, কিন্তু কেমন নেশা-নেশা লাগে।

রাতে ভালো ঘুম হয়নি, ঘুম ঘুম পাচ্ছিল; কিন্তু তবুও এই নতুন চাকরি এবং আমার মালিকের আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব, এবং রুখু হাওয়াটা আমার ঘুম চুরি করে নিয়েছে। বুঝতে পারছি আমি, ভ্যাগাবণ্ড ছেলেটা, যে রোজ দুপুরে কোলবালিশ জড়িয়ে ধরে তিন ঘণ্টা ঘুমোত কলকাতায় সে আর

কখনো দুপুরে ঘুমোবে না।

আর একটা সিগারেট শেষ করলাম, এমন সময় দেখি দূর থেকে ভজনবাবু আসছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, কী মশাই? কেমন বুঝছেন?

ফার্স্ট ক্লাস। আমি বললাম।

তারপর শুধোলাম, এই দুপুরবেলায় কোথায় চললেন?

কোথায় আবার? আমার পুষ্যিদের দেখতে। এখন কার তেষ্টা পেল-না-পেল দেখতে হবে, জল খাওয়াতে হবে, এই গরমে দুপুরের কষ্ট কার কতটুকু কী করে কমানো যায়, তার তদবির তদারকি করতে হবে।

তারপর বললেন, আসবেন নাকি? চলুন আমার পুষ্যিদের দেখিয়ে আনি।

উঠে পড়ে বললাম, চলুন।

একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, খাবেন? বাজে সিগারেট।

নাঃ। ভজনবাবু বললেন। ভুসিমাল আমার চলে না। এসব বিষ। সন্ধেবেলা কাজকর্ম সেরে কুয়োর ঠাণ্ডাজলে চান করে এক বোতল মৃতসঞ্জীবনী সুরা পান করি।

আমি বললাম, সেটা কী? কবিরাজি ওষুধ? ডাবর কোম্পানির? না সাধনা ঔষধালয়ের?

ভজনবাবু বললেন, না না মশায়, লি-অ-এস।

অবাক হয়ে শুধোলাম, সেটা আবার কী?

–লিকার অব-দ্য-সয়েল। মহুয়া।

বলেই হাসলেন।

ভজনবাবুর সঙ্গে চিড়িয়াখানার দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, আপনারা সকলেই কি এখানে সেটলড। ক-ভাই আপনারা?

উনি বললেন, না, না। আমি একাই এখানে সেটলড কী আনসেটলড যাই-ই বলুন। আমাদের দেশ জয়নগর-মজিলপুর। মোয়া খেয়েছেন? জয়নগরের মোয়া?

বললাম, নিশ্চয়ই।

সেই। আমি সেই মোয়ার দেশের লোক। আমরা তিন ভাই এক বোন। ভজন, পূজন, সাধন। বোনের নাম আরাধনা।

আমি বললাম, এ তো রবিঠাকুরের কবিতা।

উনি বললেন, আজ্ঞে।

তারপর বললেন, ওয়াইফের সঙ্গে কথা হয়ে গেছে। ফ্যামিলি প্ল্যানিং কমপ্লিট করব তিন ছেলে-মেয়ে দিয়ে। রবিঠাকুরের কবিতাও কমপ্লিট করে দেব। তিন ছেলের অথবা মেয়ের নাম রাখব; সমস্ত, থাক এবং পড়ে।

আমি হেসে উঠলাম। বললাম, চমৎকার।

আজ্ঞে, ইয়েস। বলেই, একটিপ বড়ো নস্যি নিলেন।

ভজনবাবু বললেন, আমার সবকিছুই চমৎকার।

ভজনবাবুর সঙ্গে চিড়িয়াখানায় ঢুকলাম।

দু-পাশে সারি সারি ঘর। তাতে নানারকম পাখি আর জানোয়ার। ভজনবাবু চেনাতে চেনাতে চললেন।

একটা সাঁওতালি মেয়ে পশুপাখিদের জল দিচ্ছিল। ভজনবাবু ডাকলেন, ফুলমণি।

ফুলমণি বলে মিষ্টি ছিপছিপে মেয়েটি বলল, কী বলছিস রে বাবু?

একটু বেশি করে জল দাও মা। তোমরা আমাদের পিয়াসি রাখো রাখো,

বাঁদর, পাখিদের বেলা তো একটু হাত খুলতে পারো।

ফুলমণি কথাটা বুঝল না, তবে বুঝল যে, তাকে নিয়ে রসিকতা করা হচ্ছে।

বলল, ইয়ার্কি করিস কেনে রে সবসময়?

ভজনবাবু বললেন, এই বাবু নতুন। আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পরক্ষণেই বললেন, গোরুরগাড়ির হেডলাইট।

আমি শুধোলাম, এতগুলো বাঁদর কেন?

ভজনবাবু বললেন, মানুষের মতো দেখতে হলেই যেমন মানুষ হয় না, বাঁদরের মতো দেখতে হলেই বাঁদর হয় না। বুঝছেন মশায়। এই যে সামনে দেখছেন...

আমি বললাম, ভজনদা, আর আপনি চালাবেন না, তুমি করেই বলুন।

–বেশ। তথাস্তু-কিন্তু তোমার নামটা যেন কী?

–টিকলু।

টিকলু কথার কোনো মানে আছে? না প্রপার নাউন?

–প্রপার নাউন।

তবে তোমার একটা নাম দেওয়া যাবে।

ভালো। আমি বললাম, বউরানি তো ইতিমধ্যেই নাম দিয়েছেন পাতিকাক।

–আমার নাম দাঁড়কাক। আমি জানি।

ভজনদা বললেন।

জানেন?

আমি অবাক গলায় শুধোলাম।

তারপরেই ভজনদা আবার বললেন, এই যে সামনে দেখছ, এটা আফ্রিকান গিব্বন–তার পাশের খাঁচায়–এটা উল্লুক-বাঁদর নয়।

আমি অবাক গলায় বললাম, ওঃ ওটা উল্লুক?

ভজনদা বললেন, ইয়েস।

ডালহাউসি স্কোয়ারে চোখ খুলে চললে দেখবে অনেক উল্লুক প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরে চলে যাচ্ছে।

তারপর বললেন, তার পাশের খাঁচায় দিশি বাঁদর।

পরক্ষণেই ভজনদা বললেন, এই বাঁদরটা ভারি অসভ্য। এমন করে দু-পা ফাঁক করে কোনো মহিলার বসা উচিত? এ শালিকেও একটা নাইটি বানিয়ে দিতে হবে সাহেবকে বলে। আচ্ছা তুমিই বলো। যত লজ্জা কি মহিলাদেরই? আমরা ব্যাটাছেলেরা কি লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বসে আছি?

তারপর বললেন, ওই দ্যাখো, তার ওপাশের ঘরে লায়ন-টেইলড বাঁদর, তার পাশের ঘরে স্টাম্পড-টেইল বাঁদর। বাঁদরে-বাঁদরে একাকার।

পাখিরা যেদিকে আছে সেদিকে গিয়ে চোখ জুড়িয়ে গেল কতরকম রং-বেরঙের ম্যাকাও, প্যারাকিট, ফোজেন্ট, ক্যানারি, বদ্রী, কাকাতুয়া যে, তার ইয়ত্তা নেই।

ভজনদা বললেন, প্যারাকিট কতরকম হয় জানো?

না। আমি বললাম।

হয় আরও অনেকরকম। আমাদের কাছে আছে রোজেলা–এগুলো নানা রং হয়। রেড রাম্প–এদের কোমরের কাছটা লাল। কালো ঠোঁট। ব্রুক–দ্যাখো গা-টা খয়েরি, বুকের কাছটা লাল। আর ওই দ্যাখো ককলেট–এগুলো সাদাও হয়, ছাই রঙাও হয়।

তারপর দম নিয়ে বললেন, এবারে চলো ফেজেন্টস দেখাই। এগুলো সিয়ামিজ ফায়ার ব্যাক–গাটা কালো, পেছনটা লাল। মাদিগুলোর গায়ে খয়েরি ছিট ছিট হয়। আর ওই দ্যাখো সোনালি ফেজেন্টটা ওদের নাম গোল্ড ফেজেন্ট।

আমি বললাম, ওই কোণায় যে, বিরাট বাদামি রঙা কাঠবিড়ালিটা শুয়ে আছে ওটা কি কাঠবিড়ালি?

হ্যাঁ, কাঠবিড়ালি। ওগুলো এর চেয়েও বড়ো হয়। এদের নাম হিমালয়ান স্কুইরেল। উড়িষ্যার গভীর জঙ্গলেও পাওয়া যায় শুনেছি।

কচ্ছপের খাঁচাটার সামনে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম যে, এতবড়ো কচ্ছপ? এ তো কলকাতার চিড়িয়াখানাতেও দেখেছি বলে মনে হয় না।

ভজনদা বললেন, এদের বলে, সাউথ ইণ্ডিয়ান লায়ন-টরটয়েস। গায়ের ওপর কেমন চৌকো চৌকো সন্দেশের ছাঁচের মতো ছাঁচ দেখেছ?

সবিস্ময়ে আমি বললাম, এই সব পশুপাখির দায়িত্ব আপনার?

-ইয়েস। সব আমার। শুধু কি তাই? কত যে কমপ্লিকেশান হয় তা কী বলব। এই তো গত সপ্তাহে ক্যানারির ডিম হবে–ডিম আর বেরোয় না– সে কী গব্ব-যন্ত্রণা–ক্যানারির যত-না কষ্ট, সাহেবের কষ্ট যেন তার চেয়েও

বেশি। যেন সাহেব-ই ছেলে বিয়োবেন এমন করে পেটে হাত দিয়ে আথালি-পাতালি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এদিকে পাখিও কষ্টে মারা যায় আর কী! শেষে কলকাতার ট্রাঙ্ককল হল। ভেট এল। ক্যানারির সিজারিয়ান-সেক্সন অপারেশন হল। তারপর ডিম বেরুল। সাহেব ঠাণ্ডা হলেন। তারপর বললেন, ঝামেলা কি কম! এই চিড়িয়াখানায় বেঁচে থাকাটাই একটা দারুণ ঝামেলা।

আমি বললাম, আপনি এতসব শিখলেন কী করে?

ইচ্ছা থাকলেই শেখা যায়। সাহেবের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখে দেখে শিখলাম।

–সাহেব-ই বা এসব শিখলেন কোথায়? তিনি তো অ্যাকাউন্টটেন্ট।

–ওঁর শখ ছিল, ইচ্ছা ছিল। শখ আর ইচ্ছা থাকলে কিনা শেখা যায়?

চিড়িয়াখানায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে কখন যে, পাঁচটা বাজতে চলল খেয়াল-ই ছিল না।

ভজনদার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ির দিকে এগোলাম।

বাড়ির কাছে পৌঁছেই দেখি, একটি সাঁওতালি মেয়ে পড়ন্ত রোদ্দুরে লনঝাঁট দিয়ে উড়ে পড়া শুকনো পাতা, ফুল, ধুলো সব সরাচ্ছে।

মেয়েটি আমাকে দেখেনি। সে আমার দিকে পাশ ফিরে কোমর বেঁকিয়ে ঝাঁট দিচ্ছিল।

ভারি সুন্দর লাগছিল তার সেই ঝাঁট দেওয়ার ভঙ্গিটি। সুন্দর মরালী গ্রীবা, কাটা-কাটা নাক-মুখ, একটা রঙিন ছাপা শাড়ি পরেছে, হলুদের মধ্যে লাল ফুল-ফুল, সঙ্গে হলুদ ব্লাউজ, মাথায় হলুদ ফুল গুঁজেছে, তার গায়ের চিকন কালো রঙে সেই হলুদ-লালের যে কী বাহার খুলেছে তা কী বলব?

আমি বাড়ির কাছে যেতেই ও আমাকে দেখল।

দেখেই এমন করে আমার দিকে তাকাল যে, আমার প্রায় ভিরমি খাওয়ার অবস্থা হল। মনে হল বুকের মধ্যে চাসনালার দুর্ঘটনা ঘটে গেল। হু হু করে হৃদয়ে শ্বাসরোধকারী গ্যাসী জল ঢুকতে লাগল চতুর্দিক থেকে।

আমি ওর দিকে আর না তাকিয়ে সোজা বাড়ির দিকে চললাম।

সাহেব সবে বুদ্বুর হাত ধরে বেড়াতে বেরিয়েছেন।

সাড়ে ছ-ফিট লম্বা অতবড়ো সাহেবের পাশে বাঁদরটাকে লিলিপুটের দেশের লোক বলে মনে হচ্ছিল। সাহেবের হাঁটুরও অনেক নীচে ছিল বুদ্ধুর মাথা।

আমাকে দেখেই বললেন, শোনো টিকলু, একটু আগেই ট্রাঙ্ককল

এসেছিল। মুম্বাইতে আমার একটা কনফারেন্স আছে–কাল সকাল দশটা-পঁয়তাল্লিশের ফ্লাইটে আমায় মুম্বাই যেতে হবে। তাই আমি আজ পাঞ্জাব মেলে চলে যাব রাত দুটোয়। পরশু সকালে মিথিলা এক্সপ্রেসে আমার কয়েকজন গেস্ট আসবেন। কলকাতা থেকে। পাঁচ-জন অ্যাডাল্ট, দু-জন বাচ্চা। গোমিয়া থেকে একটি কাপল–তিনটি বাচ্চা। তাঁরা গাড়িতে আসবেন।

তারপর একটু থেমে বললেন, বউরানি অবশ্য থাকবেন। যাঁরা আসছেন, তাঁরা আমার বিশেষ বন্ধু। যত্ন-আত্তির ত্রুটি কোরো না কোনো। ভালোই হল, চাকরিতে বহাল হতে-না হতেই ইণ্ডিপেন্টেলি কাজ করার সুযোগ এল তোমার।

তারপর বললেন, প্রুভ ইয়োর ওয়ার্থ।

আমি মুখ নীচু করেছিলাম।

বললাম, চেষ্টা করব।

তারপর বললাম, বুন্ধুর তো টিবি হয়েছে আর আপনি ওর সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা করছেন, আপনার কিছু হবে না তো?

সাহেব হাসলেন। বললেন, দুর, বাঁদরের টি বি আর মানুষের টি বি এক নয়। কিন্তু টি বি রোগটা অরিজিন্যালি গোরুর থেকে মানুষে এসেছিল।

একথা জানো কি?

আমি মাথা নাড়লাম।

মনে মনে বললাম, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?

হঠাৎ গম্ভীর মুখে সাহেব বললেন, বুন্ধুটা আর বেশিদিন বাঁচবে না। মনে হয় ও কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবে। তোমাকে বলে যাই, ও যদি আমার অনুপস্থিতিতে মারা যায়, তাহলে ওকে ওই লাইব্রেরির কাছে জামগাছের নীচে কবর দিয়ো। ওর জন্যে চন্দনকাঠের কফিন তৈরি করা আছে। বাঁদরদের কী ধর্ম জানি না। তাই সাঁওতাল পুরোহিতকে বলে রেখেছি, সে এসে বুন্ধুর লাস্ট রাইটস পারফর্ম করবে।

ওকে কবর দেওয়ার পর থেকে, মালিকে বলবে কবরের ওপরে সন্ধেবেলায় ধূপ আর ইউক্যালিপটাসের পাতা পুড়বে।

তারপর বললেন, আর শোনো, রোজ সকালে একছড়া পাকা কলা দেবে ওর কবরের ওপরে।

মনে মনে ভাবলাম, আহা! সাহেবের বাঁদর হলেও এ জন্মের মতো বেঁচে যেতাম।

সাহেব বুদ্বুর গাল টিপে আদর করে বললেন, এরকম পত্নী-প্রেম আমি

মানুষের মধ্যেও দেখিনি। ওর স্ত্রী গোপা খুব সুন্দরী মহিলা ছিল এবং প্রচন্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্না। প্রেমও ছিল দু জনের ভীষণ। গোপা মারা যেতেই বুদ্ধ খাওয়া-দাওয়া একেবারে বন্ধ করে দিল–এই টি বি বাধাল স্রেফ না খেয়ে।

ওই জামগাছের নীচেই গোপারও কবর আছে। তার পাশেই যেন বুদ্ধকে কবর দেওয়া হয়। অবশ্য ভজনকে এ সম্বন্ধে আগেই বলে রেখেছি। তোমাকেও বললাম।

সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছিলাম।

সাহেব বললেন, সব কটা বাড়ি ঠিকমতো ঝাড়পোছ হল কি না দেখে এসো। টি-হাউসের ভেতরের ঘরের আলো জ্বলছে না। ইলেকট্রিসিয়ান আছেন আমার পার্মানেন্ট স্টাফ। তাঁকে খবর দিয়ে কাল সকালের মধ্যেই ওগুলো ঠিক করে নিয়ো।

তারপর বললেন, আমার সঙ্গে থাকার দরকার নেই এখন তোমার। তুমি বউরানির কাছে যাও। উনি ছুটি দিলে তোমার ছুটি। প্রথম দিনেই বেশি খাটুনি করতে হবে না।

বউরানির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, বউরানি মেঝেতে বসে পান সাজছেন। পাশে একটা রুপোর হাঁস রাখা আছে। এক-একটা পান সাজছেন, আর সেই হাঁসের পেটে ঢোকাচ্ছেন। হাঁসের পেটে ডিমের

বদলে পেট-ভরতি পান হয়ে যাওয়ার পর হাঁসের ডানা খুলে বউরানি গোলাপজল ছিটিয়ে দিয়ে হাঁসটাকে সটান ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

এতক্ষণ এমন মনোযোগের সঙ্গে পান সাজছিলেন উনি যে, আমার অস্তিত্ব টেরই পাননি।

হঠাৎ মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, কী চাও টিকলু!

বললাম, আমি কিছু চাই না। সাহেব বললেন, আপনার কাছে আসতে।

বউরানি বললেন, তোমার সাহেবের বাঁদর-পাখির ওপর যেটুকু দরদ ও মানুষের ওপরে, আমি–সুদ্ধু; তার ছিটেফোঁটাও নেই। জান তো, তোমার সাহেবের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

-মানে?

আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

মেমসাহেব বললেন, বিয়ের সময় নাপিত তোমার সাহেবকে মালাটা এগিয়ে দিতে গিয়ে ভুল করে সে নিজেই সেটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিল। যে আসল বর সে কোথায় হারিয়ে গেল–আর সারাজীবন কাটল এই উন্মাদের সঙ্গে।

তারপর একটু থেমে বললেন, আজ-ই তো তোমার প্রথম দিন-রাতেও

তো ঘুম হয়নি। প্রথম দিন-ই কি তোমার সাহেব তোমার পরীক্ষা করেছেন?

তারপর বললেন, যাও এখন আর কী কাজ? রাতে খেয়ে নিয়ে কাল সকালে এসো।

আমি ছুটি পেয়ে বাড়ির হাতার মধ্যে একা একা পায়চারি করে বেড়াতে লাগলাম। এতবড়ো কম্পাউণ্ড যে, বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ালেই পায়ে ব্যথা ধরে যায়।

এখন বেলাশেষের স্লান রোদে টিগরিয়া পাহাড়টা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। বেলা পড়ে এল, কিন্তু হাওয়ার বিরাম নেই। হাওয়াটা যেন আরও জোর হয়েছে দুপুরের চেয়েও। এখন হাওয়াটা আগুনের মতো গরম। এখনও পাতা-ফুল উড়ে আসছে লাল ধুলোর সঙ্গে মাইলের পর মাইল দূর থেকে।

.

চিড়িয়াখানা থেকে ময়ূর ডাকছে, ম্যাকাও ডাকছে, সন্ধের আগে সব পাখিরা ডাকাডাকি শুরু করেছে। উল্লুক, উক-উক-উক-উক করে উঠল।

ধীরে ধীরে বেলা পড়ে আসতে লাগল। রাধাচূড়া গাছে গাছে ফুল ছেয়ে আছে। চিড়িয়াখানায় কোকিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জংলি কোকিল কৃষ্ণচূড়া গাছের মগডালে লালের মধ্যে তার কালো শরীর লুকিয়ে বসে

গলা-ফুলিয়ে ডাকছে কুহু-কুহু-কুহু। আহা! এমন ডাক যে, আমার মতো বাউণ্ডুলে, ছন্নছাড়া, একলা লোকের বুকের মধ্যেটাও উঁহু-উঁহু করে ওঠে।

কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর আমার কোয়ার্টারে এলাম। কুঁজো থেকে গড়িয়ে ঠাণ্ডা জল খেলাম একগ্লাস। বিকেলে চা খেয়েছি, আর এককাপ চা হলে বড়ো ভালো হত। বউদি বাড়িতে আদরে-আদরে আমার মাথাটি খেয়েছে একেবারে।

বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে সাতপাঁচ ভাবছি, ইউক্যালিপটাস গাছের ডালের ফাঁক দিয়ে সবে দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছে, এমন সময় মেহবুব হঠাৎ ট্রেতে করে চা এনে হাজির।

বলল, মেমসাহেব আপনার জন্যে পাঠিয়ে দিলেন।

দেখি ট্রের ওপরে টি-পটে চা, সঙ্গে নোনতা মাঠরি।

বউরানিকে মনে মনে কী যে ধন্যবাদ দিলাম, তা আমিই জানি।

বউরানি যেন আমার মায়ের মতো, মনের কথা না বলতেই বুঝে ফেলেন।

চা খেতে খেতে অন্ধকার হয়ে এল। কাছেই কোথাও হাসনুহানা ফুটেছে। কী সুন্দর গন্ধ। হাওয়ার সঙ্গে ঝলক ঝলক, মহুয়ার গন্ধও আসছে।

ইজিচেয়ারে বসে সেই অন্ধকারের হাওয়ার শব্দটা সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ

বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন কোন অচেনা সমুদ্রের পারে চাঁদ-ওঠা বালিয়াড়িতে বসে আছি আমি। একা একা বসে হাওয়ার সঙ্গে চাঁদের সঙ্গে, ফুলের গন্ধের সঙ্গে, নিরুচ্চারে কত কী কথা বলছি।

এমন সময় হঠাৎ আমার-ই সমবয়সি একটি ছেলে কাঁকরের ওপর চটিতে কিরকির শব্দ তুলে বারান্দায় এসে উঠল।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম।

ভদ্রলোক বললেন, বসুন মশাই, বসুন। আমি কি আর সাহেব যে, আমাকে এত সম্মান করতে হবে?

আমি তখনও দাঁড়িয়েই বললাম, আপনি?

ভদ্রলোক বারান্দার আলসেতে বসে পড়ে বললেন, আমার নাম নবীন রায়, আমি চিড়িয়াখানার গ্রিনহাউসের দেখাশোনা করি।

তারপর বলল, গ্রিনহাউস দেখেছেন?

আমি বললাম, না তো!

নবীনবাবু বললেন, ঠিক আছে, সব দেখবেন। তাড়া কীসের?

তারপর-ই বললেন, এখন ছুটি?

হ্যাঁ। আমি বললাম।

নবীনবাবু বললেন, চলুন একটু বেড়িয়ে আসি।

তারপর-ই বললেন, কাল থেকে শালার সাইকেলটার টায়ারটা পাথর লেগে চিরে রয়েছে–। চলুন হেঁটেই যাই।

-কোথায়?

-আরে চলুন-ই না!

নবীনবাবুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে গেটে এলাম।

দারোয়ান আমাদের ছেড়ে দিল স্টাফ বলে।

দেখলাম, দারোয়ানের সঙ্গে নবীনবাবুর বেশ সদ্ভাব।

নবীনবাবু গেট পেরোতে পেরোতে বললেন, কেয়া? লায়গা রামস্বরূপ।

-লাইয়ে একঠো।

আমি শুধোলাম, কী?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, মহুয়া।

বেশ অনেকক্ষণ জ্যোৎসালোকিত পথে ধুলো মাড়িয়ে, গাছগাছালির পাতায় পাতায়, ঝরনা ঝরানো হাওয়ায় ভেসে চললাম আমরা। দু-পাশে চন্দ্রালোকিত লালমাটির ধু-ধু টাঁড়, খখাওয়াই; ক্বচিৎ শাল ও মহুয়া। পথের পাশের একটা বাড়িতে নাম-না-জানা লতায় ফুল ধরেছে। পথের সে জায়গাটা গন্ধে ম ম করছে।

বেশ অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম।

দূর থেকেই মনে হল যে, এটা একটা ভাঁটিখানা।

নবীনবাবু চোখ নাচিয়ে শুধোলেন, চলে?

আমি বললাম, না, নবীনবাবু।

নবীনবাবু বললেন, সে কী মশায়? কলকাতার ছেলে এসব চলে না কীরকম?

লজ্জিত মুখে বললাম, চলে না মানে, কোনোদিনও চলেনি তাই।

ডোবালেন মশাই। নবীনবাবু বললেন।

তারপর স্বগতোক্তির মতো বললেন, সারাজীবন কি আমাকে ভজনদার শাগরেদ হয়েই কাটাতে হবে নাকি।

ভাঁটিখানায় আলো জ্বলছিল হ্যারিকেনের। শালকাঠের খুঁটি দেওয়া মাটির বাড়ি, নিরিবিলি শালগাছের নীচে। চারধারে শালপাতার দোনা ছড়ানো-ছিটানো ছিল। কিছু মেয়ে-পুরুষ ভাঁটিখানার সামনে ও ভেতরে, দাঁড়িয়ে-বসে ছিল। একটা অলস, মন্থর, পরিবেশে সমস্ত জায়গাটিতে।

আমি শুধোলাম, জায়গাটার নাম কী?

মিরিডি! নবীনবাবু বললেন।

বললাম, আচ্ছা এখানের বেশিরভাগ জায়গায় নামের শেষে এমন ডি কেন? এই ডি-র — কোনো মানে আছে?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, ডি হচ্ছে ডিহ। ডিহ হল সাঁওতালি ভাষায় বাড়ি বা গ্রাম।

এমন সময় ভাঁটিখানার ভেতর থেকে জড়ানো-গলায় কে যেন হঠাৎ বাংলায় গান গেয়ে উঠলেন

শ্যামা মা যে, আমার কালোকালো রূপে দিগম্বরী;হৃদিপদ্ম করে যে আলো রে–শ্যামা মা যে, আমার কালো।

নবীনবাবু খরগোশের মতো কান খাড়া করে শুনলেন একমুহূর্ত, তারপর-ই বললেন, ভজনদা।

বলতে-না-বলতেই ভজনদা বাইরে বেরিয়ে এলেন, হাতে মহুয়ার বোতল নিয়ে।

আমাকে দেখেই বললেন, এ কী! হাউসকিপিং ম্যানেজার হাউসের বাইরে কেন?

আমি উত্তর করার আগেই ভজনদা বললেন, আমিও আজ চলে এলুম। আজ সাহেব মনে বড়োদুকু দিলেন। সেই দুকু ভোলার জন্যেই চলে এলুম।

নবীনবাবু গলা নীচু করে বললেন, মাল খাবে খাবে, তারজন্যে এত দুঃখের দোহাই কেন রে বাবা? মাল কি বাপের পয়সায় খাচ্ছ না, শ্বশুরের পয়সায় খাচ্ছ?

আমি বললাম, আহা! বেচারা সত্যিই হয়তো দুঃখ পেয়েছেন কোনো কথায়।

নবীনবাবু বললেন, রাখুন ভজনদার দুঃখ। রোজ-ই উনি দুঃখ পান। কোনোদিন সাহেব দেন, কোনোদিন মেমসাহেব দেন। কোনোদিন বাঁদর, কোনোদিন উল্লুক, কোনোদিন কচ্ছপ –ওঁর দুঃখ পেতেই হবে কারও-না-কারও কাছ থেকে সন্ধেবেলায়।

ভজনদা আমাদের ওভারহিয়ার করে বললেন, কীরে নবনে, আমার সম্বন্ধে

টিঙ্কুকে কিছু বলেছিস? এখন থেকেই মন বিগড়োচ্ছিস?

তারপর-ই আমার দিকে বোতলসুষ্ঠু হাত তুলে বললেন, এই নবনেটার সঙ্গে মিশো না হে টিঙ্কু।

আমি বললাম, আমার নাম টিকলু!

ওই হল। আমি টিঙ্কুই বলব। কিন্তু ওই ছোঁড়ার সঙ্গে মিশলে আমি সাহেবকে বলে দেব।

আমি তখন সিরিয়াসলি ভাবছিলাম, কার সঙ্গে মিশব তা ঠিক করার সময় হয়েছে। যা সব স্যাম্পেল দেখছি, তাতে বোধ হয় বুন্ধুর সঙ্গে মেশাই সেফ।

তারপর-ই নবীনবাবুর দিকে ফিরে বললেন, আজ এলি কেন বাপ? আজ যে, তোর পানুই তুই আসার আগেই এক ব্যাটাকে সঙ্গে নিয়ে হেই উদোম টাঁড়ে চলে গেছে। পানুই কি তোর বাঁধা মাগ, না গোয়ালের গাই যে, তোর খুঁটোয় দিনরাত শুয়ে-বসে জাবর কাটবে?

তারপর একটা হেঁচকি তুলে, গলায় ঢেউ খেলিয়ে বললেন, বনকে চিড়িয়া, বনমে গিয়া।

নবীনবাবু ফিসফিস করে বললেন, ভজনদা আজ একদম তৈরি।

তারপর বললেন, নাঃ, আজ চলুন ফিরেই যাই। আজ যাত্রা অশুভ। পানুই নেই, তার ওপরে ভজনদা একেবারে হাই।

আমি বললাম, হাই হলে কী করেন উনি?

নবীনবাবু বললেন, উনি কী করেন তার ঠিক কী? অনেক কিছুই করেন। কিন্তু আমার গুরু বলে দিয়েছেন–অন্যে হাই হলেই নিজে লো হয়ে যাবে। এর চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ আর নেই।

ভজনদার খ্যানখেনে গলায় গান শুনতে পাচ্ছিলাম

এসো প্রিয়া হবে মোর রানি,তোমার খোঁপায় পরাব ফুল।কানে ঝুমকো তারার দুল।

ফিরে আসতে আসতে শুধোলাম, পানুইটি কে? যে চিড়িয়াখানায় কাজ করে, সেই মেয়েটি?

হ্যাঁ। নবীনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, চালুপুরিয়া।

আমি শুধোলাম, কেন একথা বলছেন?

নবীনবাবু বললেন, কী বোঝাই জানি না। মানে, ঠাকুমারা যেমন করে

নাতি-পুতি হ্যাণ্ডেল করে-না, ও তেমনি করে অ্যাডাল্ট পুরুষ মানুষ হ্যাণ্ডেল করে। ঘুঘুর-সই, ঘুঘুর-সই খেলে

হাত ঘোরালে নাড় পাবে নইলে নাড় পাবে না–বলে, কেউ আবার বেশি কান্নাকাটি করলে দুদু খাইয়ে দেয়। এমন ছেলে-ভুলোনো পাড়াজুড়োনো ঘুম-পাড়ানো মাসি-পিসি আর হয় না।

হাওয়ার তেজটা আস্তে আস্তে কমছে। আমরা দু-জন পাশাপাশি হাঁটছি। পথটার দু-পাশে ছোটো ছোটো ঝোপঝাড়। এদিকে গাছপালা কম। জঙ্গল কেটে প্রায় শেষ করে এনেছে। মাঝে মাঝে দুটো-একটা হরজাই গাছ– বেশিরভাগ-ই ঝাঁটি-জঙ্গল। বাঁ-দিকে একটা পুরোনো ইটের পাঁজা। কখনো বোধ হয় এখানে ইট বানানো হয়েছিল।

ইটের ভাঁটাটার পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি, হঠাৎ নবীনবাবু আমার হাত ধরে এক হ্যাঁচকা টান লাগালেন।

আমি একটা ঝটকায় পেছনে চলে এলাম।

চাঁদের আলোয় দেখলাম, আমার পায়ের সামনে দিয়ে একটা কালো মোটা দড়ি আস্তে আস্তে বাঁ-দিক থেকে ডানদিকে চলে যাচ্ছে।

হঠাৎ নবীনবাবু খেপে গেলেন। দৌড়ে, বাঁ-দিকে গিয়ে পাঁজা থেকে একটা ইট তুলে নিয়ে সেই ধীরে অপস্রিয়মাণ দড়িটার পেছন পেছন দৌড়ে

গেলেন, তখন-ই প্রথম বুঝলাম যে, ওটা একটা সাপ!

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সাপ দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করে ওঠে। ছোটোবেলা থেকে। শুধু সাপ, কেন? নরম তুলতুলে কোনো কিছু দেখলেই অমন হয়।

নবীনবাবু ততক্ষণে, পথ ছেড়ে মাঠে নেমে গেছেন। যে-সাপ কামড়ায়নি, ফোঁস করেনি, থুথু ছিটোয়নি, নির্বিবাদে পথ দিয়ে চলে গেছে কিছুই না করে–তাকে হঠাৎ তাড়া করে যাওয়ার কী দরকার বুঝলাম না।

একটু পর শক্ত মাটিতে ফটাং ফটাং করে ইটের আঘাতের শব্দ শুনে একটু সাহস সঞ্চয় করে এগিয়ে গেলাম ওদিকে।

সবিস্ময়ে দেখলাম, নবীনবাবু উবু হয়ে বসে ইটটা দিয়ে সাপটার মাথাটা বাড়ির পর বাড়ি মেরে একেবারে থেঁতলে দিচ্ছেন।

সাপটা তখনও নড়ছিল।

মাথাটা ঘা মেরে মেরে একেবারে সম্পূর্ণ থেঁতলে দেওয়ার পর নবীনবাবু প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে উঠলেন।

তারপর হঠাৎ সাপটার ল্যাজ ধরে হাতে ঝুলিয়ে আমার দিকে আসতে লাগলেন।

আমি আতঙ্কিত গলায় শুধোলাম, বিষ আছে? বিষ নেই?

কে জানে?

তাচ্ছিল্যর গলায় নবীনবাবু বললেন।

তারপর বললেন, থাকতেও পারে না-ও থাকতে পারে। আসলে সাপেরা মেয়েদের মতো –। ছোবল না-মারার আগে সব সাপকেই নির্বিষ বলে মনে হয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনার আত্মীয়স্বজন কাউকে কি সাপে কামড়িয়েছিল? সাপের ওপর আপনার এরকম তীব্র আক্রোশ কেন?

নবীনবাবু সেই চাঁদের আলোয় লাল ধুলোয় ধূসরিত পথে অনেকক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থাকলেন–যেন আমার মতো ইনকুইজিটিভ লোক এ জন্মে আর দ্বিতীয়টি দেখেননি।

তারপর বললেন, না নয়। তবে গুরুবাক্য আমি কখনো অমান্য করি না।

আমি উৎসুক হয়ে শুধোলাম, গুরুবাক্যটা কী?

নবীনবাবু বললেন, দেকেচো কী মেরেচো!

তারপর নিজেই আমাকে শুধোলেন, কি? বুঝলেন কিছু?

আমি বললাম, সাপ?

নবীনবাবু হাসলেন।

সেই চাঁদের আলোতেও তাঁর সাদা দাঁত ঝিকঝিক করে উঠল।

–শুধু সাপ নয়। দেকেচো কী মেরেচো। ফণী–আর.....।

আমি বললাম, থাক থাক। বলতে হবে না। বুঝেছি।

উনি আবার বললেন, আমার গুরু বলেছিলেন।

কথাটার অর্থ হৃদয়ংগম করতে এবং হৃদয়ংগম করে সামলে নিতে আমার অনেকক্ষণ সময় লাগল।

ততক্ষণ নবীনবাবু মরা সাপটাকে ডান হাতে নিয়ে এগিয়ে গেছেন। সাপের ল্যাজটা ধরে আছেন, থ্যাঁতলানো মাথাটা মাটিতে সড়সড় শব্দ করে ধুলোর ওপরে লম্বা দাগ টেনে দিয়ে চলেছে।

সাপটা বেশ লম্বা আর বড়ো ছিল।

আমি তাড়াতাড়ি নবীনবাবুর বাঁ-দিকে চলে গেলাম, মরা সাপকেও বিশ্বাস নেই।

তারপর ওঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে বললাম, গুরুবাক্য তো মানলেন। ফণী তো মারলেন। কিন্তু গুরু কি মরা সাপ হাতে করে নিয়েও যেতে বলেছেন?

নবীনবাবু এবার হেসে ফেললেন।

বললেন, আমার ডানহাত আটকা। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমার মুখে পুরে দিন তো?

আমি দাঁড়িয়ে পড়ে, হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরালাম, তারপর সেই সিগারেট থেকে আরও একটা ধরিয়ে নিয়ে নবীনবাবুকে দিলাম।

নবীনবাবু একগাল ধোঁয়া ছেড়ে বাঁ-হাতে সিগারেটটাকে মুখ থেকে নামিয়ে বললেন, সাপটি নিয়ে যাচ্ছি চুমকির জন্যে।

সে কে? অবাক হয়ে শুধোলাম আমি।

চুমকির সঙ্গে ভজনদা এখনও আলাপ করিয়ে দেননি? আশ্চর্য।

তারপরেই বললেন, চিড়িয়াখানার পরি, হুরি, সরি–ময়ূরী। সাহেবের গার্লফ্রেণ্ড। চুমকি সাপ খেতে বড়ো ভালোবাসে। রোজ রোজ তো ফণী দেখা যায় না; অন্যকিছুও অবশ্য না। তবে যখন দেখা যায়, তখন আমি চুমকির জন্যে। আর......

আমি নবীনবাবুকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললাম, আর আমি শুনতে চাই না।

নবীনবাবু দাঁড়িয়ে পড়ে আমার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে থেকে বললেন, আপনি মশাই একটি মহান্যাকা লোক।

আমি ব্লাশ করলাম।

অস্ফুটে বললাম, যা বলেন।

.

০৪.

ভোর চারটেয় উঠলাম। তারপর তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে গেটে এলাম।

ট্রেনটা স্টেশনে পৌঁছোয় সকাল পাঁচটার পর পর-ই। যে-ট্রেনে আমি সাহেবের সঙ্গে এসেছিলাম।

পান্ডে ড্রাইভার গাড়ি বের করে তৈরি হয়েছিল। যে স্কুটার-টেম্পো চালায়, সেও তার হলুদরঙা টেম্পো নিয়ে তৈরি।

যখন আমরা সাড়ে চারটের সময় বেরোলাম গেট খুলে, তখন পুবে সবে একটু লালের ছোপ লেগেছে। কোকিল ডাকছে, টিগরিয়ার টাঁড় থেকে,

দূর কুকরিবাগ গ্রামের দিক থেকে মুহুর্মুহু কুহু-কুহু-কুহু করে।

ফুরফুর করে হাওয়া বইছে ভারি মিষ্টি। এই সাঁওতাল পরগনার বৈশাখী ভোরগুলো ভারি সুন্দর। বৈশাখের এই ভোরের হাওয়া এই গানটা আমার কলকাতার বউদি ভারি ভালো গান।

হঠাৎ-ই গাড়ির সামনের সিটের দরজায় বাঁ-হাত রেখে বসে এই আধো-আলো আধো অন্ধকারে বউদিকে ভীষণ মনে পড়তে লাগল। আমি কাঠখোট্টা মানুষ, ভাব-টাব কবিত্ব-টবিত্ব প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই–কিন্তু মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে কত কী যে, কুরকুর করে উঠে–নিজেকে কুরে কুরে খায়। একবার ভালো লাগে, পরক্ষণেই দুঃখ লাগে–কারও কথা ভেবে ভীষণ খুশি খুশি লাগে–কাউকে ভালোবাসতে পেরে নিজের পিগমি সাইজের মনটা অনেক বড়ো হয়ে গেছে বলে মনে হয়।

বুঝি না। কেন এমন হয়। হয়তো সকলের-ই হয়–যদি কেউ কখনো কাউকে ভালোবেসে থাকে। কিন্তু হয়।

ভালোবাসার মতো দাগ ভগবান যেন কাউকে না দেন। খালি চুলকোয়–আর চুলকোলেই চুলকোনি বেড়ে যায়। ঢোল কোম্পানির মলম আছে দাদের। কোনো কোম্পানি এই দারুণ দাদের মলম যে, কেন বের করে না জানি না। এই জ্বালা, এই আরাম; এ আর সহ্য হয় না।

স্টেশনে পৌঁছে ওভারব্রিজ পেরিয়ে ওপাশের প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালাম।

এমার্জেন্সির পর ট্রেনগুলোএমন টাইমে যাতায়াত আরম্ভ করেছে যে, প্রায়-ই মনে হয় নিজের ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে। কাঁটায় কাঁটায় ভোর পাঁচটা ন-মিনিটে ধুয়ো উড়িয়ে মিথিলা এক্সপ্রেস এসে ঢুকল স্টেশনে।

ফার্স্টক্লাসের সামনে জোড়হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি–পবননন্দন যেমন করে রামচন্দ্রকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তেমন করে সাহেবের অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্যে।

আমার চাকরির সেকেণ্ড স্পেসিফিক অ্যাসাইনমেন্ট।

ট্রেন থেকে যাঁরা নামলেন তাঁদের চেহারা ও হাবভাব মোটেই প্রকৃতিস্থ বলে মনে হল না। একজন লম্বা-চওড়া। চাণ্ডিলের বেগুনের মতো গায়ের রং, মাথা-মোটা, হুবহু কাতলা মাছের মতো দেখতে-পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে শুঁড়তোলা নাগরা জুতো। সারারাত বোধ হয় পান চিবিয়েছিলেন–ঠোঁট দাঁত সব লালে লাল।

আর একজন বেঁটে-খাটো, ছিপছিপে, কালো। থুতনিতে একমুঠো ছাগলদাড়ি–তিনি পান খাননি,–কিন্তু তাঁর নীচের ঠোঁটটা এমনিতেই বুলবুলির পশ্চাৎদেশের মতো লাল।

আর একজন যিনি, তাঁকেই একমাত্র ভদ্রলোকের মতো দেখতে-কাঁধে ঝুলোনো কালো চামড়ার একটি বাক্স। সঙ্গে দু-জন মিষ্টি, নেকু নেকু মহিলা ও দু-টি বাচ্চা দেখলাম। এঁরা কার-কার স্ত্রী বুঝলাম না।

সাহেবের অতিথিদের ওভারব্রিজ পেরিয়ে প্রশেসান করে এসকর্ট করে নিয়ে যেতে লাগলাম। এঁদের সঙ্গেও লটবহর কম নয়। কাতলা মাছ ছাড়া আর দু-জনের কাঁধেই ভেড়ার ঠ্যাং-এর মতো কী একটা করে চামড়ার যন্তর ঝুলছে। কোনো বাজনা-টাজনা হবে বোধ হয়। বড়োলোকদের কারবার–আমি কতটুকু আর জানি। তবে এটুকু বুঝলাম ভদ্রলোকদের দেখেশুনে যে, চিড়িয়াখানায় আরও কিছু জন্তু, জানোয়ার তিন-চারদিনের জন্যে অতিথি হলেন।

সকলকে গাড়িতে তুলে দিলাম। লটবহর সব গাড়ির ক্যারিয়ারে, বুটে ও স্কুটার-টেম্পোতে এঁটে গেল।

স্টেশন থেকে বেরোতে বেরোতেই রোদ উঠল। সকাল থেকেই যা রোদের তাপ, কলকাতার মাখন-মাখন সুন্দরীরা যে, কী গলান গলবেন দুপুরে তা ভেবেই আনন্দ হল।

পান্ডে আগে সাহেব মেমসাহেবদের নিয়ে চলে গেল। আমি স্কুটার-টেম্পোতে সাহেবের বন্ধুর ছোটোমেয়ের হিসিকরা কাঁথার বাণ্ডিল, আধ-কামড় দেওয়া সন্দেশের বাক্স, কল লাগানো গরম কাপড়-জড়ানো রুপোর জলের বোতল এসব সামলাতে সামলাতে পাথর ছড়ানো পথে হিক্কা তুলতে তুলতে সামনের গাড়ির চাকায়-ওড়া কিলোখানেক ধুলো খেয়ে ব্রেকফাস্ট করে যখন চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছোলাম, তখন দেখলাম আসর জমে গেছে।

মেমসাহেব নিজে আমগাছের নীচের গোল শ্বেতপাথরের টেবিলে চা ও খাবার নিয়ে বসে অতিথিদের আপ্যায়ন করছেন।

চা, নোনতা মাঠরি, রসকদম, চকোলেট, সন্দেশ ইত্যাদি দিয়ে সাহেবের অতিথিরা ব্রেকফাস্ট করছেন।

মুখের ধুলোগুলো নামাবার জন্যে আমি বাবুর্চিখানায় গিয়ে রামকে বলে একগ্লাস চা নিয়ে তাড়াতাড়ি গিলে ফেললাম।

কাতলা মাছ ভারি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হল। ইতিমধ্যেই গান জুড়ে দিয়েছেন তিনি। রবীন্দ্রসংগীত। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা এবং সুরের সঙ্গে সেই রবীন্দ্রসংগীতের কোনো মিল নেই। রবীন্দ্রনাথ ও দীনুঠাকুর যদি চিরদিন মেইন লাইনে গিয়ে থাকেন তো কাতলা মাছ বরাবর কর্ড লাইনে। গলার স্বরটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ করে কথা বললে যেমন আওয়াজ হয়, অনেকটা তেমন।

ভাবলাম, চাকরি করতে হলে মানুষের কতরকম অত্যাচার-ই না সহ্য করতে হয়!

ইতিমধ্যে সেই ছাগল-দাড়ি ভদ্রলোক কাঁধের ভেড়ার ঠ্যাংটা খুলে ফেললেন।

ওমা :, বাজনা নয়; দেখি একটা বে-জোড় বন্দুক।

খুলে ফেলেই বন্দুকটা জোড়া লাগিয়ে ফেললেন–লক-স্টক ব্যারেল।

তাহলে সবগুলোই বন্দুক!

মেমসাহেব বললেন, টিকলু, এঁরা সব বিখ্যাত শিকারি। তুমি পান্ডের সঙ্গে এঁদের বিকেলে টিগরিয়া পাহাড়ের নীচে নিয়ে যাবে তিতির মারবার জন্য। পান্ডে জানে, কোথায় তিতির থাকে বিকেলে।

আমি মাথা নাড়লাম।

একটু পরেই একটি নতুন কচি-কলা-পাতা রঙা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি এসে উপস্থিত হল।

তা থেকে ফুটফুটে তিনটি বাচ্চা ও হেমামালিনী ও সিম্মিকে একসঙ্গে ব্রাহ্মীশাক দিয়ে হাঁড়িতে সেদ্ধ করলে যেরকম সৌন্দর্য হয় তেমন-ই সুন্দরী এক মহিলা বাঁ-দিকের দরজা দিয়ে নেমে ফিক করে হাসলেন। ডান দিকে দেড়খানি গজদন্ত।

তারপরে তাঁর স্বামী নামলেন।

একটা শেতলপাটিকে গোল করে পাকিয়ে মাটিতে শুইয়ে তার ওপর দিয়ে স্টিমরোলার চালিয়ে দিলে যেমন চ্যাপটা, ফ্যাকাশে, লেন্থ-উইদাউট-ব্রেথ একটা ব্যাপার হয়, ভদ্রলোক ঠিক তেমন দেখতে। উনিও হাসলেন।

হাসিটাও চ্যাপটা দেখাল। এবারে নরক গুলজার।

হঠাৎ মেমসাহেব বললেন, টিকলু, ডেয়ারি আর পোলট্রি থেকে ডিম আর দুধের রিকুইজিশন স্লিপ পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে নাও। বাজারের লিস্ট আমি করে রেখেছি। পানটা লিখতে ভুলে গেছি। তুমি তিনশো পান আনবে।

ছাগল-দাড়ি আঁতকে উঠে বললেন, তিনশো পান কে খাবে?

মেমসাহেব একটু হাসলেন। বললেন, এখানে অনেক ছাগলের সমাবেশ- ভাববেন না। দেখতে দেখতে সব পান উড়ে যাবে। আমি ভালো করে পান সাজি তারপর দেখবেন পান কোথায় থাকে।

কাতলা মাছ সন্দেশ মুখে জবজবে গলায় বললেন, বাঃ বাঃ। আমি একাই আদ্ধেক খাব।

ভাবলাম বলি, রামছাগলে তাই-ই খায়।

আমি চলে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মেমসাহেব ডেকে বললেন, শোনো আজ আমি এদের নিয়ে থাকব। তুমি ভাই আজ পাঠশালা চালাবে।

আমি মাথা নাড়লাম। আমার মুখটা কেমন দেখাল তা ওঁরাই বলতে পারতেন।

আমার কাজকর্ম শেষ হতে না হতেই, মেমসাহেব তলব করলেন। বললেন, পোোেরা এসে গেছে, এইবার তুমি ওদের নিয়ে পড়ো।

চিড়িয়াখানা আর গ্রিনহাউসের মাঝামাঝি একটা বড়ো চাঁপাগাছের নীচে গোল সিমেন্টের বেদি। তার নীচে গোটা বারো-সাত থেকে দশ বছরের বাচ্চা ছেলে জমায়েত হয়েছে। সকলেই প্যান্ট-শার্ট পরে আছে; সব একরকম। সবুজ রঙের। বুঝলাম, মেমসাহেবের-ই দান।

সংস্কৃততে আমি পনেরো পেয়েছিলাম–স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায়। ফলে ফেল করেছিলাম। আমি হিন্দি সিনেমা দেখে হিন্দি একটু বলতে শিখেছি কিন্তু পড়তে পারি না। ছেলেগুলোর সকলের হাতেই দেখলাম হিন্দি অ আ ক খ-র বই।

ছেলেবেলা থেকে একটা সাধ ছিল যে, শান্তিনিকেতনে বাংলার অধ্যাপক হব। আম্রকুঞ্জে, এমন-ইবৈশাখী ভোরের হাওয়ায় আমি ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, কাঁধে পাট করে চাদর ঝুলিয়ে বসব–আমার সামনে গোল হয়ে বসে থাকবে একগুচ্ছ রজনিগন্ধার মতো সুন্দরী, সুরুচিসম্পন্না যুবতীরা, আর আমি তাদের শেষের কবিতা পড়াব।

কিন্তু কী অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স! আজ সেই বৈশাখী ভোরেই আমি বসে আছি। ফুটন্ত জীবন্ত চাঁপারা নেই–বসে আছি একটা কেঠো কাঁঠালিচাঁপা গাছের নীচে–আর হাতে উলটো করে ধরা একটা হিন্দি বই।

আমি বললাম, বোলো বাচ্চে, অ।

ওরা বলল, ও।

বললাম, বোলো, আ।

ওরা বলল, ইয়া।

বুঝলাম, আমার চাকরিটা থাকবে না।

ইতিমধ্যে মেহবুবকে হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসতে দেখা গেল।

মেহবুব এসে বলল, মেমসাহেব বলেছেন আপনাকে এক্ষুনি বাজার যেতে–আমিই পাঠশালা চালাব এখনকার মতো।

ছেলেগুলো ও মেহবুবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাজার থেকে ফিরতে বেলা হল। রামকে বাজারের জিম্মা ও মেমসাহেবকে পানের জিম্মা দিয়ে আমি চান-টান সারতে আমার কোয়ার্টারের দিকে এগোচ্ছি, এমন সময় ভজনদার সঙ্গে দেখা।

ভজনদা খুব ব্যস্তসমস্ত দেখা গেল।

বললাম, কী ব্যাপার?

-আরে, ব্যাপার আবার কী? সাহেব-মেমসাহেবের আর কী? উঠল বাই তো কটক যাই। আজ তোমাকে এবং আমাকে ওঁদের তিতির মারতে নিয়ে যেতে হবে বিকেলে। কাল পূর্ণিমার রাতে সুজানী গ্রামে সাঁওতালি নাচের বন্দোবস্ত করতে হবে। কুকরিবাগ, বদলাডি ও সুজানী তিন গ্রামে মেয়ে-মদ্দ জড়ো করতে হবে সুজানীর বড়ো অশ্বত্থ গাছতলায়। তাদের জন্যে বিস্তর মহুয়ার বন্দোবস্ত করতে হবে। সেখানে নাচ-গান হবে সারারাত।

তারপর বললেন, আরে অর্ডার দিলেই তো হল না, যে ইন্তেজাম করে, সেই বোঝে কী ঝকমারি?

আমি নার্ভাস হয়ে গিয়ে বললাম, বিকেলে তিতির বেরোবে তো ভজনদা? না বেরোলে?

ভজনদা চটে উঠে বললেন, তিতির কি আমার পুষ্যি, যে, আমার কথায় উঠবে বসবে? তাদের ইচ্ছে হলে বেরোবে, ইচ্ছে না হলে বেরোবে না।

যদি না বেরোয়, তাহলে সাহেবরা কী মারবেন?

ভজনদা রেগে গিয়ে বললেন, না বেরোলে আমরাই পেছন ফিরে দাঁড়াব। আমাদের-ই মারবেন। আর কী করতে পারি?

তারপর একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, তুমি চললে কোথায়?

বললাম, স্নান করতে।

-অ্যাই দ্যাখো! এ কী তোমার কলকাতা নাকি? চান করে নেবে সকাল-সকাল, জল তখন ঠাণ্ডা থাকে। এখন চান করা-না করা সমান। একেবারে বিকেলে সাহেবদের তিতির মিতির মারিয়ে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে সন্ধের সময় চান কোবরা। এখন চলল আমার সঙ্গে পোলট্রিতে একটু কাজ আছে–ঘুরে আসি।

কাল এসে পর্যন্ত পোলট্রিটা দেখা হয়নি। ভাবলাম, ভজনদার সঙ্গে দেখে আসি।

.

অনেক দূর হেঁটে গেলাম রোদে। হঠাৎ দূর থেকে দূরাগত অদ্ভুত একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। আওয়াজটা একটা ঝিমধরা সম্মিলিত কাকলি। ওই গমগমে সমুদ্রের হালকা ঢেউ ভাঙার আওয়াজের মতো আওয়াজ যে, মুরগির আওয়াজ তা অনুমান করার ক্ষমতাও আমার ছিল না।

যতই এগোতে লাগলাম, ততই আওয়াজটা বাড়তে লাগল। একেবারে কাছে যেতে ভজনদা আমার কী বলছিলেন, তা শুনতে পর্যন্ত পাচ্ছিলাম না।

পোলট্রির সামনে পৌঁছে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আধুনিকতম কায়দায় লাইটরুফ এর ছাদ দেওয়া মুরগির লম্বা শেডের পর শেড। সমস্ত সাদা ধবধবে লেগ-হর্ন মুরগি। একটা শেডের কোণায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, প্রায় কোয়ার্টার মাইল লম্বা মুরগির খাঁচাগুলোর নীচে লাগানো টিনের স্লিপে ডিম গড়িয়ে আসছে আর খাকি হাফপ্যান্ট ও শার্ট পরা তিনটে লোক ক্রমান্বয়ে সেই ডিম কুড়িয়ে নিয়ে চলেছে একটা ঝুড়ির মধ্যে।

ভজনদা আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ওরা হচ্ছে কালেক্টর।

–দিনে কত ডিম হয়?

আমি বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে শুধোলাম।

ভজনদা বললেন, এখন গরমের সময়, এখন কম পাই আমরা–তা এখনও প্রায় পনেরোশো থেকে আঠেরোশো হয়। শীতকালে আড়াই থেকে তিন হাজার।

তি-ন-হা-জা-র-? আমি নাভি থেকে শ্বাস টেনে বললাম।

ভজনদা নন-চ্যালান্টলি বললেন, ইয়েস।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল যে, শেডের মধ্যে কেবল-ই মুরগি। মোরগ নেই

একটাতেও। ব্যাপারটা আমার পশুপাখির প্রজননবিদ্যা সম্বন্ধে যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাতে পরিষ্কার হল না। এই ম্যাজিকটা কী করে সম্ভব হচ্ছে আমার মাথায় ঢুকল না।

ভজনদাকে ভয়ে ভয়ে শুধোতেই উনি আমার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকালেন।

তারপরেই বললেন, ও সরি! তোমার তো বিয়ে-থা হয়নি।

তার পরমুহূর্তেই বললেন, বিয়ে না হলেই বা কী? মেয়ে-ছেলেদের যেমন শীতের সকালে দাড়ি কামাবার কষ্ট ভগবান দেননি তেমন আবার অন্য কিছু কিছু কষ্ট এবং কমপ্লিকেশান ভগবান তাদের দিয়েছেন তা জানো তো? মানে যা পুরুষদের দেননি।

অস্বস্তিতে আমার কান লাল হল।

মুরগিগুলোর দিকে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, এই মুরগিগুলো মানুষের মেয়েদের চেয়ে অনেক স্বাধীন। এরা মোরগ ছাড়াই, অন্য কারও কোনো কষ্টকর ও ক্লান্তিকর সহযোগিতা ছাড়াই অবলীলায় মা হয়ে যায়। শশীকলা যেমন আকাশে ক্যালেণ্ডারের তারিখ মতো বৃদ্ধি পায়, এরাও তেমনি ক্যালেণ্ডারের তারিখমতো ডিম দিয়ে যায় সাহেবকে। সব-ই সাহেবের কপাল!

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন ভজনদা, ব্যাপারটা কী ইন-হিউম্যান ভেবে দ্যাখো! এরা জীবনের একটা কী ভাইটাল আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাহেবকে ডিম জোগানোর জন্য। মাঝে মাঝে যখন আমার সাহেবের ওপর রাগ হয়, তখন আমার খুব বিদ্রোহ করতে ইচ্ছে হয়।

আমি বললাম, কলকাতার কিড স্ট্রিটে একটা অর্গানাইজেশন আছে, তার নাম অ্যানিমাল লাভারস সোসাইটি। তাদের একটা বার্ড লাভিং উইং খুলতে বলে আপনার কেসটা সেখানে পুট-আপ করে দিলে মন্দ হয় না!

ভজনদা অবাক হয়ে বললেন, আছে নাকি? সত্যি!

তারপর ভজনদা পোলট্রির যিনি ইনচার্জ সাহেবের পার্টনার–মল্লিকবাবু তাঁর সঙ্গে কীসব কাজের কথাবার্তা বলার পর দূরে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন, ওই যে দেখছ ওই শেডটা–ওইখানে এগলেয়িং বার্ডস নয়, টেবল-বার্ডস ডেভেলাপ করা হয়।

মানে? আমি শুধোলাম।

–মানে, খাওয়ার মুরগি। মুরগির বেলায় মানুষের মেয়েদের নিয়ম খাটে না। এখানে যে রাঁধে, সে রাঁধেই; যে চুল বাঁধে সে তাই-ই বাঁধে। বুজেছো?

-বুঝলাম।

আমি বললাম।

একটা লোক ডিম কুড়োচ্ছিল এবং অন্য একটা লোক বালতি করে গুঁড়ো গুঁড়ো কী যেন খাবার এনে মগে করে করে সব ছোটো ছোটো খোপে দিচ্ছিল।

আমি শুধোলাম, এগুলো ওরা কী খাচ্ছে ভজনদা?

ভজনদা বললেন, একে বলে চিকেন-ফিড। আমরা এখানেই তৈরি করি।

-কী দিয়ে তৈরি করেন?

-আরে আমি কী ছাই করি! এসব মল্লিক সাহেবের কাজ। পন্ডিত লোক- মুরগি সম্বন্ধে স্বয়ং ব্রহ্মার চেয়েও বেশি জ্ঞান রাখেন।

বললাম, কী দিয়ে চিকেন-ফিড বানানো হয়, একেবারেই জানেন না?

একটু একটু জানি। ভজনদা বললেন।

বললাম, সেই একটু একটুই বলুন শুনি।

ভজনদা বললেন, ভুট্টার গুঁড়ো, গমের গুঁড়ো, অয়েল রাইস ব্র্যান, বাদাম খোল, ফিশ মিল অর্থাৎ মাছের গুঁড়ো, অস্টার-শেল ক্রাশ, মানে শামুকের খোলের গুঁড়ো, ভিটামিন রুবি মিক্স, পোলট্রি মিনারাল সল্ট এইসব

মিলিয়ে-টিলিয়ে চিকেন-ফিড তৈরি হয় আর কী।

আমি বললাম, এ তো এলাহি কান্ড।

ভজনদা বললেন, চার হাজার মুরগি পোষা এবং দিনে আড়াই হাজার ডিম পয়দা করা এবং তার থেকে ফায়দা করাও তো এলাহি কান্ড। আমার সাহেব নিজে যেমন সাড়ে ছ-ফুটি, সাহেবের কান্ড-মান্ডও সব এলাহি।

তারপর ভজনদা পোলট্রির পাশে একটা ছোট্ট পাকা দোতলা বাড়িতে নিয়ে এলেন। এই বাড়িতে পৌঁছোবার আগেই চিউ চিউ শব্দ শুনতে পেলাম।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এখানে কী?

ভজনদা বললেন, এখানে সব ডে-ওল্ড চিকস রাখা আছে। মুম্বাই আরবার-এফারস ফার্মের মতো সাহেবেরও ইচ্ছে লেগহর্নের ডে-ওল্ডের চিকের ব্যাবসা করার।

দেখলাম একটা কালো অ্যালসেশিয়ান কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়িটাতে।

আমি শুধোলাম, কুকুরে মুরগির বাচ্চা খেয়ে ফেলে না?

ভজনদা বললেন, এর নাম কী জানো? এর নাম রেখেছেন সাহেব, বিবেক। যাত্রা দেখেছ কখনো? আধুনিক যাত্রা নয়, পুরোনো যাত্রা। যাত্রা-দলে একজন করে বিবেক থাকত। সে মাঝে মাঝেই এসে একটা করে

গান গেয়ে নায়ক-নায়িকার বিবেক জাগিয়ে দিয়ে চলে যেত। বিবেক-ই তো এই ডে-ওল্ড চিকসদের শেয়াল, ভাম, সাপ এদের হাত থেকে রক্ষা করে। রক্ষক কখনো ভক্ষক হয়? হয় হয়তো। কিন্তু হওয়া অনুচিত।

একটা বছর বারো-তেরোর সুন্দর ছেলে উলের ব্যাডমিন্টন বলের মতো গোল গাল হলুদ হলুদ বাচ্চাগুলোর দেখাশোনা করছিল। খাবার ও জল দিচ্ছিল।

সে ভজনদাকে আতঙ্কিত গলায় বলল, বাবু হিঁয়া বড়কা বড়কা বহত চুঁহা আয়া হ্যায়।

ভজনদা বললেন, বলিস কীরে? মল্লিক সাহেবকে খবর দিয়েছিস?

তারপর বললেন, আহা! খুব চিন্তার কথা। আমিও এক্ষুনি খবর দিচ্ছি।

তারপর তার দিকে ফিরে হঠাৎ বললেন, আরে ও ছোটুয়া, মুরগির বাচ্চা যদি বড়কা বড়কা ছুঁচোয় খেয়ে যায় তাহলে সাহেবের কিছু ক্ষতি হবে– কিন্তু মুরগি আবারও ডিম পাড়বে, ডিম ফুটে আবারও বাচ্চা হবে। কিন্তু তুই তো রাতে এখানেই শুয়ে থাকিস; খুব সাবধানে থাকিস।

ছোটুয়া অবাক হয়ে বলল, কাহে বাবু?

আমিও ভজনদার কথা শুনে অবাক হলাম। ছুঁচোয় তো আর মানুষ খাবে

না। মুরগির বাচ্চা খেলেও খেতে পারে।

আমিই ভজনদাকে শুধোলাম, একথা কেন বলছেন?

ভজনদা বললেন, তুমি একেবারে বালখিল্য।

কেন? আমি বোকার মতো শুধোলাম।

ভজনদা গম্ভীর চিন্তান্বিত মুখে বললেন, ছুঁচোয় মানুষের শরীরের সবচেয়ে নরম জায়গা

ছোটুয়া আতঙ্কিত গলায় বলল, হামারা নাক খা লেগা?

ভজনবাবু বললেন, আরে হতভাগা! নাক গেলে না হয় সাহেব প্লাস্টিক-সার্জারি করে তোর নাক গজিয়ে দেবেন। নাকের চেয়েও নরম জায়গা কি পুরুষের শরীরে নেই? হতভাগা! সে জায়গা খেয়ে গেলে গেল–চিরদিনের মতোই গেল। পৃথিবীর কোনো দোকানেই স্পেয়ার পার্টস পাওয়া যাবে না।

ছোটুয়া কথাটার তাৎপর্য ভালো করে হৃদয়ংগম করার আগেই ভজনদা আমার দিকে ফিরে বললেন, টিংকু, তুমিও সাবধানে থেকো–বড়োই চিন্তার বিষয়।

ছোটুয়া অত্যন্ত উত্তেজিত ও বিচলিত হয়ে শুধোল, তব বাবু ম্যায় কা

করে?

ভজনদা একটু ভেবেই বললেন, তারের জাল দিয়ে একটা জাঙিয়া বানিয়ে নে। আমাকে বললেন, তুমিও একটা বানিয়ে নিয়ে। তারপর-ই আমার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে উত্তিষ্ঠিত হওয়ার আগেই বললেন, চলো চলো, অনেক বেলা হল। এবার যাওয়া যাক। তুমি তো আবার সাহেবদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করবে।

৫-৬. বিকেলের রোদ

০৫.

তখনও বিকেলের রোদ ছিল। বেশ কড়া রোদ। ভজনদা সাহেবদের বলে রেখেছিলেন যে, তিতিরের জায়গায় পৌঁছোতে প্রায় কুড়ি মিনিট কী আধঘণ্টা লাগবে। অতএব বেলা থাকতে থাকতে না গেলে তিতির পাওয়া যাবে না।

আমি, ভজনদা, পান্ডে ড্রাইভার সব বাংলোর কাছে ঠা ঠা রোদে চারটের থেকে দাঁড়িয়ে আছি। সাহেবের অতিথিদের সাড়াশব্দ নেই। পান্ডে নিজে শিকারি না হলে কী হয় তার উৎসাহ দেখলাম শিকারিদের চেয়েও বেশি। সে কেবল-ই বলছে, বড়ি দের হো রহা হ্যায়। ইতনা দের করনেসে চিড়িয়া মিলেগা নেহি।

ভজনদা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বললেন, তা আমাকে বলছিস কেন? সাহেবের

মেহমানদের ঘুম ভাঙিয়ে কি চাকরিটা খাব?

একটা ঘর থেকে ফোঁ-ফোঁ, ফোঁ-ফোঁৎ করে নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল।

ভজনদা আঙুল দিয়ে ঘরটা দেখিয়ে আমার দিকে চেয়ে চোখের ভুরুতে নীরব প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকলেন।

বললেন, এ কোন জানোয়ার?

আমি বললাম, ওটা কাতলামাছের ঘর।

কাতলামাছ?

ভজনদা অবাক হয়ে শুধোলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ। একজন কাতলামাছ, একজন ছাগলদাড়ি, একজন শেতলপাটি এবং একজন মাত্র ভদ্রলোক। তিনি ফোটোগ্রাফার।

ভজনদা বললেন, কম্বিনেশনটা দারুণ। তার সঙ্গে দাঁড়কাক পাতিকাক। আজকে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

ঠায় আধঘণ্টা আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম সেখানে। চা পর্যন্ত খাইনি কেউ। কিন্তু বাড়ির মধ্যে যে, কেউ জেগেছেন এমন লক্ষণ দেখলাম না কোনো।

ওপাশের ঘর দুটো থেকে এয়ার কণ্ডিশনারের মৃদু ঝিরঝির শব্দ ভেসে আসছে শুধু।

প্রায় পৌনে পাঁচটা নাগাদ কাতলামাছ হেঁড়েগলায় চিৎকার করলেন, মেহবুব, চায়ে....।

ভজনদা বললেন, যাক তাও নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সাহেবরা প্রায় সোয়া-পাঁচটা নাগাদ বেরোলেন। তাদের পোশাক-আশাক দেখে আমরা থ!

ছাগল-দাড়ি এসে অবধি একটা হাফ-প্যান্ট পরেছেন, যেটাকে হাফ-প্যান্ট না বলে সুইমিং ট্রাঙ্ক বলাই ভালো। কোনোক্রমে লজ্জা নিবারণ হয়। ওপরে নীলরঙা ব্যাংলনের গেঞ্জি। কাতলামাছও এসে অবধি একটা লাল জিনের ফ্লেয়ার গলিয়ে নিয়েছেন, ওপরে জিনের লাল শার্ট–দারুণ দেখাচ্ছে। শেতলপাটির পরনে খাকি প্যান্ট, সঙ্গে লাল মোজা, কালো জুতো, গায়ে খালিজ-ফেজেন্টের মতো ছিটছিট খয়েরি জামা। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোকের গায়ে হলুদ ব্যাংলনের গেঞ্জি–টেরিকটের কালো প্যান্ট। সকলের হাতেই গুপী-যন্তর। শুধু কাতলামাছের হাত খালি। সকলের চোখ-মুখ-ই দুপুরে জাপানিজ টি-হাউসে বসে বিস্তর বিয়ার পানের পর চোব্য-চোষ্য খেয়ে ও ঘুমিয়ে, ফুলে উঠেছে।

সকলে একে একে গাড়িতে এসে উঠলেন। মেমসাহেবরা এসে তাঁদের

আঙুল-নেড়ে সি অফ করে গেলেন। কাতলামাছের বউ নেই। থাকার কোনো সম্ভাবনাও নেই বলে মনে হল। এরকম লোককে বিয়ে করে কোন মহিলা জীবনের ওপর ট্রাক্টর চষবেন?

সামনের সিটে পান্ডে, আমি, ভজনদা ও কাতলা মাছ, পেছনে বাকি তিনজন, কাতলা মাছ একাই অর্ধেক সিট জুড়ে বসেছেন, আমি, ভজনদা ও পান্ডে শুঁটকি মাছের মতো গায়ে গায়ে সেঁটে বসে আছি। পান্ডের শরীরটা প্রায় সিটের বাইরে। পশ্চাৎদেশের পাঁচশো গ্রাম মাংস কোনোক্রমে সিটে ঠেকিয়ে সে যে, কী করে স্টিয়ারিং ঘোরাচ্ছে, গিয়ার চেঞ্জ করছে! সেই-ই জানে।

বাজারের কাছের ঘড়িঘরের পাশের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে আমরা দুমকা রোডে পোঁছালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা জায়গায় এসে পড়লাম।

বেশ লাগছে- গরম হলেও হু-হু শুকনো হাওয়া। মনের মধ্যের সব আদ্রতা শুষে নেয়।

যখন আমরা মেন লাইনের লেভেল-ক্রসিং পেরিয়ে টিগরিয়া পাহাড়ের কোলে এসে পোঁছোলাম তখন তিতিররা প্রত্যেকেই রাতের মতো শোয়ার বন্দোবস্ত করছে। আলো বিশেষ নেই-ই বলতে গেলে।

কিন্তু এখানের তিতিরদের মধ্যে আত্মহত্যাপ্রবণতা যে, এমন বেশি আমার

তা জানা ছিল না।

দু-পাশে ঝাঁটি-জঙ্গল-খোলা টাঁড়-লাল খোওয়াই।

কাতলামাছ স্বগতোক্তি করলেন, খরগোশ, তিতির ও ক্যাজুয়াল লেপার্ডের আইডিয়াল জায়গা।

এমন সময় পান্ডে জোরে ব্রেক কষল।

দেখলাম বাঁ-দিকে পথের পাশেই একটা বড়কা তিতির দাঁড়িয়ে পড়ে মুখ হাঁ-করে কাতলামাছকে দেখছে।

মুহূর্তের মধ্যে শেতলপাটি পেছন থেকে গাড়ির জানলা দিয়ে বন্দুকের নল বের করে দেগে দিলেন।

তিতিরটার চোখে কাতলামাছের ছবিটা ফিল্টারড হয়ে তার ব্রেনে পৌঁছোবার আগেই তিতিরটা দু-ঠ্যাং ওপরে তুলে উলটে গেল।

প্রায় নল ঠেকিয়েই মারা হয়েছিল। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়নি এই-ই যথেষ্ট।

পান্ডে মুহূর্তের মধ্যে নেমে দৌড়ে গিয়ে তিতিরটা তুলে এনে বুটে রাখল।

গাড়ির মধ্যে কনগ্রাচুলেশানস, গুড শট ইত্যাদি শোনা গেল।

কাতলামাছ উত্তেজনায় ভুরুক-ভুরুক করে পাইপ খেতে লাগলেন।

পাইপের মধ্যে এত নিকোটিন আর থুতু জমেছে যে, থেলো-কোর মতো আওয়াজ করছে পাইপটা। লোকটা থ্রোট বা টাঙ ক্যান্সার হয়ে মরল বলে, মরার আর দেরি নেই; মনে হল আমার।

আর একটু এগিয়ে যেতেই পথের ডানদিকের টাঁড় থেকে দুটো বড়ো তিতির ভরররর আওয়াজ করে উঠল।

উড়তেই দেখি, অর্ধ-নগ্ন ছাগল-দাড়ি নেমে পড়ে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে একবার এদিকে আর একবার ওদিক করে দুটো গুলি করলেন।

উড়োপাখি দুটোই ঝুপ ঝুপ করে পড়ে গেল।

এবার আমার-ই তারিফ করতে ইচ্ছে হল। শিকারি বটে। ইচ্ছে হল, ছাগল-দাড়ির দাড়িতে চুমু খেয়ে দিই।

পরক্ষণেই ভাবলাম, আমার কপালে চুমু খাওয়ার এ ছাড়া আর কোন জায়গা জুটবে? একটা হীনম্মন্যতা আমাকে ছেয়ে ফেলল। নিজের বাসানার সুতো মনের লাটাইয়ে গুটিয়ে নিলাম।

পান্ডে গিয়ে পাখি দুটোকে আবারও নিয়ে এল।

এখন পরিবেশটা বড়ো মনোরম হয়ে এল। কুয়াশার মতো সদ্যোজাত

নরম অন্ধকার। প্রসন্ন চাঁদটা ইতিমধ্যেই পাহাড়ের গা বেয়ে উঠেছে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা নীল স্নিগ্ধ শান্ত শরীরে ফুটে উঠেছে।

আমি বাঙালির ছেলে। সাঁওতাল পরগনায় এই-ই প্রথম। ভারি ভালো লাগছে। দুমকার পথটা নরম সবুজ ঝাঁটি-জঙ্গলের আর পাহাড়ের মাঝ দিয়ে গিয়ে সামনেই একটা হঠাৎ বাঁক নিয়েছে। মাঝে মাঝে লাল মাটির খোওয়াই। পূর্ণিমার চাঁদ, সন্ধ্যাতারা, বনের সবুজ আর লাল এবং পিচ-ঢালা পথের কালো মিলে-মিশে একটা দারুণ সুন্দর কম্পোজিশনের সৃষ্টি হয়েছে।

এমন সময় বাঁ-দিকে প্রায় পঁচিশ-তিরিশ গজ দূরে একটা একলা দার্শনিক তিতিরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ভজনদার কাছে শুনেছিলাম যে, তিতির সাধারণত দলে থাকে অথবা জোড়ায় থাকে। মনে হল, এখানের তিতিরগুলোর দাম্পত্যজীবন বিশেষ সুখের নয়। নইলে এরা এমনভাবে এই আধো-অন্ধকারে গুলিভোর হওয়ার অভিপ্রায়ে আত্মহত্যা করার জন্যে একা একা দাঁড়িয়ে থাকবে কেন?

এবার ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক নামলেন। হাতে বন্দুক নিয়ে।

ভদ্রলোকের শিকারের প্রক্রিয়াটা অদ্ভুত লাগল। উনি গাড়ি থেকে বসেই গুলি করতে পারতেন, তিতিরটা কাছেই ছিল, কিন্তু তা না করে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরেই তিনি তিতিরটার পেছনে দৌড় লাগালেন।

তিতিরটা প্রথমে এই চোর চোর খেলাটা খেলতে চায়নি। অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

যখন শিকারি তার পাঁচ হাতের মধ্যে দৌড়ে গেলেন, তখন বোধ হয় ওর মনে বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা হঠাৎ জাগরূক হয়ে উঠে থাকবে।

সেও এই অদ্ভুত শিকারির কারবার দেখে ঝেড়ে দৌড় লাগাল।

তিতিরের দৌড় দেখতে ভারি মজার। ওয়াল্ট-ডিজনির ছবির হাঁসের মতো দৌড়োয় এরা।

তিতিরও দৌড়োচ্ছে, হলুদ গেঞ্জিও দৌড়াচ্ছেন। বন্দুকের কথা বেমালুম ভুলে গেছেন শিকারি। তাঁর মনে বন্দুকটা হঠাৎ লাঠি হয়ে গেছে বোধ হয়।

দেখতে দেখতে দু-মিনিটের মধ্যে শিকারি ও শিকার আমাদের সকলের চোখের সামনে থেকে খোওয়াই-এর মধ্যে জঙ্গলের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাতলামাছ, শেতলপাটি এবং ছাগল-দাড়িকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল। চিন্তায় দাঁড়কাকের অবস্থা ঝোড়োকাকের মতো হয়ে গেল।

.

ভজনদা একেবারে গরম দুধে মুড়ির মতো চুপসে গেলেন। যদি সাহেবের একজন অতিথিকেও এখানে রেখে যেতে হয়, তাহলে ভজনদাকেও চাকরি এখানে রেখে চিরদিনের মতো জয়নগর-মজিলপুরে গিয়ে মোয়া খেয়ে বাদবাকি জীবন কাটাতে হবে।

যখন দশ-পনেরো মিনিট হয়ে গেল তখন সাহেবরা সমস্বরে বামাপদ বামাপদ বলে চেঁচাতে লাগলেন। ওঁরা এমন সুরে ও পর্দায় বামাপদকে ডাকছিলেন যে, হঠাৎ আমার মনে হয় বাল্মীকি প্রতিভা-র বাল্মীকি-রাঙাপদ, পদযুগে প্রণমি হে ভবদারা গাইছেন। বামাপদ কথাটাকে হুবহু সেই গানের রাঙাপদ বলে মনে হচ্ছিল।

কিন্তু আসন্ন রাতের জঙ্গল থেকে, পাহাড় থেকে বামাপদর কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

সকলে চিন্তিত হয়ে উঠলেন। নীল ছাগল-দাড়ি ওইদিকে হলুদ বামাপদকে খুঁজতে গেলেন।

এমন সময় গাড়ির একেবারে গায়ের পাশ থেখে কুঁই কুঁই আওয়াজ শোনা গেল।

আমরা তাকিয়ে দেখি, চারটে তিতির আর তাদের সঙ্গে একপাল একশোগ্রাম ওজনের সুনটুনি-মুনটুনি বাচ্চা।

বিনা বাক্যব্যয়ে কাতলামাছ শেতলপাটির হাত থেকে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিয়ে গদাম করে মা-বাচ্চাদের ওপর কসাইয়ের মতো দেগে দিলেন। দুটো তিতির পড়ে গেল, দুটো উড়ে গেল; আর বাচ্চাগুলো মিনি লাটুর মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল।

শেতলপাটি বললেন, পাকড়ো, পাকড়ো।

আদেশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি, ভজনদা আর পান্ডে বাচ্চাগুলোর পেছনে পেছনে দৌড়োতে লাগলাম। এবং বারংবার বডি-থ্রো করতে লাগলাম। সে-এক হাসির ব্যাপার। দৌড়োতে গিয়ে ভজনদা পাথরে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়লেন। কিন্তু পরক্ষণেই উঠে পড়ে আবার দৌড়োলেন।

চাকরি রাখতে যে, এমন সার্কাসও করতে হবে তা কোনোদিন ভাবিনি।

যখন আমরা তিনজন ফিরলাম, তখন ভজনদা বুক-পকেটের ওপর থেকে দুটো বাচ্চা উঁকি মারছিল আর আমার আর পান্ডের দু-হাতের তেলের মধ্যে আরও চারটে করে বাচ্চা।

ভজনদা হুংকার ছাড়লেন। খবরদার। সাহেব যদি জানতে পারেন যে, একটা বাচ্চাও মরে গেছে তো সর্বনাশ হবে। এদের যত্ন করে গাড়ির বুটের মধ্যে রাখো।

শেতলপাটি মৃদু ভসনা করলেন। বললেন, বাচ্চাসুদু মারলে?

কাতলামাছ লাজুক মুখে বললেন, কী করব বলো? সংযম ব্যাপারটা যে, আয়ত্ত হল না জীবনের কোনোক্ষেত্রেই।

ইতিমধ্যেই হলুদ বামাপদ ও নীল ছাগল-দাড়ি এসে হাজির হলেন প্রায় অন্ধকার ফুঁড়ে।

ছাগল-দাড়ি শুধোলেন ভজনবাবুকে, ভজনবাবু এতটুকু-টুকু বাচ্চাদের বাঁচাবেন কী করে?

ভজনদা গর্বিত গলায় বললেন, তাহলে আর এতদিন চিড়িয়াখানার ম্যানেজারি কী করলাম।

কী খাওয়াবেন ওদের? শেতলপাটি প্রশ্ন করলেন।

ভজনদা উত্তর দিলেন, উই পোকা, পোস্ত দানা আর জল। দেখবেন, সব কটাকে ঠিক বাঁচিয়ে তুলব।

রাতে তিতির শিকার করে ফিরে আসার পর ছাগল-দাড়ি, শেতলপাটি ও ভদ্রলোকের মেমসাহেবরা মিলে লনে বসে গান-বাজনা করবেন বলে ঠিক করলেন। বউরানিও ছিলেন। কাতলামাছ যেন কোর্ট জেস্টার। আগের দিনের রাজরাজড়ার বিদূষকের মতো। যাই-ই হোক, সবসময় হেঁড়েগলায় রসিকতা করে গান করে সকলকে আনন্দ দান করছেন তিনি। তিনি নিজে জানেন না যে, তাঁর চেহারাটাই এমন যে, তাঁকে দেখলে লোকের

এমনিই হাসি আসে।

ভাগ্যিস জানেন না।

বউরানি বড়ো ভালো গান গাইলেন। ছেলেবেলায় উনি বেনারসে মানুষ হয়েছিলেন। গজল ও ঠুংরির গায়কি। ডান হাতের পাঁচখানা আঙুল নাড়িয়ে তিনি যখন গজল গান তখন না-দেখে গহরজান বা মালককা-জান বাইজিদের গায়কির কথা মনে পড়ে যায়। পড়েছিলাম যে, গহরজান যখন পান খেয়ে পানের পিক গিলতেন তখন নাকি তাঁর ধবধবে ফর্সা গলা দিয়ে পানের পিকের রক্তিমাভাকে নামতে দেখা যেত। মেমসাহেব পান খেয়ে পিক গিললেও বোধ হয় তেমন-ই দেখা যায়। চাঁদের আলোয় বোঝা যাচ্ছিল না। ভাবলাম, একদিন দিনের আলোয় ভালো করে লক্ষ করতে হবে।

শেতলপাটি মেমসাহেব বললেন, আমি তবলা ছাড়া গাইতে পারি না।

অমনি বউরানি বললেন, টিকলু, লেডকেনিকে ডাকো।

আমি না বুঝে বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

বউরানি বুঝতে পেরে বললেন, সরি। লালমোহনকে।

আমি আরও অবাক হয়ে বললাম, যিনি বাঁশের কাজ করেন?

-নীলমোহনবাবু?

–হ্যাঁ।

আমি আর সময় নষ্ট না করে নীলমোহনবাবুকে ডাকতে চললাম।

দাঁড়িয়ে পড়ে যে, ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবব, তারও সময় নেই। চলতে চলতেই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ভেবেও বাঁশের মিস্ত্রির সঙ্গে তবলার কী সম্পর্ক বুঝতে পারলাম না।

নীলমোহনবাবু তাঁর কোয়ার্টার্সের সামনে একটা চৌপাইয়ের ওপর লুঙ্গি পরে আসন-পিঁড়ি হয়ে উত্তরমুখো বসে ঠাকুরের নাম করছিলেন।

ওঁকে বললাম, আপনাকে বউরানি ডাকছেন।

উনি ঠাকুরের নাম থামিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরনেত্রে তাকিয়ে থাকলেন।

তারপর হঠাৎ বললেন, গান-বাজনার আসর বসেছে বুঝি?

আজ্ঞে। আমি বললাম।

নীলমোহনবাবু আমায় বললেন, একটু ভেতরে আসুন।

ওঁর কোয়ার্টার্সে ঢুকেই উনি একজোড়া পেতলের তবলা দেখিয়ে আমাকে বললেন, উঠিয়ে নিন।

আমি বাঁয়াটার কান ধরে তুললাম। উনি তবলাটার কান।

তারপর-ই পাশের ঘরের কাকে যেন ডাকলেন নীলমোহনবাবু, ছোটুয়া বলে।

ওঘরে গিয়ে দেখলাম, একটি বছর বারো-তেরোর ছেলে ভেক-কুম্ভস্য আসনে উবু হয়ে বসে দু-হাত দিয়ে কাঁসার থালাতে আটা মাখছে–রুটি বানাবে বলে।

সে চমকে উঠে বলল, ক্যা হুয়া?

নীলমোহনবাবু বললেন, কুচ্ছ হুয়া নেই; আভি হয়েগা।

তারপর-ই আমাকে হতবাক করে দিয়ে দারুণ হিন্দিতে বললেন, তুমহারা বাঁশিটা লেকে আভভি হামারা ল্যাজমে ল্যাজমে আও।

ছোটুয়া তার দু-হাতের আঙুলে লেগে থাকা ভিজে আটার দিকে তাকাল।

নীলমোহনবাবু বললেন, সময় নেহি হ্যায়, যেইসা হ্যায়, অইসাই আও।'

তারপর আমরা শোভাযাত্রা করে লনের দিকে এগোতে লাগলাম।

নীলমোহনবাবু দৈর্ঘ্যে চার ফিট দশ ইঞ্চি, ব্যাসে তিন ফিট। গায়ের রং কুচকুচে কালো, তার ওপর একটা খয়েরি-রঙা লুঙ্গি ও হাতকাটা গেঞ্জি পরেছেন। তাও খয়েরি। উনি আমার সামনে সামনে হেঁটে যাচ্ছিলেন।

মনে হল, বউরানি লেডিকেনি নামকরণটা নেহাত খারাপ করেননি।

পরক্ষণেই মনে হল, আমার চেহারাটাও কি তাহলে হুবহু পাতিকাকের মতো? আজ-ই রাতে কোয়ার্টারে গিয়ে আয়নায় ভালো করে দেখতে হবে নিজেকে। আত্মদর্শন করতে হবে।

আমরা যখন গিয়ে পৌঁছোলাম, তখন বউরানি বললেন, বাঃ, ছোটুয়াও এসেছ?

ছোটুয়ার হাতের ভিজেআটা তখন পুরো শুকিয়ে গিয়ে হাত দিয়ে চষি বেরোচ্ছে। ইমিডিয়েটলি চষি-পিঠে করা যায়।

ছোটুয়া আড়ষ্ট হাত তুলে সেলাম ঠুকে বলল, জি হাঁ মেমসাব।

বউরানি শেতলপাটির মেমসাহেবের দিকে তাকালেন। তাঁর নাম ততক্ষণে জানা গেল, লিচি।

পরে ওভার-হিয়ার করে জেনেছিলাম যে, তাঁদের বাড়ি নাকি মুজফফরপুরে। তাই তাঁর দিদিমা মুজফফরপুরের বিখ্যাত লিচুর নামে নাম

রাখেন তাঁর। চেহারাটাও লিচু-লিচু। ভালো মানিয়েছে।

মেমসাহেব বললেন, লিচি, সোলো গাইবে না কোরাস?

লিচি লজ্জা লজ্জা গলায় বললেন, না সঙ্গে ছুপকি ও নিনির গাইতে হবে।

কাতলামাছ বিনা রিকোয়েস্টেই বললেন, আমিও গাইব।

কোন গান গাওয়া হবে, তাই আলোচনা করে প্রথমে দশ মিনিট কেটে গেল। ততক্ষণে ছোটুয়ার হাতের ভিজে আটা স্টিকিং-প্লাস্টারের মতো তার দু-হাতে সেঁটে গেছে।

যখন গান ঠিক হল তখন দেখা গেল লিচি আর মিনি গানটা জানেন, কিন্তু ছুপকি ও কাতলামাছ জানেন না। তারপর অনেক ন্যাকামি, এমা :, তা হবে না, পারব না ওরে বাবা রে-র পরে ওঁরা ঠিক করলেন যে, রবীন্দ্রসংগীত-ই গাইবেন–পুরানো সেই দিনের কথা শুনবি যদি আয়।

কাতলামাছ বললেন, দেবব্রত বিশ্বাস বড়ো ভালো গান, এই গানটা।

তারপরে আরও পাঁচ মিনিট গেল রেডি গেট-সেট গো-তে।

হঠাৎ আমার বউরানি ফোর-ফরটি ইয়ার্ডস রেসের স্টার্টার-এর মতো পিস্তলের বিকল্পে পানের সেই রুপোর বটুয়া দিয়ে টেবিলে ফটাস করে আওয়াজ করে বললেন, স্টার্ট।

তারপর গান আরম্ভ হল।

লিচি ধরলেন বি-ফ্ল্যাটে, ছুপকি ও নিনি আরও খাদে আর কাতলামাছ বি-ফ্ল্যাটে শুরু করে মুহূর্তের মধ্যে ব্যালিস্টিক মিসিলের মতো চলে গেলেন হারমোনিয়ামের একেবারে শেষ দক্ষিণ প্রান্তে।

সে যে কী কোরাস কী বলব!

এদিকে লেডিকেনি লনের মধ্যে লুঙ্গি পরে হাঁটুগেড়ে বসে পেতলের তবলায় উড়ন-চাঁটি দিয়ে যেতে লাগলেন। এ তবলা-বাঁয়া বোধ হয় বাঁধতে-টাধতে হয় না, সেজন্যেই পেতল দিয়ে চামড়া চিরতরে সিল করা আছে।

তবলাটা থেকে অনেকদিনের পুরোনো ব্রংকাইটিসের রুগি যেমন করে কাশে, তেমন একটা ঠং-ঠং আওয়াজ বেরোতে লাগল, আর বাঁয়া থেকে চ্যবনপ্রাশ আর ছাগলাদ্য মিশিয়ে খল-নোড়ায় মকরধ্বজ দিয়ে মারলে যেরকম ঢ্যাবঢেবে আওয়াজ হয় তেমন আওয়াজ।

ছোটুয়া কেষ্ট ঠাকুরের মতো বাঁ-পায়ের মধ্যে ডান পাটা সড়াৎ করে ঢুকিয়ে দিয়ে এমন বিপজ্জনকভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বাঁশি তুলল ঠোঁটে যে, আমার মনে হল, এই ঝোড়ো-হাওয়ায় যেকোনো সময়ে ও ছাগল-দাড়ির ঘাড়ে পড়ে যেতে পারে।

ছোটুয়ার বাঁশিটা ও ওর দেশ হাজারিবাগ জেলা থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল চাকরিতে বহাল হওয়ার সময়। ওই বাঁশি ওর বাবা হাজারিবাগের জঙ্গলের মধ্যে বাজরার খেতে রাতে বুনো শুয়োর যাতে বাজরা না খায় সেজন্যে মাচার ওপরে বসে বসে বাজাত।

যে-বাঁশির সুর ও স্বরের উদ্ভব হয়েছিল, দাঁতাল বুনো শুয়োরদের ভিরমি লাগানোর জন্যে সেই বাঁশি পুরানো সেই দিনের কথার প্রতি কী করে জাস্টিস করবে?

এতক্ষণে গায়ক-গায়িকাদের মুড এসে গেছে। একেবারে হইহই ব্যাপার। উত্তেজনায় আমার পা থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমি আর সহ্য করতে না পেরে লনের মধ্যে বসে পড়লাম।

গায়ক-গায়িকার গলা বিভিন্ন স্কেলে, বিভিন্ন দিকে চলেছে কলকাতার দিকে গ্যালোপিং, লোকাল, এক্সপ্রেস ট্রেন ও মালগাড়িতে। বাঁশি ছুটেছে টিগরিয়া পাহাড়ের দিকে। তবলা পরেশনাথ পাহাড়ে।

আমার যে, কখনো এমন সুপারসনিক বিটোফেনিক অর্কেস্ট্রা শোনার সৌভাগ্য হবে, একথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

মনে মনে বললাম, পাগল ভালো করো মা।

.

০৬.

সাহেব আজ ভোরের ট্রেনে এলেন।

আমি আর পান্ডে ড্রাইভার, স্কুটার-টেম্পো সঙ্গে নিয়ে গেছিলাম।

এবারও সাহেবের সঙ্গে গন্ধমাদন পর্বত। প্রতিবার-ই চ্যাপটা করে ভাঁজ করা পিচবোর্ডের বাক্স নিয়ে আসেন আর যাওয়ার সময় কূপে ভরতি করে ডিম নিয়ে যান কলকাতায়। কলকাতায় দাম ভালো পাওয়া যায়–তাই যতটুকু পারেন কলকাতাতেই বিক্রি করেন– বাদবাকি লোকালি।

শহরের প্যাঁড়াওয়ালারা দুধ কেনেন সাহেবের ডেয়ারি থেকে। বাজারের হোল-সেলাররা টেবল-বার্ডস ও ডিম কেনেন।

সাহেব নেমেই আমাকে বললেন, কেমন আছ গজেন?

আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

তারপর বললাম, ভালো।

আমার গেস্টরা সব ভালো মুডে? যত্ন-আত্তি করছ তো?

হ্যাঁ স্যার। কাল বিকেলে তিতির মেরেছেন। রাতে লনে গান-বাজনা হয়েছে। তারপর লোডশেডিং হয়েছিল বলে, বাইরের চাঁদের আলোয় লনে

বসে ডিনার খেয়েছিলেন!

মেহবুব হুইস্কি-টুইস্কি সব দিয়েছিল তো? কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

–না স্যার।

তারপর ওভারব্রিজ পেরোতে পেরোতে বললেন, তোমার স্টকে কী কী কমে গেছে একটা লিস্ট করে দিয়ো। বুঝলে গজেন।

বললাম, হ্যাঁ স্যার!

সাহেব একটু এগিয়ে যেতেই দেখি পান্ডে আমার পাশে এসে আমার মুখে চেয়ে মিটিমিটি হাসছে।

অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, কী ব্যাপার?

পান্ডে বলল, ব্যাপার কিছু না, সাহেব নাম ভুলে যান মাঝে মাঝে সকলের-ই। তাই আপনাকে গজেন বললেন। দেখবেন, পরে আবার মনে পড়ে যাবে। আমাকেও মাঝে মাঝে দুখিরাম, খান্ডেলওয়াল, যোধ সিং এরকম নানা উলটোপালটা নামে ডাকেন।

এ ক-দিনে চিড়িয়াখানার কান্ড-কারখানায় অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এখন আর কিছুতেই অবাক লাগে না।

সাহেব বাড়ি ফিরতেই বাড়ির চেহারা পালটে গেল। বোধ হয় সবসময়েই পালটে যায়।

সাহেব বললেন, ব্রেকফাস্টের পর তুমি আমার সঙ্গে হানিফ সাহেবের বাড়ি যাবে। আমার বন্ধুদের জন্যে একদিন বিরিয়ানি পোলাও আর গুলহার কাবাবের আয়োজন করতে হবে। বউরানি আবার লোকটাকে দেখতে পারেন না। কিন্তু ভদ্রলোক ভারি ভালো রান্না করেন, বড়ো শৌখিন লোক, বয়স হয়েছে বিস্তর, কিন্তু এভার ইয়াং।

বললাম, আচ্ছা স্যার।

গেস্টরা সবাই তখনও ঘুমোচ্ছিলেন। রাতে অবশ্য শুয়েছেন সকলে প্রায় দুটো নাগাদ। লনে সকলেই চাঁদের আলোয় ইজিচেয়ারে বসেছিলেন। লনের সামনের বড়ো চাঁপাগাছটা থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় চাঁপাফুল উড়ে উড়ে লনময় ছড়িয়ে পড়ছিল। চাঁপাফুলের গন্ধ, মেমসাহেবদের গায়ের বিভিন্ন পারফিউমের গন্ধে মিলে-মিশে কেমন নেশা-নেশা লাগছিল।

ভাবছিলাম চাকরিটা টিকে গেলে, বউদিকে একবার আমার কোয়ার্টার্সে এনে দিনকতক রাখব। বউদির শখ ও রুচি আছে। এমন জায়গা বউদি দারুণ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। চাঁপাফুল বউদির দারুণ প্রিয়। কলকাতার রাস্তায় চাঁপাফুলওয়ালার কাছ থেকে কাঠিতে গোঁজা একটা দুটো চাঁপাফুল কিনে দিয়েছি বউদিকে। বউদি চাঁপাফুল বালিশের নীচে নিয়ে ঘুমোতে

ভালোবাসে। এত চাঁপাফুল, মানে চাঁপাফুলের গালচে-বিছানো আছে দেখলে কী যে, করবেন জানি না।

সাহেবের ঘুম বড়োকম। লোকটার এনার্জি দেখে অবাক হয়ে যাই। দিনে-রাতে বড়োজোর চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমোন।

সাহেব এসেই এককাপ চা খেয়ে যে, জামাকাপড় পরে ট্রেনে এসেছিলেন, সেই বাথরুম স্লিপার, মোটা কাপড়ের পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে বেরিয়ে পড়লেন কাজকর্ম দেখাশোনা করতে। তা কম্পাউণ্ডের মধ্যের ডেয়ারি, পোলট্রি, সামান্য চাষবাস দেখাশোনা করলেই প্রায় মাইল খানেকের চক্কর। তারপর কম্পাউণ্ডের বাইরে কো-অপারেটিভ বেসিসে যেসব জায়গায় চাষবাস হবে, পুকুর কাটা হবে, কর্মচারীদের কোয়ার্টার হবে সেইসব দেখাশোনা করলে তো দু-মাইলের চক্কর।

চলে যাওয়ার আগে সাহেব শুধোলেন, সাঁওতাল নাচের সব বন্দোবস্ত পাকা আছে তো? ভজনকে জিজ্ঞেস করেছিলে?

হ্যাঁ সাহেব। কাল দুপুর থেকে তো ভজনদা ওই ব্যাপার নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।

সাহেব বললেন, ভজনকে বলে দিয়ো যে, আমরা সাড়ে আটটা নাগাদ সুজানী গ্রামের অশ্বত্থ গাছতলায় গিয়ে পৌঁছোব। তার আগেই যেন সব বন্দোবস্ত পাকা করে রাখে।

আচ্ছা স্যার। বললাম আমি।

ভেতরে ভেতরে আমারও কম উত্তেজনা হচ্ছিল না। ছেলেবেলা থেকে সাঁওতালি নাচ সম্বন্ধে পড়েছি, শুনেছি। জীবনে এই প্রথম আমিও তা দেখব। তাই বন্দোবস্তে যেন ত্রুটি না হয়, সেজন্যে ভজনদার পেছনে আমিও ছিনে-জোঁকের মতো লেগেছিলাম।

সাহেব চলে যেতেই ভজনদা এলেন।

বললেন সাহেব কই?

আমি বললাম, ডেয়ারির দিকে গেলেন।

বললেন, তুমি তো এসে অবধি ডেয়ারিতে একবারেও গেলে না। খুব চাকরি করছ বাছা! চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে গোরু ও ষাঁড় চেনাই।

আমি বললাম, এক্ষুনি সাহেবের গেস্টরা উঠে পড়বেন। কার কী প্রয়োজন হয়। এখন আমি যেতে পারব না।

ভজনদা বললেন, তা অবশ্য ঠিক।

তারপর বললেন, সাহেবের যেন প্রত্যেক উইক-এণ্ডে গেস্ট না আসলে চলে না। এত বন্ধু যে, সাহেবের কবে হল, কী করে হল, তাই-ই ভাবি। আসলে বুঝেছ টিঙ্কু, বন্ধু-ফন্ধু কেউ নয়, সব স্যার এ এম-এর হোটেলে

বড়ি-ফেলে দিব্যি খানা-পিনা করে চলে যায়। এমনিতেই গোদ নিয়ে বেঁচে আছি আমরা। তার ওপর প্রতি সপ্তাহে-সপ্তাহে বিষ-ফোঁড়া।

পরক্ষণেই বললেন, আচ্ছা। চললুম তাহলে।

বললাম, আচ্ছা।

ভজনদা চিড়িয়খানার দিকে চলে গেলেন।

দেখতে দেখতে সাহেবের গেস্টরা ঘুম ভেঙে উঠলেন। বারান্দায় চায়ের আসর বসল। বউরানি মুখ-টুখ ধুয়ে যখন বারান্দায় এলেন, তখন আমার সাময়িকভাবে ছুটি মিলল। আমিও বাবুর্চিখানায় গিয়ে আরও এককাপ চা খেয়ে নিয়ে স্কুটার-টেম্পো চড়ে বাজারে বেরোলাম।

বাজার থেকে ফিরে এলাম ন-টার মধ্যে। এসে দেখি সাহেবও বারান্দায় বসে আছেন। সাহেবের গেস্টদের সব চান-টান হয়ে গেছে। লিচু একটা হলুদ লুঙ্গি পরেছেন। খাসা দেখাচ্ছে। চলমান এককাঁদি হলুদ সবরিকার মতো।

ব্রেকফাস্ট হয়েছে টিঙ্কু? সাহেব শুধোলেন।

-না স্যার।

আমি বললাম।

–শিগগিরি খেয়ে নাও। চলো, হানিফ সাহেবের বাড়ি যাব।

মেমসাহেবরা সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরাও যাব।

চলো। সাহেব বললেন, প্রশ্রয়ের সুরে।

আমি তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম। তারপর শেতলপাটির গাড়ি ও আমাদের গাড়ি নিয়ে আমরা হানিফ সাহেবের বাড়ি গেলাম।

বিরাট কম্পাউণ্ড। গোলাপের চাষ করেন ভদ্রলোক। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। কিন্তু খুব শক্ত-সমর্থ ডাঁশা পেয়ারার মতো চেহারা।

গোলাপের চাষ সাহেবেরও কিছু আছে। নবীন রায় বলছিলেন।

আমরা যেতেই সাহেব সকলের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করিয়ে দিলেন হানিফ সাহেবের। বিরাট সিটিং রুমের একপাশে ফায়ার প্লেস, অন্যপাশে সেলার–আর একপাশে একটা দারুণ রাইটিং টেবিল। টেবিলটা দেখে বড়ো লোভ হল। আহা! আমার যদি এমন একটা টেবিল থাকত, তবে আমিও হয়তো লেখক হতে পারতাম একদিন ওই টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে কসরত করতে করতে।

হানিফ সাহেব মেয়েদের কোকাকোলা, ছেলেদের রাম অফার করলেন।

শেতলপাটি ও আমি মেয়েদের মতো কোকাকোলা খেলাম।

সাহেবরা রাম।

হানিফ সাহেবের গোলাপ-বাগানে বাডিং করতে আসত একটি মেয়ে দূরের গ্রাম থেকে। হানিফ সাহেব তাকেই বাডিং করে দিলেন। শেষে বিয়ে করতে হল রীতিমতো ধর্মীয় অনুষ্ঠান-টনুষ্ঠান করে–আমার সাহেবের মধ্যস্থতায়। চারশো টাকা খরচ করে, শ্বশুরকে গোরু-বলদ, ধুতি এবং গাঁয়ের লোককে প্রচুর মহুয়া খাইয়ে। হানিফ সাহেবের বউও ভজনদার স্ত্রীর মতোই ডি অ-স–ভার্সেটাইল বউ। সকালে বাগানে গোলাপের বাডিং করেন, দুপুরে রান্না-বান্না; বিকেলে বাগানে জল দেওয়া। রাতে তাঁকেই আবার হানিফ সাহেব বাডিং করেন। সিস্টেমটা সম্মানজনক, লিস্ট এক্সপেনসিভ ও অত্যন্ত কনভিনিয়েন্ট।

দেখেশুনে কাতলামাছ খেপে গেলেন যে, তিনিও এখানে একটা বাড়ি করে লাল গোলাপ ফুলের বাডিং ও অন্য ফুলের বাডিং একসঙ্গে চালু করে দেবেন।

কাতলামাছের মুখটার কোনো রাখ-ঢাক নেই।

সাহেব আনকম্ফর্টেবল ফিল করতে লাগলেন, যদিও কথাবার্তা সব ইংরিজিতেই হচ্ছিল কিন্তু পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মিসেস হানিফ কাতলামাছের চোখ-মুখের উত্তেজনা দেখে কিছুটা অনুমান করতে নিশ্চয়ই পারছিলেন।

বিরিয়ানি পোলাও রান্না হবে আগামীকাল রাতে–সঙ্গে গুলহার কাবাব। কতজনের মতে হবে, কখন হবে, সব জেনে নিয়ে সাহেবের নির্দেশানুসারে হানিফ সাহেব আমাকে বুঝিয়ে দিলেন প্রস্তুতি পর্বে কী কী লাগবে। নধর এবং মাঝবয়সি খাসির কোন কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে কতখানি করে মাংস কিনতে হবে কাটিয়ে নেয়ে, কতখানি জাফরান, গরম মশলা, বড়ো নৈনিতাল আলু ইত্যাদি ইত্যাদি। গুলহার কাবাবের মাংস সেদ্ধ করার জন্যে পেঁপে, ভাঙা কাপ-ডিশ (ভাঙা কাপ-ডিশে নাকি তাড়াতাড়ি মাংস-সেদ্ধ হয়) ইত্যাদিরও রিকুইজিশন দিলেন। লিস্টের শেষে লিখলেন–এক বোতল রাম।

এই ব্যাপারটা আমার জানা ছিল। মামাদের জমিদারিতে যখন যজ্ঞির ঠাকুর আসত হয়তো পাঁচ-শো লোকের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে কোনো পালা-পার্বণে–তখন বাজারের লিস্টের শেষ আইটেমে থাকত; শরীর মেরামতি খাতে–দুই টাকা। অর্থাৎ যজ্ঞির ঠাকুরদের আফিং-এর খরচা।

সেইরকম এই হানিফ সাহেবও বডি রিপেয়ারিং-এর জন্য ওষুধের বন্দোবস্ত করে রাখলেন। ভাবলাম, ষাট বছর বয়সেও এত বাডিং করলে শরীরের দোষ কী?

হানিফ সাহেবের কাছ থেকে আমরা যখন বাড়ি ফিরে এলাম, তখন বউরানিকে দেখা গেল না কোথাওই।

সাহেব শুধোতে, মেহবুব বলল, মেমসাহেব স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছেন আর আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন।

ছাগল-দাড়ি মুখ কালো করে দাড়ি চুলকে বললেন, বেলা এগারোটায় স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়ার মানে? কী গো অংশুমান? শেষে কি তোমার বউ আত্মহত্যা-টত্যা করে আমাদের খুনের মামলায় জড়াবে?

সাহেব বললেন, ও কিছু না, ভ্রমরের যে, রাগ হয়েছে এটা তার সিমটম। এ নিয়ে তোমরা মাথা ঘামিয়ো না।

সাহেব বাইরের বারান্দাতেই মেমসাহেবের চিঠিটা অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছিলেন, এক নজর চোখ বুলিয়ে।

টি-হাউসে ওঁরা সকলে মিলে বসলেন গিয়ে।

সাহেব বন্ধুদের বললেন, তোমরা গল্প-সল্প করো, ততক্ষণে আমি একটু কাজ সেরে আসি। নিনি বললেন, আমি যাই ভ্রমর বউদিকে একটু দেখে আসি।

সাহেব বললেন, ওর দু-চারটে স্লিপিং পিলে আজকাল কিছু হয় না। ঠিক লাঞ্চ-টাইমে ঘুম ভেঙে যাবে। এখন ওকে বিরক্ত না করাই সেফ সকলের পক্ষে।

বলেই, সাহেব চলে গেলেন।

সাহেব চলে যেতেই ওই চিঠিতে মেমসাহেব কী এমন রাগের কথা লিখলেন জানতে বড়ো ইচ্ছে হল। সাহেব আমাকে সকালেই বলেছিলেন যে, বউরানি হানিফকে পছন্দ করেন না।

আমি মেহবুবকে টি-হাউসের কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে এবং ওঁদের খিদমদগারি করতে বলে বারান্দায় এসে চিঠিটা উঠিয়ে নিলাম।

চিঠিটা এত সংক্ষিপ্ত সাংকেতিক ভাষায় লেখা যে, তার মর্মোদ্ধার করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

চিঠিটায় কোনো সম্বোধন অথবা লেখিকার নাম ছিল না। ওপরে তারিখ ছিল শুধু, আর লেখা

মি. হানিফকে যখন ডেকেছে, তখন তুমিই সমস্ত রাত ধরে রান্না শিখবে। মির্জা গালিবের প্রেমপত্রর ব্যবস্থা করো। আমার শরীর তখন খারাপ হবে। একশোবার কথা দিয়ে কথা রাখো না।

ঝাঁকি দর্শনে কথা হল না বলে, এতখানি কালি খরচ হল।

কিছুই না-বুঝতে পেরে চিঠিটা যেমন অ্যাশট্রে চাপা দেওয়া ছিল তেমন-ই চাপা দিয়ে রেখে আমি কোয়ার্টারের দিকে এগোলাম।

আধাআধি গেছি, এমন সময় চিড়িয়াখানার দিক থেকে একটা প্রচন্ড ও উত্তেজিত চিৎকার ভেসে এল। হয়েছে; হয়েছে; হয়েছে রে, হয়েছে।

কী হয়েছে, বুঝলাম না, কিন্তু প্রচন্ড উত্তেজনাকর কিছু যে, একটা হয়েছে তা বুঝলাম।

চিড়িয়াখানার দিকে দৌড়ে গেলাম।

প্রায় আমার পাশে পাশেই গ্রিনহাউসের দরজা খুলে হঠাৎ বেরিয়ে নবীন রায়ও দৌড়ে চললেন ওদিকে।

গিয়ে দেখি, মুখে হঠাৎ গরম আলু পড়লে লোকে যেমন এক ঠ্যাং-এ নাচে, তেমনি করে ভজনদা একঠ্যাং-এ লাফিয়ে নাচছেন আর চিৎকার করছেন, হয়েছে রে হয়েছে; অবশেষে হয়েছে।

নাচতে নাচতে হঠাৎ-ই নবীনকে দেখতে পেয়েই ভজনদা আরও চেঁচিয়ে উঠে বললেন, নবনে রে নবনে হয়েছে রে হয়েছে।

যাই হয়ে থাকুক, খারাপ কিছু যে, হয়নি তা বুঝলাম।

কিন্তু কী হয়েছে সেটা এখন জানা দরকার।

হঠাৎ নবীনবাবু আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, টিকলুবাবু দৌড়ে যান অফিসঘরে, সাহেবকে গিয়ে খবর দিন যে, হয়েছে।

কী হয়েছে? আমি তাড়াতাড়ি শুধোলাম।

কিন্তু আমার কথার উত্তর কে দেবে?

দেখি, ভজনদা আর নবীন রায়ে জড়াজড়ি করে ঘুরে ঘুরে নাচছেন আরও জোরে চিৎকার করছেন, ওরে নবনে হয়েছে, এতদিনে হয়েছে। আর নবনেও সমান উল্লসিত হয়ে বলছেন, ধন্যি তুই ভজনদা, হয়েছে রে হয়েছে।

স্কুলের স্পোর্টস-এর পর এতজোরে আমি আর দৌড়োইনি।

দৌড়ে অফিসঘরের দিকে যেতে যেতে দেখি সাহেবের গেস্টরাও সকলে পড়ি-কী-মরি করে চিড়িয়াখানার দিকে সেই চিৎকার শুনে দৌড়ে আসছেন।

লিচুর লুঙ্গি খুলে যার আর কী।

এমন বিপজ্জনকভাবে তিনি দৌড়োচ্ছেন। ছুটন্ত আমি যখন বিপরীত দিকে ছুটন্ত গেস্টদের ডেলিগেশনকে মাঝপথে মিট করলাম, তখন কাতলামাছ হাঁফাতে হাঁফাতে দৌড়োতে দৌড়োতে শুধোলেন, কী হয়েছে?

আমি হাত তুলে বললাম, হয়েছে।

ওঁরা ঘাবড়ে গিয়ে জোরে দৌড়োলেন।

ওঁদের ঘাবড়ে যেতে দেখে আমিও ঘাবড়ে গিয়ে আরও জোরে দৌড়োলাম।

সাহেব টেবিলে বসে একটা ফাইলের কাগজ দেখছিলেন।

আমাকে ওইভাবে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে দেখেই সাহেব উদবেগে ভুরু কুঁচকে বললেন, কী হল গজেন?

আমি বললাম, স্যার হয়েছে।

বলেই, চিড়িয়াখানার দিকে আঙুল দিয়ে দেখালাম।

সাহেব একলাফে উঠে দাঁড়ালেন। সেই হঠাৎ উঠে দাঁড়ানোতে হালকা অ্যালুমিনিয়ামের চোয়ারটা ফটাস করে উলটে গেল।

সাহেব তক্ষুনি দু-হাত ওপরে তুলে তেড়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন অফিস থেকে দৌড়োতে দৌড়োতে চেঁচিয়ে বললেন, আসছি, ভজন আসছি।

মনে হল, কাউকে জলে ডুবে যেতে দেখলে বা কারও বাড়ি ডাকাত পড়লে বন্ধুরা যেমনভাবে দৌড়ে যান, তেমনভাবেই যেন উনি দৌড়ে গেলেন।

আমিও পেছন পেছন। ভাবনা বেড়ে গেল।

কিন্তু আমার সাধ্য কী, সাড়ে ছ-ফিট সাহেবের ক্যাঙারুর মতো পায়ের সঙ্গে পাল্লা দিই আমি?

আমি আধ-রাস্তা যেতে-না-যেতেই দেখলাম সাহেব পৌঁছে গেছেন ভজনদার কাছে।

আমি যখন পৌঁছোলাম, তখন দেখি সাহেব ভজনদার হাতে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ভজনদার দু-চোখে জল।

সমবেত জনমন্ডলী নির্বাক, নিস্তব্ধ। ছাগল-দাড়ির দাড়ি উড়ছে না, কাতলামাছের মুখ আরও ফাঁক হয়েছে; শেতলপাটি স্ট্যাচু হয়ে গেছেন।

আমি ফিসফিস করে ওঁদের বললাম, কী হয়েছে স্যার?

তিনি আমাকে আরও ফিসফিস করে বললেন, ময়ূরীর ডিম হয়েছে। চুমকির।

এরপর আর এক নতুন বিপত্তি হল।

দেখি, খাঁচার দরজা খুলে সাহেব চুমকির ঘরে ঢুকে পড়লেন।

চুমকি তার সদ্যোজাত ঐতিহাসিক ডিম্ব প্রসব করতে যা-না উত্তেজনা বোধ করেছিল, প্রসবের পর প্রসবিনীর মতো ঘটনা-পরম্পরায় সে হতচকিত হয়ে খাঁচার এককোনায় গিয়ে চুপ করে মুখ নীচু করে

দাঁড়িয়েছিল। যেন মহা অন্যায় কিছু করে ফেলেছে। তার সামনে আড়াইশো গ্রাম ওজনের ডিমটা খাঁচার মধ্যে খড়ের ওপর লজ্জায় নীল হয়ে নট নড়নচড়ন নট-কিচ্ছু হয়ে পড়েছিল।

খাঁচাটা উচ্চতায় বড়োজোর পাঁচ ফিট। সাড়ে ছ-ফিট সাহেব তারমধ্যে কুঁজো হয়ে ঢুকলেন। ঢুকেই বললেন, মা গো। বোস মা লক্ষ্মীটি।

শেতলপাটি হাতের সিগারেটটা উত্তেজনায় ছুঁড়ে ফেলে বললেন, ব্যাপারটা কী? এখন কী হবে?

ভজনদা এই অর্বাচীন প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনারা এবার যান স্যার–এখানে ভিড় করলে বোধ হয় চুমকি তা দিতে বসবে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, ক্যাপ্টিভিটিতে ময়ূরের বাচ্চা করানো অত্যন্ত কঠিন। আমরা, আপনারা কো-অপারেট করলে, সেই অসাধ্যসাধন করতে পারি।

সাহেবও খাঁচায় মধ্যে থেকে কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যাও হে, তোমরা গিয়ে বিয়ার খেয়ে চুমকির ডিম-হওয়া সেলিব্রেট করো।

আমরা ওখান থেকে চলে আসার সময় দেখলাম, চুমকি সুন্দরী গর্বিতা মেয়ের মতো এক পা এক-পা করে খাঁচাটার চারপাশে ঘুরে ডিমটাকে প্রদক্ষিণ করছে আর সাহেব পেছনে পেছনে–অদ্ভুত ভঙ্গিমায় না দাঁড়িয়ে,

বসে তার পেছনে ঘুরতে ঘুরতে বলছেন, বোসো মা, মা আমার লক্ষ্মী সোনা তা-য়ে বোসো মা।

সাহেবের বন্ধুরা আগেই চলে এলেন।

নবীনবাবুর সঙ্গে আমি ফিরছিলাম।

গ্রিনহাউসের পাশে আসতেই নবীনবাবু বললেন, চলুন, আমার গ্রিনহাউসটা আপনাকে দেখাই। এসে অবধি তো আপনার সময় হল না।

গ্রিনহাউসের ভেতর ঢুকেই চোখ জুড়িয়ে গেল।

কতরকম যে, গাছ আর ফুল আর অর্কিড। মধ্যে একটা জাপানিজ কায়দায় খোঁড়া পুকুরের মতো ছোট্ট পাথর-খোঁড়া জল। তারমধ্যে ফোয়ারা। চারপাশে হেঁটে বেড়াবার জায়গা। আর পথের পাশে পাশে গ্যালারির ওপরে টবে সাজিয়ে রাখা পাতা, অর্কিড, ফুল। গ্রিনহাউসের ছাদ থেকেও অনেক অর্কিড ঝুলছে। সেই অর্কিডের মাটির টবগুলো সুন্দর রং-করা পাট দিয়ে তৈরি শিকে থেকে ঝুলছে। শিকেগুলোতে ফুল তোলা। ফুলগুলো আবার রং করা।

এমন একটিও তুচ্ছ জিনিস নেই, যাতে চিন্তা, কল্পনা ও সুরুচির ছাপ নেই। কত মাথা খাটিয়ে, কতদিনের পরিশ্রমে ও কত যত্নে যে, এই গ্রিনহাউসের প্রতিটি টুকরোকে গড়ে তোলা হয়েছে তা ভেবেই আশ্চর্য

হয়ে গেলাম আমি।

আমি স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে নবীনবাবুকে শুধোলাম, ওই যে নানারঙা সুন্দর লতাগুলো, ওগুলোরকী নাম?

–কোনগুলো?

–ওইগুলো।

বলে আঙুল দিয়ে দেখালাম আমি।

নবীনবাবু বললেন, ওগুলো ফিলোডেন-ড্রন। নানারকম হয় ওগুলো। বাই-কালার হয়, মনো-কালারও হয়। সবুজ। ডেকরেটিভ পাতাগুলো দেখছেন না লতার সঙ্গে। এইগুলোই বিশেষত্ব।

আমি শুধালাম, ওই যে পানপাতার মতো বড়ো বড়ো পাতাঅলা লতা, ওগুলো কী?

নবীনবাবুর চোখে-মুখে গর্ব ঝরে পড়ছিল। এত কষ্ট করে, যত্ন করে এগুলো পরিচর‍্যা করেন, কেউ দেখে তারিফ করলে তবে না আনন্দ।

উনি বললেন, ওগুলোকে বলে অ্যান্থোরিয়াম। ওরোকুইনামও আছে। সাদা সাদা শিরা বের করা ডেকরেটিভ।

আমি অবাক গলায় বললাম, এত বিভিন্নরকম কচুগাছ রেখেছেন কেন?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, কচু তো মাটির তলায় হয়। কিন্তু তাদের পাতার বাহারের কি শেষ আছে? আমার এখানেই তো কতরকমের কচু আছে। যেমন দেখুন ওইটা।

আমি বললাম, কোনটা।

ওই যে ওইটা, বলে বাঁ-দিকের কোনায় দেখালেন।

বললেন, ওগুলোকে বলে এলোকেশিয়া।

বললাম, বাঃ বেশ বাংলা এলোকেশী-এলোকেশী গন্ধ আছে তো নামটাতে।

নবীনবাবু বললেন, এলোকেশিয়ার মধ্যে আবার নানারকম ভ্যারাইটি আছে। যেমন সানড্রিয়ানা-কালো, ওই দেখুন, তারপর মেটালিকা–একেবারে ব্রোঞ্জের রং। সানড্রিয়ানার কালোর মধ্যে সাদা শিরা আছে।

হঠাৎ চোখ পড়ল ডানদিকে–ছোটো ছোটো পানপাতার মতো লতা।

আমি শুধোলাম, ওগুলো কী? পানগাছ কি?

নবীনবাবু হেসে বললেন, না ওগুলো এগ্লোনিয়া–ডোয়ার্ফ–পানপাতার-ই

মতো; কিন্তু ডেকরেটিভ।

সব দেখেশুনে রীতিমতো উত্তেজিত বোধ করছিলাম।

নবীনবাবু বললেন, ওই যে, ভেলভেটি বড়ো পাতাগুলোতে সাদা ফুল–নানারঙা পাতায় ছাওয়া–ওইগুলোর নাম বিগোনিয়া রেক্স।

আমি বললাম, কলাপাতার মতো পাতাগুলো কোন গাছের?

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন ওগুলোকে বলে ডিফিয়োনবিচিয়া। কলাপাতার মতোই ছোটো ছোটো হয়–অনেকরকম পাতা হয় এদের। এদের মধ্যে একটা বিশেষ ভ্যারাইটির ডাঁটি হয়–তাদের রং সাদা। সাদা মানে, একেবারে মার্বল হোয়াইট।

হঠাৎ জলের পাশে একটা এগ্লোনিমা প্ল্যান্টের গায়ে চোখ পড়ল। দেখি একটা ছোটো ব্যাং হাত-পা ছড়িয়ে তার ওপর বসে আছে। গ্রিনহাউসের ওপরের ফাঁকফোকর দিয়ে সূর্যের আলো এসে জলে পড়েছে। পড়ে, সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে নানারঙা পাতা ও প্ল্যান্টের ওপর, অর্কিডের ওপর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সেই আলোর প্রতিফলনে, বিভিন্ন রঙে, জলের ঝিকিমিকিতে পুরো জায়গাটাকে একটা স্বর্গরাজ্য বলে মনে হচ্ছে।

এমন সময়ে হঠাৎ পেছনে গ্রিনহাউসের দরজা খোলার আওয়াজ শোনা গেল। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে একসঙ্গে অনেক পুরুষ ও নারীকণ্ঠে হাউ

লাভলি, হাউ সুইট ইত্যাদি আওয়াজ।

তাকিয়ে দেখলাম, সাহেবের অতিথিরা।

প্রত্যেকের হাতেই একাধিক ক্যামেরা। স্টিল ক্যামেরা। টেলিফোটো ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স লাগানো স্টিল ক্যামেরা; মুভি ক্যামেরা–এইট মিলিমিটারের।

হঠাৎ ফোটোগ্রাফার বামাপদ ব্যাংটাকে আবিষ্কার করল। তারপর বেচারা ব্যাংটার যে, কী হেনস্থা হল সে চোখে দেখা যায় না। কে যেন দৌড়ে গিয়ে চেয়ে-চিন্তে কোথা থেকে একটা আয়না জোগাড় করে আনল। রোদের যেটুকু ফালি গ্রিনহাউসের মধ্যে এসে পড়েছিল, সেই ফালিতে আয়না ধরে আলোর প্রতিফলন ফেলা হল ব্যাংটার গায়ে। তিনি মাটিতে থেবড়ে বসে সেই আয়নাটা ধরে ফোকাস করে থাকলেন। আর চতুর্দিকে ক্যামেরাম্যানরা কখনো শুয়ে, কখনো থেবড়ে বসে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো হাঁটু গেড়ে বসে কির-কির, খুট-খটাস, ক্লিক-ক্লিক করে ছবি তুলতে লাগলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো কটকটি ব্যাং এতবড়ো ইম্পর্টেন্স পেয়েছে বলে মনে হল না আমার।

ভালো করে ফোটো তুলতে গিয়ে কাতলামাছ একটা ডিফিয়োন-বিচিয়ার ওপরে হেলান দিয়ে ফেলেছিলেন একটু হলে।

সঙ্গে সঙ্গে নবীনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার গাছ; আমার গাছ।

ওঁর আর্তনাদ শুনে মনে হল কেউ জুতোসুষ্ঠু ওঁর নাক-ই মাড়িয়ে দিয়েছে বুঝি।

ভাবছিলাম, ভালোবাসা, ডেডিকেশন এসব-ই একটা অনুপ্রেরণার ব্যাপার। এই চিড়িয়াখানার প্রতিটি লোক সাহেবের সংস্পর্শে এসে এমন-ই অনুপ্রাণিত হয়েছেন যে, সে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। শুধু টাকার জন্যে কোনো কর্মচারী কখনো এমন করতে পারেন না। ময়ূরের বাচ্চা হলে পাথুরে ভজনদার চোখফেটে আনন্দাশ্রু গড়ায়, নবীনবাবু সাপ মেরে সে সাপ দু-মাইল বয়ে আনেন, চুমকি সাপ খেতে ভালোবাসে বলে, গ্রিনহাউসের গাছ-পাতায় কেউ হাত ছোঁয়ালে মনে হয় কেউ নবীনবাবুর বিষফোঁড়ায় হাত ছোঁওয়াল।

সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলাম যে, ভালোবাসা, অনুপ্রেরণা, সৎসঙ্গ, এই ব্যাপারগুলো নিশ্চয়ই খুব ছোঁয়াচে-নইলে সাহেবের কাছ থেকে একজন লোকের মধ্যে এ ব্যাপারগুলো এমনভাবে সংক্রমিত হত না।

৭. সুজানী গ্রামের দিকে

০৭.

সন্ধে সাতটা সাড়ে সাতটা নাগাদ আমি আর ভজনদা, মেহবুবকে সঙ্গে নিয়ে, আইসবক্সে বরফ, সোড়া, কোকাকোলা, ফান্টা এবং আলাদা করে হুইস্কি-টুইস্কি নিয়ে আমাদের গাড়িতে সুজানী গ্রামের দিকে রওনা হলাম। অ্যাডভান্স টিম আমরা। গিয়ে সব ইন্তেজাম করে রাখব।

ফুটফুট করছিল জোৎস্না। কুতনিয়া নদীটার বালি চাঁদের আলোতে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। কুতনিয়া পেরিয়ে টাঁড়ের মধ্যে পায়েচলা সঁড়িপথ লক্ষ্য করে পান্ডে গাড়ি চালাতে লাগল টিগরিয়া পাহাড়ের কোলের সুজানী গ্রামের উদ্দেশে।

পথে বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই ছিল। গাড়ি চালাতে রীতিমতো কসরত করতে হচ্ছিল।

প্রায় আধঘণ্টা লাগল পৌঁছোতে। গাড়ি বেশিরভাগ-ই সেকেণ্ড কী থার্ড গিয়ারে যাচ্ছিল। দূর থেকে বিরাট অশ্বত্থগাছটা দেখা যাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় তার পাতা ঝিলমিল করছিল হাওয়া লেগে। গাছের নীচে অনেক মেয়ে-পুরুষ জমা হয়েছে ইতিমধ্যেই দেখলাম। মাদলে ও কাঁসরে চাঁটি ও কাঠি পড়ছে এলোমেলো। দূর থেকেই তাদের দ্রিম দ্রিম আওয়াজ কানে আসছিল।

আমরা পৌঁছে গাড়ির বুট খুলে ফোল্ডিং ইজিচেয়ারগুলো নামালাম। চৌপাইও জোগাড় হল। আইস-বক্স নামিয়ে মেহবুবের জিম্মায় দেওয়া হল। আইস-বক্সে জলও ছিল। কোনো সাহেব সোডা দিয়ে হুইস্কি খাবেন, কেউ বা জল দিয়ে। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নেই।

মানুদি, ফুলমণি, ও আরও অনেক মেয়ে, যারা চিড়িয়াখানায় কাজ করে সবাই সেজেগুজে এসেছে। তার মধ্যে পানুই-এর সাজ আজ দেখে কে? পানুই-এর চলায়, তাকানোতে, ইংরিজিতে যাকে আমরা ডিমেন্যুর বা গেইট বলি, তা এমন মাত্রায় ছিল যে, তা বলার নয়।

আমার হৃদয়ে আবারও বিস্ফোরণ হল। চাসনালায় আবার দুর্ঘটনা।

আমরা নেমেই গাড়ি ছেড়ে দিলাম। সাহেবরা মেমসাহেবদের সঙ্গে নিয়ে আবার দু-গাড়ি বোঝাই হয়ে আসবেন নাচ দেখতে।

ভজনদা বললেন, আর্মিতে একটা কথা আছে জানো?

কী কথা? আমি শুধোলাম।

–ওয়ার্মিং-আপ দ্যা ব্যারেলস। অবশ্য কথাটা সাহেবদের। তাই বলছি, এসো ভায়া, আসল যাত্রা আরম্ভ হওয়ার আগেই আমরা একটু ওয়ার্মিং আপ করে নিই। এসো, একটু মহুয়া খাবে।

আমি বললাম, আমার ওসব চলে না দাদা। কখনো খাইনি।

ভজনদা বললেন, এই কখনো খাইনি, কখনো করিনি কথাগুলো আমি ঘেন্না করি। ফুলশয্যার রাতে কি খাটের বাজুতে পা-ঝুলিয়ে বসে বউকে বলবে লাল মুখ করে যে, কখনো....। সব জিনিস-ই কোনো-না-কোনোদিন আরম্ভ করতে হয়। সুনার দ্যা বেটার। বুজেচো।

আমি বললাম, আমাকে মাপ করুন দাদা।

ভজনবাবু বললেন, ঠিক আছে। তোমার শেয়ারটাও আমিই খাব।

তারপর বললেন, তোমাকে সঙ্গে না এনে নবনেকে আনা উচিত ছিল। আজকে দু-জনে মিলেচুমকির ডিম-হওয়াটা সেলিব্রেট করা যেত।

তারপর আবারও বললেন, সাহেব বেছে বেছে সব মেয়েছেলে মার্কা তোমার মতো ব্যাটাছেলে যে, কোত্থেকে রিক্রুট করে আনেন, তা সাহেব-ই জানেন।

সাঁওতাল ছেলেরা ও মেয়েরা ততক্ষণে পুরোপুরি ওয়ার্ড হয়ে গেছে সূর্য ডোবার পর থেকে মহুয়া খেয়ে। ছেলেরা হাত ধরে একলাইনে দাঁড়িয়ে একটা গান গাইছিল। ওদের গানের সুরে ঘুম পেয়ে যায়–সুরে ভারি একটা মহুয়ার গন্ধভরা মনোটোনি–সেটাই বুঝি ওদের গানের বিশেষত্ব।

ওরা যে গানটা গাইছিল এগিয়ে-পেছিয়ে সে-গানের কথাগুলো এইরকম :

আইলে না গলে পুতাআইলে না গলে হোকঁহা পাবলো হো পুতাকানেকা সোনা বাহামরা গোঙ্গো শাসুরযায়সে না তৈসে হো-হামরা গোঙ্গো শাসুরববাড়োরে বিলাতে হো... ইত্যাদি ইত্যাদি

ভজনদাকে বললাম, ভজনদা এই গানটার মানে কী?

ভজনদা বললেন, বিরক্ত কোরো না তো, সবে নেশাটা চড়েছে।

তারপর বললেন, আমি সাঁওতালি ভাষা জানি না। কয়েকটা কথা ম্যানেজ করতে পারি। এইপর্যন্ত।

আমি অবাক হয়ে বললাম সে কী? বউদি সাঁওতালি বলেন, আমি ভেবেছিলাম আপনি বুঝি জানেন।

তারপর অবাক হয়ে শুধোলাম, বউদির সঙ্গে তাহলে কথাবার্তা চালান কী করে?

ভজনদা বললেন, কথাবার্তা যা দু-একটা দরকার হয়, যেমন একগ্লাস জল দাও, আর একটু ভাত দাও এসব শিখে নিয়েছি। এ ছাড়া কথার দরকার কী? বাদবাকি তো ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য বডি–সারাপৃথিবীতে এক-ই ভাষা চলে। বে-শাদি করো, তখন জানবে।

কিছুক্ষণ পর তিন-চার মাইল দূর থেকে ফাঁকা ফাঁকা চাঁদের আলো ছমছম করা টাঁড়ে দুটো হেডলাইটকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল।

গাড়িগুলো আসছে দেখে আমাদের মধ্যে এবং যারা নাচবে তাদের মধ্যেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

পাগলা সাহেব আসছে। পাগলাসাহেবকে মান্যি-গণ্যি করে না, এমন লোক এ তল্লাটে নেই।

সাহেব মেমসাহেবরা এসে পৌঁছোতেই, চেয়ারে বসতে-না-বসতেই যার যার হুইস্কি, মেমসাহেবদের কোকাকোলা, ফান্টা, সব মেহবুব হাতে হাতে ধরিয়ে দিল।

এবার মেয়েরা হাতে হাত রেখে ছেলেদের সামনে মুখোমুখি নাচতে আরম্ভ করল।

এবারে মেয়েরাই গাইতে লাগল। চার লাইনের গানটা–কিন্তু পরে দেখলাম দু-ঘণ্টা ধরে সেই একটাই গান গেয়ে চলল ওরা–অথচ ওই মনোটোনির

মধ্যেই, একঘেয়েমির মধ্যেই ওদের গানের পুরো মজাটা লুকোনো ছিল :

রাজা চলে সড়কে সড়কেরানি চলে বিন সড়কে–রাজা হাতে সোনা ছাতাটুকুরি জো উড়ে না। গেরানি হাসে মনে মনে....

এ গান বোঝার জন্যে ভজনদার হেল্পের দরকার হল না। নিজেই আন্দাজে বুঝে নিলাম– রাজা পথে পথে চলেছেন, রানি পথ ছেড়ে চলেছেন–রাজার হাতে সোনার ছাতা-হাওয়ায় ছাতা উড়ে গেল। রানি দেখে হাসেন মনে মনে।

জানি না, মানেটা ঠিক হল কি না।

শেতলপাটি হাতে একটি টেপ-রেকর্ডার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর গান-বাজনা, কথাবার্তা সব টেপ করে যাচ্ছেন।

যাত্রা জমল সাহেবরা সব চার-পাঁচটা করে হুইস্কি খাওয়ার পর।

আমার সাহেব–নীলকণ্ঠ–হুঁইস্কি খেলেও যা, না খেলেও তা–মহাস্থবির–কোনোই চাপল্য নেই–মাথা ঠাণ্ডা–চোখ সজাগ।

অন্য সাহেবরা যত হুইস্কি খান, ভজনবাবু তত মহুয়া।

পৌনে-এক ঘণ্টা পরে নরক গুলজার হল। মেমসাহেবরা সকলে মেয়েদের হাতে হাত দিয়ে নাচতে আরম্ভ করলেন।

সাহেব আর বউরানি ইজিচেয়ারে পাশাপাশি বসে অতিথিদের কান্ড দেখতে লাগলেন।

হঠাৎ কাতলামাছ খেপে উঠলেন। আসলে সকালে হানিফ সাহেবের বাড়িতেই খেপে ছিলেন। এখন গোটা পাঁচ-ছয় হুইস্কি পেটে পড়াতে লিচুকে বললেন, লিচু তুমি পছন্দ করো, এখুনি আমি আমার বউ ঠিক করব।

লিচু মেমসাহেবদের মধ্যে সবচেয়ে সরল আর স্পোর্টিং। তিনি বললেন, আপনি পছন্দ করুন আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।

তারপর পানুইকে দেখিয়ে বললেন, ওই তো বিউটি-কুইন।

কাতলামাছ বললেন, ও বড়োবেশি সুন্দরী, তাই আনইন্টারেস্টিং।

কাতলামাছের কথা শুনে ভক্তি হল আমার।

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা গেল কাতলামাছও মেয়েদের হাত ধরে নাচছেন। সে কী নাচ! একদল সুন্দরী মেয়ের মধ্যে একটা হিপোপটেমাসকে নীল জিনের ফ্লেয়ার আর লাল জিনের শার্ট পরিয়ে ছেড়ে দিলে যেমন দেখতে হয় তেমন আর কী!

কাতলামাছের ফুলমণি আর মানুদিকে পছন্দ হল। নিজেই গিয়ে দু-জনকে

বললেন, আমাকে বিয়ে করবি?

মানুদি স্ট্রেট মুখের ওপর না করে দিল।

বলল, তুই বড়ো মোটা আছিস।

ফুলমণিও একেবারে গররাজি। এমনকী নিমরাজিও নয়।

কাতলামাছ ওদের বললেন তোদের সসম্মানে বিয়ে করব, বউয়ের সম্মান দেব, গাই দেব–বলদ দেব, ছেলে হলে ছেলেকে নিজের সাকসেসর বলে স্বীকার করব।

ওরা সাকসেসর-টাকসেসর কখনো শোনেনি।

ঠোঁট উলটে বলল, কিছু লিব্ব না–তোকে বিয়া করব নারে বাবু।

কাতলামাছ ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে পড়লেন।

ছাগল-দাড়ি আর বামাপদ সমানে ফ্ল্যাশ-লাইট দিয়ে ছবি তুলে যাচ্ছিলেন।

এমন সময় মেয়েরা একটা নতুন গান ধরল।

তার প্রথম লাইনটা ছিল কলকাতা-হাবড়া এইসব।

সেই গান শুরু হতেই ছাগল-দাড়ি হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, গায়ে আসা ইস্তক পরে থাকা নীল ব্যাংলনের গেঞ্জিটা খুলে ফেললেন। এমনিতেই তো নিম্নাঙ্গে যা পরেছিলেন তা না পরার-ই মতো। কেন খুললেন, বুঝলাম না।

হঠাৎ তাঁকে এমনভাবে বস্ত্র-হৃত দেখে কাতলামাছের সংগীত প্রতিভা– আট-দশটা হুইস্কির কল্যাণে প্রবলভাবে জাগরূক হল।

তিনি নাচ ছেড়ে গান ধরলেন চৌপাইতে বসে।

এতক্ষণে একটা কাজ করে ফেলেছিলেন কাতলামাছ। ওদের সোজা দোলানি সুরের মেজাজটা ধরে ফেলেছিলেন। আসলে ওঁর উচিত ছিল এমন সব সিম্পল টিউনের কলকাতা হাবড়ার মতো গান শেখা। রবিঠাকুর দীনুঠাকুরের অকল্যাণে উনি কেন যে, লাগেন উনিই জানেন।

তাই, যেই কাতলামাছের গান শুরু হল অমনি তিন-জন মেমসাহেব কাতলামাছকে চৌপাই-এর দু-পাশে বসে একদম চেপটে রাখলেন, পাছে আবারও উঠে গিয়ে কোনো বেলেল্লাপনা করেন।

ছাগল-দাড়ির ডাকনাম কপাল।

কাতলামাছ যে, স্বভাব-কবি তা এতক্ষণে জানলাম। তিনি এখন ওদের গানের ও বাজনার সঙ্গে সঙ্গে ওই তালে ও লয়ে মিলিয়ে গান শুরু

করলেন। স্বরচিত।

শেতলপাটি টেপ বাগিয়ে ধরলেন সামনে।

কাতলামাছ টেনে টেনে গাইতে লাগলেন।

কপালবাবু কপালবাবু, তুমি বড়ো চালাক হয়েছে–ও-ও-ও-ও-চালাকেরও বাবা থাকে থ-ও-ও-ও-ও বাবারও বাবা থাকে থ-ও-ও-ও-ও ন্যাংটা হয়ে এসেছ, যেটুকু বা বাকি আছে -আমি খুলে লিব্ব থ-ও-ও-ও-ও।

যাত্রা পুরোপুরি জমে গেল।

এমনি স্বরচিত গান প্যারাগ্রাফের পর প্যারাগ্রাফ চলতে লাগল। ব্যাপারটাতে যারা গাইছিল, নাচছিল তারা প্রথমটাতে হকচকিয়ে গেলেও পরে সকলেই মজা পেল। এমন মজা পেল যে, ওরা নাচ-গান থামিয়ে সব কাতলামাছের ও মেমসাহেবদের সামনে এসে জড়ো হল।

আমার ইচ্ছে হল বলি কাতলামাছকে, বাহা, বাহা, বাহারে, ঘুরে ফিরে, ঘুরে ফিরে। নেহাত চাকরি যাওয়ার ভয়ে বলা গেল না।

হঠাৎ-ই সকলের খেয়াল হল রাত বারোটা বাজে।

রসভঙ্গ ও সভাভঙ্গ করতে হল।

আসর ভঙ্গ হতেই কাতলামাছ দৌড়ে গিয়ে ফুলমণি আর পানুইকে জড়িয়ে ধরে গালে দু দুটো করে চুমো দিয়ে দিলেন।

বললেন, কাল আসিস কেনে, শাড়ি দিব তুদের।

আমি ভাবলাম, এবার তির খেয়ে মরতে হবে।

ভজনদা নার্ভাস। পুরো গ্রামের লোকের চোখের সামনে এমন কান্ড।

সাহেবের চোখ দেখে মনে হল সাহেবও নার্ভাস।

ভজনদা তাড়াতাড়ি ওদের মধ্যে গিয়ে পড়ে বললেন, আরে সাহেবরা মজা করতে এসেছে।–না হলে কেউ নিজের বউয়ের সামনে ওদের চুমু খায়–দেখছিস না বউগুলোও কেমন হাসছে।

এই অকাট্য যুক্তিতে সকলেই ব্যাপারটাকে স্পোর্টিংলি নিল। কোনো অঘটন ঘটল না শেষপর্যন্ত। ঘটতে পারত! অবশ্য সাহেবরা যে, নির্দোষ মজা করতেই এসেছেন ও তাঁরা সকলেই ওয়েল-মিনিং, এ সম্বন্ধে সত্যিই ওদের কারও সন্দেহ থাকার কথা ছিল না।

যাই-ই হোক, যখন সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সাহেবরা ও আমরা গাদাগাদি করে একইসঙ্গে গাড়িতে উঠলাম তখন রাত সাড়ে বারোটা বাজে।

এ আমার কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। এই চাঁদনি রাত, ঝাঁকড়া

অশ্বত্থগাছ, চাঁদের আলোয় দেখা টিকরিয়া পাহাড়, সাঁওতালদের নাচ, গান, এই আশ্চর্য উন্মুক্ত নিষ্কলুষ পরিবেশ –এবং লাস্ট বাট নট দ্যা লিস্ট-কাতলামাছ–সব মিলিয়ে একটি অভিজ্ঞতার মতো অভিজ্ঞতা।

ফেরার পথে সারারাস্তা শেতলপাটি টেপ বাজাতে বাজাতে এলেন।

আমার মনে হল, কাতলামাছ এখানে এসে পর্যন্ত একমাত্র এই গানগুলিই সুরে গেয়েছেন।

চাঁদের আলোয় ভরা নিশুতি রাতে টাঁড়ের মধ্যে দিয়ে গাড়িতে আসতে আসতে সাঁওতালদের নাচ ও গানের ও কাতলামাছের গানের টেপ বাজছিল। ভারি ভালো লাগছিল। সকলেই একেবারে খোলামনে খুব হইচই করলেন।

ভজনদা ও আমার চাকরিটা রইল।

হুইস্কি বা মহুয়া কিছু না খেয়েও ওই পরিবেশের জন্যে আমারও নেশা নেশা, ঘোর ঘোর মনে হচ্ছিল।

বাড়ি পৌঁছোলাম যখন সকলে, তখন রাত প্রায় একটা বাজে।

সাহেব বললেন, টিকলু, তোমায় কাল ভোরে স্টেশনে যেতে হবে। মি. রায় বলে এক ভদ্রলোক আসবেন। একটু ডেসক্রিপশান দিচ্ছি, যাতে

চিনতে ভুল না হয়–বয়স ষাটের ওপর–বেঁটে–পেট-মোটা–সাদা চুল–পরনে অলিভ গ্রিন মিলিটারির মতো পোশাক। দেখে মনে হবে রিটায়ার্ড জেনারাল। চিনতে ভুল কোরো না। ওঁকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। উনি এগ্রিকালচার, হর্টিকালচার, ডেয়ারি, পোলট্রি, ফিশারি, জন্তুজানোয়ার ইত্যাদি সব বিষয়ে অথরিটি। খুব সম্ভব এঁকে এখানে আমার অ্যাডভাইসার করে পার্মানেন্টলি রাখা হবে।

তারপর বললেন, দেখো, ওঁর কোনো কষ্ট না হয়। গাড়ি নিয়ে যেয়ো। আমি উঠে তৈরি হয়ে থাকব ওঁর জন্য। তুমি সোজা আমার কাছে নিয়ে আসবে।

অথিতিদের খাওয়া-দাওয়ার তদারক করলাম। তাঁরা সবাই লনে চাঁদের আলোতে বসেই খেলেন। প্রত্যেকের সামনে মেহবুব আর অশোক ছোটো ছোটো টেবিল লাগিয়ে দিল। সেদিন বাড়িতে রান্না হয়নি। বউরানির অর্ডারে শহর থেকে নান আর তন্দুরি চিকেন আনা হয়েছিল। সঙ্গে খাসির রেজালা।

ওঁদের খাওয়া হয়ে গেলে নিজের খাওয়া-দাওয়া শেষ করে কোয়ার্টারে গিয়ে শুতে শুতে রাত সোয়া-দুটো বাজল। বেশি হলে আড়াই ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম সে-রাতে।

অশোককে বলে রেখেছিলাম।

অশোক এসে দরজা ধাক্কা দিয়ে চা দিয়ে গেল। ঠিক সাড়ে চারটের সময়।

অশোক, মেহবুব ওরাও নিশ্চয়ই আড়াই ঘণ্টার বেশি কেউ ঘুমোয়নি। পান্ডেও তিনঘণ্টা ঘুমিয়েছে বেশি হলে। কিন্তু তাতে কারও কোনো অনুযোগ, অভিযোগ নেই। সকলের-ই হাসি মুখ।

আমি যখন তৈরি হয়ে, পান্ডের পাশে সামনের সিটে পৌনে পাঁচটার সময় এসে বসলাম গাড়িতে, তখন আমার এনার্জি দেখে আমি নিজেই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছিলাম। এ ক-দিনেই সাহেবের পাল্লায় পড়ে কত বদলে গেছি। কলকাতায় দুপুরে তিনঘণ্টা ও রাতে কম করে আটঘণ্টা ঘুমোতাম, অথচ এখানে এত কম ঘুমিয়েও মেজাজ বা শরীর কিছুই খারাপ লাগছে না। আসলে আস্তে আস্তে বুঝতে শুরু করেছিলাম যে, পুরুষ কাজে থাকলেই বা কিছু একটা নিয়ে থাকলেই সবচেয়ে ভালো থাকে–নইলে তার জীবনীশক্তিতে ভাঙন ধরতে থাকে।

মি. রায় দৈর্ঘ্যে কম, প্রস্থে বেশি, কিন্তু খুব রাশভারী লোক। মনে হল খুব রাগিও। আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করলেন না। গট গট ছোটো ছোটো পা বড়ো বড়ো করে ফেলে হেঁটে এসে গাড়িতে উঠলেন।

বাড়ি পৌঁছেই মি. রায়কে সাহেবের কাছে নিয়ে গেলাম।

সাহেব মার্বেলের গোলটেবিলে মি. রায়ের জন্যে চা সাজিয়ে নিয়ে

বসেছিলেন।

মি. রায় চা খেতে খেতেই আশ-পাশের সমস্ত গাছগুলোর কী কী ডেফিসিয়েন্সি তা বলে দিলেন। কোনটায় অর্গানিক ম্যানিয়োর দিতে হবে, কোনটায় ইনসেক্টিসাইডস স্প্রে করতে হবে; ইত্যাদি ইত্যাদি। এগ্রিকালচারের কথাবার্তাও হল সাহেবের ওঁর সঙ্গে। ভদ্রলোককে দেখে রীতিমতো চমৎকৃত হয়ে গেলাম। এমন সর্বজ্ঞ লোক আর দেখেছি বলে মনে হল না। একেবারে ইনস্ট্যান্ট কফির মতো ইনস্ট্যান্ট জিনিয়াস। সে-কারণেই এ প্রতিভার মধ্যে কনসিসটেন্সি আছে কী নেই সে-বিষয়ে সন্দেহ জাগছিল।

সাহেব আমাকে অর্ডার করলেন, ওঁর মালপত্র নিয়ে দোতলার সবচেয়ে ভালো ঘরটাতে ওঁকে সেটলড করে দিতে।

চা খেয়ে উনি বললেন, আমি তাহলে স্নান করে, পুজো সেরে আসি। পুজো না করে আমি কিছু খাই না। সংসারের সঙ্গে তো কোনো সংস্রব নেই–এখন আমি সন্ন্যাসীবাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছি–নেহাত আপনি বললেন এত করে, তাই না এসে পারলাম না। আমি জীবনে অনেক ভোগ করেছি, টাকাপয়সা, মানসম্মান কিছুর-ই মোহ নেই–এখনও শুধু কর্মের জন্যে-কর্মযোগে বিশ্বাস করি বলেই কাজ করি।

তারপরেই একটু থেমে বললেন, আপনার কথাটা ভেবে দেখলাম। আমার

দু-হাজার হলেই চলবে মাসে। আর খাওয়া-দাওয়া অন দ্যা হাউস।

সাহেব বললেন, তা তো নিশ্চয়ই! এ তো আমার সৌভাগ্য। আপনার হেল্প যদি পাই তবে...।

মি. রায় বললেন, ডোন্ট ইউ ওয়ারি। আমি আজ থেকে আপনার লোকাল গার্জেন অ্যাপয়েন্ট করলাম নিজেকে।

কথাটা শুনে আমি একটু অবাক ও ভীতও হলাম। সাহেব কি হস্টেলে-থাকা নাবালক যে, লোকাল গার্জেনের প্রয়োজন হল হঠাৎ।

আমি মি. রায়ের মালপত্র সব গুছিয়ে-গাছিয়ে দিয়ে, ওঁকে নিয়ে এলাম ওপরে ঘর দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে।

উনি বললেন, শোনো ছোকরা, আমার জন্যে কিছু ফল আর গরম দুধ, বেশি নয়; এই এককেজি মতো; পাঠিয়ে দিয়ে ওপরে।

আমি বললাম, আচ্ছা স্যার।

.

কেন জানি না। ভদ্রলোককে আমার একেবারেই পছন্দ হল না। এই চিড়িয়াখানার পরিবেশে, সকলের এই আন্তরিক ঘরোয়া প্রায়-পারিবারিক সম্পর্কের পটভূমিতে এই লোকটা হঠাৎ হামবাগ ইম্পসটারের মতো

এসেই যেন নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু আমার ভালো লাগা না-লাগা দিয়ে আর কী হবে। সাহেব তাঁকে গুণী-জ্ঞানী জ্ঞান করেন তাহলেই হল।

নীচে নেমে দেখলাম অতিথিরা সকলেই উঠে গেছেন। বারান্দায় চায়ের আসর বসেছে। কাল রাতের টেপ বাজছে সকাল থেকে।

কাতলামাছ, ছাগল-দাড়ি, নিনি-ছুপকি সকলে বসে আছেন। একটু পর মেমসাহেবও এলেন।

এমন সময় দেখি ফুলমণি আর পানুই এসে বারান্দার সামনে দাঁড়িয়েছে।

সাহেব ওদের দেখতে পেয়েই বললেন, কী রে? কী চাই?

ফুলমণি লজ্জা পেয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, উ বাবুটা বলেছিল শাড়ি দেবে।

কাতলামাছের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

কাল রাতে নেশার ঝোঁকে যে, ওদের শাড়ি দেবেন বলেছিলেন, সে-কথা বোধ হয় বেমালুম ভুলে গেছেন উনি।

ওদের দেখে তাড়াতাড়ি হিপ-পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে কুড়ি কুড়ি চল্লিশ টাকা দিলেন ওদের।

পানুই বললেন, এতে হবেক নাই।

মেমসাহেব বললেন, হবে রে বাবা, হবে।

ওরা চলে যেতেই কাতলামাছ বললেন, আগে যদি জানতাম এরকম গচ্চা যাবে, তবে ভালো করে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটেই চুমু খেতাম। গালে চুমু খেয়ে–তাও এক সেকেণ্ডের জন্যে -এতগুলো টাকা গচ্চা দেওয়া বড়োবেশি এক্সপেনসিভ হয়ে গেল।

ছাগল-দাড়ি আমায় শুধোলেন, চল্লিশ টাকায় কতখানি পাঁঠার মাংস পাওয়া যায় এখানে?

আমি বললাম, তিনকেজি ছ-শো।

ছাগল-দাড়ি কাতলামাছকে বললেন, দ্যাখ, টাকার কী ওয়েস্টেজ করলি তুই! সকলে মিলে খাসির রেজালা কী চাপ খাওয়া যেত।

মেমসাহেব বললেন, টিকলু, মেহবুবকে বলো আরও চা নিয়ে আসতে, আর তারপর তুমি বাজারে যাবে।

আরও চায়ের পরে আরও গল্প-গুজব করলেন ওঁরা, এমন সময় ওপরের সিঁড়িতে থপ থপথপ আওয়াজ হল কারও নামার।

মেমসাহেব সবে ঘুম থেকে উঠেছেন। সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

তোমার কচ্ছপটা কি কাল ওপরে ঘুমিয়েছিল?

সাহেব ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শ-স-স-স করে বললেন, মি. রায় আসছেন!

মেমসাহেব ভুরু তুলে অবাক হয়ে বললেন, তিনি কে?

মেমসাহেব মি. রায় সম্বন্ধে জানতেন না।

মি. রায় টান-টান করে অলিভ-গ্রিন শিকারের পোশাক ও তারসঙ্গে লাল রঙা একটা যোধপুরি বুট পরে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। আত্মপ্রত্যয় ঝরিয়ে বললেন, গুড মর্নিং টু ইউ। অল।

সাহেব প্রথমে বউরানি ও পরে তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ও মেমসাহেবদের সঙ্গে মি. রায়ের আলাপ করিয়ে দিয়ে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত বললেন।

তারপর বললেন যে, উনি খুব বড়ো শিকারিও। সুন্দরবনের ওপর অথরিটি।

ছাগল-দাড়ি নিজে শিকারি বলে শিকারির চোখ দিয়ে মি. রায়কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখছিলেন।

হঠাৎ বউরানি মি. রায়কে বললেন, আচ্ছা মি. রায়, আপনি কি সব সময়ই শিকারের পোশাক পরে থাকেন?

মি. রায় আমার মুখের দিকে তাঁর মাংসল-পশ্চাৎদেশ সবেগে ঘুরিয়ে বউরানির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পা ফাঁক করে দুটো হাত কোমরের সমান্তরালে দু-পাশে ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, কে জানে? কখন ডাক আসে?

বউরানি তাঁর অভিব্যক্তিহীন চোখে কিছুক্ষণ অপলকে মি, রায়ের হাসি হাসি আত্মবিশ্বাসী মুখের দিকে চেয়ে রইলেন!

তারপর হঠাৎ, একেবারে হঠাৎ-ই বললেন : কিছু মনে করবেন না মি. রায়, বাঘ মারার ডাক এলে কি পেন্টুলুনটা বদলাবার সময়ও পাবেন না?

কথাটাতে সকলে হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মি. গদাধর রায় আলপিন-ফোঁটানো বেলুনের মতো চুপসে গেলেন।

সাহেব তাড়াতাড়ি সিচুয়েশন সেভ করার জন্য চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েই মি. রায়কে বললেন যে, চলুন চলুন রায়সাহেব, আমরা গিয়ে টি-হাউসে বসি। আমার বন্ধুরা এসেছে ছুটি কাটাতে–এখানে আড্ডা-গুলতানি হচ্ছে, এখানে আমাদের কাজ হবে না।

মি. রায় যেতে পেরে বেঁচে গেলেন।

সাহেব বললেন, মেহবুব রায়সাহেবের ব্রেকফাস্ট টি-হাউসে পাঠিয়ে দাও।

ওঁরা চলে যেতেই হাসির ফোয়ারা উঠল।

ছাগল-দাড়ি বললেন, বউদি, আপনার মতো ঠোঁটকাটা লোক দেখেনি। কথাটা বলতে আমিও চেয়েছিলাম, কিন্তু বলতে পারতাম না।

বউরানি বললেন, আপনাদের বন্ধু মানুষ চেনে না, এ ভদ্রলোক মোটেই ভালো লোক নন, কাজের তো নন-ই; তা আমি চেহারা দেখেই বুঝেছি। চ্যাম্পিয়ন মেমসাহেব! ইনি এখানে থাকলে আমার চিড়িয়াখানার সোনার সংসারে আগুন লেগে যাবে।

একসঙ্গে বউরানিকে এতগুলো কথা বলতে কখনো শুনিনি। তাই অবাক হলাম শুনে।

এমন সময় লিচু বারান্দায় এলেন। উনি এতক্ষণ বোধ হয় হেয়ার ডু করছিলেন। মাথার ওপরে একটা হিমালয়ান স্কুইরেলের বাসার মতো প্রকান্ড বাসা বানিয়ে এসে বললেন।

ছাগল-দাড়ি বললেন, করেছ কী লিচু!

লিচু চোখ ঘুরিয়ে কটাক্ষ করলেন, স্বামীর বন্ধুকে, তারপর বউরানিকে বললেন, আচ্ছা বউদি, আপনার এমন কেশবতী কন্যার মতো চুল, আপনি কেন মাঝে মাঝে হেয়ার ডু করেন না! আপনার মতো যদি আমার চুল থাকত।

বউরানি চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে বললেন, একবার করেছিলাম

ভাই, সেই প্রথম ও সেই শেষ সুন্দরী হওয়ার চেষ্টা।

সমবেত সকলে নড়েচড়ে বসলেন।

তিনি বললেন, বলুন বউদি, বলুন।

বউরানি আস্তে আস্তে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কাটাকাটা ডায়ালগে বলতে আরম্ভ করলেন।

ইতিমধ্যে আমি চট করে ভেতরে গিয়ে অশোককে আবারও চা আনতে বলে এলাম। সাহেব-মেমসাহেবদের এখন মুড এসেছে। মুড যাতে ঠিক থাকে, তার বন্দোবস্ত করাই তো আমার কাজ।

বউরানি সাহেবের বন্ধু ও বন্ধুর স্ত্রীদের বলছিলেন, তোমাদের বন্ধুর সঙ্গে দিল্লি গেছি। ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেনটালে উঠেছি। সঙ্গে আমার বড়ছেলে। তখন ওর বয়স এগারো বারো বছর।

স্বামী বললেন আজ সন্ধেয় কয়েকজনকে আসতে বলেছি–একটা ককটেল পার্টি দেব। আমাদের সুইটেই। তুমি যাও-না ভ্রমর, নীচের বিউটিপার্লার থেকে চুলটা বেঁধে এসো।

আমি বললাম, আমি ওসবের মধ্যেই নেই, তা ছাড়া চিনিও না কোথায় কী আছে। কখনো করিনি ওসব!

স্বামী বললেন, তুমি ছেলেকে নিয়ে যাও, ও চিনিয়ে নিয়ে যাবে।

তারপর বললেন, যাও-ই না বাবা–জীবনে একদিন চুল বেঁধেই দ্যাখো কেমন দেখায়।

পার্টি আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা দুই আগে, অতএব ছেলের সঙ্গে গেলুম।

দু-জন মেয়ে মিলে তো আমাকে নিয়ে পড়ল। আমরা যেমন করে চিংড়ি মাছের কাটলেট বানাবার সময় চিংড়ি মাছ থুরি, তেমন করে আমার চুল ঘুরছে তো ঘুরছেই–যতক্ষণ ধরে থুরল, ততক্ষণে আড়াইশো চিংড়ি মাছের কাটলেট বানিয়ে ভাজা হয়ে যেত।

ছেলের অতধৈর্য ছিল না। সে আধঘণ্টা মতো বসে বলল, মা আমি চললুম, তুমি চুল বেঁধে এসো।

কিছুক্ষণ পর ঘুম পেয়ে গেল। আমি চোখ বুজে ফেললুম। আমি রক্ষণশীল ঘরের মেয়ে নাপতেনি ও দাইয়েরা চিরদিন পিঁড়েতে বসিয়ে চুল বেঁধে দিয়েছে। এমন অদ্ভুত চেয়ারে বসে, হাসপাতালের নার্সের মতো পোশাকপরা মেয়েরা যে, কী করবে আমাকে নিয়ে শেষপর্যন্ত তাই ভেবেই আমার আতঙ্ক হল।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, এদেরও উচিত এনেস্থেসিয়া দিয়ে নেওয়া চুল বাঁধার আগে।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

কে যেন আমার ঘাড়ে মিষ্টি করে নরম আঙুলে একটি চাঁটি মেরে ইংরিজিতে কীসব বলল।

আমি তাকিয়ে দেখি, আমি যে চেয়ারে ছিলুম, সেখানে নারদমুনি বসে আছে। ভয়ে আমার কেঁদে ফেলার অবস্থা।

যাই-ই হোক, গুচ্ছের টাকা দিয়ে তো সেখান থেকে বেরোলাম, কিন্তু এখন ঘরে যাব কী করে?

শেতলপাটি ইন্টারাপ্ট করে বললেন যে, তা ঠিক ওবেরয় ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেলে মনে হয় শহর-ই একটা ছোটোখাটো।

অশোক আবার চা নিয়ে এল।

লিচু বললেন, বলুন বউদি।

বউরানি বললেন, ঘরের নম্বর জানি না, কোন তলায় ঘর তা জানি না, ছেলে তো আমার ফেলে চলে এল। এখন আমি কী করি?

লাউঞ্জে দেখলাম, অনেক সাহেব-মেম বসে আছেন। আমিও তাদের পাশে বসে পড়ে কী করি তাই ভাবতে লাগলাম।

ওরা ড্যাবড্যাব করে আমার মাথার দিকে চাইতে লাগল।

সামনেই পাশাপাশি দুটো লিফট উঠছিল-নামছিল। অবশেষে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে আমি একটা বোতাম টিপে দিলুম। লিফটের দরজা খুলে গেল। আমি ঢুকতেই বন্ধ হয়ে গেল। বোতাম টিপলুম। লিফটটা সড়াৎ করে নীচে নেমে গেল।

দরজা খুলতেই দেখি, দু-জন কালো শেরওয়ানিপরা মুসলমান লোক দৌড়ে এসে আমার দু-কানে আতর-দেওয়া তুলো গুঁজে দিয়ে কুর্নিশ করল।

আমি ভয় পেয়ে আবার দৌড়ে লিফটে ঢুকে গেলুম। আবার বোতাম টিপলুম।

দরজা খুলতেই দেখি সাহেব-মেমরা যেখানে বসেছিলেন, সেই তলাতেই আবার এসে পৌঁছোলুম।

তখন আমার কী যে অবস্থা!

ছাগল-দাড়ি বাঁ-হাতে দাড়ি চুলকে বললেন, শেষে স্বামীর কাছে পৌঁছোলেন কী করে?

বউরানি বললেন, একে-তাকে জিজ্ঞেস করে-করে রিসেপশান না কী

বলে, যেখানে অনেক ছেলে-মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নীচুগলায় গল্প করে, সেখানে গিয়ে শুধোলাম, এখানে কলকাতার এ এম মিত্তির কোন ঘরে উঠেছেন, কোন তলায়?

রিসেপশনের মেয়েগুলো এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যেন, আমি খারাপ মেয়ে-টেয়ে হব।

এদিকে বলতেও পারছি না যে, আমি তাঁর স্ত্রী। বললে তো আবার বোকা ভাববে।

ওরা বলল আমি কী চাই?

আমি বললুম, মি. মিত্তিরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আমার।

ওরা ঘর ও তলা বলে দিল।

কিন্তু আমি রিস্ক নিলুম না। বললুম, কাউকে সঙ্গে দিন।

একটি মেয়ে ঢঙি-ঢঙি গলায় পে-এ-এ-এ-জ বলে ডাকল।

হলুদ জামা পরা একটা বেয়ারা এসে আমায় যখন স্বামীর ঘরের সামনে পৌঁছে দিল, তখন পার্টি বেশ জমে গেছে।

দরজা খুলতেই, আমি ঢুকতেই ছেলে আবার আমাকে দেখে হাঁউ মাউ

করে কাঁদতে শুরু করে দিল।

পার্টির সমস্ত লোক, সকলেই পাঞ্জাবি, আমার অচেনা; আমার দিকে অপলক তাকিয়ে রইল। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, ও মা, তোমার মাথায় ওটা কী? খুলে ফ্যালো মা, এক্ষুনি খুলে ফ্যালো–ওমা খুলে ফ্যালো।

সব অপরিচিত পাঞ্জাবি ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা, তাদের সামনে কী হেনস্থা!

স্বামী আমাকে চোখ দিয়ে ইশারা করলেন, বাথরুমে গিয়ে ওটাকে খুলে আসতে।

বাথরুমে ঢুকে তো খোলা আরম্ভ করলাম–কিন্তু যে-নারদ ঋষি তৈরি হতে এত সময় লাগল, তা কি অতসহজে খোলা যায়?

বেসিনের সামনে ঘাড় কুঁজো করে থেকে ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেল। ওই ঠাণ্ডা এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে মাথার জল লাগিয়ে লাগিয়ে সর্দি ধরে গেল। যখন নারদ ঋষিকে সম্পূর্ণ গলিয়ে মা-বাবার দেওয়া চুল নিয়ে বাথরুম থেকে ঘরে এলুম, তখন দেখলুম পার্টি শেষ।

ছেলে ততক্ষণে কেঁদে কেঁদে বেডরুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার স্বামী আমাকে কাছে টেনে বললেন, ভ্রমর, তোমাকে আর কখনো

হেয়ার-ডু করতে বলব না।

বউরানি একটু চুপ করে বললেন, বললেই যেন আমি আবার করতাম।

ছাগল-দাড়ি বললেন, ওই শেরওয়ানি পরা লোক দুটোর কি কোনো মতলব ছিল?

শেতলপাটি বললেন, আরে না না মোগল রেস্তরাঁয় ঢুকলে ওরা ওইরকম করে কাস্টমারদের ট্রিট করে। ওটা একটা রিচুয়াল।

হঠাৎ সকলের খেয়াল হল বামাপদকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। লিচু, নিনি ও ছুপকি তিনজনেই এখানে। কাতলামাছ, ছাগল-দাড়ি শেতলপাটিও, শুধু তিনি-ই অনুপস্থিত।

ছাগল-দাড়ি বাঁ-হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মধ্যে একটা জ্বলন্ত সিগারেট ধরে বাঁ-হাতটা আমার নাকের কাছে তুলে ধরে অনুনয় করে বললেন দেখুন-না টিকলুবাবু, বামাপদর ঘরে বামাপদ আছে কি না? থাকলে একটু ডেকে দিন।

ছাগল-দাড়ির কায়দাটা অদ্ভুত-লক্ষ করছিলাম, কাউকে কিছু অনুরোধ করতে হলেই, বক্সারের মতো ভোলা বাঁ-হাতের কেলে-কেলে আঙুলঅলা পাতাটা সোজা, যাকে অনুরোধ করা হচ্ছে তার নাকের সামনে চলে যাবে।

আমি উঠে যে-ঘরে বামাপদর থাকার কথা, সে-ঘরের সামনে গিয়ে শুধোলাম, আছেন নাকি স্যার।

ভেতর থেকে একটা অদ্ভুত হুম-হাম শব্দ আসতে লাগল। এয়ার-কণ্ডিশনার বন্ধ; বাইরের দরজা ভেজানো।

এখানে এসে ইস্তক এমন এমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে, এখন তার কোনো কিছুতেই আমি চমৎকৃত হই না। ভেজানো দরজা পাল্লায় কান লাগিয়ে মনে হল ঘরের মধ্যে একটা পালকি চলছে ঘুরে-ঘুরে। হুম-হুঁমানি তুলে।

আবারও বললাম, স্যার আসব?

এবার উত্তর পাওয়া গেল। কিন্তু ভৌতিকভাবে।

বামাপদ ঝাঁকি দিয়ে বললেন, কাম। তারপর, ইন। কিন্তু কাম কথাটা একেবারে দরজার কাছ থেকে এল আর ইন কথাটা, একটু পর; দূর থেকে। এবং দুটোই ঝাঁকি দিয়ে।

ভয়ে ভয়ে আস্তে করে দরজাটা ঠেলে ভেতরে ঢুকে দেখি বামাপদ নীল গেঞ্জির ওপর নীল ফুল-হাতা সোয়েটার ও ছাগল-দাড়ির মতো একটা শর্টস পরে সারাঘরে ব্যাঙের মতো লাফিয়ে বেড়াচ্ছেন–দু-কোমরে দু-হাত দিয়ে। চোখ লাল, মুখ লাল, ঘরের মেঝে ঘামে ভিজে গেছে।

উনি আমাকে দেখেও থামলেন না।

আমি বললাম, আপনাকে ওঁরা ডাকছেন।

উনি তেমন-ই লম্ফ দিতে দিতে, ঝাঁকি দিয়ে বললেন, জগিং।...শেষ ফ্লগিং... আরম্ভ...।

এটুকু বলতেই ঘরটা দু-বার পরিক্রমা করে ফেললেন।

তারপর বললেন, যা... ...চ্ছি...।

আমি তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে বাইরে এলাম।

আমার ওঁকে দেখেই কপাল ঘেমে গেল, আর উনি না জানি কী ঘামান ঘেমেছেন।

আমি ফিরতেই ছাগল-দাড়ি শুধোলেন, কী করছে?

আমি বললাম, জগিং শেষ; ফ্লগিং আরম্ভ। বললেন যে, আসছেন।

বউরানি বললেন, টিকলু এবার বাজারে যাও। আজকে তো রাতে তোমাদের হানিফ সাহেব আসবেন বিরিয়ানি বানাতে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, তার ফর্দ আমার পকেটে।

স্কুটার-টেম্পো নিয়ে আমি চলে গেলাম বাজারে।

বাজার থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় নিল। হানিফ সাহেব খাসির অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেরকম বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন, ডা. নৃপেন দাসের মতো সার্জন হলেও তাঁরও অনেক সময় লাগত কাটা-কুটি করতে কলিজা, কবুরা, সিনা, রাং, প্রভৃতি জায়গা থেকে বিভিন্ন ওজনের রিকুইজিশান। রাং-এরও আবার ক্লাসিফিকেশন আছে, সামনাওয়ালা; পিছলাওয়ালা।

যা-ই হোক, বাজার করে ফিরতেই ভজনদার সঙ্গে দেখা। গেটের কাছে।

ভজনদা বললেন, ভেরি বিজি?

আমি বললাম, না।

উনি বললেন, বাবুর্চিখানায় বাজারের জিম্মা দিয়েই চলে এসো। কেস গড়বড়। চিড়িয়াখানার একজিসটেন্টস নিয়ে ঝামেলা হয়ে গেছে।

তাড়াতাড়ি আমি ফিরে এলাম।

ভজনদা বললেন, মিস্টার রায়কে তুমি-ই নিয়ে এসেছ আপ্যায়ন করে?

আমি বললাম, সে তো শুধু স্টেশান থেকে! আসলে সাহেব-ই ওঁকে আনিয়েছেন।

তা তো আনিয়েছেন কিন্তু এসে অবধি, উনি যা শুরু করেছেন তাতে পোলট্রির মল্লিক সাহেব ও ডেয়ারির ঘোষ সাহেব রীতিমতো ক্ষুণ্ণ। ডেয়ারিতে গিয়ে উনি বলেছেন সমস্ত গোরুর ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি আছে। ষাঁড়গুলোকে আরও অনেক বীর্যবান হতে হবে যদি স্বাস্থ্যবান বাচ্চা পয়দা করতে হয়। পোলট্রিতে গিয়ে বলেছেন এর দেড়গুণ ডিম হওয়া উচিত। এখনও চিড়িয়াখানায় ও গ্রিনহাউসে আসেননি। শুনলাম নাকি তিনি এগ্রিকালচারারিস্ট, বটানিস্ট, ডেয়ারি এক্সপার্ট, পোলট্রি এক্সপার্ট, জিয়োলজিস্ট, বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট এক্সপার্ট মানে, হোয়াট নট?

তারপর একটু থেমে বললেন, ডেয়ারির ঘোষ সাহেব বলেছেন আসলে মি. রায় একটি বুলশিট।

মানে? আমি অবাক হয়ে শুধোলাম।

বুল-শিট মানে জানো না? ভজনদা অবাক হয়ে শুধোলেন।

তারপর বললেন, ষাঁড়ের গোবর।

তারপর আবার বললেন, আমি নবনেকে বলে দিয়েছি, ওকে একটা লাউডগা সাপ এনে দেবে, গ্রিনহাউসের ডিফিয়োনবিচিয়ার গায়ে জড়িয়ে রেখে দেবে। যেই উনি গ্রিন-হাউসে ঢুকবেন তখন নবনে বলবে, স্যার এই ডিফিওনবিচিয়াটা ভালো বাড়ছে না। তারপর যেই মি. রায় হাত বাড়িয়ে ডিফিওনবিচিয়া ধরতে যাবেন সাপ দেবে কিটুং করে। মাস্তানি

বেরিয়ে যাবে। সাহেবের এ কী ভীমরতি হল।

আমি বললাম, সাহেবকে বলুন, আপনারা সবাই মিলে।

ভজনদা আঁতকে উঠলেন।

বললেন, মাথা খারাপ! সাহেবকে বলার সাহস নেই কারও। তবে ব্যাপারটা এমন সিরিয়াস টার্ন নেবে যে, ভাবা যায় না। ঘোষ সাহেব ও মল্লিক সাহেব দু-জনেই আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা প্রফেশনালি অপমানিত বোধ করছেন–তাঁরা দুজনেই পার্টনারশিপ থেকে রেজিগনেশান দেবেন।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা ডেয়ারির কাছে গিয়ে পৌঁছোলাম।

আমি বললাম, মেমসাহেব কিন্তু ওই ভদ্রলোককে একেবারেই পছন্দ করেননি। উনি বলেছেন যে, সাহেব মানুষ চেনেন না, ওই ভদ্রলোক নাকি মোসাহেবি ছাড়া আর কিছুই জানেন না।

-সত্যি?

ভজনদা যেন হাতে চাঁদ পেলেন।

তারপর বললেন, তাহলে একটা বুদ্ধি করতে হবে।

আমি বললাম, কী বুদ্ধি?

ভজনদা বললেন, সাহেব আজ-ই রাতে আবার কলকাতা যাচ্ছেন। পরশু ফিরবেন। কালকের মধ্যে ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করতে হবে।

ঘোষ সাহেব মন খারাপ করে তাঁর কোয়ার্টারে চলে গেছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।

দেখলাম সারে সারে গোরু দাঁড়িয়ে। এখানেও এক দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার। আমি শুধোলাম, এগুলো কি সব-ই দিশি গোরু? দিশি গোরুর মতো তো দেখতে নয়?

ভজনদা বললেন, অনেকরকম গোরু আছে। এসো তোমাকে চিনিয়ে দিই। ওই দ্যাখো, ওইদিকে সব দিশি গোরু। আর তার পাশে পাঞ্জাবি গোরু– এদের নাম সহিওয়াল। গায়ের রং দেখছ মেশানোকালো-সাদা, লাল-সাদা ইত্যাদি। তার পাশে লাল বড়ো বড়ো গোরুগুলো দেখছ ওগুলোর নাম– রেড সিন্ধি। তার পাশে ক্রসড জার্সি; এগুলো ইংলিশ। আরও ইংলিশ গোরু আছে, চলো দেখাই। ওইগুলো হচ্ছে হলস্টাইন তাদের পাশে রেড ডেন। ওগুলো সব বিরাট বিরাট। কালো হয়, লাল হয়।

তারপর বললেন, দুধ কিন্তু সকলের-ই সাদা।

আমি শুধোলাম, ওরা জাবনা করে খাচ্ছে কী?

আসলে জাবনা নয়–সারি করা গোরুর সামনে একেবারে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো পারমানেন্ট সিস্টেম।

ভজনদা বললেন, ক্যাটল-ফিড খাচ্ছে ওরা।

চিকেন-ফিডের মতো? আমি শুধোলাম।

ভজনদা বললেন, বাঃ, এই তো শিখে গেছ।

কী কী খায় গোরুরা?

ভজনদা বিরক্ত হয়ে বললেন, এই ক্যালকেশিয়ান সাহেব নিয়ে তো মহামুশকিলে পড়লাম। গোরু কী খায় তাও জান না? ধানগাছ চেন তো?

তারপর নিজেই বললেন, চূণী, ভুসি, অড়হর চূণী, জোয়ার চূণী, বাদাম-খোল, সরষে খোল, তিসি-খোল, খড়। গুড়ও খায় মাঝে মাঝে।

আমি বললাম, এরকম তেলের খোল খায়, গোরুর দুধ তৈলাক্ত হয়ে যায় না?

ভজনদা আমার উৎসাহে ভাটা দিয়ে বললেন, গোরুর দুধও খাওনি নাকি? আর বিরক্ত কোরো না তো আমাকে–এখন আমার মেজাজ খারাপ।

তারপরে আমাকে নিয়ে ঘোষ সাহেবের কোয়ার্টারে গেলেন।

ঘোষ সাহেব পায়জামা পরে, তোয়ালে হাতে চান করতে যাচ্ছিলেন।

বললেন, কী ব্যাপার?

ভজনদা বললেন, একটা আশার আলো দেখতে পাওয়া গেছে ঘোষ সাহেব।

বিরক্তমুখে ঘোষ সাহেব বললেন, কী?

ভজনদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, টিকলু বলছিল যে, মেমসাহেব নাকি মি. রায়কে একেবারেই পছন্দ করেননি। আমার মনে হয় আজ সাহেব চলে গেলেই কাল ভোরে আমরা মেমসাহেবের কাছে সকলে একসঙ্গে ডেলিগেশান নিয়ে যাব।

ভজনদা আমাকে নিয়ে ডেয়ারির দিকে যেতে যেতে বললেন, গজকচ্ছপ রায়কে টিট করতে পারলে মেমসাহেব-ই পারবেন।

ঘোষ সাহেবের কুঁচকোনো ভুরু সোজা হয়ে গেল।

বললেন, কথাটা মন্দ বলেনি ভজন।

তারপর বললেন, একটা বন্দোবস্ত করো। তুমিই ইনিসিয়েটিভ নাও।

ভজনদা বললেন, ঠিক আছে।

ভজনদা আর আমি অন্যদিক দিয়ে ফিরলাম। সেখানে গোলাপ-বাগান, চাষ হচ্ছে গোলাপের। অনেকখানি জায়গা বেড়া দিয়ে ঘেরা। অনেক সাঁওতালি মেয়ে সেখানে বাডিং করছে আর নবীনবাবু তদারকি করছেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কতরকম গোলাপ?

-হ্যাঁ। অনেকরকম।

নবীনবাবুকেও খুব পারটার্বড় দেখলাম, তবুও আমাকে কিছু কিছু গোলাপ চিনিয়ে দিলেন। ব্ল্যাক প্রিন্স, ক্লিওপেট্রা-পিঙ্ক রঙা। সুপারস্টারও পিঙ্ক। ডা. ভ্যালোস–এগুলো বাই-কালার ডোরাকাটা-লালের ওপর হলদের স্ট্রাইপসও হয়। গার্ডেন পার্টি–সাদা রঙা। তা ছাড়া বহুরকম মিনিয়েচার গোলাপ–লাল, সাদা, চুন-হলুদ রঙা। বহুরকমের লতানো গোলাপ।

নবীনবাবু তখন অফ-মুড। উনি ভজনদার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। মুশকিল হচ্ছে যে, মি. রায়,সাহেবের বাড়িতেই আছেন।

ভজনদা বললেন, টিকলু তুমি কাল ভোরে মেমসাহেবকে নিয়ে গ্রিন হাউসে চলে আসবে সাহেবের বন্ধুরা ওঠার আগেই। আমরা সকলে ওখানে জমায়েত হব ছ-টার সময়। তারপর দরজা বন্ধ করে কনফারেন্স হবে।

আমি বললাম, ঠিক আছে।

সে-রাতে লনে খুব হই-হল্লা হল। হানিফ সাহেব জব্বর বেঁধেছিলেন বিরিয়ানি। বাবুর্চিখানা একবারে সরগরম। বিকেল থেকে গুলহার কাবাব বানানোর তোড়জোড়। তখন থেকেই বাবুর্চিখানাতে বসেই হানিফ সাহেব রাম খেতে শুরু করেছিলেন ওই গরমে। তাই যখন রান্না-বান্না শেষ করে উনি লক্ষ্ণৌ-এর কাজ করা চিকনের পাঞ্জাবি, কলিদার পায়জামা, ফুলতলা নাগরা জুতো, বগলে খস আতর লাগিয়ে লনে এসে দাঁড়ালেন তখন শুধু মির্জা গালিব নন, জিগর মোরাদাবাদি, জাফফর এবং অন্যান্য তাবৎ উর্দু, ফারসি, পুশতু, আরবি কবিদের ভূত ওঁর কাঁধে ভর করছিলেন। শায়েরের ফুলঝুরি ফুটছিল আর অতিথিরা মুখ ভরতি গুলহার কাবাব নিয়ে ক্রমান্বয়ে ওয়াহ, ওয়াহ করছিলেন।

বউরানি সাহেবকে চিঠিতে যেমনটি বলেছিলেন, তেমন-ই করলেন। তখন তাঁর শরীর খারাপ হল। তিনি বিরিয়ানি ছুঁলেন তো নাই-ই; দেখলেন পর্যন্ত না। একবাটি জল-দেওয়া পান্তাভাতে একটা শুকনো-লঙ্কা পোড়া গুলে খেয়েদেয়ে তিনি শয্যা নিলেন।

সাহেব বহুবার ভ্রমর-ভ্রমর করলেন। কিন্তু কখন থামতে হবে তা সাহেব জানতেন। অনেক বছর যিনি ভ্রমরের সঙ্গে একঘরে কাটালেন, তিনি ভ্রমর কখন হুল ফোঁটাতে পারে আর কখন পারে না, তা বিলক্ষণ জানতেন।

সেই রাতে শুধু দু-জন হিরো। হানিফ সাহেব আর নবাগত সর্বজ্ঞা মিস্টার

রায়। এমনটি তাদের বক্তৃতার চোটে খল-বলে কাতলামাছও ভাবনার পুকুরের নীচে গভীর পাঁকে মুখ লুকিয়ে রইলেন।

মি. রায় গন্ডায় গন্ডায় নরখাদক মেরেছেন, উনি লেডিকিলার; ইনি কি নন? তাঁর নানারকম গল্প শুনে সকলের চোখ বড়ো বড়ো।

গোলমালের মধ্যে ভজনদা আমাকে ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললেন, শালা বড়ো কপচাচ্ছে। জানো না বাছা তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।

আমি বললাম, সে এখন পান্তাভাত খেয়ে ঘুমোচ্ছ। কাল বুঝবেন মি. রায়, কত ধানে কত চাল।

বউ-রানিকে আমি বলে রেখেছিলাম।

সকালে উঠেই ওঁর ভীষণ রাগ। ভজনদা ওঁর হাউস-হোল্ড স্টাফের দু-জন লোককে নিয়ে গেছেন কী কাজে সাহেবের হুকুম। তাই মেমসাহেবের ঝোঁক উঠেছে, এক্ষুনি ওঁর চারজন লোক চাই। যেহেতু সাহেব ওঁকে না বলে ওঁর দু-জন লোক নিয়েছেন, সুতরাং উনি এক্ষুনি সাহেবের অর্ডার সুপারসিড করে ডেয়ারি, পোলট্রি, চিড়িয়াখানার চারজন লোক চান।

এদিকে বউরানিই এখন মি. রায়ের হাত থেকে পুরো চিড়িয়াখানা বাঁচানোর একমাত্র উপায়।

আমি বললাম, ওঁরা তো সকলেই গ্রিনহাউসে আসছেন; আপনি নিজেই ভজনদাকে বলবেন।

তখনও বাড়ির সকলেই ঘুমোচ্ছেন, খিদমদগাররা ছাড়া।

আমি বউরানিকে নিয়ে গ্রিনহাউসের দরজা ঠেলে ঢুকলাম।

ঢুকতেই ওঁরা সকলে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

প্রথমে আমি বউরানির অভিযোগের কথা বললাম।

সঙ্গে সঙ্গে চারজনের বদলে আটজন লোকের বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

বউ-রানি ভজনদাকে বললেন যে, আপনাদের সাহেবকে বলে দেবেন যে, ভবিষ্যতে আমার পারমিশান ছাড়া একজনও লোক নিলে, আপনারা ওঁকে না জানিয়েই একজন লোকের বদলে আমাকে আট-জন করে লোক দেবেন।

ভজনদা বললেন, বলব মেমসাহেব।

তারপর ওঁদের সকলের কথা চুপ করে আধ ঘণ্টা শুনলেন বউরানি।

তারপর বললেন, আপনাদের সাহেবের ভীমরতি ধরেছে। থাকগে, আপনারা আজ সকালে সন্ধেয় আমার এখানে খাবেন। তখন খাওয়া-

দাওয়ার পর আমি যা বন্দোবস্ত করার করব।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, টিকলু আমরা যখন খাওয়া-দাওয়ার পর লনে বসব, তখন তুমি অশোককে দিয়ে মি. রায়ের স্যুটকেস গুছিয়ে হোল্ডঅল বাঁধিয়ে রেডি করে রাখতে বলবে। ছোটুয়া লন থেকে বাঁশি বাজালেই যেন অশোক আর মেহবুব ওঁর মালপত্র নিয়ে লনে নেমে আসে। পান্ডেকে বলে রাখবে, গাড়ি নিয়ে রাত নটার থেকে যেন বাড়ির কাছে থাকে। মি. রায়কে স্টেশনে পৌঁছোত হবে।

তারপর ভজনদার দিকে ফিরে বললেন, ভজনবাবু, আপনি কাউকে স্টেশনে পাঠিয়ে মি. রায়ের জন্যে ট্রেনের টিকিট কাটিয়ে রাখবেন মিথিলা এক্সপ্রেসের।

তারপর আগেকার দিনের রাজা-রানিরা যেমন হাততালি দিয়ে সকলকে ডিসমিস করতেন, তেমন করে নরম হাতে হাততালি দিয়ে বললেন, আপনারা কাজে যান। এ ব্যাপারটা আমার ওপর-ই ছেড়ে দিন। আপনাদের সাহেব কাল ভোরেই এসে যাবেন। সাহেব আসার আগে ওঁকে তাড়াতে না পারলে ঘোর অশান্তি হবে।

মি. ঘোষ বললেন, তা যা বলেছেন মিসেস মিত্র।

সেই সকালের পর থেকে সারাদিন বাড়ি, চিড়িয়াখানা, পোলট্রি, ডেয়ারি, গ্রিনহাউস এবং অন্যান্য সব জায়গায় সকলেই আমরা যে-যার কাজ করে

যাচ্ছিলাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে দারুণ একটা টেনশান গড়ে উঠছিল। কখন দিন ফুরাবে, সন্ধে হবে এই ভরসায় আমরা ক্ষণ গুনছিলাম।

ভজনদার সঙ্গে দুপুরে একবার দেখা হল। খুব ব্যস্ত ছিলেন। উল্লুকটার কনস্টিপেশন হয়েছে। তার জন্য কী একটা ওষুধ বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

যেতে যেতে বললেন, উল্লুকের কী দোষ? এই লোকটা একদিনে আমার-ই কনস্টিপেশান করে ছেড়ে দিল।

পরিস্থিতি তুঙ্গে এল যখন বিকেলে তাঁর ইন্সপেকশন ট্যুর শেষ করে এসে মি. রায় বউরানির হাতে একটা লিস্ট দিয়ে বললেন, মিসেস মিত্র, মিস্টার মিত্র কাল ভোরে এলেই এটা ওঁকে দেবেন।

আমি আর বউরানি শুধু ছিলাম। সাহেব-মেমসাহেবরা সব কাছেই এক মন্দির দেখতে গেছিলেন দু-গাড়ি বোঝাই করে ক্যামেরা-ট্যামেরা নিয়ে।

বউরানি লিস্টটা হাতে নিয়ে বললেন, এটা কীসের লিস্ট?

মি. রায় চিজ-স্ট্র চিবোতে চিবোতে বললেন, স্যাকিং-লিস্ট। কাকে কাকে ইমিডিয়েটলি স্যাক করতে হবে, তার-ই একটা লিস্ট তৈরি করে ফেললাম।

বউরানি ধীরেসুস্থে লিস্টটাতে চোখ বুলিয়ে বললেন, এতে দেখছি ঘোষ সাহেব, মল্লিক সাহেব, ভজনবাবু, নবীন সকলের-ই নাম আছে। সকলকেই আপনি একসঙ্গে বরখাস্ত করলে এতবড়ো ব্যাপার চালাবে কে?

মি. রায় বললেন, আমি একাই চালাব। মি. মিত্রর অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বড়োই টপ–হেভি হয়ে গেছে। এক্ষুনি ছাঁটাই না করলে উনি ডুবে যাবেন।

বউরানি বললেন, এতে একটা নাম ঢোকাতে আপনি ভুলে গেছেন!

-কার নাম?

বলে, মি. রায় একবার বউরানির দিকে আর একবার আমার দিকে চাইলেন। ভাবলেন, আমার নামের কথাই বলছেন বুঝি তিনি।

বউরানি আস্তে বললেন, আমার নাম।

মি. রায় বললেন, কী যে বলেন! আপনি আমার মালিক, আমি সামান্য কর্মচারী আপনাদের ভালোর জন্যেই যা-কিছু করছি।

আমি ভাবলাম, বুড়ো লোকটার আত্মসম্মান জ্ঞান পর্যন্ত নেই। সত্যিই একটা আকাট মোসাহেব।

সন্ধে হওয়ার আগেই সাহেব-মেমসাহেবরা ফিরে এলেন। তখন আমি একদৌড়ে গিয়ে ভজনদা, নবীনবাবুকে বললাম, স্যাকিং-লিস্টটার কথা।

ভজনবাবু বললেন, দাঁড়াও। শালা আজ এমনি না গেলে চ্যালাকাঠ মেরে তাড়াব।

সন্ধেবেলা লনে সকলে এসেছেন। ঘোষ সাহেব, মল্লিক সাহেব, ভজনদা, নবীনবাবু আর সাহেব-মেমসাহেবরা তো আছেনই।

কাতলামাছ ও ছুপকি ডুয়েট রবীন্দ্রসংগীত ধরল। লেডিকেনিবাবু ও ছোটুয়ার তবলা ও বাঁশি সহযোগে।

মি, রায় বললেন, এই দাড়িঅলা লোকটাই বাঙালি জাতের সর্বনাশ করল।

ছাগল-দাড়ি উদবেগের সঙ্গে তাকালেন।

কাতলামাছ বললেন, কোন দাড়িঅলা লোক?

মি. রায় বললেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই কথাতে সমবেত সকলে মনে মনে খুব ক্ষুব্ধ হলেন।

শেতলপাটি শুধোলেন, আপনি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন?

মি. রায় বললেন, না। আমি ট্র্যাশ পড়ি না।

তখন মনে হল, শুধু এখানের পার্টনার-কর্মচারীরাই নন, প্রতিটি লোক-ই

এ লোকটা এখান থেকে বিদেয় হলে খুশি হন। একটা ধেড়ে, বুড়ো পরগাছা।

তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে আবার লনে গিয়ে জমা হল। তখন রাত সাড়ে ন টা বেজেছে।

আমরা সকলেই ঘড়ি দেখছি। মিথিলা এক্সপ্রেস ছেড়ে যায় এগারোটায়। তখনও বউরানির মতলব বোঝা যাচ্ছে না।

সাহেব-মেমসাহেবরাও একটা দুর্যোগের আশঙ্কা করেছেন। এখানকার সকলের, এমনকী তাদের স্ত্রীদের মুখগুলোও থমথমে।

এমন সময় বউরানি পান-ভরতি রুপোর হাঁসটা এনে রাখলেন। সবাইকে পান দিয়ে, নিজে দুটো পান মুখে দিয়ে বললেন, মি. রায়, আপনি আমার সামনে এসে বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে কয়েকটা।

এতক্ষণ নির্লজ্জ ভদ্রলোক যাদের চাকরি খাওয়ার লিস্ট বানিয়েছেন তাঁদের সঙ্গেও কেমন হৃদ্যতার সঙ্গে গল্প করে যাচ্ছিলেন ও নিজের জ্ঞান ছড়াচ্ছিলেন, তা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম।

মি. রায় ইম্পরট্যান্স পেয়ে খুশিতে রগরগে হয়ে উঠলেন।

বউরানির সামনে এসে চেয়ারে বসে বললেন, বলুন।

খাওয়ার পর-ই আমি অশোককে নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে কাপড়-চোপড় বাক্সে ভরে, হোল্ডঅল বাঁধিয়ে রেখে এসেছিলাম।

বউরানি বললেন, আপনি তো ডেয়ারির গোরু সম্বন্ধে অথরিটি তাই না?

মি. রায় আবার দুটো হাত দু-দিকে ছুঁড়ে বললেন, লোকে তো সেইরকম-ই জানে।

বউরানি পরক্ষণেই বললেন আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব। তার জবাব দিতে পারা-না-পারার ওপর আপনার এখানকার চাকরি নির্ভর করছে। যদি দিতে পারেন, তাহলে আপনি এখানে থাকবেন, যদি না পারেন, তাহলে আজ-ই রাতের গাড়িতে আপনি কলকাতা চলে যাবেন।

মি. রায় এতজন লোকের সামনে এমন কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন।

হাসলেন। ব্যাপারটা লঘু করার জন্যে বললেন, আপনি খুব রসিকা মহিলা, কিন্তু আমি আপনার কথায় তো এখানে আসিনি, এসেছি মিস্টার মিত্রের কথায়। উনি প্রায় জোর করেই আমাকে এনেছেন।

তা ঠিক। বউরানি বললেন।

তারপর বললেন, আপনি ওঁর কথায় এসে থাকতে পারেন, কিন্তু যাবেন আমার কথায়। উনি যেমন জোর করে এনেছেন, প্রয়োজন হলে আমিও

তেমন-ই জোর করেই আপনাকে ফেরত পাঠাব।

মি. রায় চমকে উঠলেন। বললেন, এসব কী ইনসাল্টিং কথা, এতজন অপরিচিত লোকের সামনে?

পরক্ষণেই বললেন, আমি শুতে যাচ্ছি–আই গো টু বেড আর্লি।

বউরানি বললেন, দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান। শোবেন এখন। পুরো রাত তো পড়ে আছে।

তারপর বললেন, যা বলছিলাম, আপনি তো ডেয়ারির গোরর ওপর অথরিটি। এখন আমাকে বলুন দেখি, আপনাকে রাস্তার গোরু গুতোলে কী করবেন?

-মানে?

মি, রায় প্রশ্নটার অভাবনীয়তায় একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।

বউরানি বললেন, পাঁচ মিনিট সময় দিলাম। ভেবে বলুন।

মি. রায় মাথায় হাত দিয়ে পড়লেন। দেখতে দেখতে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল।

বউরানি বললেন, পারলেন না।

তারপর ডেয়ারির পার্টনার ঘোষ সাহেবকে বললেন, মিস্টার ঘোষ আপনি কী করতেন?

ঘোষ সাহেব সপ্রতিভভাবে বললেন, আমি হলে, মিসেস মিত্র, কাউকে বলতাম আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে।

চমৎকার। বললেন বউরানি।

তারপর আবার মিস্টার রায়কে বললেন, দ্বিতীয় প্রশ্ন মি. রায়–আপনি দেখে থাকবেন ডেয়ারিতে বড়ো বড়ো গোবরের চৌবাচ্চা আছে।

বলেই, থেমে গিয়ে আমাকে বললেন, টিকলু, একটু কাগজ পেনসিল।

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একদৌড়ে কাগজ পেনসিল নিয়ে এলাম।

বউরানি বললেন, আমায় নয়, ওঁকে দাও।

চোখের কোণে দেখলাম, ভজনদা সত্যিই দাঁড়কাকের মতো গলা উঁচু করে ইজিচেয়ারে বসে মি. রায়কে দেখছেন।

বউরানি বললেন, গোবরের চৌবাচ্চাগুলোর সাইজ বারো ফিট বাই বারো ফিট বাই আট ফিট। সেই চৌবাচ্চার গোবর দিয়ে চার ইঞ্চি বাই দু-ইঞ্চি বাই হাফ ইঞ্চি কতগুলো খুঁটে হবে? টেন পারসেন্ট হ্যাঁণ্ডলিং শর্টেজ।

তারপরেই, কাগজ পেনসিল এগিয়ে দিয়ে বললেন, নিন। কষে ফেলুন।

আজ্ঞে। বলে, মি. রায় প্রায় আঁতকে উঠলেন।

বউরানি বললেন, পাঁচ মিনিট সময়।

মি. রায় কাগজ পেনসিল টেনে নিয়ে আঁকা কষা আরম্ভ করলেন, এমন সময় ছুপকি হাসি চাপতে না পেরে ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসি বড়ো সংক্রামক। ছুপকির হাসি শুনে এদিকে-ওদিকে অনেকেই হাসতে লাগলেন।

হঠাৎ নবীনবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন।

সবাই চোখ তুলে তাকালেন সেদিকে।

মি. রায় নবীনবাবুর দিকে চেয়ে বললেন, ভেরি ব্যাড ম্যানার্স।

তারপর বউরানিকে বললেন, আপনি আমাকে তাড়াতে চান, এখন-ই তো তাড়ালে পারতেন। আমাকে এমন এম্বরাস করছেন কেন? তাছাড়া এটা হাইলি ইমপ্রপার। আমাকে মিস্টার মিত্র খাতির করে এনেছেন।

বউরানি বললেন, সেজন্যেই মিসেস মিত্র খাতির করে তাড়াবেন।

মি. রায় বললেন, আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন সম্পর্ক....।

বউরানি বললেন, আপাতত আপনি গোবরের সঙ্গে ঘুঁটের সম্পর্কটা নির্ধারণ করে ফেলুন। দু-মিনিট গ্রেস দেওয়া গেল।

রেগে উঠে মিস্টার রায় সত্যিই ক্যালকুলেশন করলেন। কিন্তু সময় পেরিয়ে গেল।

বউরানি ছাগল-দাড়িকে বললেন, কপালবাবু, আপনি তো অ্যাকাউন্টেন্ট–এই নিন কাগজ পেনসিল। পাঁচ মিনিট সময়।

ছাগল-দাড়ি তিন মিনিট পর বললেন, চার লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার নশো চুরাশিটা ঘুঁটে হবে।

বউরানি বললেন, কারেক্ট।

তারপর মি. রায়ের দিকে ফিরে বললেন, পারলেন না।

তারপর আবার বললেন, এবার গাছগাছালি। আপনি তো এসবেও অথরিটি। আচ্ছা, বলুন তো মিস্টার রায়, পুরুষ পেঁপেগাছ ও মেয়ে পেঁপেগাছে তফাত কী?

–কী যে বলেন?

মি. রায় হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন।

-পাঁচ মিনিট সময়।

বউ-রানি বললেন।

মি. রায় দু-হাতে কপাল চেপে মুখ নীচু করে বসেছিলেন! মনে মনে সাহেব যে, তাঁকে কার হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন সে-কথা ভাবছিলেন বোধ হয়।

বউরানি বললেন, পাঁচ মিনিট পেরিয়ে গেল।

তারপর বললেন, নবীন–তুমি জান?

নবীনবাবু কিণ্ডারগার্টেন ক্লাসের ছেলেরা যেমন করে ইয়েস মিস বলে হাত তুলে উঠে দাঁড়ায়, তেমনি করে হাত তুলে দাঁড়িয়ে রইলেন, পুরুষ পেঁপেগাছে খালি ফুল হয়, মেয়ে গাছেই শুধু ফল হয়। এই-ই তফাত।

বউরানি বললেন, গুড।

মি. রায় মুখ নীচু করেই ছিলেন।

কিন্তু বউরানি তবুও বললেন যে, গোলাপগাছও তো আপনি গুলে খেয়েছেন শুনলাম, বলুন তো ক্লিয়োপেট্রার স্বামী কে?

মি. রায় সোজা দাঁড়িয়ে উঠলেন।

মনে হল উনি দৌড়ে দোতলায় নিজের শোয়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করবেন।

বউরানি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, টিকলু।

আমি বললাম, রেডি।

মেমসাহেব বললেন, ছোটুয়া।

অমনি ছোটুয়া তার সেই শুয়োর-ভয়-পাওয়ানো বাঁশিতে ফুঁ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে অশোক ও মেহবুব রায় সাহেবের সুটকেস ও হোল্ডঅল নিয়ে ওপর থেকে নেমে এল দৌড়ে।

মি. রায় বললেন, এ কী, এ কী?

ওঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই পান্ডে গাড়িটাতে কোঁ-ও-ও-ও-ও করে ব্যাক করে এনে একেবারে লনের সামনে দাঁড় করাল।

আমি পকেট থেকে বের করে বললাম, এই আপনার টিকিট, আমি সঙ্গে যাব তুলে দিতে, মিথিলা এক্সপ্রেস। এগারোটা।

মি. রায় টলতে টলতে উঠলেন।

কোনোদিকে না তাকিয়ে সোজা গিয়ে গাড়ির পেছনের সিটে বসলেন।

মেহবুব মাল তুলে দিল বুটে।

আমি গিয়ে পান্ডের পাশে বসলাম।

বউরানি একা এগিয়ে এলেন গাড়ির কাছে।

তারপর জানলা দিয়ে মুখ ঢুকিয়ে বললেন, আরও একটি প্রশ্ন করছি আপনাকে–ট্রেনে ভাবতে ভাবতে যাবেন।

কী? কী? মি. রায় তুতলে বললেন!

বউরানি বললেন, সীতা হরণের সঙ্গে দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের তফাত কী?

পান্ডে অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল।

গাড়ি এগিয়ে চলল।

আমি পেছনে তাকিয়ে দেখলাম, ভজনদার চিড়িয়াখানার সব ক-টা জানোয়ার লনের মধ্যে লাফাচ্ছে, উঠছে পড়ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে, চিৎকার করছে, আর মাঝখানে বউরানি স্থির মর্মরমূর্তির মতো শান্ত হয়ে বসে–। গরম ঝোড়োহাওয়ায় ঝুর ঝুর করে চাঁপাফুল ঝরছে তাঁর মাথায়।

পরিযায়ী

১-৪. ঐশিকা

পরিযায়ী – উপন্যাস – বুদ্ধদেব গুহ

০১.

ঐশিকা! ঐশিকা! ঐশিকা!

নামটা নিজের মনেই বার বার উচ্চারণ করেছিল।

ভারি আশ্চর্য নাম যা হোক। তাকে লেখা কাকির চিঠির কথা যেদিন প্রথম জানল কর্বুর, তখন থেকেই একটা চাপা উত্তেজনায় ভুগছে ও। ব্যানার্জিসাহেবরা সকলে থাকবেন যদিও ঠাকুরানি পাহাড়ের ওপরের গেস্টহাউসে, তবু সেদিন থেকেই গৈরিকা বা ঐশিকা নাম দু টিকে ব্রাহ্মণ না হয়েও যে, মনে মনে গায়ত্রী অথবা পেতনি তাড়ানো মন্ত্রর মতোই কেন জপছে, তা ঠিক বলতে পারবে না। কিন্তু জপছে। ঐশিকা! কী আশ্চর্য নাম রে বাবা। কোনোদিনও অমন নাম শোনেনি।

তার নিজের নামটা নিয়েও অবশ্য অনেকেই তাকে ঠাট্টা করে এসেছে সেই স্কুলের দিন থেকেই। বাঙালি সহপাঠীরা কেউ কেউ বলেছে, কর্পূর। অবাঙালিরা বলেছে গড়বুর, অর্থাৎ গড়বর-এর ছোটোভাই গোছের ব্যাপার আর কী!

আসলে এখানে বাংলা ভাষা ভালো করে জানা মানুষের বড়ই অভাব। তাই কর্বুর শব্দটার মানে যে, বহুরঙা একটি ব্যাপার তা জানেই না কেউ। শিশুকাল থেকেই চরিত্রে সে নাকি চিত্রবিচিত্র তাই ঠাকুরদার-ই ইচ্ছেতে স্কুলে ভরতি করানোর সময়ে বাবা তার নাম রাখেন কর্বুর।

ওড়িশা-বিহারের সীমান্তবর্তী এই লোহা আর ম্যাঙ্গানিজ আকরের নীল-লাল নদী বওয়া এলাকাতে শুদ্ধ বাংলার চর্চা কম মানুষেই করেন। শুদ্ধ বাংলার চর্চা অবশ্য আজকাল কলকাতার সাহেব-হয়ে-যাওয়া ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া-করা বাঙালিরাও করেন না। বাঙালিয়ানা বলতে এখানে একমাত্র আনন্দবাজার রাখা। যদিও আনন্দবাজার নিজেই আর এখন তেমন বাঙালি নেই।

তবে ওরা প্রবাসী হলেও সেনদের টাটিঝারিয়া বাংলোতে বাংলার চর্চা এখনও আছে খুব-ই। নানা দৈনিকপত্র ছাড়াও নানা লিটল-ম্যাগাজিনও নিয়মিত আসে।

এখন দাদু বা ঠাকুমা কেউই আর জীবিত নেই কিন্তু তাঁদের মতামত

সেন-বাড়িতে এখনও সমান মান্য এবং সম্মানের।

ব্যাবসাতে ইতিমধ্যেই খুব-ই সুনাম হয়েছে কর্বুরের। ছেলেমানুষ হওয়া সত্ত্বেও। দাদু গত হয়েছেন ছ-বছর হল। উত্তরাধিকারসূত্রে বাবা দাদুর ইজিচেয়ারটা পেয়েছেন। কর্বুর পেয়েছে দাদুর ম ব্লাঁ মাস্টারপিস পেনটি। হেড অফ দ্য ফ্যামিলি হিসেবে বাবা ওই ইজিচেয়ারে বসেই সকালে হেঁটে এসে তিন কাপ চা খেয়ে, প্রায় বেলা দশটা অবধি ডাঁই করা খবরের কাগজ ও পত্র-পত্রিকা পড়েন। সকালে চা আর দু-টি ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কিট ছাড়া বাবা আর কিছুই খান না। ব্রেকফাস্টও খান না। কর্বুরের মনে হয় খবর খেয়েই বাবার পেট ভরে যায়।

কাকু, দাদুর জীবদ্দশাতেই দাদুর চোখের মণি জিপগাড়িটাকে চেয়ে নিয়েছিল। গারাজ ভরতি নতুন নতুন গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকান ডিসপোজাল থেকে কেনা, একেবারেই লজঝড়ে হয়ে যাওয়া জিপটার প্রতি দাদুর যে কী, অসীম মমতা ছিল তা যাঁরা তাঁকে চিনতেন তাঁরাই জানতেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিল দাদুর পার্সোনাল ড্রাইভার। সিরাজুদ্দিন। দাদুর উইলে তিনি লিখে গিয়েছেন যে, সিরাজ যতদিন বাঁচবে ততদিন-ই সে মাইনে পাবে। কাজ করতে ইচ্ছে করলে কাজে আসবে, ইচ্ছে না করলে বা শরীরে না কুলোলে আসবে না। জিপটা নিয়েছিলেন যখন দাদু, তখন-ই প্রথম ম্যাঙ্গানিজ মাইনটা নেন ধুতরাতে। জিপটা আজও যে কী করে চলে, সেটা একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

স্টিয়ারিংটা পুরো তিন-পাক ফলস।

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে খুব-ই ভালোবাসতেন দাদু। যতদিন শিকার আইনি ছিল, উনিশশো বাহাত্তর অবধি, ততদিন অবধি পারমিট নিয়ে শিকারও করেছেন। ওদের বড়োবিলের বাড়ির বাইরের বারান্দা আর বিরাট বসবার ঘর দেখলে এখনও বাঘ, ভাল্লুক, বাইসন-এর মাউন্ট-করা মাথা, হাতির পা-এর মোড়া, নানারকম হরিণের চামড়াতে প্রায় মিউজিয়ম বলেই মনে হয় নবাগন্তুক মানুষের কাছে।

কাকুও বাবার-ই মতো এঞ্জিনিয়ার। তবে মাইনিং এঞ্জিনিয়ার নন। যা কিছুই চলে না, তার সবকিছুকেই চালু রাখাটা প্রফেশনাল চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছে কাকু। এখন কাকু, কাকি আর তাঁদের একমাত্র সন্তান সাত বছরের কিরিকে নিয়ে জামশেদপুরের নীলডিতে থাকেন। ব্যানার্জিসাহেব-ইহচ্ছেন কাকুর বস। যদিও কর্বুরদের পরিবারে তৈলমর্দনটা উচ্চশ্রেণির আর্ট হিসেবে পরিবারের কোনো সদস্যই গ্রহণ করেননি, তবু খাতিরদারি তো একটু করতে হয় ই, যখন ওঁরা আসছেন-ই।

কাকুর একটা সাদা-রং ফিয়াট সিয়েনা আছে। জিপটা কাকু শুধু এখানে এলেই ব্যবহার করে। নইলে, বিশ্রামেই থাকে অন্যসময়ে। তবে এবারে যেহেতু তাঁর বড়োসাহেব আসছেন, কর্বুরকে চিঠিতে জানিয়েছেন কাকু, জিপটাকে পঞ্চমীর দিনের মধ্যে চলেবল কণ্ডিশনে আনতে। যদিও

বড়োবিলে বড়োজামদার বার্ড কোম্পানি ও মিত্র এস. কে. কোম্পানির নতুন আর্মাডা ও মারুতি জিপসি থাকবে বড়োসাহেবের চড়ার জন্যে, তবুও তাঁর জঙ্গল-পাগল মেয়েরা সারাণ্ডাতে যখন যাবে তখন ওই হুডখোলা, সামনের কাচ বনেটের ওপরে শুইয়ে দেওয়া পুরুষালি জিপ-এ চড়ে রিয়্যাল-রাফিং করে তারা আনন্দ পাবে। তারা নাকি ইতিমধ্যেই কাকুর মুখে জিপ-এর গল্প শুনে রীতিমতো উত্তেজিত। কাকুর তাই ইচ্ছে যে, জিপটিতে কর্বুর যেন সন্ধিপুজো করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। এবং তারপর জ্যান্ত দেবীরা এলে, গজ-এ বা নৌকোতে করে তাঁদের না নিয়ে গিয়ে, যেন ওই জিপে করেই নিয়ে যায় অকুস্থলে।

গৈরিকা বড়ো, ঐশিকা ছোটো। তবে পিঠোপিঠি। ব্যানার্জিসাহেবের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন, যখন মেয়েদের বয়েস ছিল খুবই কম। বহুদিন বিদেশে থাকা ক্ষৌণিশ ব্যানার্জি নিজে নাকি যেমন সুদর্শন তাঁর স্ত্রীও নাকি তেমন-ই সুন্দরী ছিলেন। মেয়েদুটিও তাই ডানাকাটা পরি হয়েছে। উনি দুই মেয়েকে, বলতে গেলে সিংগল প্যারেন্ট-এর মতো মানুষ করে তুলেছেন। মেয়েদের জন্যে জীবনের অনেক সহজ সুখ, অনেক সস্তা আনন্দ বর্জন করেছেন। নিজেকে অনেকভাবে বঞ্চিত করেছেন। তবে উনি নাকি বলেন, মেয়েদের কাছাকাছি থাকতে পেরে তিনি যে, আনন্দ পেয়েছেন সেই আনন্দ তাঁকে অন্য কোনো কিছুই দিতে পারত না। এতদিন বাবা হয়েও উনি এতবছর মেয়েদের মা হওয়ার আনন্দকে জেনেছিলেন, এখন মেয়েরা দূরে চলে যাবে বলে মেয়েদের বিদাইয়ার কষ্টটাও যেন মায়ের-ই

মতো বুঝতে আরম্ভ করেছেন।

কিরি নামটি কাকুই দিয়েছে। দাদু দেননি। হো ভাষাতে কিরি মানে পোকা। কিরিবুরু মানে পোকাদের জঙ্গল। যেমন মেঘাতিবুরু মানে জমাট বাঁধা মেঘেদের মতো জঙ্গল। তা যাই হোক, কাকু, বুরু থেকে কিরি কেটে নিয়ে ছেলের নাম দিয়েছে কিরি।

ভদ্রলোকের মতো একটা নাম তো দিতে পারত ছোটকা। কোথায় কিশা আর কর্বুর আর কোথায় কিরি। ওর চেয়ে হারাকিরি দিলেই তো হত।

দাদু বলেছিলেন।

দাদু তখন প্রচন্ডরকম বেঁচে। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত অবধিও দাদু প্রচন্ডরকম জীবিত ছিলেন।

কাকু দুঃখ পেয়েছিল ছেলের নাম সম্বন্ধে দাদুর প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে। কিন্তু মুখে কিছু বলেনি।

কর্বুরদের পরিবার দৃঢ়বদ্ধ, ঘন-সন্নিবিষ্ট, মেঘাতিবুরুর-ই মতো। তথাকথিত আধুনিকতার কোনোরকম বারফাট্টাই তাদের নিরন্ধ্র পারিবারিক বেষ্টনীকে টলাতে পারবে না মনে হয় আরও অনেকদিন। এখন পরের প্রজন্মের বউ-জামাইরা এসে যদি এতদিনের ঐতিহ্যকে নষ্ট করে দেয় তো, সে অন্য কথা। সেইজন্যেই জামাই ও বউ নির্বাচনে এই

পরিবার অত্যন্ত সাবধানি।

দিদি কিশার বিয়েতে সকলেই খুব খুশি। অত্যন্ত শিক্ষিত, উদার, বনেদি অথচ সর্বার্থে আধুনিক পরিবারেই বিয়ে হয়েছে কিশার। জামাই বিলাবল এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেককেই এ-পরিবারের সকলের-ই খুব পছন্দ।

.

০২.

প্রতিবছর-ই পুজোর পরে একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন বড়োবিল-বড়োজামদার বাঙালিরা মিলে। এবারে কথা ছিল মহড়া নাটকটি মঞ্চস্থ করবেন। নাটক হিসেবে যদিও সেটি লেখা নয়। ওই নামের একটি উপন্যাসের-ই নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করছেন ওঁরা। তবে মূলউপন্যাসের মধ্যেই নাটকটি প্রায় নাটকের ফর্মেই আছে। উপন্যাসে এমন আছে যে, মাভুর রূপমতী নাটকটি মঞ্চস্থ করা গেল না, কারণ, যে-ছেলেটির নায়কের ভূমিকাতে। অভিনয় করার কথা, তার মা নাটক শুরু হওয়ার আধঘণ্টা আগে হার্ট-অ্যাটাকে মারা। গেলেন।

ঔপন্যাসিক আসলে ওই নাটকের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবন-ই অনেকগুলি মহড়ার-ই সমষ্টিমাত্র। আসলে আমাদের জীবনে খুব কম মহড়াই অবশেষে সফল হয়, নাটকরূপে মঞ্চস্থ

হতে পারে। এই আমাদের জীবনের ট্র্যাজেডি। মহড়া উপন্যাসটি কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল নাট্যামোদী একজন। দেজ পাবলিশিং বা সাহিত্যম-এর বই। সঠিক মনে নেই। ওদের প্রত্যেককেই জটাদা একটি করে জেরক্স-করা স্ক্রিপ্ট ধরিয়ে দিয়েছেন।

সকলের পীড়াপীড়িতে এবারে কর্বুর রাজিও হয়ে গিয়েছিল নায়কের ভূমিকাতে অভিনয় করতে। কারণ, উপন্যাসটির বক্তব্য ও উপস্থাপনা তার মনে খুব-ই ধরেছিল। তক্ষ রায়ের ভূমিকাতে স্থানীয়দের মধ্যে বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং অভিনেতা জটা রায় অভিনয় করবেন ঠিক হয়েছে। উনি নাটকটি পরিচালনাও করবেন এবারে। অন্যান্যবারের সামাজিক সব নাটক পচাদা পরিচালনা করেন।

যেদিন মহড়া প্রথম শুরু হল ঠিক সেদিন-ই কাকির চিঠি এসেছিল ঐশিকা অ্যাণ্ড কোম্পানির আগমন-বার্তা জানিয়ে। কর্বুর বলেছিল জটা রায়কে, জটাদা, আমাকে বাদ দিতে হবে। তাতে পুজো কমিটির প্রত্যেকেই বেঁকে বসেছিল। আলাদা আলাদা ডেপুটেশন গিয়েছিল বাবার এবং মায়ের কাছে পুরুষ এবং মহিলাদের। তারপর তাঁদের-ই সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে বাবার ব্যক্তিগত চিঠি নিয়ে ফটকা গেল বড়োবিল থেকে ভোরের বাসে টাটাতে। কাকুর উত্তরও নিয়ে এল সন্ধের বাসে। দাবি মঞ্জুর হয়েছে। কাকু নাকি বলেছে যে, ব্যানার্জিসাহেব ও তার মেয়েরা নাকি খুব খুশিই হয়েছেন। সারাণ্ডার পাঁচদিন থেকে একটি দিন কমিয়ে

সন্ধেবেলা পুজোমন্ডপে মহড়া নাটকটি দেখে পরদিন ভোরেই জঙ্গলে যাবেন ওঁরা কর্বুরের সঙ্গে। এইরকম-ই ঠিক আছে।

অভিনয় কখনো করেনি কর্বুর। কী জীবনে, কী মঞ্চে। অভিনয় করা যে, এত কঠিন সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাও ছিল না। নবাব বাজবাহাদুরের চরিত্রে অভিনয় করছে সে। আর রূপমতীর ভূমিকাতে অভিনয় করছে বড়োজামদার একজন এঞ্জিনিয়ারের রূপবতী গুণবতী কন্যা শিখী।

মহড়া আরম্ভ হয়ে গেছে গতকাল থেকেই। এই মহড়ার-ই জন্যে বড়োবিলেই রাতে থাকতে হচ্ছে কর্বুরের। ভোর পাঁচটাতে উঠে ভোগতা মুণ্ডার বানিয়ে দেওয়া এককাপ চা খেয়ে ষাট কিমি জঙ্গলে এবড়ো-খেবড়ো পথে গাড়ি চালিয়ে খাদানে যায়। বিকেলে পৌনে চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়ে খাদান থেকে। বাড়ি ফিরে চানটান করে সাতটাতে যায় মহড়াতে। ফিরতে ফিরতে এগারোটা সাড়ে এগারোটা। মা, না খেয়ে বসে থাকেন। ও মহড়া থেকে ফিরলে, মা-ছেলেতে গল্প করতে করতে বসে একসঙ্গে খান।

মাঝে মাঝে ব্যানার্জিসাহেবের মেয়ে গৈরিকা-ঐশিকার কথা ওঠান মা। মাঝে মাঝেই বড়োজামদার শিখীর কথাও ওঠে। শিখীর বাবা নিজে গাড়ি করে শিখীকে নিয়ে যেতে আসেন। আসবার সময়ে বড়োজামদার গোয়েলসাহেবের ছেলের গাড়ি করেই আসে শিখী। রাজ গোয়েলও অভিনয় করছে সেনাপতি একরাম খাঁ-এর ভূমিকাতে। গোয়েলসাহেব

সেইল এর বড়ো ঠিকাদার। চারপুরুষ বিহারে থেকে থেকে এবং বাঙালি অফিসারদের খিদমদগারি করে করে ওরা ব্যাংলো বিহারি হয়ে গেছে। হিন্দি বলে বিহারিদের মতন। বাংলাও বলে বাঙালিদের-ই মতন।

কর্বুর ঠিক বুঝতে পারে না যে, ওর মা, ইদানীং অদেখা ঐশিকা আর শিখীর কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনেন কেন। বুঝতে যে, একেবারেই পারে না তা নয়। একটু একটু পারে। কিন্তু ভাব দেখায় যে, পারে না। আজকাল সে তো অভিনয় করতে একটু একটু শিখছেই। তবে ওর মা একটা কথা ছেলেবেলাতে প্রায়ই বলতেন ওকে, উলটোপালটা কথা বললে, কবু, তুই আমাকে পেটে ধরেছিস না, আমি তোকে পেটে ধরেছি? আমি তোকে যতখানি বুঝি, তুই কি আমাকে তার ছিটেফোঁটাও বুঝতে পারবি কোনোদিনও?

কেন জানে না, আজকাল আর বলেন না, মা ওই বাক্যটি। ছেলে-মায়ের মধ্যেও ধীরে ধীরে ছেলের বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু ব্যবধান গড়ে ওঠেই। ছেলের বিয়ে হলে হয়তো সেই ব্যবধান আরও বাড়ে। অনেক কিছু কর্বুর যেমন জানে, আবার অনেক কিছু জানেও না।

আজ রাতে ফিরে স্ক্রিপটা নিয়ে বসল আবার ও। নাটক করতে গিয়ে, নতুন করে বুঝতে পারছে যে, এই কম্পিউটার-এর যুগেও স্মৃতিশক্তিকে একেবারে নস্যাৎ করাটা ঠিক নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তির খুব প্রয়োজন আছে।

নাটকটার মধ্যে বেশ গভীরতা আছে। ডায়ালগ-এর মধ্যে দিয়ে নায়ক-নায়িকা যা বলছেন একে অন্যকে, সেই কথোপকথন একটা অন্য মাত্রা পাচ্ছে। তাদের যা বক্তব্য, তা যেন শুধুমাত্র নাটকের অন্য এক চরিত্রের জন্যই নয়, যেসব দর্শকের গভীরতা আছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই সেইসব চরিত্রের মধ্যে নিজেদের-ই দেখতে পাবেন হয়তো। আইডেন্টিফায়েড হবেন।

আজ বার বার-ই ভুল করছিল কর্বুর তার পাঠ বলতে গিয়ে। শিখী মুখ টিপে হেসেছিল একবার।

জটাদা বলেছিলেন, কর্বুর, ভুলে যেয়ো না, তুমিই আমার নায়ক। তুমি ঝোলালে পুরো নাটকটাই ঝুলে যাবে।

শিখী বলেছিল, কর্বুরদা, কো-অ্যাক্টরের ওপরে অন্যের অভিনয়ের মান নির্ভর করে। তোমার অভিনয়টা যদি ভালো হয় তবে আমার অভিনয় আপসেই ভালো হবে। এবং vice versa.

জটাদা বলেছিলেন, পার্ট মুখস্থ করাটা প্রাইমারি ব্যাপার, তারপরে অভিনয়ের অন্য সবদিক। পার্ট-ই যদি মুখস্থ না করো কর্বুরসাহেব, তবে আমরা যে, ডুবে যাব।

লজ্জা পেয়েছিল খুব-ই কর্বর। সেই কারণেই স্ক্রিপটা নিয়ে বসা। ও ঠিক করেছে, কাল রিহার্সালের সময়ে টেপ করে নেবে পুরোটা, তারপর

খাদান-এ যেতে আসতে গাড়িতে ক্যাসেটটা বার বার বাজিয়ে ভুল-ত্রুটি শুধরে নেবে। মুখস্থও করে নেবে নিজের পার্ট। ধরা ছাড়াও ভালো করে লক্ষ্য করবে।

আজ-ই কিছুটা অংশ অন্তত নিজেই পড়ে, অন্যদের পার্টসুদু টেপ করে নেবে ঠিক করল। যেখানে যেখানে ভুল হচ্ছে বারে বার। কাজটা এগিয়ে থাকবে অন্তত কিছুটা।

শ্যামলের বেগুন-ভাতে ভাই আর মানিকের চিচিঙ্গার মতো দেখতে মেয়েলি গলার দাদা প্রম্পটার। দু-দিকের উইংস-এর আড়াল থেকে দু-জনে প্রম্পট করছে। একজনের গলা ফেন ভাতের মতো ভ্যাভ্যাতে, কিন্তু ভারী। অন্যজনের গলা আবার এমন-ই চিচি করে যে, রিহার্সাল যেখানে হয়, সেই প্রাচীন দুর্গাবাড়ির কার্নিশে-বসা পায়রাগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে ডানা ধড়ফড়িয়ে উড়ে যায়।

জটাদা সিগারেটটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, বি রেডি! অল ক্যারেকটারস। প্রথম দৃশ্য। তৃতীয় অঙ্ক। স্টেজ-এ নবাব বাজবাহাদুর এবং রূপমতী। লোকেশান: মান্ডুর দুর্গর পশ্চিমপ্রান্তের রূপমতী মেহাল। রেডি? নাউ স্টার্ট।

হাতঘড়িটা, পাঞ্জাবির আস্তিনটা একবার তুলে একঝলক দেখে নিয়েই বলেছিলেন জটাদা।

কল্পনাতে দেখা মান্ডুর দুর্গের পশ্চিমপ্রান্তর রূপমতী মেহাল-এর এক সকালবেলা। যেন চোখে দেখতে পাচ্ছিল কর্বুর। নর্মদার দিকে চেয়ে-থাকা, স্নান-করে ওঠা সুকেশা, সুগন্ধি গায়িকা, রূপমতী মেহাল-এর চাঁদোয়ার নীচে বসে আছেন।

রূপমতী বললেন–সুলতান। কিছুদিন থেকেই আপনাকে বড়ো ছটফট করতে দেখছি। আমার গান কি আর ভালো লাগে না আপনার?

বাজবাহাদুর–সে জন্যে নয়, সে জন্যে নয়। গানও যেদিন ভালো লাগবে না রূপমতী, বিশেষ করে তোমার গান, সেদিন বাঁচা আর মরাতে তফাত থাকবে কি কোনো?

রূপমতী-তবে? সুলতান সবসময়ে কোন চিন্তা আপনাকে এমন অন্যমনস্ক করে রাখে আজকাল?

এমন সময়ে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা যাবে। অশ্বারোহীদের আসবার আওয়াজ। দূর থেকে। রূপমতী-মেহালের দিকে।

বাজবাহাদুর ওইদিকে চেয়ে হঠাৎ-ই কথা থামিয়ে দেবেন। রূপমতী ওই দূরাগত অশ্বারোহীদের দিকে যেন, চেয়ে থাকবেন কিছুক্ষণ। এখনও দূরে আছে অনেক-ই। সুলতানের ডাকহরকরা, ভালো করে লক্ষ্য করে, যেন তাদের ধ্বজা দেখেই বুঝলেন। বুঝেই, অন্যমনস্ক হয়ে যাবেন রূপমতী।

রূপমতী-মেহালের নীচে অমলতাস গাছেরা ফুলের স্তবকে স্তবকে ভরে গেছে। সামান্য প্রভাতি হাওয়ায় একটু একটু দুলছে সেই স্তবকগুলি।

রূপমতী-কী সুন্দর। না? জাঁহাপনা?

বাজবাহাদুর–কী?

রূপমতী-এই ফুলগুলি। এই সকাল, নিমারের আদিগন্ত এই উপত্যকা, দূরের নর্মদাদেবী, পুণ্যতোয়া, উত্তরবাহিনী। অথচ আপনার সময়ই নেই এসব দেখবার। এমনকী গানও শোনবার।

একজন অশ্বারোহী দুড়দাড় করে সরু সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে এল। অন্যরা দাঁড়িয়ে রইল। কুর্নিশ করল সবাই বাজবাহাদুরকে। হ্রেষারব এবং অস্থির ঘোড়াদের পা ঠোকার আওয়াজে মন্থর প্রভাতি হাওয়া অবিন্যস্ত হয়ে উঠল। অশ্বারোহী এসে পাকানো এবং হলুদ রেশমি সুতোয় বাঁধা বার্তা তুলে দিল সুলতানের হাতে, মাথা ঝুঁকিয়ে। বলল–

হোশাঙ্গাবাদ থেকে সেনাপতি লড্ডন খাঁ পাঠিয়েছেন। বাজবাহাদুর বার্তাটি খুলে পড়লেন। যুগল কুঞ্চিত হল তাঁর। বললেন, সেনাপতি একরাম খাঁকে দেখা করতে বলো আমার সঙ্গে বড়া মসজিদে। এক্ষুনি। আমি যাচ্ছি।

(অশ্বারোহী চলে গেল আবারও দুড়দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে।)

রূপমতী-কী খবর সুলতান? খারাপ কিছু?

বাজবাহাদুর–খবর খুবই খারাপ। দিল্লি থেকে মোগল সম্রাট আকবর, সেনাপতি আধম খাঁকে পাঠিয়েছে মালোয়া দখল করার জন্যে। তাঁর বিরাট বাহিনী এগিয়ে আসছে ক্রমশই। লডড়ন খাঁ খবর পাঠিয়েছেন হোশাঙ্গাবাদ থেকে যে, সারাংগপুরে আধম খাঁকে রুখতে না পারলে মান্ডু বাঁচানো যাবে না কোনোক্রমেই। তাকে তো ধার পেরিয়ে মান্ডুতে উঠে আসতে দেওয়া যায় না।

একটু চুপ করে থেকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, হেস্তনেস্ত যা হবার তা ধার-এর সমতলেই হোক। আমার মা আর আমার রূপমতীর গায়ে যেন আঁচড়টিও না লাগে।

রূপমতী–সর্বনাশ! বড়োই খারাপ খবর এ সুলতান। আধম খাঁর বাহিনী যে বিরাট। সম্রাট আকবর তো ছেলেখেলা করার জন্যে সেনাবাহিনী পাঠান না। আপনি যদি হেরে যান তাহলে কী হবে আমার?

বাজবাহাদুর-হারার কথা বোলো না আমাকে রূপমতী। বোলো না, হারার কথা। বোলো না।

যা বলতে চাইছিলাম তা থেকে অনেক-ই সরে এলাম আমি রূপমতী। যেমন, জীবনে যা করতে চেয়েছিলাম, তা থেকেও। সময় হাতে বেশি নেই। আমাকে বলতে দাও। আমি চেয়েছিলাম এমন-ই এক সুলতান

হতে, এই সুন্দর মান্ডুর ব্যতিক্রমী সুলতান, যিনি কোনো রাজ্য জয় করবেন না কোনো অন্য রাজার। জয় করবেন সংগীত-জগতের সমস্ত রাজ্য, জাগির জানবেন সেই আশ্চর্য জগতের ঝংকৃত অলিগলিকে, আবিষ্কার করবেন নারী ও পুরুষের প্রেমকে নতুনতর, শান্ত স্নিগ্ধ আলোয়। কী বলো তুমি? এও কি এক ধরনের রাজত্ব নয়? সাম্রাজ্য নয়? এই সাম্রাজ্যের গভীরে যাওয়ার চেষ্টাও কি রাজকার্য নয়? রাজকার্য মানে কি শুধুই মৃত্যুদন্ড? কারাগার? যুদ্ধ? রক্তপাত? নারী ও শিশুর ক্রন্দন?

রূপমতী–আপনি কি যুদ্ধে আপনার নিজের সহোদরকে হত্যা করেননি নবাব?

বাজবাহাদুর-আঃ। যুদ্ধ আমি করেছিলাম, সে তো প্রাথমিক যুদ্ধই, ক্ষমতাতে আসীন হওয়ার-ইযুদ্ধ সে। যা নইলে, আমি সুলতান হতাম না মাঁলোয়ার, মান্ডুর।

রূপমতী-(হেসে) সুলতানদের জীবনে প্রাথমিক যুদ্ধ বলে কোনো কথা নেই। যুদ্ধই তাঁদের জীবনের বড়োসঙ্গী।

আজ কী সুন্দর দেখাচ্ছে সবকিছু। না, জাঁহাপনা? আপনাকেও। চারদিকের এই প্রভাতি প্রকৃতিকে। আঃ। কত ফুল। কত পাখি চারদিকে? জৌনপুরিতে গান ধরব একটা? এই গম্ভীর রাগ এইমুহূর্তে আমার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। ধরি? সুলতান?

বাজবাহাদুর–না। আমি মসজিদে যাব। সেনাপতি একরাম খাঁ অপেক্ষা করছেন সেখানে আমার জন্যে। চলি আমি, রূপমতী। সন্ধেবেলায় জেহাজ-মেহালে বরং দেখা হবে। আজ গভীর রাতে মালকোষ শুনব তোমার গলায়। জানি না, আর কতদিন শুনতে পাব তোমার গান! এ পৃথিবীতে গান, প্রেম সব-ই সুকৃতির জিনিস, উপচে-পড়া ধন এসব। ক-জনে এর কদর জানে বলো?

.

রিহার্সাল দিয়ে বাড়ি ফিরতেই মা বললেন, নে ধর, তোর কাকির চিঠিটা পড়। আজ-ই এল। পড়ে আমাকে ফেরত দিস।

কর্বুর একটু অবাক হল। ওঁরা যে, আসবেন তা তো কাকি অনেক আগেই জানিয়েছে মাকে। আবার এ চিঠি পড়ার কী দরকার।

নীলডি

জামশেদপুর

১০-৯-১০

শ্রদ্ধাভাজনীয়াসু দিদি, অনেকদিন আপনার চিঠি পাই না। বড়োবিল-এর বাড়ির ফোন কি ঠিক হবে না? যে পরিমাণ খোঁড়াখুঁড়ি টেলিফোন ডিপার্টমেন্ট করে চলেছে গত দু-মাস হল তাতে জায়গামতো খুঁড়লে, যেমন সুবর্ণরেখায় বা স্যেশেলস আইল্যাণ্ডস-এ, সাত রাজার বা সাত

জলদস্যুর গুপ্তধনের সন্ধানও তারা পেতে পারত। কবুকে বলুন যে, ওদের ধমক-ধামক দিক। নইলে অন্তত বক্তৃতাই দিক। আমাদের দেশে তো এখন বক্তৃতা দিয়েই জন্মনিয়ন্ত্রণ থেকে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা পর্যন্ত হচ্ছে। আর কর্বুর বক্তৃতাতেও যদি তাড়াতাড়ি গর্তগুলো না বোজায়, তবে কবুকে বলুন আজকের দিনের সব যুক্তির বড়োযুক্তি, সব বাগ্মিতার, নোটের বাণ্ডিল ছুঁড়ে মারতে।

কুরুবকের বড়োসাহেব তাঁর দুই কন্যাকে নিয়ে যে-যাবেন শুধু সে কথাই আগে জানিয়েছি আপনাকে। এবারে একটু বিস্তার করে বলি। এতদিন কিরির পরীক্ষা নিয়ে খুব-ই ব্যস্ত ছিলাম। বড়ো করে লেখার অবকাশ ছিল না। কুরুবকের বস ব্যানার্জিসাহেবের সঙ্গে আপনি ও দাদা যখন এখানে এসেছিলেন তখন আলাপিতও হয়েছেন। তিনি তাঁর দুই কন্যা গৈরিকা ও ঐশিকাকে নিয়ে পুজোর সময়ে সারাণ্ডার জঙ্গল দেখতে যাবেন। আমাদের কর্বরবাবু তো সারাণ্ডার পোকা। বড়োবিল-এ ওঁরা ঠাকুরানি পাহাড়ের ওপরে বার্ড কোম্পানির অতিথিশালাতেই থাকবেন। আমি আর আপনার দেওর কর্মুর কথা ওঁদের এতই বলছি ও বলেছি যে, বলতে গেলে ওঁরা মিস্টার কর্মুর সেন-এর ভরসাতেই আহ্লাদ করে সারাণ্ডা দেখতে যাচ্ছেন। আপনারা তো ব্যানার্জিসাহেবকেই দেখেছেন শুধু, মেয়েদের দেখেননি। তাই এই বিস্তার।

সেনসাহেবের মেয়েরা কেউই টাটানগরে থাকে না। গৈরিকা

আহমেদাবাদের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাইনস থেকে পাশ করেছে সবে। তার বিয়েও ঠিক হয়ে গেছে। বিয়ের পর দুজনে মিলে মাস দুই পরে স্টেটস-এ চলে যাবে। ঐশিকা দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে মাসকম করে এসেছে। একটি বিদেশি টিভি কোম্পানিতে ইন্টারভিউ দিয়েছে। শুনতে পাচ্ছি যে, চাকরিটি হয়ে যাবে। হয়ে গেলে, হয়তো দিল্লি অথবা মুম্বাইতে পোস্টিং হবে। তাই ব্যানার্জিসাহেব মেয়েরা চলে যাওয়ার আগে কটা দিন সব কাজকর্ম ছেড়ে তাদের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে চান।

আর কী লিখব। আশাকরি দাদার ব্লাডসুগার আর বাড়েনি। আপনার হাঁটুর ব্যথা কি কমল?

কিরি ভালো আছে। পড়াশুনোতে একেবারেই মন নেই। কবু পড়াশোনাতে এত ভালো হওয়া সত্ত্বেও ওকে পারিবারিক স্বার্থে ব্যাবসাতে ঢুকতে হল। এখন মনে হয়, ওকে, ও যা পড়তে চায়, তাই পড়তে দিয়ে কিরিকেই সেখানে ঢুকিয়ে দেওয়া ভালো ছিল। এই ব্যাবসা এমনকিছু কঠিন নয় যে, কর্বুর মত ব্রিলিয়ান্ট ছেলে এতে আনন্দ পাবে। তবে কিরির বড়ো হতে যে, অনেক-ই দেরি।

দিদি! আপনাকে এইবারে চুপি চুপি আসল কথাটা বলি। গৈরিকার বিয়ে তো ঠিক হয়েই গেছে। আমার ও আপনার দেওরের খুব-ই ইচ্ছে যে, ঐশিকার মতো একটি সর্বগুণসম্পন্না মিষ্টি মেয়ে আমাদের পরিবারের বউ

হয়ে আসুক। ওরা সকলে মিলে যে, বড়োবিল-এ যাচ্ছে তাতে আমরা খুব-ই উত্তেজিত। আপনি ও দাদা ওদের সকলের সঙ্গে ভালো করে মিশতে পারবেন। কবুও বেশ ক-দিন কাছ থেকে ঐশিকাকে দেখতে পারবে। ঐশিকা এবং তার পরিবারও আপনাদের সকলকে কাছ থেকে দেখার প্রচুর সুযোগ পাবে। কুরুবককে, উনি তো বটেই, মেয়েরাও খুব-ই পছন্দ করে।

আপনাকে কী বলব দিদি। পুজোর এখনও দেড়-দুমাস দেরি আছে কিন্তু এখন থেকেই আমি রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে রয়েছি। যদি আমার এই আশা পূর্ণ হয় তাহলে আনন্দ রাখার আর জায়গা থাকবে না। আমার একটুও সন্দেহ নেই যে, আপনার ও দাদার ঐশিকাকে ভীষণ-ই ভালো লাগবে। অমন বউ এলে আমাদের পরিবারের মুখোজ্জ্বল হবে। কবুও খুব সুখী হবে। সম্ভবত।

ভালো থাকবেন। ফোনটা ঠিক হলেই আমাকে একটা ফোন করবেন। তারপর যেমন আগে করতাম, একরাতে আমি, আর একরাতে আপনি অবশ্যই কথা বলব। কিরিরও তার জ্যাঠা জেঠিমার আর কবুদাদার গলা দিনান্তে একবার শুনতে না পেলে ঘুম আসে না।

একটা কথা বলে এই চিঠি শেষ করছি। চুপি চুপি বলি যে, ঐশিকাকে আপনাদের কিরিবাবুর খুব-ই পছন্দ। ও-ই প্রথম আমার মাথাতে কথাটা ঢোকায়। গতশনিবার গৈরিকার জন্মদিনে ও-ও গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে

ব্যানার্জিসাহেবের বাংলোতে। খাওয়া-দাওয়া, গানবাজনার পর অনেক রাতে ফিরে শুতে যাওয়ার আগে আমরা বসার ঘরে বসে যখন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল দেখছিলাম তখন, হঠাৎ ও এসে বলে গেল, মা! কবুদাদার সঙ্গে ঐশিকা দিদির বিয়ে দিয়ে দাও না। দারুণ হবে। ভাবি হো তো এইসি।

সেই রাত থেকে আমরা কিরির কথাটিই ভাবছি। বার বার।

আহা! সত্যিই যদি কিরির মুখের কথাটা ফলে তবে আর আমার আনন্দ রাখার জায়গা থাকবে না।

আমরা গাড়িতে মহাষষ্ঠীর দিন গিয়ে পৌঁছোব।

ইতি
স্নেহধন্যা পদ্মা

রুক্মিণী সেন
টাটিঝারিয়া, চড়ুই চড়াই
বড়োবিল, ওড়িশা

চিঠিটা বার দু-তিন পড়ল কর্বুর। ওর মনের মধ্যে কিছু উত্তেজনা, কিছু ভয়, কিছু আশা, ভালোলাগা ঝিলিক মেরে গেল। কর্বুর ভাবছিল, একা এলেই তো পারতেন। মা বা কাকি বা দিদি হলে অন্য কথা ছিল। একে

অনাত্মীয়া, তার ওপরে তরুণীদের ঠিক হ্যাণ্ডল করতে জানে না কর্বুর। এয়ারপোর্টের কনভেয়ার বেল্ট-এ কার্ডবোর্ডের বাক্স আসে না? লেখা থাকে, Fragile! Handle with care. মেয়েদের তেমন-ই কাঁচের বাসন বলেই মনে হয় কর্বুরের। ভেঙে গেলেই, হাতে-পায়ে কাচ ফুটে গিয়ে রক্তারক্তি কান্ড ঘটতে পারে।

চিঠি প্রসঙ্গে কর্বুর ভাবছিল, আজকাল ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল-এর দৌলতে পৃথিবী এখন রীতিমতো দৌলতাবাদ হয়ে গেছে। চিঠি লেখে খুব কম মানুষ-ই। অথচ চিঠির কোনো বিকল্প সতিই কি কিছু আছে? বড়ো বড়ো মনীষীরা তাঁদের মন-খোলা চিঠির মধ্যে দিয়ে, তাঁদের দীর্ঘ এবং ব্যতিক্রমী ইচ্ছাপত্রর মধ্যে দিয়ে পরবর্তী সময়ের মানুষদের যতখানি দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে গেছেন তা কি ফোন ফ্যাক্স বা ই-মেইল কোনোদিন করতে পারবে?

ইনফরমেশন-ই সব নয়। স্মৃতিই মানুষের একমাত্র গুণ নয়। গুণ তো নয়ই বরং কর্বুরের মনে হয়, স্মৃতি এক ধরনের দোষ-ই। স্মৃতি যার অত্যন্তই প্রখর তার কল্পনাশক্তিই নষ্ট হয়ে যায়, তার বিচার-বুদ্ধি-শ্রুতি নষ্ট হয়ে যায়, তার মনুষ্যত্বও অবশেষে বিঘ্নিত হয়। Robot মানুষের বিকল্প হতে পারে অনেক ব্যাপারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে-মানুষকে পূর্ণ-মানুষ আখ্যা দিয়েছিলেন, সে-মানুষ-ই সব মানুষের আদর্শ বলে গণ্য হওয়া উচিত। সেই পূর্ণ-মানুষ কোনোদিনও Robot হয়ে উঠতে পারে না।

পারবে না। কর্বুরের মনে হয়, মানুষ নিজের মধ্যে অহমিকা এবং অন্ধত্বর কারণে বিজ্ঞানের দাস হয়ে ওঠাতে মনুষ্যত্বের যে-ক্ষতি হচ্ছে, তা পরে তারা বুঝতে পারবে। কিন্তু যখন পারবে, তখন খুব-ই দেরি হয়ে যাবে। মানুষ পরম মূর্খ বলেই নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতাতে নেমেছে আজ। কিন্তু এসব কথা বললে অন্যে কর্বুরকে পাগল ভাববে, পাগল বলবে।

ফ্যাক্স বা ই-মেইল এবং ইন্টারনেট থাকুক, শুধুমাত্র বাণিজ্যের জন্যে, শিল্পের জন্যে, আধুনিক সফল মানুষের টাকা, আরও টাকা আয়ের জন্যে, তার ব্যাবসার, পেশার, শিল্পের সাম্রাজ্যর সীমা আরও বিস্তৃত করার জন্যে। কিন্তু ব্যক্তি-মানুষের সম্পর্কে চিঠি যদি আর না থাকে, আধুনিক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সম্পর্ক অচিরেই ব্যাবসার ও শিল্পের অংশীদার, খরিদ্দার অথবা প্রতিযোগীর-ই হয়ে উঠবে। স্বার্থহীন কোনো সম্পর্ক, প্রেম বা সহমর্মিতার, সমবেদনার কোনো সম্পর্ক আর বোধ হয় থাকবে না, এই কেজো-পৃথিবীতে। সে বড়ো দুর্দৈব হবে।

ঐশিকাদের ট্যুরের একটি আইটিনিরারি দিয়ে মা বলেছিলেন কর্বুরকে, সারাণ্ডার প্ল্যানিং ওঁরা তোর ওপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

-সারাণ্ডাতে ক-দিন?

–তিনরাত চারদিন।

–একগাদা মেয়ে-ফেয়ে নিয়ে কেউ জঙ্গলে যায়?

–কেন? মেয়েরা কি মানুষ নয়? তুই এত নারীবিদ্বেষী কবে থেকে হলি?

–হলাম আবার কী? ছিলাম-ই তো চিরদিন।

–তাই? বোঝা তো যায়নি।

কাকির চিঠিটা মা বার বার-ই পড়ছিলেন আর বলছিলেন, সত্যি! খুব ভালো চিঠি লেখে রে পদ্ম। মনে হয়, যেন সামনে বসে কথা বলছে।

কর্বুর খাবার টেবিলে মাকে ফেরত দিল চিঠিটা।

-পড়লি ভালো করে?

–হুঁ।

–কী বলিস?

-আশ্চর্য তো তুমি। চিনি না জানি না, কে বা কারা আসছেন। তা আসছেন আসুন না। এতে বলাবলির কী আছে? সত্যি। তোমরা এমন করো না!

রুক্মিণী একটু নিষ্প্রভ হয়ে গেলেন।

.

০৩.

কর্বুর ওর নতুন সাদা ইণ্ডিকাটা নিয়ে ঠাকুরানি পাহাড়ে গিয়েছিল। গেস্ট হাউসটা পাহাড়ের ওপরে। সবচেয়ে ভালো ঘর দুটোই বুক করে রেখেছিল ও আগে থেকেই। গেস্ট হাউসের কেয়ারটেকারের সঙ্গেও কথাবার্তা বলে এল। তিনি বললেন, কোম্পানির হেড অফিস থেকেও ফোন এসেছিল। ব্যানার্জিসাহেবের দেখভাল ভালো না হলে আমার চাকরিই চলে যাবে।

আজ মহালয়া। পুজো তো এসেই গেল। আকাশে বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ লেগেছে। শিউলি গাছের নীচে কমলা-বোঁটা সাদা-ফুলের অবিন্যস্ত আলপনা পড়েছে। বড়োজামদা আর বড়োবিলের মাঝামাঝি অনেকখানি জায়গা নিয়ে গর্জন সেন-এর অর্থাৎ কর্বুরের দাদুর বানানো একতলা বিরাট বাংলোটির মধ্যে গাছগাছালি, জগিং অথবা হাঁটার পথ, লিলিপুল, তাতে জাপানিজ গার্ডেন–শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণের লিলিপুল-এর মতো, সব-ই আছে। বাংলোর ভেতরে, কিন্তু অন্যপ্রান্তে একটি বড়ো গেস্ট-কটেজ আছে তাতে দু-টি শোয়ার ঘর এবং মাঝে ডাইনিং-কাম-লিভিং রুম, সামনে পুবমুখী চওড়া বারান্দা। অ্যাটাচড বাথ। তাতে গিজার, কমোড তো আছেই এবং বিদেও আছে, মেয়েদের সুবিধের জন্যে।

কর্বুর ভাবছিল, ওঁরা এসে এইখানে থাকলে দেখাশোনা করার সুবিধে হত। কাকু নাকি বলেওছিলেন ব্যানার্জিসাহেবকে কিন্তু উনি নাকি গা করেননি। কেন করেননি, কে জানে। হয়তো ভেবেছিলেন, অধঃস্তন অফিসারদের কাছে ব্যক্তিগত ঋণ হয়ে যাবে, নয়তো ভেবেছিলেন,

সেখানে থাকাটা তাঁর নিজের এবং তাঁর নানা আরামে অভ্যস্ত মেয়েদের পক্ষে যথেষ্ট আরামদায়ক হবে না হয়তো।

যাই হোক, ওঁদের যা খুশি তাই করুন। কর্বুরের কিছু করার নেই এ ব্যাপারে।

বাংলো থেকে বেরিয়ে, যে-পথটি অনেক দূরের প্রধান সড়কে পড়েছে সেই লাল মাটির ঢেউ-খেলানো পথটাকে, বর্ষার জল পেয়ে চড়চড় করে বেড়ে-ওঠা কচিকলাপাতা-রঙা শালের চারাগাছ, সবুজ-রঙা ঝাঁটিজঙ্গল এসে যেন, দু-পাশ থেকে গলা টিপে ধরেছে। দু-পাশের বড়োগাছের ডালপালা আর ফুলপাতা মাথার ওপরে সবুজ-রঙা চাঁদোয়ার সৃষ্টি করেছে। তাতে দিনের বেলাতে সোনা-রঙা রোদের ঝালর ঝোলে। এবং হাওয়ায় দোলে। শরতের রোদ তখন বুটি-কাটা গালচে পাতে, সোনা-সবুজ রঙা, সেই পথে। আর চাঁদনি রাতে সেই চাঁদোয়ার-ই হাজারও ঝরোকা খুলে যায়। সেই চাঁদোয়ার রং তখন হয়ে যায় রুপোলি। আর তা দিয়ে রূপসি রুপোচুর আলো চুঁইয়ে পড়ে বরখার মতো।

ওদের বাংলোর বাগানের মধ্যে শারদীয়া গাছগাছালির মিশ্রগন্ধের মধ্যে বারোমাস্যা চাঁপা আর ম্যাগনোলিয়া গ্রাণ্ডিফ্লোরার গন্ধ থম মেরে থাকে। আমলকীর ডালেদের থেকে পাতা ঝরতে থাকে। জলপাই গাছের গাঢ় সবুজ পাতাগুলোতে তখন জেল্লা লাগে। দাদুর শখ করে লাগানো রাবার গাছগুলোর পাতাগুলো কালচে-সবুজ দেখায়। রাবার গাছে অনেক জল

লাগে। তাদের জন্যই আজ থেকে ষাট বছর আগে দাদু ইংল্যাণ্ড থেকে Sprinkler আমদানি করেছিলেন। তবে গ্রীষ্মকালে বাগানের অনেক জায়গাতেই Sprinkler ব্যবহার করা হয়। এই শরতে প্রত্যেকটি গাছ এক বিশেষ সুগন্ধে সুগন্ধি হয়। বর্ষণক্ষান্ত প্রকৃতি পাখিদের গলার জুয়ারি খুলে দিয়ে ঠোঁটে মধু ঢেলে দেয়।

দাদুর খুব-ই গোলাপের শখ ছিল। বাবা আর কাকুর সিজন-ফ্লাওয়ার আর গোলাপের চেয়ে পছন্দ বেশি স্বয়ম্ভর নানা দিশি-বিদেশি গাছের। ওদের বাগানে কদম থেকে রাধাচূড়া, আতা থেকে চালতা কোনো গাছের-ই অভাব নেই। মস্তবড়ো বটল-ব্রাশ থেকে আফ্রিকান টিউলিপ, আকাশমণি থেকে অগ্নিশিখা, অমলতাস থেকে বাসন্তী সব গাছ-ই আছে। প্রায় দশ বিঘা জায়গা নিয়ে বাংলোটা। দাদু গর্জন সেন বাংলোর নাম রেখেছিলেন টাটিঝারিয়া।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের বগোদর থেকে হাজারিবাগ শহরে যেতে পথে পড়ে টাটিঝারিয়া। দাদুর খুব প্রিয় জায়গা ছিল ওই টাটিঝারিয়া। মস্তবড়ো একটা রয়্যাল টাইগারও মারেন দাদু সেখানে এক শীতের সকালে। টাটিঝারিয়ার বাংলোতেই দশদিন। সেই জায়গার নামেই বাংলোর নাম দেন। নামটি বড়োই কাব্যিক।

কর্বুর, বলতে গেলে এই বাংলোর হাতার মধ্যেই বড়ো হয়েছে। এখনও যখন খাদানে না থাকে, তখন এই বাড়ির মধ্যেই সময় কাটে কর্বুরের।

বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা যাকে বলে, তা কখনোই ছিল না। নিজের চেয়ে উৎকৃষ্ট মানুষের সংস্পর্শ ওর ভালো লাগে। নইলে উৎকৃষ্ট মানুষদের সঙ্গে সময় কাটায় লাইব্রেরিতে, গান শুনে। অবসর সময়ে বাগানের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। এই বাগান-ই শিশুকাল থেকে ওর মধ্যে প্রকৃতির প্রতি এক গভীর ভালোবাসা জাগিয়ে তুলেছে। ছুটি-ছাটা পেলেই ও সারাণ্ডার বনে বনেও ঘুরে বেড়ায়। বলতে গেলে, এই-ই প্রধান শখ ওর। শখ বলা ঠিক হবে না। বলতে হয় নেশা।

টালির ছাদ-দেওয়া চারদিক খোলা একটি তিনকোনা ঘর বানিয়েছে বাগানের এক নিরিবিলি কোণে। সিমেন্টের গোল টেবিল ও বেঞ্চ আছে তার নীচে। সেখানে বসেই গান শোনে কর্বুর। কখনো ছবি আঁকে। ডায়েরি লেখে। কখনো কিছু লেখালেখিও করে। তবে নিজেই লেখে, নিজেই পড়ে। ও একা থেকেই আনন্দ পায় খুব। তার লেখা কবিতা বা গদ্য বা তার গাওয়া গান গাছেরা শোনে, ফুলেরা শোনে আর শোনে পাখিরা।

এতেই খুশি কর্বুর। খাদানে ওকে যেমন সব জাগতিক কাজ করতে হয় তার সম্পূর্ণ বিপরীত জগতে বাস করে, ও যখন খাদানে থাকে না। ওর কোনোরকম সুখের জন্যে অন্য কারওকেই প্রয়োজন যে, পড়ে না একথাটা জেনে ও এক ধরনের শ্লাঘা বোধ করে। সেই শ্লাঘাকে ও ন্যায্য বলেই মনে করে। অন্তর্মুখী বলে ও নিজেকে নিয়ে গর্বিত এই সহজ

বহিমুখিতার দিনে। তবে সেই গর্ব প্রচ্ছন্ন থাকে ওর নিজের-ই মধ্যে। বাইরে তার কোনোই প্রকাশ নেই। কেজোজগতে ওর যে, ব্যক্তিত্ব সেই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ওর অবসরের জগতের ব্যক্তিত্বের কোনোই মিল নেই। ঈশ্বরের কাছে তাই ও প্রার্থনা করে, সুখের-ই মতো, ওর দুখের দিনেও যেন ওর অন্য কারওকেই প্রয়োজন না হয়। ঈশ্বরের দেওয়া হাজারও সুখের ভার যদি সে বইতে পেরে থাকে এতগুলো বছর অনায়াসে কোনো জ্যোতিষীনির্দেশিত কোনো মাদুলি বা আংটি না পরেই, তাহলে সে তাঁর দেওয়া দুখের ভারও সইতে পারবে।

তার কাকি পদ্মা তার-ই সমবয়েসি। কাকু চাকুরিতে জয়েন করে টাটাতে থাকলেও কাকি এখানেই থাকতেন। উইক এণ্ডে কাকু আসতেন গাড়ি চালিয়ে। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় চলিতার্থে, কাকি তা ঠিক নয়। কিন্তু তার মনটি ভারি সুন্দর। তার শরীরের বাঁধুনিটিও। চোখ চিবুকও কাটা কাটা। কিন্তু নাকটি একটু চাপা। সেই খুঁতের ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছেন ঈশ্বর তার চোখ দুটিতে। কাকির চোখের দিকে চাইলে চোখ ফেরানো যায় না। যেদিন কাকি চোখে কাজল দিত সেদিন আড়কাঠি হয়ে যেত চোখ দুটি। কর্বুরের দুটি চোখকে সেই চোখজোড়া কোনো অদৃশ্য আঠাতে জুড়ে দিত। খড়কে-ডুরে তাঁতের শাড়িতে অথবা কটকি শাড়িতে অথবা কখনো-কখনো প্যাস্টেল শেড-এর বেগমবাহারে বা মধ্যপ্রদেশের হোসসা সিল্কে এই বাগানে প্রজাপতির মতো মনে হত কাকিকে।

পদ্মা যখন এই বাড়িতে প্রথম আসে তখন কর্বুরের বয়স বাইশ আর পদ্মার বয়স পঁচিশ। পঁচিশ বছরের বিবাহিত নারী অভিজ্ঞতাতে বাইশ বছরের কলেজছাত্র কর্বুরের চেয়ে অনেক ই এগিয়ে ছিল। পদ্মা কাকিমা না বলে কর্বুর তাকে কিছুদিন পর থেকেই ডাকত শুধুই কাকি বলে। তাতে কারর-ই আপত্তি ছিল না। একমাত্র পদ্মার ছাড়া। পদ্মা বলত, কাকি মানে তো মেয়ে কাক। আমি কি এতই কুৎসিত?

বলতে গেলে, প্রোষিতভর্তিকা, নিঃসন্তান অল্পবয়েসি পদ্মার একমাত্র সঙ্গী ছিল কর্বুর। ও বড়ো হয়ে ওঠার পরে কাকির সান্নিধ্য ওর শরীরের মধ্যে নানারকম উদবেগ জাগাত। এক অস্বস্তিকর ভালো লাগাতে বিবশ হয়ে পড়ত কর্বুর। তাই, ওর মতো করে ভালো যেমন বাসত কাকিকে, তেমন এক ধরনের ভয়ও জাগত বুকের মধ্যে। কাকির মধ্যে এমন কিছু ছিল যে, অঙ্গুলিলেহনে সে প্রায় সমবয়েসি কর্বুরকে তার দাস করে তুলতে পারত। কাকির

কোনো অনুরোধ, কোনোরকম আজ্ঞাই তাকে মুখে বলতে হত না। তার চোখের ভাষাই যথেষ্ট ছিল, সেইসব ভয়ংকর অথচ শালীন খেলার দিনে। কাকি তখন ভীষণ-ই একা। কিরি তখনও আসেনি। একটা সময়ে কাকি, কাকুর ওপরে সব ভরসা ত্যাগ করেছিল। অথচ দোষটা পরোক্ষে দেওয়া হত কাকিকেই সেকথা বুঝতে পারত কর্বর। কাকি ছিল তার একমাত্র খেলার সাথি, তার কবিতা ও গানের একমাত্র শ্রোতা। তার নির্জনতার

একমাত্র সাথি। কাকি জামশেদপুরে চলে যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে মন বসে না কর্বুরের। খাদানেই থাকে অধিকাংশ সময়ে। যখন পারে তখন সারাণ্ডার কোনো বাংলোতে চলে যায়।

মা-বাবা অখুশি হন কিন্তু তাঁদের মুডি ছেলেকে কিছু বলেন না মুখে।

বিয়ের পাঁচ বছর পরে কলকাতার ডাক্তার ঘনশ্যাম কুন্ডুর হাতযশে পদ্মা কনসিভ করে। ছ-বছরের মাথাতে কিরি জন্মায়। এই ছ-বছরে পদ্মা ও কর্বুর দু-জনেই অনেক বড়োও বুঝি হয়েছে নিজেদের যার যার মতো করে। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বুঝির মধ্যেও কিছু অবুঝপনা তো থাকেই। সেই অবুঝপনাকে গলা টিপে যারাই মারতে জানে, মারতে পারে, তারাই শুধু জানে তাদের কষ্টের কথা। কর্বুর ও পদ্মা জেনেছিল, তাদের নিজের নিজের মতো করে সেই কষ্টকে। ঘি আর আগুন কাছাকাছি থাকলে এবং বিশেষ করে প্রকৃতির মধ্যে থাকলে, যেকোনো মুহূর্তেই আগুন ছড়িয়ে যেতেই পারে। বাইরের নয়, ভেতরের সেই আগুনকে নিবোনোর জন্য কষ্ট যেমন আছে, এক গভীর ব্যথাজাত আনন্দও আছে। সেই কষ্ট ও আনন্দের কথা, সেই কষ্ট ও আনন্দ, যারা জীবনে কখনো পেয়েছে, শুধু তারাই জানে।

.

০৪.

গতকাল দশেরা গেছে। আজ মান্ডুর রূপমতী মঞ্চস্থ হবে। ব্যানার্জিসাহেবেরা সকলে এসে গেছেন দুপুরে। রাতে সকলেই নাটক দেখতেও আসবেন। কাকিও রয়ে গেছে নাটক দেখার জন্য।

কর্বুরের বাবা বলেছিলেন, ব্যানার্জিসাহেবরা যখন আসবেন আমি আর তোর মা-ই যাব ওঁদের রিসিভ করতে। আর পদ্ম তো যাবেই বলেছে। তুই যা করছিস তাই ভালো করে কর। জীবনে এই প্রথম নাটক করছিস, সকলে যেন দেখে ধন্য ধন্য করে। জীবনে যা-কিছুই করবি, কোনো কিছুই খারাপ করে করিস না। এমন জেদে করবি যে, জীবনের কোনোক্ষেত্রেই যেন, তোকে কেউ হারাতে না পারে। এক নম্বর হওয়ার সাধনাই পৌরুষের সাধনা।

মা বলেছিলেন, কেন? সাধনা কি শুধু পুরুষদের-ই একচেটে নাকি? পুরুষ-এর নয়, মানুষ-এর বলো।

ঠিক-ই বলেছ তুমি। দিনকাল পালটে গেছে। আমরা এখনও এই পৃথিবীকে পুরুষ-প্রধান পুরুষশাসিত বলেই মনে করি। সেটা ভুল।

কর্বুর আর পদ্ম টাটিঝারিয়ার বাইরের গেট-এ দাঁড়িয়ে কাকুকে টা-টা করে দিয়ে ফিরে আসছিল। কাকি আর কিরি নাটক দেখে তারপর-ই যাবে। সিরাজ চাচা পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কাকি বলল, তোমাকে কিন্তু সত্যিই নবাবের মতোই দেখাবে। স্টেজ

রিহার্সালেই যা দেখাচ্ছিল।

নবাবের পোশাক পরলেই তো নবাব হওয়া যায়। বাহাদুরির কী?

কর্বুর বলল।

–ঠিক তা নয়। পোশাক, কারওকে নবাবের ভড়ংটুকুই দিতে পারে মাত্র, নবাবি আছে। তোমার চেহারায়, চলাফেরায়, গলার স্বরে, চোখের দৃষ্টিতে।

-আমাকে ফিউড্যাল বলছ?

তারপর-ই বলল, বড়োজামদার শিখীকে কীরকম দেখাবে?

–ওর মধ্যে আভিজাত্য বলে কোনো ব্যাপার-ই নেই। তোমার পাশে ওকে বাঁদির মতো দেখাবে। ঝুটো হিরে-মুক্তো পরলেই কি আর বাঁদি রানি হয়ে যায়?

–আমার তো বেশ লাগে শিখীকে। স্মার্ট, বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বময়ী, হাসিখুশি।

–হুঁ। ঐশিকাকে তত দ্যাখোনি। তাই শিখীর প্রশংসা করছ। তুমি একটি ভ্যাবাগঙ্গারাম। ক-জন মেয়ে তুমি দেখেছ জীবনে?

–তা সত্যি। সেই শরীর-মন জাগার পর থেকে প্রথম যৌবনে মা ছাড়া, মেয়ে বলতে তো, শুধু তোমাকেই দেখেছি। তুমি আসার আগেই তো

দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তুমি এমন করেই আমার সমস্তখানি মন জুড়ে ছিলে যে, অন্য কারওকে দেখবার বা জানবার সুযোগ যে, পাইনি তাই শুধু নয়, দেখবার বা জানবার কোনো তাগিদও হয়তো বোধ করিনি।

–দোষটা তাহলে আমার-ই বলছ?

–দোষের কথা তো বলিনি কাকি। এ তো তোমার গুণ-ই। চারুলতার মতো তুমিও যে, আমার সখী ছিলে। জীবনের যা-কিছু সুন্দর দিক, সব তো আমি তোমার মধ্যেই দেখেছি। তোমার কাছ থেকেই শিখেছি, মানে তোমার-ই সান্নিধ্যে। আমার কিন্তু মনে হয় যে, তোমাকে কাছে পেয়েছিলাম দীর্ঘ ছ-বছর, কিরি আসার আগে পর্যন্ত, তাই অন্য কোনো মেয়েকেই আমার এ-জীবনে আর ভালো লাগবে না। মেয়েদের কেমন যে, হওয়া উচিত তার-ই রোল মডেল হয়ে উঠেছ তুমি আমার কাছে।

-লাগবে, লাগবে। ঐশিকাকে ভালো লাগবেই। কতকিছু স্বপ্ন দেখেছি আমি। হয়তো দাদা আর দিদিও দেখছেন। তোমার কাকু তো তার নিজের বয়েসটা একটু কম হলে ঐশিকাকে নিজেই বিয়ে করে ফেলতেন, ভাব দেখলে এমন-ই মনে হয়।

-ভালোই বলেছ। আগেকার দিনে স্ত্রী গত হওয়া অনেক বাবা ছেলেদের জন্যে পাত্রী দেখতে গিয়ে মেয়ে তেমন পছন্দ হলে যেমন নিজেরাই বিয়ে করে ফেলতেন তেমন-ই আর কী!

ওরা লতাপাতা ডালপালার চাঁদোয়ার নীচে নীচে পাখির ডাক, ফুলের গন্ধ, শরতের রোদের গন্ধের মধ্যে ঝুঁদ হয়ে সবুজাভ-সোনালি পথ বেয়ে বাংলোর দিকে ফিরে আসছিল। গেট থেকে। টাটিঝারিয়ার গেট থেকে বাংলোটি প্রায় আড়াইশো মিটার মতো।

কর্বুর বলল, আচ্ছা কাকি, আমার সুখ নিয়ে তুমি এত ভাবো কেন বলো তো?

কর্বুরের মুখের দিকে মুখ ঘুরিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে রক্তিম মুখে পদ্মা বলল, ভাবব? আমি যে, তোমার মায়ের-ই মতন কবু, আমি যে, তোমার কাকিমা।

-তা তো বটেই। সম্পর্কেই ওই কাকিমা। আমার চেয়ে কী এমন বড়ো। তোমার সঙ্গে তো আমার বিয়েও হতে পারত তুমি আমার কাকিমা না হলে।

আরও অনেক কথাই মনে এসেছিল কর্বুরের, সেসব বলল না। গান, সাহিত্য এইসবের সাঁকো পেরিয়ে নারীর মধ্যে যে, চিরকালীন রহস্য জমা রয়েছে অনন্তকাল ধরে তার-ই হদিশ পেয়েছিল কর্বুর পদ্মার মাধ্যমে।

–সেকথা অবান্তর। ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমি তোমার কাকিমা। তোমার গুরুজন। মনে নেই? দিদি বিয়ের পর প্রথম বছর বিজয়ার দিনে আর নববর্ষে তোমাকে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করিয়েছিলেন। তারপরে অবশ্য

আমিই দিইনি তোমাকে প্রণাম করতে।

–প্রণামের কতরকম হয়, কাকি। পা ছুঁলেও অনেক সময়ে প্রণাম হয়ে ওঠে না, আবার কারওকে চুমু খেলেও তো তা প্রণাম-ই হয়ে ওঠে।

পদ্মা চুপ করে রইল।

–বলল, জানি। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক তো চুমুরও ছিল না, প্রণামেরও নয়।

তারপর বলল, বলো কবু, ছ-ছটা ভারি বিপজ্জনক বছর আমরা কাটিয়ে গেছি এখানে– কিরি আসার আগে অবধি! তাই না?

–তাই। আমরা দুজনেই যে, ভ সভ্য, সম্ভ্রান্ত পরিবারের তার প্রমাণ কিন্তু আমরা দিয়েছি।

–তা দিয়েছি। কিন্তু সেই অলিখিত সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্যে, কষ্টও তত কম পাইনি দু-জনেই আমরা। বলো তুমি?

পদ্মা বলল।

চমকে উঠে কবু বলল,

–তা ঠিক! তবে মাঝে মাঝে কী মনে হয় জান?

–কী?

–সেই কষ্টটাই হয়তো আনন্দ ছিল।

একটু চুপ করে থেকে পদ্মা বলল, ঠিক তাই। জীবনে যা-কিছুই গভীর আনন্দের তার বেশির ভাগ সম্ভবত কষ্টই। কষ্টটাই যে, আনন্দ তা বুঝতে অনেক-ই সময় লাগে। ত্যাগ বা বঞ্চনার মধ্যে দিয়ে যে, গভীর এক শুচিস্নিগ্ধ আনন্দ আসে তা সম্ভবত সহজ এবং সাধারণ শারীরিকপ্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে আসে না কোনোদিন-ই।

–কী জানি! জানি না। তবে আমার একটা ভয় হয় কাকি যে, যদি কখনো বিয়ে করি, কোনো মেয়েকেই আমি তোমার আসনে বসাতে পারব না।

-একী অলক্ষুণে কথা। ছি :, ওরকম বলতে নেই। দিদি এবং দাদা আর তোমার কাকু একথা শুনতে পেলে কী ভাববেন বলো তো আমাকে? তা ছাড়া, আমি তো তোমাকে দুখি করতে চাইনি কোনোদিন-ই, সুখী করতেই চেয়েছিলাম। ওরকম করে বোলো না। আমার পক্ষে নিজেকে ক্ষমা করা সম্ভব হবে না তাহলে কোনোদিনও। তা ছাড়া, বিয়ে করলেই জানবে যে, নারী-পুরুষের সম্পর্কে শুধু মন-ই নয়, শরীরটাও অনেকখানি। দাম্পত্যর সঙ্গে নিছক মনের প্রেমে তফাত আছে অনেক-ই। তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। You have to live life to know life. সব জিনিস বই পড়ে বা উপদেশ পেয়েই শেখা যায় না।

বাংলোতে পৌঁছে ওরা দু-জনে বারান্দাতে এসে বসল। কর্বুরের বাবা এবং মা, কাকু আর কিরি রওনা হয়ে যাওয়ার পরেই বিজয়া সারতে বেরিয়ে গেছেন। একটি নতুন ফিয়াট উনো এসেছে, বাসন্তী-রঙা। বাবার ওই গাড়িটা খুব পছন্দ। নিজেই চালিয়ে গেছেন। বাবার ড্রাইভার বানোয়ারি আজ আসবে না। দশেরার দিন রাতে প্রচুর সিদ্ধি খেয়েছে আর ঢোল বাজিয়ে নেচেছে। আজ নেশা কাটতে সময় লাগবে। যদি আসেও হয়তো সন্ধের দিকে আসবে।

পদ্মা বলল, দশটা বাজে। তুমি যাও স্নান করে নিয়ে বিশ্রাম করো। আমি কিচেনে যাচ্ছি। আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে একটা ঘুম লাগাও। তারপর গরম জলে স্নান করে বেরোবে। ক টাতে পৌঁছাতে হবে?

-চারটেতে। মেক-আপ-এ যে, অনেক-ই সময় নেবে।

–তা তো নেবেই। নবাব হওয়া কি সোজা কথা! যাওয়ার আগে গরম জলে দুটো ডিসপিরিন ফেলে গার্গল কোরো আর আমার কাছ থেকে কাবাব-চিনির রুপোর কৌটোটা নিয়ে যেয়ো। গালে ক-টি ফেলে রাখবে, দেখবে, গলা বাঘের মতো বলছে।

-কত বড়োকৌটো?

ছোটোকৌটো। নস্যির কৌটো। বেঁটে কাকার ছিল। ওপরটাতে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক লাগানো। ভেতরটা দেখা যায়। আমার একটা পেতলের কৌটো

ছিল। বেঁটে কাকা সেটা নস্যির জন্যে নিয়ে তাঁর রুপোর কৌটোটা কাবাব-চিনি রাখার জন্যে দিয়ে দেন। তোমার নবাবি জোব্বার পকেটে থাকবে। স্টেজেও তুমি জোব্বা থেকে বের করে খেতে পারবে। কৌটোটা আমি silvo দিয়ে পালিশ করে দিচ্ছি। এসব জিনিস তো নবাবদের-ই মানায়।

–সে হবেখন।

–তুমি যাও। বিশ্রাম করো। আমি ওদিকে যাই।

উঠে দাঁড়িয়েই, পদ্মা বলল, কাল ভোরে কখন বেরোবে জঙ্গলে?

–ব্রেকফাস্ট করে বেরোব। ওঁদের বলেছি, সাড়ে আটটার মধ্যে তৈরি হয়ে থাকতে।

–প্রথমে কোথায় যাবে?

–কুমডি।

–ইশ। যেখানে আমরা বাংলোর পাশে হাতি দেখেছিলাম?

–হ্যাঁ।

–আমারও খুব যেতে ইচ্ছে করছে। তোমার সঙ্গে জঙ্গলে যাওয়ার মজাই

আলাদা। কত গাছ চেন তুমি, কত পাখি, কত ফুল।

–চল-না তুমি।

-তা হয় না।

-কেন?

–আমরা সকলেই চাই তুমি আর ঐশিকা দু-জনে দু-জনকে কাছ থেকে জানো।

-তাহলে কাবাবমে হাড্ডি করে গৈরিকাকেও সঙ্গে দিচ্ছ কেন?

হেসে উঠল পদ্মা।

তারপর বলল, রিলিফ-এর জন্যে। একটানা একসঙ্গে থাকলে রোমিওরও, জুলিয়েটকে খারাপ লাগতে পারত।

-তাই? আর ঐশিকার বাবা?

–ব্যানার্জিসাহেবও দারুণ কম্পানি। কোনোরকম হ্যাঙ-আপস নেই ভদ্রলোকের। তাঁর স্ত্রী সত্যিই ভাগ্যবতী ছিলেন।

-তাই নাকি? তবে লোকে যে বলে, যার স্ত্রী মরে, সেই ভাগ্যবান।

–তারা সব বাজে লোক।

–চল-না তুমিও। খুব মজা হবে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচব। আমার নার্ভাস লাগছে।

–নার্ভাস হওয়ার পাত্রই তো তুমি। বাজে কথা বোলো না।

-চলো চলো।

–জান-না। কিরিটা একা থাকবে। স্কুলও তো খুলে যাবে কাল থেকে। তোমাদের রওনা করিয়ে দিয়ে আমিও চলে যাব টাটা। ছানা-পোনা যতদিন ছিল না, দিন অন্যরকম ছিল।

বলেই বলল, নাঃ। আর গল্প নয়। এবার আমি যাচ্ছি। আজ বারোটার মধ্যে খেয়ে নেবে। আজ মুন্না দেবী কী রাঁধছে গিয়ে দেখি।

৫-৬. ওপেল অ্যাস্ট্রা

০৫.

ব্যানার্জিসাহেবের ওপেল অ্যাস্ট্রা, ছাই-রঙা। ড্রাইভারের নাম বিহারি। জিপটা চালাবে কর্বুর-ই নিজে। সঙ্গে রহমতকে নিয়েছে। বিচিত্রবীর্য লোক। একাধারে ড্রাইভার, ক্লিনার, বাবুর্চি এবং বডি-গার্ড। ওড়িয়া আর হিন্দি দুইয়েতেই সমান দখল। তা ছাড়া ব্যক্তিত্বও আছে। জঙ্গলের । মধ্যের বনবাংলার চৌকিদারেরা আর আজকাল আগের মতো নেই। তাদের দিয়ে ঠিকমতো কাজ করিয়ে নেওয়া বাহাদুরির কাজ। রহমত ভালো নার্সও। একবার মনোহরপুরে শিকারে গিয়ে জ্বরে, বেহুশ হয়ে গিয়েছিল কর্বুর। রহমত শুধু সেবাই করেনি, বহাল তবিয়তে বড়োবিলে ফিরিয়েও নিয়ে এসেছিল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কর্বুরকে, তুমিও এ গাড়িতেই এসো। জিপ তোমার ড্রাইভার চালিয়ে নিয়ে আসুক। এখন তো জিপের দরকার নেই।

আপত্তি আছে?

–তা নেই। কর্বুর বলল, আমি সামনে বসি?

না। ব্যানার্জিসাহেব বললেন, পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে।

তারপর বললেন, আমি মোটা মানুষ, সামনেই কম্ফর্টেবল ফিল করি। তুমি ওদের সঙ্গে পেছনেই বোসো-না বরং।

বেশ।

গৈরিকা বলল, আপনাকে স্যাণ্ডউইচ করি?

–মানে?

-মানে, আমরা দুজনে দু-দিকে বসি জানলার পাশে। দেখতে দেখতে যেতে পারব তা হলে। আপত্তি আছে?

কর্বুর মনে মনে বলল, এমন আলগা ভদ্রতার মানে কী? বাবা আর মেয়েতে যা নিজেদের ইচ্ছে তা তো করছেন-ই। মাঝে মাঝে একটা করে আপত্তি আছে? প্রশ্ন করার কী দরকার?

শুধু বলল, যেমন আপনাদের খুশি।

পদ্মা এবং কর্বুরের মা-বাবাও এসেছিলেন, ওদের সকলকে সি-অফ করতে ঠাকুরানি পাহাড়ের ওপরে।

রহমত-এর জিপে মুরগির ঝুড়ি, আনাজের বস্তা, চাল, ডাল, তেল, নুন, লঙ্কা এবং যাবতীয় মশলা। একটি পাঁচ-ছ কেজির পাঁঠা। সাদা-রঙা। চা, কফি, বিস্কিট, চিজ Knor এর স্যুপ প্যাকেট, নুডলস ইত্যাদি জিপের পেছনে বোঝাই করা।

কর্বুর বলল, আমি বরং গাড়িটা চালাই। আপনাদের ড্রাইভার আমাদের ড্রাইভারের সঙ্গে আসুক। ওকেও একা আসতে হবে না, আর এ-গাড়িতেও ওরা দু-জনে পেছনে হাত-পা ছড়িয়ে যেতে পারবেন।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ হবে না।

পেছন থেকে ঐশিকা বলে উঠল, গাড়ির পেছনের সিটটা তো বিছানা নয়, যে হাত-পা ছড়িয়ে যেতেই হবে। তবে আপনার যদি আমাদের সঙ্গে পেছনে বসতে আপত্তি থাকে, সে কথা বললেই তো হয়।

এবারে কর্বুরেরও মনে হল যে, কিছু বলা দরকার। বড়োই খলবল করছে দু-বোন। পায়ের নীচে ঘাস গজাতে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

শৈশবে মাতৃহীন মেয়েদের যত ভালো করে ব্যানার্জিসাহেব মানুষ করেছেন বলে শুনেছিল কর্বুর ওর কাকির কাছে, আসলে তেমন ভালো করে মানুষ

হয়তো করতে পারেননি উনি। মেয়ে দু-টি বেশ অভব্য আছে। এবং প্রয়োজনের চেয়ে একটু বেশিই সপ্রতিভ। আদরে আদরে একেবারেই গোবর হয়েছে।

কর্বুর হেসে বলল, আমি এই পাড়াগাঁ বড়োবিল-এ থাকি বলেই ভাববেন না যে, মেয়েদের সঙ্গে মিশতে কোনোরকম আড়ষ্টতা আছে আমার। আপনারা যা ভাবছেন, তা ভুল।

বলতে বলতেই জিপের দিকে গিয়ে রহমতচাচাকে যা বলার বলে, ওঁদের ড্রাইভার বিহারিকে জিপের সামনের সিট-এ বসিয়ে দিয়ে, নিজে এসে ওপেল-এর ড্রাইভিং সিট-এ বসল।

বসেই, এঞ্জিন স্টার্ট করল।

ঐশিকা বলল, আড়ষ্টতা যে নেই, তা তো কাল নাটক করার সময়েই দেখলাম।

কর্বুর বলল, নাটক তো জীবন নয়। দুটো আলাদা ব্যাপার।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সফিস্টিকেটেড গাড়ি, চালাতে অসুবিধে হবে না তো তোমার?

কর্বুর অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিয়ে গাড়ি সামনে গড়িয়ে দিয়ে বলল, চালাই

তো। আমাদের আছে একটা। সাদা রঙের।

–ওপেল অ্যাস্ট্রা?

–আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন দাদুর একটা ওপেল ক্যাপিটান-ও ছিল। ওপেল অ্যাস্ট্রার চেয়ে অনেক-ই বড়ো। লেফট হ্যাঁণ্ড ড্রাইভ। আমি ওতেই গাড়ি চালানো শিখেছিলাম এই রহমতচাচার-ই কাছে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, আই সি।

হয়তো ভাবছিলেন, কুরুবক সেন যেমন, নরম-সরল-বিনয়ী-ভদ্র তার ভাইপো কর্বুর ঠিক সেরকম নয়।

-তোমার বাবা মা কাকিমা তো দেখলাম একটা টাটা সাফারিতে এসেছিলেন। আরও গাড়ি আছে নাকি তোমাদের?

-একটা ইণ্ডিকা আছে আমার। গতসপ্তাহেই পেয়েছি। কাকার তো ফিয়া সিয়েনা আছে। নিশ্চয়ই জামশেদপুরে দেখেছেন। মারুতি এস্টিম-এ রহমতচাচা মায়ের ও কাকিমার ডিউটি করে, দিদিরও, যখন আসে দিদি। তা ছাড়া বাজার-দোকান করার জন্যে একটা মারুতি ভ্যানও আছে। পেছনের সিটটা খুলে ফেলা হয়েছে। বাজার বইবার সুবিধার জন্যে। তা ছাড়া একটা ফিয়াট-উনোও নিয়েছেন বাবা।

–বাঃ। আগেকার দিনের রাজারাজড়াদের ঘোড়ার শখ ছিল একসময়ে, তোমাদের দেখছি গাড়ির শখ।

–তা জিপটার কথা বললেন না? ওটা বুঝি ধর্তব্যের মধ্যেই পড়ে না?

গৈরিকা বলল।

–ওটাকে কি ঠিক গাড়ি বলা চলে?

–তবে ওটা কী?

ঐশিকা বলল, পেছন থেকে।

-ওটা পক্ষীরাজ।

কর্বুর বলল।

সকলে হেসে উঠলেন একইসঙ্গে। গাড়ির মধ্যের আবহাওয়ার গুমোটটা এয়ারকণ্ডিশনার চালানো থাকা সত্ত্বেও ঠিক কাটছিল এতক্ষণ। এবার মনে হল যেন কাটতে শুরু হল।

হঠাৎ ঐশিকা বলল, কাল রাতে আপনাকে কিন্তু সত্যিই নবাব-নবাব-ই দেখাচ্ছিল। নাটকে।

-তাই? থ্যাঙ্ক ইউ। নাটকের নবাব।

তারপর বলল, মেক-আপম্যানের বাহাদুরি আর ভাড়া-করা পোশাকের দৌলতে অনেক বান্দাও সহজেই চেহারাতে নবাব বনতে পারে, কিন্তু ডিমেন্যুরেও নবাব বনা বোধ হয় অতসহজ নয়।

–আপনার চেহারা এবং ডিমের দুইয়েতেই নবাব-নবাব লাগছিল।

এবারে গৈরিকা বলল।

কর্বুর আবারও বলল, থ্যাঙ্ক ইউ।

তারপর বলল, আমি তো নবাব-ই। অন্যরকমের নবাব।

-কোথাকার নবাব?

–সারাণ্ডার জঙ্গলের নবাব। কারও-কোয়েল-কয়নার উপত্যকার এই Land of seven hundred hills-এর নবাব আমি। শালমহুয়ার জঙ্গলের নবাব।

–কোয়েল নদীর নাম তো শুনেছি কিন্তু কারো বা কয়নার নাম তো শুনিনি। ওইসব নামেও নদী আছে বুঝি? জানতাম না তো!

-এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব? আমি

এখানে থাকি। বলেই হয়তো জানি।

–তা কেন? ডিসকভারি চ্যানেল বা ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক চ্যানেল দেখলে তো, ঘরে বসে অনেক-ই জানা যায়। বিপুলা পৃথিবীর সর্বত্রই যে, নিজের পায়ে হেঁটে ঘুরতেই হবে তার কী মানে?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

-তা হতে পারে। কিন্তু নিজের পায়ে না ঘুরলে আবার কোনো জায়গাই তেমন করে দেখাও হয় না। যাকে বলে, To have a feel of the place. সেই অনুভূতিটা হয় না আদৌ টিভি দেখে।

সেটা অবশ্য ঠিক-ই।

ব্যানার্জিসাহেব কর্বুরের কথায় সায় দিলেন।

মেয়েদের কেমন লাগছে তা বলতে পারবেন না, ব্যানার্জিসাহেব গতরাতে বাজবাহাদুরের চরিত্রে কর্বুরের অভিনয় দেখে এবং আজ এইটুকু সময়ের মধ্যেই তাকে যতটুকু দেখেছেন তাতেই ছেলেটিকে ভালো লাগতে আরম্ভ করেছে ওঁর। নিজের ছেলেবেলার কথাই মনে পড়ে যাচ্ছে যেন। নো ডাউট, দিস ইয়াং ম্যান ইজ কোয়াইট আ Guy! আসলে, নিজেকে মানুষ যত ভালোবাসে তত তো আর কারওকেই বাসতে পারে না। কারও সঙ্গে নিজের মিল খুঁজে পেলেই তাকে ভালো লেগে যায়।

মনে মনে বললেন, উনি।

গৈরিকা বলল, মহড়া নাটকটির কিন্তু বেশ ডেপথ আছে। নাটকের মধ্যেও নাটক ছিল একটা। থিমটা খুব-ই প্র্যাকটিকাল।

-কোয়াইট আনইউজুয়ালও।

ঐশিকা বলল।

-সত্যিই তো আমাদের সকলের জীবন-ই এক-একটি মহড়া। ক-জনের জীবনে জীবনের নাটক শেষ পর্যন্ত মঞ্চস্থ হয়? রিহার্সালই তো সার। আইডিয়াটা সত্যি খুবই অরিজিন্যাল। সন্দেহ নেই।

-ওই ভদ্রমহিলা কে?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

–কোন ভদ্রমহিলা?

–যিনি রূপমতীর ভূমিকাতে অভিনয় করলেন? গানও তত বেশ ভালোই গান মহিলা দেখলাম।

–দেখলাম কী? শুনলাম বল।

গৈরিকা বলল।

–ওই হল।

–মহিলা ঠিক নন। বয়সে আপনাদের-ই মতো হবে শিখী। ওর নাম শিখী রায়। ক্ল্যাসিকাল গান শেখে বড়োজামদার হেরম্ববাবুর কাছে। হেরম্ব চ্যাটার্জি। আগ্রা ঘরানার গাইয়ে। বিজয় কিচলু রবি কিচলুদের গুরুভাই। কুমারপ্রসাদ মুখার্জিরও।

-কই? হেরম্ব চাটুজ্যের নাম তো কখনো শুনিনি। গানও শুনিনি কখনো।

-শোনবার তো কোনো কারণ নেই। হেরম্ব জ্যাঠারা তো they also ran-এর দলেই পড়েন। বাণিজ্যিক সাফল্যের মুকুট তো তাঁদের মাথায় ওঠেনি। দিল্লি, মুম্বাই, কলকাতাতেও থাকেন না। তাই তাঁদের আপনারা চিনবেন কী করে!

-তা ছাড়া এসব প্রাগৈতিহাসিক গানও শোনেন নাকি আপনারা? আপনারা তো সম্ভবত নচিকেতা, সুমন, লোপামুদ্রাদের আধুনিক গান-ই শোনেন বাংলা গান আদৌ শুনলে। ইণ্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল মিউজিক তো এখন কাকুর এই জিপগাড়ির-ই মতো অ্যান্টিক ব্যাপার হয়ে গেছে।

–আপনি বড়োবেশি Surmise করে নেন মশায়। আপনি একটু বেশি ওভার কনফিডেন্টও। আধুনিকতার ওপর আপনার রাগ আছে মনে হয়।

–আধুনিকতার ওপরে রাগ নেই। যে মানুষ আধুনিক নন তিনি অশিক্ষিত। তবে আধুনিকতা আর ছদ্ম-আধুনিকতার মধ্যে তফাত তো আছেই। থাকবেও চিরদিন।

-আপনি বুঝি ইণ্ডিয়ান ক্ল্যাসিকাল গানের খুব ভক্ত? ওয়েল। বাহার আর বসন্ত এই দুই রাগের মধ্যে তফাত কী তা বলতে পারবেন?

–আজ্ঞে না। আমি জলবসন্ত আর আসল বসন্তর মধ্যের ফারাকটা জানি।

তারপর বলল, ওইসব গান শুনলেও আপনারা কোনো কোটিপতির বাড়িতে বা রবীন্দ্রসদনে বা কলামন্দিরে বা সংগীত রিসার্চ আকাঁদেমিতে শোনেন। হেরম্ব চাটুজ্যেদের খোঁজ আপনারা রাখেন না। কোনোদিন রাখবেনও না। ক্ল্যাসিকাল ইণ্ডিয়ান মিউজিক আপনাদের কাছে জামদানি শাল, জড়োয়ার গয়না, এম. এফ. হুসেইনের ছবির-ই মতো, নিছক-ই Status Symbol.

গৈরিকা বলল, আপনি তো মহা ঝগড়াটে লোক মশায়। আমার মা একটা কথা বলতেন, বাতাসের গলায় দড়ি দিয়ে ঝগড়া করা। আপনাকে দেখে মায়ের সেই কথাটা মনে পড়ছে।

হেরম্ববাবু প্রসঙ্গে আপনি আগ্রা ঘরানার কথা বলছিলেন না?

আপনি আবার এসব ঘরানা-টরানার কথাও জানেন নাকি?

খুব বেশি ঘরানা তো নেই। তা ছাড়া কুমারপ্রসাদ মুখার্জির কুদরত রঙ্গি-বিরঙ্গি বইটি কেউ পড়ে ফেললেই তো মোটামুটি জেনে ফেলতে পারেন।

তারপর বলল গৈরিকা, সেটি আবার কী বই?

–সেটি ভারতীয় মার্গ সংগীত এবং গাইয়েদের নিয়ে লেখা একটি অসাধারণ বই। না পড়ে থাকলে, অবশ্যই পড়বেন। আনন্দ পাবলিশার্স-এর বই। তা ছাড়া, রসবোধ কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন বইটি পড়ে।

–কোন কুমারপ্রসাদ? ধূর্জটিপ্রসাদের একমাত্র পুত্র যিনি?

ব্যানার্জিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

–হ্যাঁ।

–আরে তাকে তো আমি চিনতাম। কোল-ইণ্ডিয়াতে ছিলেন না?

–ছিলেন-ই তো। আমার বাবাও সেই সুবাদে চেনেন।

পড়তে হবে তো।

তারপর কর্বুর বলল, অমিয়নাথ সান্যালের স্মৃতির অতলে বইটি পড়েছেন?

না তো।

–ইউ হ্যাভ মিসড সামথিং ইন ইয়োর লাইফ। জিজ্ঞাসার বই, মানে প্রকাশক। অবশ্যই পড়বেন সে বইটিও।

-আজকাল বেশি জানার তো প্রয়োজন নেই। বইয়ের ব্লাব, সিডি বা এল.পি-তে গায়ক গায়িকার যে পরিচিতি থাকে, সেই পরিচিতিটুকু পড়ে নিলেই তো পন্ডিতি করা যায়। ঠেকাচ্ছেটা কে? আসল পন্ডিতেরা আমাদের মত এইরকম নকল পন্ডিতদের দাপটে লজ্জাতে আজকাল ঘরেই থাকেন কুলুপ এঁটে। ইকনমিস্ট গ্রেশাম সাহেবের সেই Maxim এখন জীবনের সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে গেছে। শুধুমাত্র অর্থনীতিতেই নয়।

-কী? মানে কোন Maxim?

— Bad money drives away good money.

–যা বলেছ ভাই। কার-রে-ক্ট।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

পরক্ষণেই ভাবলেন, কর্বুর যদি ভবিষ্যতে তাঁর জামাই হয়, তাহলেও কি তাকে ভাই বলেই সম্বোধন করবেন? সত্যি। নিজেকে নিয়ে চলে না। যদি..

তারপরই বললেন কর্বুরকে, তোমার কি কোনো ডাকনাম নেই বাবা? কর্বুর, কর্বুর করে বার বার ডাকতে যে, আমার ডেঞ্চার খুলে যাচ্ছে।

কর্বুর হেসে বলল, বাড়িতে সকলে আমাকে কবু বলেই ডাকেন।

–দ্যাটস মাচ বেটার।

–কর্বুর মানে কী? কোনো দিশি শব্দ?

গৈরিকা জিজ্ঞেস করল।

–শব্দটা বাংলাই। কিন্তু শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত বাঙালিরা তো আজকাল বাংলা জানাটাকে লজ্জাকর ব্যাপার বলেই মনে করেন। তাঁরা অনেক শব্দর-ই বাংলা জানেন না অথচ ইংরেজি অথবা ফ্রেঞ্চ প্রতিশব্দ জানেন।

–আপনি বাপির-ই মতো বড়োজ্ঞান দেন মশায়! মানেটা বলুন-ই না। তা ছাড়া বাপি ঝগড়ুটে নন, আপনি একনম্বর ঝগড়ুটে।

ঐশিকা বলল।

–কর্বুর মানে বহুবর্ণ। মানে বুঝলেন? মাল্টি-কালারড। চিত্র-বিচিত্র।

–বাবা! নামটা কে রেখেছিলেন আপনার? খুব-ই থটফুল মানুষ তো উনি।

–আমার দাদু। হি ওয়াজ আ গ্রেট ম্যান।

এদের খুনশুটির হাত থেকে বাঁচার জন্যে ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কবু, আমরা প্রথমে কোথায় যাচ্ছি?

কুমডিতে। আজকে সারাদিন কুমডিতেই থাকব। রাতেও। তারপর কাল ব্রেকফাস্ট করে থলকোবাদে যাব। তারপর...

–তারপরের কথা আগে বলবেন না প্লিজ। আমরা একটু সাসপেন্স-য়েই থাকতে ভালোবাসি।

-সেটা মন্দ বলিসনি। আমি প্রথমবার যখন States-এ যাই তখন পথে দেড়শো মাইল সামনে বৃষ্টি হচ্ছে কি হচ্ছে না, ট্রাফিক জ্যাম আছে কি নেই অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে কি হয়নি, সব-ই টিভি স্ক্রিন-এ ফুটে উঠতে দেখে বড়ো বিরক্তি ধরেছিল। আমাদের দেশে যখন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে আমরা পুরোনো দিনের গাড়িতে বেরোতাম, তখন ভূমিকম্প হবে না বন্যা, বজ্রপাত না শিলাবৃষ্টি, সে সম্বন্ধে কিছুমাত্রই না জেনে মহানন্দে যেতাম। অজ্ঞতারও এক বিশেষ আনন্দ আছে। বেশি জানলে সেই নির্মল আনন্দ মাটি হয়।

ঐশিকা বলল, এই ইন্টারনেট ই-মেইল-এর যুগে সাসপেন্স জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। সবাই সবজান্তা। কারোরই অজানা কিছুই নেই। ভবিষ্যৎ-এ কুয়াশা নেই, ঝকঝকে রোদ্দুর। জীবনে কোনো রহস্য নেই।

না, আমরা কিন্তু একটু প্রাচীনপন্থী। একটু কম জেনেই আমরা খুশি থাকি।

-বেশ। এ তো আনন্দের-ই কথা।

কর্বুর বলল।

–আপনার নাটকটা কিন্তু আমাকে রীতিমতো হন্ট করছে।

ঐশিকা বলল।

–হন্ট করাটা তো ভালো নয়। Haunt শব্দের মানেটা তো বিশেষ সুবিধের নয়। ভেবেছিলাম, বাংলাটা ভালো করে শেখেননি, তাই কথায় কথায় ইংরেজি ফুটোচ্ছেন। যখন ইংরেজি শিখেছেন তখন ইংরেজিটাও তো ভালো করে শেখেননি মনে হচ্ছে।

একটু অপ্রতিভ না হয়ে ঐশিকা বলল, ভুলটা ধরেছেন আপনি ঠিক-ই। অনেক শব্দ ব্যবহার করতে করতে আমরা তার আসল মানেটাই ভুলে যাই। রাইট ইউ আর!

কর্বুর অবাক হল একটু। যাকে বলে প্লেজেন্টলি সারপ্রাইজড। ঝগড়া লাগার বা অপমানিত হওয়ার যখন যথেষ্টই কারণ ছিল তখন নিজের ভুল একবাক্যে স্বীকার করে নিল ঐশিকা। এটা একটা মস্ত গুণ বলতে হবে।

–তক্ষ রায়ের চরিত্রটা, মানে গতরাতের নাটকে, কিন্তু অসাধারণ। বিশেষ করে তাঁর Introspection, যেখানে উনি স্বগতোক্তি করছেন, বলছেন, রূপমতীর বয়স হবে না কোনোদিন-ই।তক্ষ একদিন বৃদ্ধ হবে,। লোলচর্ম, গলিত, নখদন্ত কিন্তু রূপমতী রয়ে যাবেন তেমন-ই রূপমতী। তেমন-ই রইবে তাঁর গর্বিত গজগমনের পদক্ষেপ, তাঁর ব্রীড়াভঙ্গি। তাঁর গানের গলা। বয়স ছুঁতে পারবে না তাঁর কিছুকেই।

গৈরিকা বলল।

–ক্লাসিক হয়ে যাবেন রূপমতী, চিরকালিনী হয়ে থাকবেন, নুট হামসুন-এর উপন্যাসে গ্রোথ অফ দ্যা সয়েল-এর মতো, বিভূতিবাবুর আরণ্যক-এর মতো।

ঐশিকা বলল।

-বাবাঃ। আপনি আরণ্যকও পড়েছেন নাকি? বিভূতিভূষণের কী ভাগ্য!

–ইয়েস স্যার।

–সারাণ্ডা বিভূতিভূষণের খুব প্রিয় জায়গা ছিল। বিশেষ করে মনোহরপুর।

–আমরা যাব না?

–যাওয়ার কথা তো আছে। তা বিভূতিভূষণের আর কোনো বই পড়েছেন?

–আর একটা পড়েছিলাম। একটি ভারি মিষ্টি প্রেমের উপন্যাস, নাম দুই বাড়ি। বলেই বলল, আপনি পড়েছেন?

-না তো।

–ওইসব বই স্কুলে থাকতেই পড়েছিলাম। তারপর পড়াশুনোর যা চাপ পড়ল, বাংলার চর্চা আর রাখতে পারলাম কই?

-রাখা উচিত ছিল। কর্বুর বলল।

–জ্ঞান দেবেন না তো মশাই। আমরা মেয়েরা রান্নাঘরে গলদঘর্ম হয়ে সারাদিন আপনাদের জন্যে রান্না করব, দুপুরে যখন আপনারা আপিস-এ গিয়ে রাজা-উজির মারবেন, দরজাতে লাল আলো জ্বেলে আড্ডা মারবেন আর আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি বলবেন, হি ইজ ইন আ কনফারেন্স তখন আমরা শরৎবাবুর উপন্যাস পড়ব বিছানাতে শুয়ে, বাংলা গান শুনব, উত্তমকুমারের ছবি দেখব টিভিতে, বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখব, আর আপনাদের গুরুজনেরা, সাহেব আপনাদের জন্যে পাত্রী দেখতে এসে বেশ বাঙালিআনাতে সম্পৃক্ত মিষ্টি মেয়ে পছন্দ করে যাবেন। না, চিরদিন-ই তো তা হতে পারে না। এখন আমরাই আপিস করব, উপার্জন করব, বাইরের জগৎ সামলাব আর পুরুষেরাই আলু-পোস্ত আর তেল-কই রান্না করে রাখবে আমাদের জন্যে। দুপুরে সুনীল গাঙ্গুলি, দিব্যেন্দু পালিত অথবা শংকরের বাংলা উপন্যাস পড়বে। আমরা ভীষণ-ই টায়ার্ড হয়ে

বাড়ি ফেরার আগে ঘরে এয়ারকণ্ডিশনার চালিয়ে রাখবে, স্নানঘরে গিজার চালিয়ে রাখবে, বাড়ি পৌঁছেলে সেজেগুজে পারফিউম মেখে, আমাদের হাসি মুখে চা করে দেবে, নাইটি গোছ করে রাখবে বাথরুমে। এক্কেবারে সুইটি-পাই নেকুপুষুমুনু আদর্শ স্বামী হবে সব। ঘোরতর বাঙালি। ফুলেল তেল মাখবে মাথায় আমাদের জন্যে।

গৈরিকা বলল, ঠিক বলেছিস তুই। ওয়াক্সিং করবে, হেয়ার রিমুভার ইউজ করবে।

ঐশিকা বলল, দিন পালটাচ্ছে স্যার। বহুহাজার বছরের অব্যেস-টব্যেস সব পালটাতে হবে এবার পুরুষদের। স্বামী এবং স্ত্রী ভূমিকার অদলবদল হবে।

গৈরিকা বলল, কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?

–যারা না শুনতে পায় তারা বদ্ধ কালা। কালের রথের চাকাতে চাপা পড়ে মরা ছাড়া তাদের গতি নেই।

ঐশিকা বলল।

কর্বুর বলল, আমার তো মনে হয়, আর দশ-পনেরো বছরের মধ্যে বিয়ে ব্যাপারটাই অ্যাজ অ্যান ইনস্টিটিউশান আর থাকবেই না, সচ্ছল, উচ্চশিক্ষিত সমাজে। আপনারা মিছেই আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখছেন।

আমরা পুরুষেরা, আপনাদের, আমাদের অমনভাবে হিউমিলিয়েট করার সুযোগ-ই দেব না আর সম্ভবত।

–কেন একথা বলছ তুমি কবু? বিয়ে উঠে যাবে কেন? সেটা মন্দ হবে না?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

-বলছি স্যার...-

-স্যার-স্যার আবার কী...

–না, আপনি কাকুর বস।

–বস তো কাকুর অফিসে। তা ছাড়া আমি তো তোমার বস নই। বরং তুমি আমার বস এখন। তোমার গার্জিয়ানশিপেই তো জঙ্গলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে আমার ডাকনামেই ডেকো। ঘোলা বলেই।

–না। সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। বাধো-বাবধাও ঠেকবে। আমি বরং আপনাকে ব্যানার্জিসাহেব বলেই ডাকব।

-ব্যানার্জিকাকুও বলতে পারো।

–ব্যানার্জিসাহেব-ই ভালো।

–তো এখন বলল, কেন তোমার এরকম মনে হয়?

–আমার একার মনে হয় না। এও কালের-ই যাত্রার ধ্বনি। অদৃষ্টের লিখন। ভবিতব্যং ভবেতব্য। মানুষ বড়োই স্বার্থপর হয়ে যাচ্ছে, বড়োই আত্মকেন্দ্রিক। তার স্বাতন্ত্র্যবোধ এমন ই এক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষিত সচ্ছল সমাজে, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জোয়ার আসার পরে, পুরুষ ও নারীর রুচি এতই বেশি সূক্ষ্ম অথবা স্থূল হয়ে যাচ্ছে, যদিও ভিন্ন ভিন্ন রকম, তাতে এক ছাদের নীচে দু-জন মানুষের বাস করাই মুশকিল হবে। এই প্রগতির গতি রোধ করা না গেলে একটা সময় আসবেই যখন মানুষে আর live together-ও করবে না। মেলামেশা হবে, শারীরিক সম্পর্কও থাকবে। কিন্তু স্ত্রী ও পুরুষে থাকবে আলাদা আলাদা ছাদের নীচে।

গাড়ির মধ্যে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, গম্ভীর গলায়, তোমার তাই মনে হয়?

আজ্ঞে।

বাপি, তোমার গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে, শেষের সে দিন ভয়ংকর ভেবে তুমি মুষড়ে পড়ছ। তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার মেয়েরা তোমার না-থাকা ছেলেদের চেয়েও অনেক ভালো করে দেখবে তোমাকে। তা ছাড়া তুমি তো আমাদের বাবা-ই শুধু নও, তুমি যে আমাদের মা-ও।

-এরজন্যে কি মেয়েদের শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই দায়ী বলে আপনি মনে করেন স্যার?

ঐশিকা ফৌজদারি আদালতের উকিলের মতো প্রশ্ন করল কর্বুরকে।

-না, তা নয়। দায়ী আমি কোনোপক্ষকেই করছি না। দায়ী যদি কারওকে করতে হয় তবে এই সময়কেই করতে হয়। আমরা আগের প্রজন্মের তুলনাতে অনেক-ই বেশি অধৈর্য হয়ে গেছি। যা-কিছুই পাওয়ার, তা আমরা এখুনি চাই। Right now! কোনো কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করার সময় নেই আমাদের। জীবনের সবক্ষেত্র থেকেই ধৈর্য ব্যাপারটা উবে যাচ্ছে। Most Volatile of all Qualities.

বাপিদের সময়ে জীবন এত তো টেনশান-এরও ছিল না। দাম্পত্যজীবন শুরুও হত অনেক তাড়াতাড়ি। পুরুষ রোজগার করত, বাইরেটা সামলাত, আর মেয়েরা আনন্দে সংসার করত, ছেলে-মেয়ে মানুষ করত। পুরুষ ও নারীর ভূমিকাটা কমপ্লিমেনটারি ছিল। আজকের মতো এমন কমপিটিটিভ ছিল না। বাইরেও প্রতিযোগিতা, ঘরের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। সবসময়েই এখন দুজনেই দু-জনের প্রতিযোগী। হারতে কেউই রাজি নয়। হাম কিসিসে কম নেহি মানসিকতা ছিল না। মানিয়ে নেওয়াটা ছেলেবেলা থেকেই মায়েরা শেখাতেন মেয়েদের। মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে কোনোরকম হীনম্মন্যতাও ছিল না। এখন তেমন আর হয় না, তাই সুখী হওয়াটাই ভারি কঠিন হয়ে গেছে।

ঐশিকা বলল, দুঃখ দুঃখ গলায়।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সুখ যে কী, সুখ যে কাকে বলে, তা তো ভুলেই গেছিস তোরা। হয়তো কখনো জানতেও চাসনি। এখন মানুষের জীবনে আরাম আর সুখ এক হয়ে গেছে। সিনোমিনাস। ছেলেবেলায় বাট্রাণ্ড রাসেল-এর বই পড়েছিলাম, তাতে উনি লিখেছিলেন, উই ডু নট স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স, উই স্ট্রাগল টু আউটশাইন আওয়ার নেবারস। আরও চাই আরও আরও। প্রতিবেশীর যা আছে, তার চেয়ে আমার বেশি চাই। তোমাদের চারখানা গাড়ি আছে তো আমার সুখী হওয়ার জন্যে অন্তত পাঁচখানা গাড়ি চাই-ই-চাই। মানুষের পয়েন্ট অফ ভিউই সব গোলমাল হয়ে গেছে। সবকিছু জড়িয়ে মড়িয়ে hotch potch হয়ে গেছে।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতা ছিল না? একটা? যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না।

–ঠিক।

কর্বুর বলল।

তারপর বলল, এই ইউনাইটেড স্টেটস দেশটাই জীবনের সমস্তক্ষেত্রে সারাপৃথিবীর পরিবেশটাকেই দূষিত করে দিল। এইডস-এর চেয়েও মারাত্মক এই রোগ। শব্দদূষণ, বায়ু দূষণ এসব এই মানসিকতার দূষণের সঙ্গে তুলনীয়ই নয়। মানুষ যদি নিজেকেই নষ্ট করে ফেলে তাহলে তার

টাকাপয়সা, বাড়ি-গাড়ি, নির্মল পরিবেশ দিয়ে হবেটা কী?

ঠিক-ই বলেছ তুমি কবু।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

তারপর দুই মেয়েকে একটু ভংসনার সুরেই বললেন, অনেক তত্ত্বকথা হয়েছে। এবারে একটু চুপ করে দু-পাশের দৃশ্য দেখো।

পথের পাশের গাছগুলো দেখিয়ে গৈরিকা কর্বুরকে জিজ্ঞেস করল, এই গাছগুলো কি সব ই শাল?

–অধিকাংশই। সারাণ্ডার শালবন তো বিখ্যাত।

সাহেবরা কি সত্যিই পাহাড়গুলো এক এক করে গুনেছিল যে, সারাণ্ডাকে বলা হয়। ল্যাণ্ড অফ সেভেন হান্ড্রেড হিলস?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

শুনেছি তো তাই।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, গোঁজামিল ব্যাপারটা তো ওদের চরিত্রানুগ ছিল না। ওদের অনেক গুণও ছিল কিন্তু আমরা দোষগুলোকেই বড়ো করে দেখেছিলাম। ওরা চলে যাওয়ার পরে এখন ওদের গুণগুলো দীপ্তি পাচ্ছে।

-তা হবে। আমরা তো আর সেই প্রজন্মের সাহেবদের দেখিনি।

ঐশিকা বলল।

.

০৬.

কুমডি বাংলোটা ছোটো। বনবাংলোর তুলনাতে একটু চাপা। কিন্তু সুন্দর। তবে বনবাংলোর যা সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, চওড়া বারান্দা তা এই বাংলোতে নেই। কেন নেই, তা জানে না। কর্বুর।

বাংলোর সামনে থেকেই পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নদীতে। সেই নদীর ওপর বাঁধ বাঁধা হয়েছে একটা। ছেলেবেলাতে যখন আসত তখন বাঁধ ছিল না। ওই পথ-ই চলে গেছে থলকোবাদ।

কুমডিতে পৌঁছোতে পৌঁছোতে দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল। ভালো-মন্দ খেতে খেতে আরও দেরি। শুধু বনভ্রমীই তো নন ওঁরা, বনভ্রমণ কাম চড়ইভাতি করতেই এসেছেন। এঁদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলে লাভ নেই যে, বনভ্রমণ আর বনভোজন এক নয়। বললে, ভাববেন জ্ঞান দিচ্ছে। এমনিতে তো জ্ঞানদাতা উপাধি পেয়েই গেছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ব্যানার্জিসাহেব শুয়েছেন। তিনটি ভদকা খেয়েছিলেন

গন্ধরাজ লেবু দিয়ে। তারপর সুগন্ধি ভাত, বেগুনভাজা, ভাজা মুগের ডাল, নারকোল-কুচি দেওয়া, পাহাড়ি নদীর পাড়হেন মাছ ভাজা মুচমুচে, বড়োবিল থেকে আনা কচি-পাঁঠার মাংস, হাতুহাতুর দোকানের রাবড়ি।

ঘুম, কর্বুরেরও পেয়েছিল। কারণ, খেতে বসে দুই কন্যা তো শুধু গন্ধ শুঁকেই উঠে গেলেন, ফিগার-কনশাস এমন-ই। জমিয়ে খেলেন ব্যানার্জিসাহেব আর কর্বুর-ই। তা ছাড়া গতরাতের নাটকের পর আলাপ-আলোচনাতে এবং বাড়ি ফিরেও খাবার টেবিলে বসে বাবা, মা আর কাকির সঙ্গে গল্প করতে করতে খেতে অনেক-ই দেরি হয়েছিল।

কাল সারারাত যেন এক ঘোরের মধ্যে ছিল। রূপমতী-রূপী শিখীর প্রসাধিত আলো-পড়া মুখটি রাতে বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে। সে কাল একটা পারফিউম মেখেছিল তার নাম নাকি রেড ডোর রেড ডোর-এর সুগন্ধে ম ম করছিল শিখী। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যেই অনেকজন মেয়ে থাকে বোধ হয়। এক এক সময়ে এক এক জন বাইরে আসে। সেই বিভিন্নরূপী বিভিন্ন সত্তার কোন জনের হাতে যেকোনো পুরুষ কখন অনবধানে বধ হবে তা একমাত্র বিধাতাই জানেন। পুরুষমাত্রের-ই যা দুর্বলতা, তাই নারীমাত্রেরই বল। একটু দেখা, একটু ছোঁয়া, একটু বিলোল চাউনি, একটু হাসি, একটু অভিমান দিয়ে যেকোনো নারী অবহেলে যেকোনো পুরুষকে বধ করতে পারে। এ বিধাতার-ই চক্রান্ত। পুরুষকে ভঙ্গুর করে তিনিই গড়েছেন। আসলে Fragile মেয়েরা নয়, পুরুষেরাই।

শিখীকে কাকির কেন অত অপছন্দ বোঝে না কর্বুর। কর্বুরের তো খারাপ লাগে না মেয়েটিকে। তা ছাড়া তাদের শিকড়ও এ অঞ্চলে পোঁতা। এই প্রাকৃতিক পরিবেশে লোহা আকরের নীল আর ম্যাঙ্গানিজ আকরের লালের গুঁড়ো এবং নদীর বুকের সোনার গুঁড়ো নিয়ে খেলা করেছে ছেলেবেলাতে। শাল, মহুয়ার ছায়াতে ঘুরেছে। সারহুল উৎসবে হো-মুণ্ডাদের সঙ্গে নেচেছে। ছোট্ট কিন্তু নিরুপদ্রব শান্ত এক জগতে নির্মোকের মধ্যে মানুষ হয়েছে। দিল্লি আহমেদাবাদে পড়তে যায়নি। বড়ো চাকরিও করবে না। ঘরোয়া বউ হবে। স্বাবলম্বনের নেশাতে মেতে অজানিতে উদ্ধত হয়ে উঠবে না। সে হয়তো খুশি হবে পরনির্ভরতাতেই। তার স্বামীর স্ত্রী, হাউসওয়াইফ বলে পরিচয় দিতে সে, লজ্জিত হবে না। কর্বুরের সন্তানের মা হবে। কর্বুরের পছন্দসই রান্না করবে ছুটির দিনে। কর্বুরও তার হাউসওয়াইফ স্ত্রীর সবরকম সুখবিধান করবে। দু-জনে একসঙ্গে কবিতা পড়বে, রবীন্দ্রসংগীত গাইবে, আলুচাট এবং ঘুগনি খাবে। দু-জনেই দু-জনের ওপর প্রচন্ড নির্ভরশীল হবে। নির্ভরতা তো শুধু আর্থিক-ই হয় না, কত ব্যাপারেই মানুষ পরনির্ভর হয়।

আগেকার দিনে স্বামীরা রোজগার করত আর স্ত্রীরা ঘর সামলাত। দু-জনের সুস্থ ও খুশি দাম্পত্যজীবন, অবসর, হাসিগল্পের সময়, ছেলেমেয়েদের নিজের পছন্দমতো মানুষ করে তোলাতেই তাদের সব আনন্দ-আহ্লাদ ছিল। সন্তানদের মানুষ করার শিক্ষা নিয়েই ভাবতেন তাঁরা, তাদের নিছক টাকা রোজগারের মেশিন করে তোলাই একমাত্র উদ্দেশ্য

ছিল না। অর্থ আর সুখ যে সমার্থক নয়, এইসব কথা আজকালকার কম ছেলেমেয়ে এবং তাদের মা বাবারাই বোঝেন। কর্বুরের মনে হয়, বিয়ের পরে সুখী আমাদের হতেই হবে, দু-জনের দু জনকে মেনে নিতেই হবে, To burn the bridges behind অ্যাটিটিউড নিয়েই দম্পতিকে এগোতে হবে বিয়েকে সফল করার জন্যে। তাহলেই কথায় কথায় ছাড়াছাড়ি– বিচ্ছেদ হবে না। বিধাতা আর কোন মানুষকে সর্বগুণসম্পন্ন করে গড়েছেন? একজনের মধ্যে অন্যজন যা চায় তার সব সে কখনোই পাবে না, এটা মেনে নিয়েই অস্বস্তিটুকুকে মানিয়ে নিতে হবে। কিন্তু গৈরিকা ঐশিকারা এতই উচ্চশিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম, তাদের কি অত ধৈর্য থাকবে মানিয়ে নেওয়ার? হাম কিসিসে কম নেহি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চললে সম্পর্কটা চিরদিন-ই প্রতিযোগিতার-ই থাকবে, পরিপূরক হয়ে ওঠা হবে না কখনোই একে অন্যের একজীবনে।

গৈরিকা শুয়েছে বাবার পাশে। বাবাকে ছেড়ে কিছুদিন পরেই চলে যাবে বলেই হয়তো বাবার একটু বেশি কাছে থাকতে চায় সে। কে যে কী করে, কেন করে, তা তো সে নিজে ছাড়া অন্য কেউই বোঝে না।

কর্বুর, বাংলোর গেট থেকে একটু দূরে মহুয়াগাছের নীচে একটা ইজিচেয়ার চৌকিদারকে দিয়ে আনিয়ে নিয়ে তাতে বসে আছে। তার কোলে রামচন্দ্র গুহর লেখা Savaging. The Civilized বইটি খোলা আছে। ভেরিয়ার অ্যালউইনের ওপরে লেখা বই। শিখীই বইটি দিয়েছে

কবুকে। মহড়া চলাকালীন।

এ ক-দিন, মানে, যতদিন মহড়া চলেছিল মহড়া নাটকের, ততদিন যেন একটা নেশার মধ্যেই ছিল ও। নাটক মঞ্চস্থ হয়ে যাওয়ার পরে দুর্গাবাড়ির মন্ডপ খোলার সঙ্গে সঙ্গে সব-ই কেমন ফাঁকা-ফাঁকা। গোরু চরবে বাইরে, দুর্গাবাড়ির ভেতরে চড়ুইদের সভা, মাঝে মাঝে দাঁড়কাক অঙ্কের মাস্টারমশাইয়ের মতো এসে চড়ুইদের তাড়া দিয়ে যাবে। তেমন-ই হচ্ছে আজ নিশ্চয়ই।

চোখদুটো খোলা বইয়ের পাতাতে নিবদ্ধ ছিল কিন্তু বইয়ের পাতা সে দেখছিল না। দেখছিল, একটি কাঠবেড়োলি শরতের দুপুরের নরম রোদে কোথা থেকে কী একটা ফল নিয়ে এসে তাকে কবজা করার চেষ্টা করছে। রোদ আর ছায়ার ঝিলিমিলি চলছে নদীর জলে, ঘাসে পাতায়। বর্ষার পরে জল পেয়ে মহুয়াগাছের শাখাতে-উপশাখাতে পাতাগুলো সতেজ সবুজ হয়েছে। চোখ বইয়ের ওপরে পড়ছিল মাঝে মাঝে কিন্তু মন তার ঘাসফড়িং-এর মতো সেই আলোছায়ার শতরঞ্জির ওপরে এক্কা-দোক্কা খেলছিল। একা-একা।

হঠাৎ-ই চমকে উঠল, কী করছেন? শুনে।

দেখল, ঐশিকা।

কখন যে গেট খুলে এতটা হেঁটে এসেছে, শব্দ পায়নি। শীত বা গ্রীষ্ম হলে

শুকনো পাতার মচমচানি শুনতে পেত।

ওকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠল কর্বুর।

বলল, বসুন।

ঐশিকা হাসল।

রহস্যময়ী হাসি।

সেই প্রথমবার ভালো করে লক্ষ করল কর্বুর ঐশিকাকে। খাবার টেবিলে ও পাশে বসেছিল। যে পাশে থাকে, তাকে ঠিকমতো দেখা যায় না। খাওয়ার টেবিলে অথবা জীবনেও। একে অন্যের মুখোমুখি হতে হয়। এই সত্যটা হঠাৎ হৃদয়ংগম করল ও।

-কী বই এটা?

–Savaging The Civilized.

–কার লেখা?

রামচন্দ্র গুহ।

প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে ঐশিকা বলল, আপনি খাবেন?

–কী?

–হজমি।

–না।

–একটা না হয় আমার অনুরোধে খেলেন-ই।

–দিন। আপনারা দু-বোন দুপুরে খেলেন তো না, যেন শুকলেন। ওই খাবার হজম করার জন্যেই হজমি খেতে হচ্ছে?

-হজম করার জন্যে নয়।

–তবে খাচ্ছেন কেন?

–অব্যেশ।

ইচ্ছে করে স-কে শর মতো উচ্চারণ করল।

ঐশিকা বলল, ইজিচেয়ারে না বসেই।

বলল, আপনি না বসলে, এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো আমায় চলেই যেতে হয়। নাটক করে করে নাটুকে হয়ে গেছেন।

তারপর-ই বলল, আচ্ছা আমি না হয় ইজিচেয়ারের হাতলটার ওপরেই

বসছি। যা লম্বা হাতল। ভেঙে যাবে না তো?

–ভাঙবে না। তবে হাতল না বলে পাতোল বলাই ভালো। সাহেবরা শিকার করে এসে ক্লান্ত হয়ে এই হাতলটা লম্বা করে দিয়ে পা তুলে দিয়ে আরাম করত।

–পা তুলে দিলে আরাম হয় বুঝি?

–হয় না? ব্লাড সার্কুলেশন রিভার্সড হয় তো। আরাম হতেই হবে। যেদিন থেকে হাঁটতে শিখি আমরা সেদিন থেকেই তো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ক্রমাগত রক্তকে টানছে নীচের দিকে। পা তুলে থাকলে হৃদয় আরাম পায়।

জিভ দিয়ে হজমিটাকে মুখের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে ঐশিকা হঠাৎ টাক করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করল। আশ্চর্য! কাঠবেড়ালিটা এতক্ষণ ওদের কথাতে ভয় পায়নি একটুও। ওই টাক শব্দতেই ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গিয়ে একটা আমলকী গাছে উঠে গেল।

–কী সুন্দর! না?

ঐশিকা সেদিকে তাকিয়ে বলল।

ঐশিকা একটু পরে বলল, সত্যি। আপনি কত জানেন। এমন জ্ঞানী পুরুষমানুষ আগে কখনো দেখিনি। এতদিন ভাবতাম, আমার বাপিই

একমাত্র জ্ঞানী।

–আপনার বাপি কি পুরুষমানুষ নন?

–বাপি পুরুষমানুষ ছিলেন নিশ্চয়ই আমার মায়ের কাছে। আমার কাছে তিনি শুধুই বাপি। উভলিঙ্গ। বাবাও বটে মাও বটে।

তারপর বইটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতেই দেখতে পেল যে, শিখী দিয়েছে বইটা কর্বুরকে।

–শিখী কে?

–মার রূপমতীর ভূমিকাতে যে মেয়েটি অভিনয় করেছিল। বললাম না আসার সময়ে!

–ওঃ। শি ইজ ভেরি গুড। দেখতেও যেমন সুন্দরী অভিনয়ও তেমন-ই ভালো করেন।

–আমার তো ধারণা মেয়েমাত্রই ভালো অভিনেত্রী।

–তাই?

–হুঁ।

-কেন মনে হয়?

–মনে হয়।

–বোকা বোকা হল কথাটা। আপনার মতো বুদ্ধিমানের মুখে মানাল না।

–আমি বুদ্ধিমান সেকথা আপনাকে কে বলল?

–বলেছেন অনেকেই।

–কে বলুন না?

তাদের মধ্যে একজন পদ্মাদি।

কাকির মতটা মত বলে ধর্তব্য নয়।

–আমি অন্যের মতে সায় দিই না কখনো। নিজের মতেই চলি।

–তাহলে বলছেন কেন?

–বলছি, নিজের মতটাও তাই বলছে বলে।

-কেন?

–আপনার মুখ-ই বলে যে, আপনি বুদ্ধিমান, আপনার চোখ, আপনার

কথাবার্তা। কী পুরুষের কী নারীর, বুদ্ধির প্রসাধনের মতো কোনো প্রসাধন-ই আর নেই। বুদ্ধিই আপনার মুখটিকে প্রসাধিত করেছে।

–আপনারও।

–তাই? ভাগ্যিস বললেন।

–আপনি তো দেখছি খুব ওভার-কনফিডেন্ট নিজের সম্বন্ধে।

–নিজেদের ওপর কনফিডেন্স-এর অভাবেই তো মেয়েরা এত হাজার বছর ধরে আপনাদের তাঁবেদারি সয়েছে, এখনও সইছে ইসলামিক সব রাষ্ট্রে, তাই কনফিডেন্সটা মেয়েদের পক্ষে অত্যন্তই জরুরি।

ঐশিকা একবার ইজিচেয়ারের ডান হাতলে আর একবার বাম হাতলে বসছিল।

–আপনি তো ভারি চঞ্চল। মনে হয় কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্রী।

-তাই? ভালোই তো। যতদিন ছোটো থাকা যায়। বড়ো আর বুড়োর মধ্যে বিশেষ তফাত আছে কি? আজ যে বড়ো, কাল সে বুড়ো।

উত্তর না দিয়ে তাকিয়েছিল কর্বুর ঐশিকার দিকে।

বাঙালির তুলনায় বেশ লম্বা সে। একটা সাদা-কালো ডুরে তাঁতের শাড়ি

পরেছে। সাদা ব্লাউজ। শ্যাম্পু করা প্রায় হাঁটুসমান চুল মেলে দিয়েছে পিঠের পরে। কালো টিপ পরেছে একটা। অ্যানোডাইজ করা লোহার একটা মটর মালা গলাতে। ওইরকম-ই বড়ো বড়ো দানার বালা বাঁ-হাতে। ডান হাতে কালো ব্যাণ্ডের সাদা ডায়ালের হাতঘড়ি। দারুণ একটা খুশবু উড়ছে। তা ঐশিকার চুল থেকে, না মুখ থেকে, না কানের লতি থেকে, না স্তনসন্ধি থেকে বুঝতে পারছে না কর্বুর। কিন্তু খুশবুটা উড়ছে বিলক্ষণ।

শিখীর পারফিউমের কথা মনে হল কর্বুরের। Red door। কিন্তু এই গন্ধটা আরও অনেক গাঢ়, প্রায় ঐন্দ্রজালিক।

-কী পারফিউম মাখেন আপনি?

–আমি ভারতীয় নারী। আতর মাখি। জীবনে বিদেশি পারফিউম মাখিনি।

–সত্যি?

–এটা আতরের গন্ধ? কী নাম এই আতরের?

–ভালো লেগেছে আপনার?

হুঁ।

-এর নাম ফিরদৌস। ভালো লাগলেই ভালো। পৃথিবীর সব গন্ধই তো পরপ্রত্যাশী।

–অনেকরকম হয় বুঝি আতর?

–নিশ্চয়ই। এক এক ঋতুতে এক এক আতর মাখতে হয়। তবে নিজের নিজের রুচি মতোই মাখতে হয়। যেমন আপ রুচিসে খানা, পর রুচিসে পিনা তেমন-ই প্রেমিক বা প্রেমিকা যে, গন্ধ ভালোবাসে সেই সুগন্ধিতে সুরভিত হওয়াই রেওয়াজ।

-যখন প্রেমিক বা প্রেমিকার মন জানা থাকে না?

হেসে ফেলে ঐশিকা বলল, তখন আপ রুচিসে। যেমন, আমি মেখেছি।

কর্বুর লক্ষ করল যে হাসলে, ঐশিকাকে আরও অনেক বেশি সুন্দরী লাগে।

-কী কী আতর হয়?

জিজ্ঞেস করল কর্বুর।

–কতরকম। গরমে খসস, হিম্বা, গুলাব, শীতে অম্বর, মুশক, বসন্তে রাত-কি রানি, জুঁই আরও কতরকম আছে।

-কেনেন কোত্থেকে?

-আতরওয়ালা আসে জৌনপুর থেকে বছরে একবার। দিল্লি, মুম্বাই, আগ্রা,

লক্ষ্ণৌ, ভোপাল, হায়দরাবাদ, ইলাহাবাদ নানা জায়গাতেই পাওয়া যায়। যে শহরেই একটি করে চাঁদনি-চওক আছে সেই শহরেই জানবেন আতরের দোকানও আছে অনেক। এটা তো মুসলমানি সংস্কৃতি। আসলে খাওয়া-দাওয়া, গান-বাজনা, শিল্প-টিল্প, সুরভি-টুরভির চর্চা মুসলমানেরাই হিন্দুদের চেয়ে অনেক-ই বেশি করেছে। রাজা-মহারাজাদের চেয়ে নবাব বাদশাদের দাপট তো প্রবলতর ছিল দিল্লির দরবারে।

বলেই বলল, বাঃ। দারুণ লিখেছে তো আপনার শিখী?

–কী?

অবাক হয়ে বলল কর্বুর।

কর্বুরদা, কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে–শিখী।

–কই? তাই লিখেছে বুঝি? দেখি।

অবাক এবং একটু লজ্জিত হয়ে বলল কর্বুর।

দেখুন।

বলে, বইটা এগিয়ে দিল কর্বুরের দিকে।

তারপরেই বলল, বেচারি শিল্পী। যাকে এমন ট্যানজেন্ট-এ প্রেম নিবেদন

করল সেই জানল না। হতভাগিনী আর কাকে বলে।

কর্বুর রেগে গেল।

বলল, প্রেম নিবেদন করবে কেন? নিশ্চয়ই কারও কবিতা কোট করেছে।

তা তো নিশ্চয়ই। নিজমুখে যে কথা বলতে সংকোচ হয় সেকথা পরের গাওয়া গান বা লেখা কবিতা দিয়েই বলে এসেছে চিরদিন-ই মানুষ একে অন্যকে। তবে কবিতা নয়, ওটি একটি গান। এবং অবশ্যই প্রেমের গান। আপনিই তো বললেন...।

তারপর একটু থেমে ভেবে বলল, আপনিই বললেন কি? না, পদ্মাদি? যে শিখী আগ্রা ঘরানার হেরম্ব চ্যাটার্জির কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শেখে।

বলেই বলল, কিন্তু ওই গানটি তো উচ্চাঙ্গ সংগীত নয়।

-তবে? নিম্নাঙ্গ-সংগীত?

কর্বুর বলল।

খুব জোরে হেসে উঠল ঐশিকা। ওর উচ্চকিত হাসি শুনে কাঠবেড়ালিটা আমলকী গাছ। থেকে নেমে এসে কিছুটা দৌড়ে গিয়ে একটা কেলাউন্দার ঝোঁপের মধ্যে ঢুকে গেল।

-এইজন্যেই বিজ্ঞজনেরা বলেন যে, কখনো রেগে উঠতে নেই। তবে যাই হোক, রাগের মাথায় বলে ফেলা আপনার কথাটা এবারে চালু করে দেব। নিম্নাঙ্গ সংগীত। দারুণ।

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, ওই গানটা শোনায়নি আপনাকে শিখী কখনো?

না তো।

–শুনবেন? আমি জানি। শিখীর তরফে আপনাকে শোনাতে পারি যদিও শিখী জানতে পারলে রাগ করবে হয়তো।

-কেন? রাগ করবে কেন?

–বা, তার তূণের তির আমার...

–আপনি বড়োই ফেনিয়ে তোলেন।

বিরক্তির গলাতে বলল কর্বুর।

–কী করব। নিস্তরঙ্গ জলে ঢেউ তুলতে হলে কিছু তো একটা করতে হয়ই।

কর্বুর বুঝতে পারছিল যে, ভেতরে ভেতরে সে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। ঐশিকা সত্যিই সুন্দরী। এতখানি সুন্দরী যে, তা আশ্চর্য! আগে একটুও বুঝতে পারেনি। তা ছাড়া সুন্দরীই শুধু নয়, প্রচন্ড রসবোধসম্পন্ন এবং রীতিমতো বুদ্ধিমতীও। দুষ্টুও আছে বেশ। কর্বুরের কলেজের বন্ধু বিনোদানন্দন পান্ডে মেয়েদের মধ্যে যে, গুণটিকে নামকিন বলত সেই গুণটিও তার মধ্যে যেন অধিক পরিমাণেই বিদ্যমান। সত্যি কথা বলতে কী, ঐশিকা যে কেন কাকিকে এমন করে বশ করেছে এখন তা বুঝতে পারছে একটু একটু। এতদিন বেশি মেয়েদের সঙ্গে মেশেনি যে কর্বুর, তা ঠিক-ই, মেয়েদের সম্বন্ধে তেমন কোনো বিশেষ আকর্ষণ বা ঔৎসুক্যও ছিল না। কাকিই ছিল তার ধারণা, মেয়েদের সম্বন্ধে। ঐশিকা যেন প্রথম বর্ষার ঝরনার বান-এর মতো সেইসব ধ্যান-ধারণা ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের নীচের মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে। সবচেয়ে ভাবনার কথা, এ পর্যন্ত অন্য কারওকেই দেখে বা কারও সঙ্গেই মিশে এমন শারীরিক আকর্ষণ বোধ করেনি আগে। ভেতরে ভেতরে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে, নিজের সম্বন্ধে বেশ উচ্চধারণাসম্পন্ন কর্বুর সেন।

কর্বুর চুপ করেই ছিল।

শরতের দুপুর। প্রকৃতির মধ্যে বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, বুনোহাঁস যেমন অবলীলায় নদীর বালি ছেড়ে জলে নামে এতটুকু ঢেউ না তুলে, তেমন করে। একটা কপারস্মিথ পাখি ডাকছে। নদীর এপার থেকে। স্যাকরার

মতো ঠুকঠাক করছে। আর ওপার থেকে তার দোসর সাড়া দিচ্ছে। আর একটু বেলা পড়ে এলেই র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো তাদের ধাতবগলার তীক্ষ্ণডাক ডাকতে শুরু করবে। দিনশেষে নদীর ওপরে চমকে চমকে ডেকে বেড়াবে ওয়াটেলড ল্যাপউইঙ্গ।

সেইসময়ে হঠাৎ-ই একঝাঁক বুনোহাঁস নদীর বাঁধের জলে উড়ে এসে বসল।

–ওগুলো কী পাখি?

ঐশিকা শুধোল।

-জলের পাখি। বুনোহাঁস।

–নাম কী?

–কটন টিল।

–কোথায় ছিল?

কে জানে?

–প্রতিবছর শরতের গোড়া থেকেই ওরা পৃথিবীর সব শীতার্ত দেশ থেকে উড়ে আসতে আরম্ভ করে আমাদের দেশে।

-কেন আসে?

–একটু উষ্ণতার জন্যে।

-তাই? হাঁসেরাও মানুষদের-ই মতো তাহলে।

–ওই নামের একটি উপন্যাস আছে। পড়েছেন কি? ম্যাকলাস্কিগঞ্জের পটভূমিতে লেখা। আমার খুব প্রিয় উপন্যাস।

কর্বুর সামনে বসে থাকা ঐশিকার চোখে চেয়ে বলল।

-তাই? কিন্তু পড়িনি।

–তারপর-ই কথা ঘুরিয়ে ঐশিকা বলল, স্যার বইটা পড়ে ফেলুন।

–স্যার কেন? আমি কি মাস্টারমশাই?

–না সেজন্যে নয়। আমি যে, টিভি কোম্পানিতে জয়েন করছি একমাস বাদে, সেখানকার নিয়ম রপ্ত করছি। আমার মালকিন বলে দিয়েছেন, যাকেই ইন্টারভিউ করতে যাবে তিনি গোরু-ছাগল হোন কী প্রচন্ড প্রতিভাধর, সকলকেই স্যার বলে সম্বোধন করবে। অথবা ম্যাডাম। আর সবসময়েই পুরুষদের একটা বিশেষ দূরত্বে রাখার চেষ্টা করবে। পুরুষেরা হনুমানের জাত। দড়ি ঢিলে দিলেই ঘাড়ে এসে উঠবে। বিশেষ করে কবি সাহিত্যিকেরা। খুব সাবধানে হ্যাণ্ডল করবে তাদের।

-তার সঙ্গে আমার কী?

–না। বললাম-ই তো, স্যার বলাটা প্র্যাকটিস করছি আর কী।

তারপর বলল, ওই হাঁসেরা কোন কোন দেশ থেকে আসে?

–কত দেশ। সাইবেরিয়া, রাশিয়া, বেলো-রাশিয়া, নর্ডিক-কান্ট্রিজ। প্রতিবছর-ই আসে আবার গরম পড়বার আগে আগেই ফিরে যায়। সব পরিযায়ী পাখি এরা।

পরিযায়ী মানে কী?

-মানে?

–মানে কী?

–ও। ইংরেজি প্রতিশব্দ না বললে তো আজকালকার উচ্চশিক্ষিত বাঙালিরা মানে ববাঝেন না অনেক বাংলা শব্দের-ই। কী বিপদের কথা।

–ওঃ। আপনি বাপিকেও হার মানাবেন দেখছি সার্মোনাইজিং-এ।

কর্বুর বলল, মাইগ্রেটরি। Migratory। বানান করে বলল তারপরে।

-কী কী হাঁস আসে?

-বললাম না, কত হাঁস। গার্গনি, পিনটেইল, ম্যালার্ড, পোচার্ড, পিংক-হেডেড পোচার্ড, গিজ, শোভেলার, বাহমিনি ডাকস, যাকে সংস্কৃতে বলে চক্রবাক আর বাংলাতে চখাচখি আরও কত পাখি।

–আপনি পাখি সম্বন্ধে যত জানেন গোরু-ছাগলদের সম্বন্ধেও কি ততই জানেন?

কর্বুর সাবধান হয়ে গেল।

-বলল, হঠাৎ এই প্রশ্ন?

না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। পরক্ষণেই বলল, কিন্তু এখানে জল কোথায়?

–এই সাতশো পাহাড়ের দেশে আকাল তো আছেই, এইসব জলের পাখি, জলা জায়গাতেই আসে, নানা হ্রদ-এ, ঝিলে-বিলে-বাদায়। ডাঙার পাখিও আছে অনেক, পরিযায়ী, মানে মাইগ্রেটরি। সারাণ্ডায় কোয়েল, কারও, কয়না ছাড়া নদী নেই। আর সেও সব পাহাড়ি নদী। জলের পাখি এখানে বেশি আসবে কেন?

-উষ্ণ হয়ে গেলেই তারা আবার ফিরে যায়?

–হ্যাঁ তাই। শুধু পাখিই কেন। মানুষও তো একটু উষ্ণতার জন্যেই ঘুরে মরে সারাজীবন।

-তা ঠিক। কিন্তু আমি আবার এমন মানুষও দেখেছি, বিশেষ করে পুরুষমানুষ, তারা তপ্ত খোলাতে হর্স-চেস্টনাট-এর বীজের মতো ভাজা হওয়ার পরও তাদের শীত কাটে না।

কর্বুর ঐশিকার দেওয়া বাম্পারটা খেলবে ঠিক করল। বলল, প্রয়োজনের তুলনাতে এবং বয়েসের তুলনাতে আপনার অভিজ্ঞতা একটু বেশি হয়ে গেছে। আপনার সারল্য চলে গেছে। আপনি টোটালি কনফিউজড হয়ে গেছেন। ব্যানার্জিসাহেব আপনাকে আদরে একেবারে গোবর করেছেন।

–অসার অথবা অসাড় যারা, তাদের তো ফুল-ফোঁটাবার জন্যে গোবরের সার-ই লাগে। কি? লাগে না?

কর্বুর চুপ করে থাকল।

–কী জ্যাঠামশায়ের মতো হাতল ইজিচেয়ারে বসে আছেন আপনি। চলুন-না নদীর দিকে একটু বেড়িয়ে আসি। চৌকিদার তো বলছিল, অন্ধকার হলেই গেট থেকে বেরোনো মানা।

-রাতে, জিপে করে বেরোব আপনাদের নিয়ে। সঙ্গে স্পটলাইট নিয়ে এসেছি। অনেক কিছু জানোয়ার দেখতে পাবেন।

-তাই? কিন্তু সে তো রাতে। আর্টিফিশিয়াল আলোতে। দিনের বেলায় দেখার মতো আনন্দ তো হবে না।

–তা হবে না। কিন্তু আপনি যতই সুন্দরী হোন না কেন, জানোয়ারদের তো আপনার প্রতি কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আপনাকে দেখতে বা দেখা দিতে তারা আড়াল ছেড়ে বেরোবে কি? তা ছাড়া এইসব অঞ্চলে হাতি অনেক। এবং ভাল্লুকও। এরা আনপ্রেডিকটেবল। প্রতিবছর-ই অনেক মানুষ মারা যায় এখানে তো বটেই, কিরিবুরু, গুয়া, মেঘাতিবুরু, নোয়ামুন্ডির খাদান এলাকার আশেপাশে।

–ধ্যুৎ। আপনি একটি রিয়্যাল জ্যাঠামশাই। ভয়েই মরলেন। আমি একাই যাচ্ছি।

–এখানে চুপ করে বসুন। বনের মধ্যে কতরকম শব্দ, গন্ধ, শুনুন, অনুভব করুন। জানেন কি? দেখা দুরকম হয়। এক, নিজে দৌড়ে বেরিয়ে দেখা আর দুই...।

বাংলোর গেট থেকে গৈরিকা চেঁচিয়ে বলল–ওই। তুই ওখানে। আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা মানুষ তো তুই।

-তুইও আয় না দিদি।

গলা তুলে বলল, ঐশিকা।

তারপর বলল, তারপর?

-তারপর কী?

–ওই যে বলছিলেন, দুরকম দেখার কথা। দ্বিতীয়রকম দেখার কথা তো বললেন না।

–ও হ্যাঁ।

–নিজে বসে থেকেই যা কিছু দেখার, শোনার, গন্ধ নেওয়ার, সেসবকেই ধীরে ধীরে নিজের কাছে উঠে আসতে দিতে হয়, শীতের রাতে কুয়াশা যেমন নীচের খাদ থেকে ধীরে ধীরে উপরে উঠে আসে তেমনি করেই প্রকৃতিও তার সব রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ নিয়ে আলতো পায়ে এসে আপনার কাছে ধরা দেবে, নিঃশর্তে।

ঐশিকা হাততালি দিয়ে উঠল।

চমকে উঠল কর্বুর।

গৈরিকা কিছুটা এগিয়ে এসেছিল, বলল, কী হল?

–কী হল না, তাই বল। আরে ইনি তো পোয়েট। যা একখানা বর্ণনা দিলেন না। দ্বিতীয়রকম দেখার।

-কী বলছিস কী?

গৈরিকা আরও এগিয়ে এসে কর্বুরকে বলল, হাই।

-হাই!

বলল, কর্বুর।

-বাবা : আপনিও দেখি আমেরিকান হয়ে গেলেন। দিদি না হয় আমেরিকা যাবে বলে যাকে তাকে হাই! হাই! বলে প্র্যাকটিস করছে।

–চাকরি করবেন বলে আপনিও যেমন যাকে তাকে স্যার বলে যাচ্ছেন।

কর্বুর বলল।

ঐশিকা হেসে বলল, আহা। উপায় কী আছে? ভালো চাকরি। দারুণ স্যালারি দেয়। চাকরিটা রাখতে হবে তো। তাই স্যার বলা প্র্যাকটিস করছি। দোষ হয়েছে কি?

–কীরে! তুই এখনও আপনি-আজ্ঞে করে যাচ্ছিস? ব্যাপার তো ভালো মনে হচ্ছে না।

–কী করা যাবে। উনি যে স্যার।

ঐশিকা বলল।

কর্বুর বলল, দূরে রাখাই ভালো আপনি আজ্ঞে করে। পুরুষমাত্রই তো হনুমানের জাত।

-ওকথা তুই ওঁকেও বলেছিস।

–কথাটা আমার নয়, আমার মালকিনের।

–সত্যি, ওই, তুই ইনকরিজিবল। তুই এসেই, ওঁর সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিস?

খুব-ই ঝগড়াটি বুঝি উনি?

কর্বুর, গৈরিকার দিকে চেয়ে বলল।

–সে আর বলতে। সেই ছেলেবেলা থেকেই।

–মেয়েবেলা বল দিদি।

–ওই হল।

–লক্ষণসমূহ দেখে তো মনে হচ্ছে মেয়েবেলা শেষ হয়নি এখনও।

কর্বুর বলল।

ঐশিকা বলল, এখন-ই শেষ হবে কী? সারাজীবন ধরে চলবে আমার

মেয়েবেলা। আমি কোনোদিন বুড়ি হব না।

বলেই, গৈরিকাকে বলল, দিদি, তুই আমাকে বলছিস। আমার কী দোষ বল? আমি ওঁকে এদিক ওদিক খুঁজে দেখি, আমাদের ছায়া পাছে মাড়াতে হয়, তাই উনি বাংলা থেকে এতদূরে এই পেল্লায় গাছের নীচে হাতল-দেওয়া ইজিচেয়ারে বসে কোলের ওপরে একটা বই রেখে উদাস হয়ে চেয়ে আছেন দূরে। ছবিটা ভালো লাগল। নানারকম পাখি ডাকছে। কাঠবিড়ালি দৌড়াদৌড়ি করছে, সুগন্ধ থমথম করছে চারদিকে, তারইমধ্যে স্যার এত উদাস কেন তাই দেখতে এসে কারণটা আবিষ্কার করলাম।

–কী কারণ?

গৈরিকা একইসঙ্গে ঐশিকা আর কর্বুরের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল।

–কারণটি ওই বইয়ের মধ্যে আছে। শিখী, ওরফে মার রূপমতী স্যারকে লিখেছেন : কর্বুরদা, কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে।

–তাতে তোর কী হয়েছে?

দিদিগিরি ফলিয়ে গৈরিকা দেড় বছরের ছোটোবোনকে বলল।

–আমার কিছুই হয়নি। কিন্তু হতে তত পারত।

–এমন হেঁয়ালি কথা আমার ভালো লাগে না। আপনার লাগে?

উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই বলল, কর্বুর কারও নাম হয়? বলব বলছিস? আমিও স্যার?

-বলছিই তো।

–যদি বেঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেন।

–দেন তো দেবেন। যদির কথা নদীতে ফ্যাল। আমি তাহলে স্যারের মনের অবস্থাটা বর্ণনা করার জন্যে রবে ঠাকরের একটা গানই গেয়ে ফেলি।

–রবে ঠাকরেটা আবার কী ব্যাপার?

–মহারাষ্ট্রের বাল ঠাকরে আর আমাদের রবে ঠাকরে। দুই জাতের আইডেন্টিফিকিশেন মার্ক। বলেই, গান ধরে দিল ঐশিকা

হেলাফেলা সারাবেলা একী খেলা আপন সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে-মুখখানি কার পড়ে মনে।
আঁখির কাছে বেড়ায় ভাসি কে জানে গো কাহার হাসি।
দুটি ফোঁটা নয়নসলিল রেখে যায় এই নয়নকোণে।
কোন ছায়াতে কোন উদাসী দূরে বাজায় অলস বাঁশি,
মনে হয় কার মনের বেদন ভেসে বেড়ায় বাঁশির গানে।
সারাদিন গাঁথি গান কারে চাহে, গাহে প্রাণে

তরুতলে ছায়ার মতন বসে আছি ফুলবনে।

গান শেষ হলে তিনজনেই অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল।

গান, যদি তেমন ভালো গাওয়া হয়, তবে তার অভিঘাত চুমুর মতন বা থাপ্পড়ের মতনও হতে পারে। শ্রোতাকে তা স্তব্ধ করে দেয় একেবারে।

নিস্তব্ধতা খানখান করে ভেঙে দিয়ে কী একটা পাখি পাগলের মতো ডেকে উঠল। পেছনের জঙ্গল থেকে।

দুই কন্যাই চমকে উঠল সেই ডাকে।

–কী পাখি ওটা?

–হুপী।

কর্বুর বলল।

–বাঃ বাঃ। ভয় পেয়ে গেছিলাম।

গৈরিকা বলল।

–সত্যি। আপনি কত কী জানেন স্যার। আপনাকে যত দেখছি ততই অবাক হচ্ছি।

ঐশিকা বলল।

-আমিও তাই। একইসঙ্গে এত রূপ। আপনার গান শুনতে শুনতে ভাবছিলাম যে, যে মেয়ে এত ভালো, মানে এইরকম ভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে পারে, সে এমন ইংরেজি-নবিশ হয় কী করে! পরিযায়ীর মানে, যাকে Migratory বলে বোঝাতে হয়।

–হয়। হয়। আসলে জানতে পারেন না। একজন মানুষের মধ্যে অনেকজন মানুষ থাকে। আপনি পৃথু ঘোষকে চেনেন না?

-বাবা : আপনি আবার মাধুকরীও পড়েছেন দেখছি। বাংলা সাহিত্যও পড়েন?

–হ্যাঁ স্যার। পৃথু ঘোষ বলেনি কি ওয়াল্ট হুইটম্যানকে উদ্ধৃত করে?

–কী?

Do I contradict myself?
Very well then...I contradict myself
l am large...l contain multitudes.

৭-৮. হুড-খোলা জিপে

০৭.

রাতে ওরা খেতে বসেছিল।

পাহাড়ি জঙ্গলের মধ্যে হুড-খোলা জিপে, সামনে উইণ্ডস্ক্রিনের কাচ বনেটের ওপরে নামিয়ে দিয়ে গেলে এপ্রিল মাসেও শীত লাগে। আর এখন তো অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ। জঙ্গলে তো বটেই এমন উদলা-উদোম জিপেও তো ওরা অভ্যস্ত নয়। তাই হাড়-মজ্জার মধ্যেও শীত ঢুকে গেছে। হি-হি করছে ওরা শীতে। মনে হচ্ছে, ব্যানার্জিসাহেবের কন্যাদের রাফিংয়ের শখ বোধ হয় একরাতেই উবে যাবে। তবে কর্বুর তৈরি হয়েই গিয়েছিল। ব্যানার্জিসাহেবকেও সকন্যা তৈরি হয়েই আসতে বলেছিল কাকুর মাধ্যমে। তবুও তাঁরা একটি করে হালকা শাল নিয়ে এসেছেন শুধু। তার-ই অর্ধেক মাথায় জড়িয়ে আর বাকি অর্ধেক ঊর্ধ্বাঙ্গে পাক মেরে তাঁরা কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছেন।

নয়নতারা মেয়েদের পাছে সর্দি লাগে, তাই ফিরে এসেই গরম জলে একটি করে ভিএসওপি কনিয়াক গিলিয়ে দিয়েছেন তাদের। নিজেও পাতিয়ালা পেগ ঢেলে খেয়েছেন। জবরদস্ত পুরুষমানুষ।

মদ খেলেই কেউ জবরদস্ত পুরুষমানুষ হন না। তবে কিছু কিছু পুরুষ আছেন যাঁরা অন্যের ওপরে কোনো জবরদস্তি করেন না বলেই সহজেই বোঝা যায় যে, তাঁরা জবরদস্ত। ব্যানার্জিসাহেব নিজে কোনোই গরম জামা নিয়ে আসেননি। গলায় একটি সিল্কের স্কার্ফ। ফেডেড জিনসের টপ এবং ট্রাউজার তাঁর পরনে ছিল। মাথার আধখানাই টাক তাই মাথার ওপরে সাদা রঙা টুপি ছিল। তাও গলফ-খেলার টুপি–। গরম টুপি নয়। জিপে ওঠার আগে অবশ্য একটি ডাবল স্কচ মেরে গিয়েছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, ভূত আমার পুত, পেতনি আমার ঝি, হুইস্কি-সোড়া পেটে আছে শীতে করবে কী? জন হেইগ-ই ওঁর প্রিয় স্কচ। থাকবেন তিনরাত কিন্তু পাছে অতিথ-বিতিথ আসে এবং কর্বুর বেশি খায়, তাই অ্যাজ আ মিজার অফ অ্যাবাডান্ট প্রিকশান, আধ কেস অর্থাৎ ছ-বোতল হুইস্কিই নিয়ে এসেছেন।

কর্বুর ওসব খায় না শুনে তিনি হতাশ হয়েছেন। বলেছেন, তুমি কী গো ছেলে! ইফ উই ডোন্ট ড্রিঙ্ক দেন হোয়াটস দ্যা পয়েন্ট ইন লিভিং?

কর্বুর হেসে বলেছিল, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। আই হ্যাভ আ লট অফ আদার রিজনস ফর লিভিং।

দ্যাটস ভেরি গুড। তুমি অপছন্দ করো না তো, যাঁরা খান তাঁদের?

–বারে :, তা কেন করব? যে যাঁর নিজস্ব মতে চলবেন।

উনি বলেছিলেন, ফাইন। তুমি তো দেখছি সিগারেটও খাও না। কোনো নেশা নেই? বুড়োবয়সে তো তুমি রক্ষিতা রাখবে দেখছি। যৌবনের বেশি-ভালোরা প্রৌঢ়ত্বে এসে বেশি খারাপ হয়।

–কী হচ্ছে বাপি। তুমি ওঁর লোকাল গার্ডিয়ান, না উনি তোমার সমবয়েসি? তোমাকে নিয়ে সত্যিই চলে না। তুমি সত্যিই ইনকরিজিবল।

–সরি সরি। আই অ্যাপলোজাইজ। তুমি কিছু মনে করলে না তো ভায়া?

–না, না।

হেসে বলল কর্বুর।

ভাবল, পোটেনশিয়াল জামাইকে কেউ ভাই বলে এমন শোনেনি কখনো আগে।

তখনও কন্যারা ভীষণ-ই উত্তেজিত ছিল। তাদের বাবাও কম নন। রহমত চাচা আর চৌকিদার মিলে রান্না করেছে। ওরা সকলে খাবার টেবিলে এসে বসল খাবার ঘরে। মুচমুচে করে আটা ও ময়দা মেশানো পরোটা, ঝাল-ঝাল আলুর তরকারি, মেটে-চচ্চড়ি, মধ্যে টিনের আনারস দেওয়া,

শুখা-শুখা বেগুন ভাজা এবং শেষে ফুটপুডিং।

মেনুটা অবশ্য কর্বুর-ই ঠিক করেছে। বাজারও করিয়েছিল। ওই-ই মেয়েদের জন্যে পেপসির বোতল এনেছে বড়ো বড়ো।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, পাঁঠার মাংস তো অনেক-ই আছে। কাল আমি দুপুরে তোমাদের হাঙ্গারিয়ান গুলাশ বেঁধে খাওয়াব।

-বেশ।

ঐশিকার শীত যেন তখনও কাটেনি। ওকে শীতে কষ্ট পেতে দেখে কর্বুরের শরীরে এক ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। কোনো যুবতী শীতে কষ্ট পাচ্ছে আর কোনো যুবক তা দেখেও তাকে উষ্ণ করে তোলার চেষ্টা করছে না, এই অবস্থাটা সেই পুরুষের পক্ষে বড়োই কষ্টকর। ওর ইচ্ছে করছিল ঐশিকাকে বুকের মধ্যে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে, খুব করে চুমু খেয়ে দিয়ে তার দু-হাতের পাতা নিজের দু-হাতের পাতা দিয়ে ঘষে-ঘষে তাকে উষ্ণ করে তোলে। এমন যে, কখনো হতে পারে, তা আগে জানেনি কখনো। কর্বুর তার জাগতিকার্থে অসামাজিক, অতিপরিশীলিত, সুরুচিসম্পন্ন, বিদগ্ধ সত্তাকে নিয়ে অত্যন্তই গর্বিত ছিল এতগুলো বছর। কাকির ঘনিষ্ঠ সঙ্গ, তাদের টাটিঝারিয়ার নির্জন পরিবেশে মাঝে মাঝে শরীরের মধ্যে একরকম ছটফটানি যে, বোধ করেনি তা নয়, গরমের দুপুরে ধুলোবালির মধ্যে পুরুষ চড়াইয়ের ছটফটানির মতো, কিন্তু সেই

আর্তি এমন তীব্র কোনোদিন-ই ছিল না।

পরিবেশ-ই কি এজন্যে দায়ী? হয়তো তাই। এই শারদরাতের শিশিরভেজা পাহাড়বেষ্টিত বনে, ঝিঁঝিদের একটানা ঝি-ঝি শব্দের মধ্যে বন থেকে ওঠা এক নিবাত নিষ্কম্প নিষিদ্ধ মিশ্রগন্ধের প্রতিবেশে ওরও শরীর বলে যে, একটি যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার আছে, যে ব্যাপারটিকে সে আবাল্য, অজানিতে অনবধানে বয়ে বেড়িয়েছে তার মঞ্জরিত সুগন্ধি মনের-ই সঙ্গে, সে কথা আজ এই ভরা-যৌবনের আতরগন্ধী শীতার্ত দূতাঁকে দেখে সে যেন হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছে। এবং পেরে অপ্রতিভ এবং লজ্জিতও হয়েছে।

পৃথু ঘোষ হয়তো ঠিক বলেছিল, একজন মানুষের মধ্যে অনেক-ই মানুষ থাকে। তার ভেতরের কোন মানুষটি যে, কখন কোন পরিবেশে এবং প্রতিবেশে হঠাৎ তার মগ্নসত্তার বাইরে বেরিয়ে এসে অন্য মানুষটিকে হকচকিয়ে দেয়, তা পূর্বমুহূর্তেও জানা থাকে না। মানুষ হয়ে জন্মানো এক মস্ত ব্যাপার। সব মানুষ-ই কি তাদের মনের মধ্যে এবং শরীরের মধ্যেরও এইসব মনুষ্যজনোচিত ক্রিয়া-বিক্রিয়া, ঘাত-প্রতিঘাত, ভয় ও বিস্ময়কে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে পারে? নাকি, জানোয়ারের-ই মতো ভক্ষণ-শয়ন-রমণের বৃত্তর মধ্যে জীবন কাটিয়েই চলে যায়, মানুষ হয়ে জন্মাবার ও বেঁচে থাকার আশ্চর্য সব পরস্পর-বিরোধী অনুভূতির শরিক না হয়েই?

কে জানে! সব প্রশ্নের উত্তর তো কর্বুরের কাছে নেই। সব প্রশ্নের উত্তর যার জানা আছে, সেই রবীন্দ্রনাথ বা ঐশিকার ভাষায়, রবে ঠাকরের গান অটো-রিভার্স কম্প্যাক্ট ডিস্কের-ই মতো কে যেন বাজিয়ে দিল তার বুকের মধ্যে। আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না, ফুরাবে না/সেই জানারই সঙ্গে সঙ্গে তোমায় চেনা/কত জনম মরণেতে তোমায় এই চরণেতে/ আপনাকে যে দেব তবু বাড়বে দেনা/আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।

তখনও ওরা খাবার টেবিলেই বসে। চৌকিদার এসে তার বহুদিনের পরিচিত কর্বুরকে বলল, কবু দাদা, আপনারা যখন ঘুমিয়ে থাকবেন তখন যদি সেই হাতিটা আসে বাংলোর পাশে, তখন ঘুম ভাঙিয়ে দেব কি?

–আমার ঘুম ভাঙিয়ো না। তবে মেমসাহেবকে ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ো। হাতি তো দেখতে পাননি ওঁরা। রাতের বেলা না দেখতে পেয়ে ভালোই হয়েছে। রাতে তাই হাতি এসে এঁদের দেখা দিয়ে গেলেই আমাদের মান থাকবে।

-দেখি দাদা। কালও তো এসেছিল। ব্যাটা রোজ এককাঁদি করে কলা বা অন্য যা কিছু পায় সাবড়ে দিয়ে যায় গুঁড়ে করে। নিতান্ত কলা-হারাম না হলে আজকেও এসে আমাদের ইজ্জত তো বাঁচানো উচিত।

ব্যানার্জিসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, কথাটা কী বলল চৌকিদার?

-কলা-হারাম।

কর্বুর বলল।

ওরা সকলে হেসে উঠলেন।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেন্স অফ হিউমার আছে।

–আচ্ছা ওই যে কাঠ-কয়লার আগুনের মতো লালচোখো পাখিগুলো জিপের চাকার-ই নীচে পড়ে, গেল গেল করতে করতেও জিপ তাদের চাপা দেওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পথ থেকে প্রায় জিপের বনেট ফুড়ে সোজা উঠে ডান বা বাঁ-পাশের দুদিকে উড়ে যাচ্ছিল সেই কিম্ভুতুড়ে পাখিগুলোরনাম কী? ভারি সুন্দর লাগে কিন্তু ওদের লাল চোখগুলো।

গৈরিকা প্রশ্ন করল।

–হ্যাঁ তা লাগে। ওদের নাম নাইটজার। যদি বড়ো বাঘের সঙ্গে আমাদের দেখা হত তবে দেখতেন চোখ কতখানি ভূতুড়ে হতে পারে। অনেক-ই বড়ো বড়ো চোখ, তবে ঠিক নাইটজারের চোখের মতোই লাল। আর যখন মাথা ঘোরায় বাঘ, সেই আলো যেন কোনো অদৃশ্য পুরুষ এসে অন্ধকার দিয়ে মুছিয়ে দেন। নিভিয়ে দেন না কিন্তু। মুছিয়ে দেন। নিজের চোখে না দেখলে ঠিক বুঝতে পারবেন না।

–যে প্রকান্ড সাপটা আস্তে আস্তে পথ পেরোচ্ছিল তার তো কোনো ফণা ছিল না। ওটা কী সাপ?

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, মুখে যে কলুপ এঁটে থাকার অর্ডার দিয়েছিলেন, তাই তখন তো কিছুই জিজ্ঞেস করতে পারিনি।

–সব সাপের তো ফণা থাকে না। যাদের থাকে, তারাও মানুষদের মধ্যে যাঁরা পন্ডিত, তাঁদের পান্ডিত্যের ফণার মতো সবসময়েই তো ফণা উঁচিয়ে থাকে না। তবে যে সাপটিকে আজ আমরা দেখলাম তাদের ফণা থাকেই না। সাপটা পাইথন। বাংলায় যার নাম অজগর।

–অ-য় অজগর আসছে তেড়ে। সেই অজগর?

গৈরিকা বলল।

–হ্যাঁ।

–একটা পাখি যে, ডাকল হার্ট-ফেইল করিয়ে দিয়ে দুরগুম-দুরগুম-দুরগুম শব্দ করে। নদীর ধারের ঘন বনের মধ্যে থেকে, সেটা কী হে?

–সেটা তো পেঁচা।

–পেঁচা? পেঁচা হতেই পারে না।

ঐশিকা বলল।

তারপর বলল, পেঁচার ডাক তো আমাদের জামশেদপুরের নীলডিতেও শুনতে পাওয়া যায়। যায় না বাপি?

-তা যায়।

-পেঁচা ডাকে কিচি-কিচি-কিচর-কিচি–কিচর। ঘুরে ঘুরে উড়ে ঝগড়া করে। আমাদের ওখানে কখনো-কখনো লক্ষ্মীপেঁচাও আসে। দুধসাদা। যাঁদের বাড়ি আসে, তাঁরা খুব খুশি হন। না?

কর্বুর বলল, তা ঠিক। কিন্তু যে, পেঁচার ডাক শুনলেন আজ বনের গভীর থেকে সে অলক্ষ্মী পেঁচা। ওইসব শহর-গ্রামের পেঁচাঁদের চেয়ে অনেক-ই বড়ো হয় দেখতে তারা। ওই পেঁচার নাম-ইকাল-পেঁচা। গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিশুতি রাতে তারা যখন ডাকে তখন শুধু আপনাদের বুক কেন, অনেক সাহসীর বুক-ই দুরদুর করে ওঠে।

-আমরা কি ভীরু?

সাহস আর ভয় ব্যাপারটা আপেক্ষিক।

ঐশিকা বলল, বুরু মানে কী? সব নামের পেছনেই দেখছি একটা করে বুরু যোগ হয়।

কর্বুর হেসে বলল, বুরু মানে পাহাড়। কেউ কেউ আবার বলেন জঙ্গল।

আমি ঠিক বলতে পারব না। কাকু যেমন কিরিবুরু থেকে বুরু বাদ দিয়েই শুধুই কিরি নাম রেখেছে ছেলের। গুয়াতে যে লোহার খাদান আছে ওগুলো স্টিল অথরিটি অফ ইণ্ডিয়া হওয়ার আগে সব ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিলের-ই, মানে ইসফোর ছিল। স্যার বীরেন মুখার্জির বাবা স্যার রাজেন মুখার্জির পত্তন করা। লোহা, ম্যাঙ্গানিজ এসব-ই সারফেস-মাইনস। অথবা ওপেন-কাস্টও বলে। কয়লা তামা বা অভ্রর খাদানের মতো মাটির নীচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে তা তুলে আনতে হয় না। ধরুন বনম মানে উই ঢিপি। যে পাহাড়ে অনেক উইটিপি তার নাম বনম বুরু। হঞ্জর মানে হচ্ছে কুঁজ। যে পাহাড়ের ওপরে কুঁজের মতো একটি পাথর ঝুলে আছে। তার নাম হয়ে গেল হঞ্জর-বুরু। যে পাহাড়ে বনদেবতা বা মারাং থাকেন তার নাম মারাংবুরু। আমগাছকে মুণ্ডা ভাষায় বলে উলম। যে পাহাড়ে অনেক উইটিপি আর আমগাছও আছে তার নাম বনম-উলি-বুরু। বঙ্গসন্তানেরা সন্ধি করে তার নাম করে দিয়েছিলেন হয়তো বনমালিবুরু। এইসব ব্যাপার আর কী!

–এই সারাণ্ডার বনে বুঝি অনেকরকম আকর, মানে মিনারাল ওরস পাওয়া যায়?

গৈরিকা শুধোল।

-হ্যাঁ যায় তো। বিহারের সিংভূম খুব-ই বড়োলোক এ বাবদে। এইসব পাহাড়ের মৃত্তিকা-ত্বকে প্রচুর লাল-নীল-হলুদ-রঙা গুঁড়োর মতো আয়রন

অক্সাইড আছে। আকরিক লোহাও আছে। গুয়া, নোয়ামুন্ডি, বাদামপাহাড় এইসব অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে লোহার আকর আর আয়রন অক্সাইড। ম্যাঙ্গানিজ আছে জামদা থেকে রাউরকেল্লার পথে কিছুটা গিয়ে বাঁদিকে জঙ্গলের বুক ফুড়ে চলে গেলে, ভুতরা মাইনস-এ। আছে, আমাদের ধুতরা মাইনস এ। তা ছাড়াও আরও অনেক খাদান আছে। ভুতরা মাইনস, ওড়িশা ম্যাঙ্গানিজ কোম্পানির খাদান। সেখানে কুড়ারি নদী বয়ে গেছে ছায়াচ্ছন্ন গিরিখাতের মাঝে মাঝে।

–মহলশুখার চিঠি বলে একটি বই পড়েছিলাম, তাতে মহলশুখা আর ভুতরা মাইনসের কথা আছে।

ঐশিকা বলল।

প্রকাশক কে?-

-আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

তারপর বলল, এদিকের নদী-নালাতে সোনাও পাওয়া যায়। মেয়েরা পাহাড়ের বুকে কোনো কোনো নির্জন জায়গায়, যেখানে নদী বয়ে যায় নিভৃতে, সেখানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে সোনার চিকচিকে গুঁড়ো ছেঁকে তোলে।

-কেন? সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে কেন?

নিশ্চয়ই কোনো প্রথা আছে আদিবাসীদের। শুধু মেয়েরাই সেই সোনার গুঁড়ো ঘেঁকে তোলে। পুরুষদের সেখানে যাওয়া মানা।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, জায়গাটা জানো নাকি? চলো, ভায়া, তুমি-আমি চলে যাই।

ঐশিকা চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, বাবা! বিহেভ ইয়োরসেলফ।

–এদিকে মুণ্ডা, হো ছাড়া আর কোনো উপজাতি আছে?

–কোলেরাও আছে। বীরহোড়। কোলেরা গুয়ার কাছে একটি পাহাড়ের কোলে থাকে, তাই তাকে বলে কোল-টুংরি। লোহা খাদানের লাল-হলুদ মাটি এনে ওরা মাটির ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ফুল, পাতা, নানা পশুপাখি, মেয়ে-মরদের সুন্দর সুন্দর সব ছবি আঁকে।

-সত্যি। আমাদের এই ট্রাইবাল-আর্টের কোনো তুলনা নেই।

গৈরিকা বলল।

লোহা, সোনা, ম্যাঙ্গানিজ ছাড়াও আছে সিসে, তামা, রুপো। এখানের নদীর মতো সুন্দর বহুবর্ণা নদীও পৃথিবীর খুব কম জায়গাতেই দেখতে পাওয়া যায়। দেখাব আপনাদের। দেখে গাইতে ইচ্ছে করবে, সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।

একদিক দিয়ে এঁকেবেঁকে ঘন বনের মধ্যে দিয়ে ছিপছিপে লাল নদী এসে অন্যদিক থেকে আসা নীল নদীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কোথাও বা হলুদ নদী মিলেছে সবুজ নদীর সঙ্গে। সে দৃশ্য দেখার মতো।

তারপর ও বলল, বড়োবিলে বড়োজামদাতে নানা ইনস্পেকশন কোম্পানির অফিস আছে। যেমন মিত্র. এস. কে. প্রাইভেট লিমিটেড, ব্রিগস কোম্পানি ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁরা ল্যাবরেটরিতে বিভিন্ন ধাতুর আকর পরীক্ষা করে করে কোন আকরে কত শতাংশ আছে সেই ধাতু এবং তাদের অন্য গুণাগুণ কী, এইসব-ই যাচাই করে সার্টিফিকেট দেন। ওই সার্টিফিকেটকে মেনেই রপ্তানি ও আমদানিকারকরা ব্যাবসা করেন।

একসময়ে ওদের খাওয়া শেষ হল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, এই জঙ্গলে এমন পুডিং, ভাবা যায় না।

গৈরিকা বলল, সত্যি। কিন্তু এবারে কি শয়নে পদ্মনাভ?

–বাংলোর পাশে ভিউপয়েন্টে গরমের রাত হলে গিয়ে বসতে পারতাম।

-তার চেয়ে কাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে জঙ্গলে কিছুদূর হেঁটে বেড়ালে খুব ভালো লাগবে।

ঐশিকা বলল।

–শরৎকালের সৌন্দর্য যে কী তা গ্রামের সৌন্দর্য যাঁরা জানেন তাঁরা জানেন, কিন্তু এই জঙ্গলের সৌন্দর্য একেবারেই অন্যরকম। অন্ধকার রাতের রূপও কিন্তু অন্যরকম। তা পুরুষের রূপ। আর চাঁদনি রাতের রূপ, নারীর রূপ।

বাবা : তুমি তো দেখছি কবি হে কবু।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

–আমরা তার প্রমাণ আগেই পেয়েছি।

ঐশিকা বলল।

কবু বলল, একটা কাজ করলে মন্দ হয় না।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, কী?

-কাল ভোরে উঠে, এককাপ করে চা খেয়ে টোয়েবু ফলস-এ যাওয়া যেতে পারে। সঙ্গে করে গ্যাসের ছোটোউনুন আর ব্রেকফাস্টের রসদ ওখানে নিয়ে গেলে ওখানে বসেই ব্রেকফাস্টও খাওয়া যেতে পারে। তারপর বাংলোতে ফিরে অথবা না-ফিরেও থলকোবাদ যাওয়া যেতে পারে। থলকোবাদ, টোয়েবু থেকে কাছেই।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ হয় না।

তারপর বললেন, তোমরা তিনজনে যাও সকালে। ট্রান্সপোর্ট তো দুটি আছেই। আমি তোমাদের জন্যে সব বন্দোবস্ত করে মালপত্র নিয়ে গিয়ে পৌঁছোব সেখানে। কী যেন নাম। বললে ফলসটার? গোয়েবু?

-না টোয়েবু।

-হ্যাঁ। হ্যাঁ। টোয়েবু। জিনিসপত্রও সব গুছিয়ে নেব। চান-টানও সেরে নেব। যাতে ওখান থেকেই থলকোবাদ চলে যেতে পারি। তোমরা না হয় থলকোবাদে গিয়েই চান কোরো।

-কেন?

–এনজয় ইয়োরসেলভস।

–আমরা টোয়েবুতেও তো চান করতে পারি।

গৌরিকা বলল।

–তাও পারো। অ্যাজ ইউ লাইক ইট।

–ঠিক আছে। এ কি অফিস যাওয়া! যা মনে হবে, মানে সকালে উঠে যা করতে ভালো লাগবে তাই-ই করা যাবে। ছুটিতে এসেও এত আগে থাকতে সব ঠিক-ঠাক, এমন টাইট স্কেডিউল আমার ভালো লাগে না।

গৈরিকা বলল।

কর্বুর লক্ষ করল যে, Schedule-এর আমেরিকান উচ্চারণ করল গৈরিকা, স্কেডিউল। এই আমেরিকানরাই এতদিনের পৃথিবীব্যাপী ঐতিহ্যমন্ডিত ইংরেজি ভাষাটিকে কী বিকৃতই করে দিল। যাঁদের ঐতিহ্য থাকে না, অতীত থাকে না, নিজস্ব ভাষা থাকে না, তারাই গাজোয়ারি করে নিজেদের ঐতিহ্য তৈরি করতে চায়।

চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠতে ঐশিকা বলল, আমার গা এখনও ছমছম করছে। রাতের জঙ্গলের মধ্যেই মনে হয় কত জীবজন্তু সব বুঝি গা-ঠাকা দিয়ে বসে রইল। দেখা হল না।

কর্বুর বলল, তাই-তো হয়। যতটুকু অদেখা থাকে, যতটুকু অন্ধকার, ততটুকু রহস্যে মোড়া থাকে। সেখানে কী আছে? তা জানার জন্যে মন আনচান করে। যেটুকু সহজে দেখা যায়, বা যা আলোকিত, তা তো সহজে দেখাই যায়।

–ঠিক তাই।

কর্বুর বলল।

-তাহলে গুডনাইট।

–গুডনাইট তো বটে কিন্তু আমাদের খুবই খারাপ লাগবে।

কর্বুর বলল, কেন?

–না। আপনি এই বসার ঘরের সোফাতে, আর আমরা ঘরে।

সোফাতে কেন? পা-তোলা চেয়ারে আরামে ঘুমোব কম্বল মুড়ি দিয়ে। আপনাদের পাহারাও দেওয়া হবে। আমি তো দারোয়ানি করতেই এসেছি।

যদি কোনো জানোয়ার বা সরীসৃপ অথবা চোর আসে তারাও সবাই ওই ড্রইংরুম দিয়েই ঢুকবে বলছেন!

ঐশিকার কথাতে সবাই হেসে উঠলেন একসঙ্গে।

ঘুমোবই যে, তার-ই বা কী মানে আছে? আমি তো জেগেও থাকতে পারি। আপনারাও জেগে থাকলে পারতেন। রাতের জঙ্গল থেকে কতরকম আওয়াজ ভেসে আসবে। শুনতেন বসে বসে। চোখ যখন দেখতে পায় না তখন কান-ই চোখ হয়ে যায়। আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, কোন জানোয়ার, কত দূরে, কী করছে বা সে কী দেখে ডাকছে?

গৈরিকা বলল, থাক। আমার ঘুম পাচ্ছে। জঙ্গলের সব-ই একদিনে শিখে ফেলতে গেলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। হজম হবে না। আমি চললাম শুতে। আপনাকে বালিশ দিয়েছে কি?

–আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে যান। কোনো চিন্তা নেই।

কর্বুর বলল।

যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে ঐশিকা বলল, আপনি কীরকম লোক যে, অন্য কারও সঙ্গে শুতে পারেন না? বাপির সঙ্গেও পারবেন না? তাহলে বিয়ে যখন করবেন তখন কী করবেন?

–আলাদা ঘরে শোব। বিয়ে করলেই যে, একই বিছানাতে এক মশারির তলাতে অন্যজনকে জাপটে-সাপটে প্রতিরাতে শুতেই হবে তার কী মানে আছে, জানি না আমি। আমি তো আমাদের ধুতরা খাদানের কাছে একটি জঙ্গলময় টিলা দেখেছি। তাতে মনোরম দুটি ছোটো সেলফ-কনটেইনড কটেজ বানাব। একটাতে আমি থাকব, অন্যটাতে বউ। মধ্যে একটা চাঁপা-রঙা টাইলের পথ থাকবে যোগসূত্র হিসেবে। তার দু-পাশে থাকবে পারিজাত আর স্থলপদ্মর গাছ। মিয়া-বিবির আলাদা আলাদা বাবুর্চি থাকবে। আলাদা খাস বেয়ারা। এবং আয়া। একদিন আমার বাড়ি বউকে নেমন্তন্ন করব, আর একদিন সে করবে আমাকে নিমন্ত্রণ।

-আপনার ঘরে আতরদানি থাকবে তো?

–কোনো যবন-কন্যাকে বিয়ে করলে, তাও থাকবে।

–সেটি তো হবে না। যবন-কন্যাকে বিয়ে করতে হলে তো আপনাকেও

যবন হতে হবে। ধর্মান্তরিত না হলে তো বিয়ে হবে না। আপনার নাম হয়তো কর্বুর সেন থেকে হয়ে যাবে জনাব মুর্গমসল্লম খাঁ।

কর্বুর হেসে বলল, এটা যা বলেছেন! পৃথিবীতে আর কোনো ধর্মই বোধ হয় এমন জবরদস্তি করে না অন্যের ওপরে।

–সেইজন্যেই আপনার ওই লাইনে না-যাওয়াটাই সেফ হবে।

–তা ঠিক। নিজের মা-বাবার ধর্ম বিসর্জন দিয়ে বিয়ে করতে যাব কোন দুঃখে। দেশে স্বধর্মের মেয়ের কি অভাব পড়েছে?

–সেকথা ঠিক। দেশে সবকিছুর আকাল থাকলেও অনূঢ়া কন্যাদের গোন-গুনতি নেই। কী সম্মান-ই না দিলেন আমাদের। আমরা যেন গোরু-ছাগল। ভাবছেন তাই?

তারপর বলল, আপনি স্যার তাহলে আপনার সেই না-বাগানো বউদের স্বপ্নে কুঁদ হয়ে জেগে থাকুন, আমরা ঘুমোই গিয়ে। কলা-হারাম হাতিটা যদি আসে, আপনি সঙ্গে না থাকলে কিন্তু আমরা সাহস করে দেখতে যেতে পারব না।

–আমিই কি আপনাদের সাহস?-

-হ্যাঁ স্যার। তবে শুধুমাত্র কোনো কোনো ব্যাপারে।

ঐশিকা বলল।

বলেই, দুষ্টুমিভরা হাসি হেসে, ঘরে গিয়ে দুয়ার দিল। কর্বুরের মনে হল, ও যেন কর্বুরের মুখের ওপর-ই দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল। না-বন্ধ করলে, কর্বুর কি ওদের ঘরে যেত?

ভারি অসম্মানজনক ব্যাপার-স্যাপার!

কর্বুর ভাবল যে, সে অনবধানেই বড়ো তাড়াতাড়ি একটু বেশি মাখোমাখো হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা ডেঞ্জারাস। যদিও সব মেয়েই ডেঞ্জারাস। আরও প্রশ্রয় দিলেই মাথায় চড়ে বসবে। মা-কাকি-কাকুর পছন্দ হলেই যে, কর্বুরের ঐশিকাকে বিয়ে করতেই হবে তার কী মানে আছে! ঐশিকাও মনে হয়, তার সুন্দর তর্জনী আর বুড়ো আঙুলে টোকা মেরে আজ অবধি অনেক ছেলেকেই টাকা-কেন্নোর মতো ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। কর্বুর নিজের ছোট্ট জগতেই সুখী ছিল। তার পক্ষে বড়োজামদার শিখীই ভালো। ঘরোয়া মেয়ে। ঐশিকা তাকে পছন্দ করলেও তাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে সারাজীবন। তেমন অবস্থার কথা ভাবলেও আতঙ্ক হয়। অমন বোকামি কর্বুর করবেই না।

কলা-হারাম হাতিটা আসেনি কাল রাতে।

.

পুবের আকাশ ফর্সা হতেই রহমত চাচার কাছ থেকে চেয়ে দু-কাপ চা খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে কর্বুর বেরিয়ে পড়ল। সাহেব আর মিসি-বাবারা নিশ্চয়ই দেরি করে উঠবেন। ওঠামাত্র যাতে গরম জল পান হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে এবং গরম চা-ও পান তার বন্দোবস্ত ঠিকঠাক করেই ও বেরোল দূরবিনটা গলায় ঝুলিয়ে। একসময়ে প্রায় প্রতিসপ্তাহেই আসত সারাণ্ডাতে। আজকাল কাজে-কর্মে এমনভাবে জড়িয়ে যাচ্ছে যে, সময়ই পায় না। তার ওপর পুজোর দু মাস আগে থেকে তো নাটকের মহড়া নিয়েই ছিল এ বছরে।

মহড়া উপন্যাসটির লেখক হয়তো ঠিক-ই বলেছেন। আমাদের অধিকাংশ মানুষের জীবনটাই এক-একটা মহড়াই। মহড়া দিতে দিতেই জীবন শেষ। জীবনের নাটক খুব কম মানুষ-ই মঞ্চস্থ করতে পারেন। এই দুর্বুদ্ধিজীবীতে গিস-গিস করা দিনে, প্রকৃত বুদ্ধিজীবী তক্ষ রায়ের চরিত্রটা এঁকেছেন লেখক অসাধারণ। কুদর্শন তক্ষ রায়ের প্রেমে পড়ে গেছে কর্বুর।

মহড়া দিতে দিতেই শিখীকে কাছ থেকে জেনেছে কর্বুর। ভারি ভালো মেয়ে। নরম, লাজুক, ভালো গান গায় এবং দারুণ ভুনিখিচুড়ি আর কড়াইশুটির চপ রান্না করতে পারে। একেবারে তার চলে যাওয়া ঠাকুমার-ই মতো। জামশেদপুরের ঐশিকার সঙ্গে বড়োজামদার শিখীর অবশ্য তুলনাই চলে না। ঐশিকার ক্লাস অন্য। ও জন্মেছেই কোনো

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সি.ই. ও অ্যাণ্ড এম. ডি.-র স্ত্রী হওয়ার জন্যে। বড়োবিল-এর টাটিঝারিয়া আর ধুতরা খাদানের পাহাড়ের কটেজে ও আঁটবে না। ওর পটভূমির সঙ্গে শিখীর পটভূমির অনেক-ই তফাত আছে। ভবিষ্যতের তো আছেই। বিয়ের জন্য মা-বাবা-কাকু-কাকি অনবরত জোর দিচ্ছেন। নানা সেন্টিমেন্টাল কথাবার্তা বলছেন। তবে এ ব্যাপারে বলতে হয়, ওঁদের আক্কেলের অভাব আছে। কী করে ওঁরা ভাবতে পারলেন যে, ঐশিকার মতো মেয়ের এই বড়োবিল-এর খাদান-মালিক কর্বুরকে ভালো লাগবে। কর্বুর কোনো দিক দিয়েই ওর যোগ্য নয়।

যদিও বিয়ের বয়েস তার হয়েছে কিন্তু বিয়ে করলেই তো স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল সব। এলিজিবল, সচ্ছল ব্যাচেলার হিসেবে যেখানেই যায় সেখানেই যে, একটা আলাদা খাতির! সেসব আর থাকবে না। তার বাজারদরের জন্যেই নয়, কার না ভালো লাগে সমাজে তার চাহিদা যেন অব্যাহত থাকে তা দেখতে। বিয়ে-টিয়ে নিয়ে বিশেষ ভাবেওনি। নানা ভাবনা নিয়ে তাকে ব্যস্ত থাকতে হয়। বাবা-মা তাঁদের ছেলের ঘরের নাতি দেখতে অহেতুক উৎসুক হলেই যে, তাকে বিয়ে করতে হবে এক্ষুনি এবং জনক হতেই হবে এ কেমন কথা! আসলে সব মানুষ-ই স্বার্থপর। সন্তানেরা যেমন, তেমন অনেকক্ষেত্রে বাবা-মায়েরাও। নিজেদের ইচ্ছাপূরণের কথাই ভাবেন শুধু তাঁরা। অন্যের কথা ভাবেন না আদৌ।

কিছুটা গিয়েই ও আবার ফিরল। ভাবল, বাঁধের দিকে গিয়ে দেখে, কাল

শেষদুপুরে যে, কটন-টিল-এর ঝাঁকটা এখানে নামল এসে, সংখ্যায় তারা কত?

কুমেডি বাংলোটা পেরিয়ে গেল। সেখানে ঘুম-ভাঙা কারওকেই দেখল না। ভালোই হল, ভাবল ও। তাও একা থাকা যাবে কিছুক্ষণ। জঙ্গলে এসে একা না থাকতে পারলে আসার কোনো মানেই হয় না।

বাঁধের পাশে পৌঁছে আশ্চর্য হল কর্বুর। একটি হাঁসও নেই। তারা হয়তো সকালের আলো-ফোঁটার আগেই চলে গেছে, নাকি কাল-ই বিকেলে গেছে, কে জানে! চারদিক শিশিরে ভিজে আছে। কোথাওই বসার জায়গা নেই। বাঁধের ওপারের জঙ্গল থেকে নানা পাখির মিশ্রস্বর ভেসে আসছে। এমন সময়ে ধনেশ ডাকল একটা। কুমডির আশপাশে আগে ধনেশ দেখেনি কখনো। ও ঝুলিয়ে-রাখা দূরবিনটা তুলে নিয়ে সেদিকে খুঁজতে লাগল পাখিটাকে। ধনেশ উঁচু গাছের ওপরের দিকের ডালে বসে থাকতে ভালোবাসে। চুপ করে থাকা ওদের কুষ্ঠিতে নেই। সব সময়েই হ্যাঁক হুক হুক করছে। নাক্সভমিকা গাছে বসতে ভালোবাসে ওরা। ওই গাছের ফলও খেতে ভালোবাসে। ওড়িশাতে ওই গাছগুলোকে বলে কুচিলা। আর কুচিলা খায় বলেই ওদের নাম সেখানে কুচিলা খাঁই।

দূরবিনটা নামাতে যাবে এমন সময়ে কে যেন পাশ থেকে হাত বাড়িয়ে সেটা নিতে চাইল। মুখে বলল, পাখি রইল বাঁ-দিকে আর স্যার দেখছেন ডানদিকে।

-তাই?

কর্বুর খুশি ঐশিকাকে দেখে।

-বলল, কখন ওঠা হল রাজকুমারীর?

–কী যে বলেন স্যার। আমি হলাম বাঁদি। রাজকুমার কেন যে, না বলে কয়ে বেরিয়ে এলেন তা বুঝলাম না। আপনি না আমাদের লোকাল গার্জেন!

–ঐশিকা ব্যানার্জির লোকাল গার্জেনি করি এতবড়ো ধৃষ্টতা কি আমার হতে পারে!

–কী পাখি ওটা? বিচ্ছিরি ডাক কিন্তু যাই-ই বলুন।

–ওদের বাংলা নাম বড়োকি ধনেশ। ইংরেজিতে বলে, দ্যা গ্রেটার ইণ্ডিয়ান হর্ন বিল। ওড়িয়া নাম, কুচিলা খাঁই।

–ছোটোও হয় বুঝি?

–হয় বই কী। সেগুলো অনেক-ই ছোটো হয়। ওড়িশাতে সেগুলোকে বলে ভালিয়া খাঁই।

-কেন?

–ভালিয়া বলে একরকমের ফল হয়। ওরা সেই ফল খেতে ভালোবাসে বলে।

–তাহলে কি বাপিকে আমরা গুলাশ খাঁই বলে ডাকতে পারি।

গুলাশ মানে?

–আরে বাপি কাল বলল না, আজ মটন দিয়ে হাঙ্গারিয়ান গুলাশ রান্না করবে থলকোবাদে গিয়ে।

কর্বুর হেসে ফেলল।

বলল, ব্যানার্জিসাহেব খুব খাদ্যরসিক আছেন। তাই না?

–শুধুই খাদ্যরসিক কেন, পানীয়-রসিক, জীবন-রসিক। আমার বাপি একজন এপিকিউরিয়ান। বাট হি ইজ আ গ্রেট গাই। আই অ্যাডোর হিম!

বলেই বলল, পাখিগুলোকে কাছ থেকে দেখব বলে এলাম, আর তারা গেল কোথায়? আমাকে বোধ হয় পছন্দ হয়নি। কখন গেল? আমাকে আসতে দেখেই!

আমিও তো ওদের দেখতেই এসেছিলাম। এসে দেখছি, চলে গেছে। কোনো বড়োজলাতে গিয়ে বসেছে হয়তো।

-মাইগ্রেটরি।

স্বগতোক্তি করল ঐশিকা।

তারপর-ই বলল, বাংলাটা যেন কী বলেছিলেন?

–পরিযায়ী।

–রাইট। পরিযান থেকে পরিযায়ী?

-আমি কি অত জানি! আমি তো ধানবাদের মাইনিং এঞ্জিনিয়ার। পাথর চিনি, আকর চিনি। আটারলি বেরসিক।

-তাই নাকি? কে বলে? আপনি আটারলি-বাটারলি-রসিক।

তারপর আবারও নিজের মনেই বলল, পরিযায়ী। পরিযায়ী। পরিযায়ী।

পরক্ষণেই হঠাৎ চমকে উঠে বলল, ওটা কী পাখি ডাকল? মেটালিক সাউণ্ড। মেটালিক এর বাংলা কী?

-মেটাল হচ্ছে ধাতু। মেটালিক হচ্ছে ধাতব।

–সত্যি! আই শুড বি অ্যাশেমড অফ মাইসেলফ।

বলেই বলল, আপনি আমাকে বাংলা পড়াবেন?

বাংলা পড়ানো শব্দ দুটি ধানবাদ মাইনিং স্কুলের গোপেন সামন্ত অন্য অর্থে ব্যবহার করত। কর্বুরের হাসি পেয়ে গেল। ঐশিকার মুখে শব্দ দুটি শুনে। কিন্তু হাসল না।

বলল, ওই পাখিটার নাম র‍্যাকেট-টেইলড ড্রঙ্গো। ফিঙে জাতীয় পাখি।

–পাখিটা যে গাছে বসে আছে সেটা কী গাছ?

–গামহার।–

-বাঃ, সুন্দর নাম তো।

-পাশের গাছটা কী গাছ?

–ওটা বিড়ো। বাংলাতে বলে পিয়াশাল।

–আর ওগুলো।

–ওগুলো সব শাল। সারাণ্ডা তো শালের জন্যেই বিখ্যাত।

–কোথায় একটু বসা যায় বলুন তো। সব জায়গাই তো এখনও ভিজে।

–নাই বা বসলেন।

-ওই ঝোপগুলো কীসের ঝোপ? কমলা কমলা ছোটো ছোটো ফুল

ফুটেছে। বিচ্ছিরি গন্ধ কিন্তু ঝাড়গুলোতে এবং ফুলগুলোতেও।

–হ্যাঁ, তা ঠিক। ওগুলোর নাম Lantana, হিন্দিতে বলে পুটুস। গাড়োয়াল পাহাড়ে এদের-ই বলে লালটায়েন। জিম করবেট এবং অন্যান্য সাহেবদের মুখে Lantana শুনে থাকবে স্থানীয় মানুষরা, তার-ই অপভ্রংশ লালটায়েন।

-ফুলের বা গাছের-ই মতো পাখির নামও কি প্রদেশ ভেদে আলাদা আলাদা হয়ে যায়?

–যাবে না? আমাদের এই ভারতবর্ষ কত বড়ো দেশ। কত ভাষাভাষী, কত রাজ্য, কিন্তু সব মিলিয়ে আমরা এক-ই। এই বিরাটত্ব এবং মিলন-ই তো ভারতীয়ত্ব।বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

-আবার সাতসকালে জ্ঞান দিতে শুরু করলেন স্যার? বাপি তো আছেই। তার ওপরে আপনি। কিন্তু আপনার যা বয়েস তাতে তো আপনার অজ্ঞানাবস্থাই থাকা উচিত এখনও। এত জ্ঞান, আসে কোত্থেকে বলুন তো স্যার?

-জ্ঞান কি আর হেলিকপ্টার থেকে পড়ে ম্যাডাম? জ্ঞান পড়াশুনো এবং অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করতে হয়। অনেক-ই সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

–আপনার মধ্যে যতখানি জায়গা আছে তা জ্ঞানে ভরতি হয়ে গেলে কী

হবে? আপনি কি বেলুনের মতো ফেটে যাবেন? না, কলসির জলের মতো সে জ্ঞান উপচে পড়ে যাবে। না, পথে-প্রান্তরে পড়ে নষ্ট হবে?

-জানি না। কালকে যে গানটা শোনাবেন বললেন, সেটা শোনান না।

–কোনটা?

-ওই যে Savaging The Civilized বইটির মধ্যে যে, গানটি লেখা ছিল সেটা।

–ছিঃ। আপনি তো ভারি নিষ্ঠুর। একজন ভালোবেসে একটা গানের কলি লিখে প্রেম নিবেদন করল, আর সেই গান আপনি অন্যের মুখে শুনতে চাইছেন? তার মুখেই শুনবেন। গান তো রূপমতী চমৎকার গায়। এবার থেকে শিখীকে রূপমতী বলেই ডাকবেন।

–সে আমি বুঝব।

সামান্য বিরক্তির গলাতে বলল, কর্বুর।

–না তো কি আমি বুঝব? আপনার পাঁঠা আপনি ল্যাজে কাটবেন না মাথায়, তাতে আমার কী?

–বড়োবাজে কথা বলেন আপনি। বেচারি আপনার কী ক্ষতি করেছে যে, তার পেছনে লেগেছেন?

-ওমা! আমি ক্ষতি করতে যাব কেন? আমি তো তার অ্যাডমায়রার হয়ে গেছি, যেমনি হয়েছি আপনারও।

–এত অ্যাডমিরেশানের বন্যা কেন?

–কী করব স্যার। অব্যেশ।

আবার স-কে ইচ্ছে করে শ বলল ঐশিকা।

-আপনার বাপি আদরে আদরে আপনাকে এক্কেবারে গোবর করেছেন।

–আমাকে গোবর করেছেন। জানি তো! এককথা আর কতবার বলবেন স্যার। তার চেয়ে এইটা শুনুন। ভৈরবীতে বাঁধা।

একটু চুপ করে থেকে বলল, নিধুবাবুর নাম শুনেছেন? না শুনে থাকলে, রূপমতাঁকে জিজ্ঞেস করবেন, বলে দেবে। সে অবশ্যই শুনেছে। আপনাকে দেওয়া বইটিতে কী করে কলঙ্কে যদি গানটা লিখেছেন যিনি। তাঁর-ই লেখা গান।

–আমি জানি।

–কী জানেন?

–নিধুবাবুর নাম। রামনিধি গুপ্ত তো!

–সত্যি! আপনাকে যতই দেখছি স্যার ততই অবাক হচ্ছি।

–কেন?

সামান্য বিরক্তির গলাতে বলল, কর্বুর।

–আপনি কী যে জানেন না! মানে কোন বিষয়ে আপনার জ্ঞান নেই? আপনি তো। সব্যসাচী।

–তার মানে? আমি সবজান্তা বলছেন?

–সবজান্তা শব্দটা প্রশংসাসূচক নয়। বরং বলা যাক আপনি সর্বজ্ঞ।

–গানটা গাইবেন কি?

–গাইছি।

বলেই, ঐশিকা ধরে দিল : প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে/ বিচ্ছেদ তস্করে আসি, যেন কোনও রূপে নাহি হরে/অনেক প্রতিবাদী তার হারালে আর পাওয়া ভার/কখন যে সে হয় কার, কে বা বলিতে পারে/ প্রণয় পরম রত্ন, যত্ন করে রেখো তারে।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল কর্বুর। নিধুবাবুর এটি একটি বিখ্যাত গান। ভৈরবীতে বাঁধা। শরতের সকালবেলার রোদ, শিশিরভেজা সুগন্ধি

গাছপালার গন্ধের মধ্যে কারও নদীর পাশে দাঁড়িয়ে গাওয়া সেই ভৈরবীর সুর যেন, এই বনভূমির সকালের সব রন্ধ্র ভরে দিল।

এই গানটি কর্বুর শিখীর গলাতেও শুনেছিল। কিন্তু শিখীর গলা ঐশিকার গলার সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয়। ঐশিকার গলা তো নয়, যেন কোকিল কথা বলছে। সুরে একেবারে ভরপুর। কলকাতার আনন্দবাজারের প. ব.-র ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, সুরঋদ্ধ। তার ওপরে গানের ভাব, গানের বাণীর প্রতিটি শব্দ যেন প্রাণ পেল ঐশিকার গায়কির-ই জন্যে।

কর্বুরকে চুপ করে থাকতে দেখে ঐশিকা বলল, নিজে থেকেই জোর করে গান শোনালাম স্যার, ভদ্রতা করেও তো মানুষে কিছু একটা বলে বানিয়ে বানিয়েও। তাও বললেন না। আচ্ছা, বিয়ে করতে আসা জামাইকে দেখে, সে যতই হতকুচ্ছিৎ হোক না কেন, অথবা কারও গান শুনে, সে গায়িকা যতই খারাপ গান করুক না কেন, আজ অবধি কেউই কি কখনো খারাপ বলেছে? আপনি কী নিষ্ঠুর মানুষ স্যার।

তুমি তো গান গাইলেই পারতে।

কর্বুর, ঐশিকার ছদ্ম-বিনয় ছেঁটে দিয়ে বিস্ময়াভিভূত গলায় বলল।

-তুমি বলে ফেলেই লজ্জিত হল কর্বুর। বলল, সরি, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। তবে গুণপনাতে বড়ো হলেও বয়সে তো আমার চেয়ে ছোটোই আপনি!

চোখ বড়ো বড়ো করে ভর্ৎসনার স্বরে ঐশিকা বলল, খুব-ই অন্যায় হয়েছে। গুণপনাতে গুরুজনকে তুমি বলে কেউ কখনো? তা ছাড়া, আমার বয়স কত তা আপনি জানলেন কী করে।

তারপর-ই বলল, আচ্ছা স্যার! আপনি এতক্ষণ আপনি চালিয়ে গেলেন কী করে? অসীম আপনার ক্ষমতা। ঐশী ক্ষমতা। আপনি ইচ্ছে করলে লালুপ্রসাদ যাদব হতে পারতেন। আমার তো দমবন্ধ হয়ে আসছিল প্রথম থেকেই। আপনি সত্যিই প্রি-হিস্টরিক।

–এসব কথা থাক। তুমি এমন গান গাও, তো গানকেই প্রফেশন কেন করলে না?

–কোনো কিছুকেই প্রফেশন করা কি অত সোজা আজকাল স্যার? দলে না ভিড়তে পারলে, গোরু-ছাগলের মতো যূথবদ্ধ হয়ে গায়ে-গা ঘষতে না পারলে, আজকাল কিছুই হয় না। প্রকৃত গুণীরা এখন তাঁদের অভিমান নিয়ে বাড়িতেই বসে থাকেন আর ভূশন্ডীর মাঠের ভূত-পেতনিরা চারধারে হুলা-হুঁলা, হনু-হনু নৃত্য করে বেড়ায়। দলে-বলে যারা আছে, তারাই আজকাল সব পেয়েছির দেশের বাসিন্দা। রসে-বশে দিন কাটায়।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, ক্ল্যাসিকাল গানের কথা হয়তো আলাদা। অন্য অধিকাংশ গানের-ই এখন জনগণায়ন হয়ে গেছে। গণতান্ত্রিক শিল্পী সংঘর মাধ্যমেই আপনাকে পা ফেলতে হবে, নইলেই

পদস্খলন। নিজেকে অত নীচে টেনে নামাতে রুচিতে বাধে। তেমন শিক্ষাও তো পাইনি। তাই অনেকরকম কষ্ট করেও, বাপিকে একা ফেলে রেখেও দু-বোনে বাইরে বাইরে পড়াশুনো করেছি। আজকাল স্বাবলম্বী না হলে তো চলে না। আমার মনে হয়, মহারাজকে বিয়ে করলেও সে মেয়ের স্বাবলম্বী হয়েই করা উচিত। ভালোবাসাটা, আদরটা, উপরি পাওনা। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরাটার বন্দোবস্ত, নিজের স্বেচ্ছার্জিত রোজগারেই করা উচিত। মানে, তেমন প্রয়োজনে যেন করা যায়, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া উচিত।

গৃহবধূ হয়ে থাকা বলছ কোনো শিক্ষিত মেয়ের পক্ষেই আজকাল সম্ভব নয়?

–সম্ভব নয় কেন? আমার বা আমার দিদির চেয়েও অনেক বেশি শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মেয়ে কি গৃহবধু হয়ে নেই? অবশ্যই আছে। এবং তারা সুখেই আছে। হয়তো অনেক সম্মানেও আছে। কিন্তু আমরা বড়ো ভয় পাই। আপনারা পুরুষেরা যে, অনেক বছর আমাদের খেলনার মতো ব্যবহার করেছেন। পরাশ্রয়ী স্বর্ণলতাকে আঁকশি বাড়ালেই পেড়ে ফেলা যায়। সে নিজে তো গাছ নয়, লতা নয়, তার নিজের তো কোনো শিকড় নেই। নিরাপত্তার বোধটা বড়োবেশি বিঘ্নিত হয় তাতে। সেটা কোনো দম্পতির সুস্থ দাম্পত্যর পক্ষেও প্রার্থনার নয়।

–বা : তুমি তো বাংলাটাও ভালো ভালো শব্দ দিয়ে গেঁথে বলতে পারো।

–পারি না কিছুই। তবে পারা উচিত ছিল। আমাদের বাপি, আমাদের যা শেখাতে চেয়েছিল তার পাঁচ ভাগও শেখা হয়নি আমাদের। বাপিই শিশুকাল থেকে শিখিয়েছিল যে, যাই করো না কেন জীবনে, একনম্বর হওয়ার সাধনা করো। দু-নম্বর হয়ে বাঁচা আর না বাঁচাতে কোনো তফাত নেই। বাপি বলত, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

-আশ্চর্য। আমার বাবাও ঠিক এই কথাই বলেন।

এমন সময়ে গৈরিকা আর ব্যানার্জিসাহেবকেও আসতে দেখা গেল। সাদা পায়জামা পাঞ্জাবি পরে শুয়েছিলেন উনি। তার-ই ওপরে ফেডেড জিনসের টপটা চাপিয়ে নিয়েছেন। আধ-টেকো মাথাতে টুপি। ভদ্রলোক একেবারে ওরিজিনাল মানুষ। কোনো বাহ্যিক ভড়ং নেই, যদিও থাকলে মানিয়ে যেতে পারত। গৈরিকার গায়ে হালকা খয়েরি রঙা শাল। ওঁরা নীচে নামলেন না। কিছুটা এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন ব্যানার্জিসাহেব, ওগো কবু? গোয়েবু ফলস-এ যাওয়ার কী হল?

ঐশিকা বলল, গোয়েবু না বাপি টোয়েবু।

-সেটা মন্দ বলিসনি। গৈরিকা গলা তুলে দূর থেকেই বলল, কী রে ওই। তোর শীত-টিত করছে না? শালটাও নিয়ে এলি না!

ঐশিকা ফিসফিস করে বলল, কর্বুরকে, আপনাকে কী অপমান। এরকম উষ্ণ পুরুষের কাছে থাকলে কি কোনো মেয়ের শীত লাগা উচিত?

আপনিই বলুন?

–আমাকে বা আপনি করে বলা কেন?

গৈরিকা আবার চেঁচিয়ে বলল, আপনার কলা-খেকো হাতি তো আপনাকে ডিসওবলাইজ করল মশাই। উঠে আসুন। হাতি তো দেখাতে পারলেন না কিন্তু প্রোগ্রাম তো ঠিক করতে হবে।

-তাই তো দেখছি। চেঁচিয়ে বলল কর্বুর।

ওঁরা বেশ দূরেই ছিলেন।

ভালো শুনতে না পেয়ে কর্বুর বলল, মানে?

-মানে, ডিসওবলাইজ করল।

কে?

-কে আবার?

–হাতি।

ঐশিকাকে বলল, চলো। যাওয়া যাক।

–দিদিটা সারাজীবন আমার সঙ্গে শত্রুতা করে গেল।

–কেন একথা বলছ?

–বলব না? আমরা যে, একটু একা গল্প করছি তা সহ্য হল না।

ঐশিকার মুখে ওই বাক্যটি শুনে এক অনাবিল আনন্দে কর্বুরের মন ভরে গেল। প্রাপ্তিটার রকম না জেনেই খুশিতে ডগমগ হল।

–তোমাকে আমি ওই বলেই ডাকব, গৈরিকার মতন-ই।

–ওই যাঃ-ও বলতে পারতেন।

ঐশিকার রসবোধে নতুন করে নিশ্চিন্ত হল কর্বুর।

ওপরে উঠতেই ব্যানার্জিসাহেব বললেন, ব্রেকফাস্টে কী খাবে ভাই কবু? আমি ভাবছি, অরেঞ্জ জুস। তারপর কষে প্যাঁজ আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে ডাবল-ডিম-এর ওমলেট, সঙ্গে বেকন ভাজা, উইথ মাস্টার্ড। নিয়ে এসেছি তো আমরা সঙ্গে করে। ঠাণ্ডাতে খারাপ হবে না। রুটিও তো তুমি এনেছ। তবে আর কী! ক্রিসপ টোস্ট, উইথ অরেঞ্জ মার্মালেড। আর কিছু কি তুমি সাজেস্ট করছ? বড়োজামদার দোকানের কড়াপাকের সন্দেশও আছে। এতেই চলে যাবে? কী বলছ তুমি?

–বাপি, আমরা কি এখানে খেতেই এসেছি?

-সেটা মন্দ বলিসনি। তবে খেতেও তো এসেছি এবং খাওয়াতেও।

ছেলেটাকে তোরা তো দেখাশোনাই করছিস না। তা আমার তো কিছু করতে হয়।

–ছেলেটা কি কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র বাপি?

গৈরিকা বলল।

সকলে জোরে একসঙ্গে হেসে উঠল সেই কথায়। সকালের শিশিরভেজা বনপথে আর শরতের জঙ্গলে সেই হাসির অনুরণন উঠল। কতকগুলো ব্যাবলার উচ্চকিত হাসিতে ভয় পেয়ে ছিঃ ছিঃ ছিঃ। করতে করতে দল বেঁধে উড়ে চলে গেল। ডানদিক থেকে বাঁ দিকের জঙ্গলে।

ঐশিকা বলল, কর্বুরকে। আচ্ছা, পাখিগুলো কি ব্রাহ্ম?

কর্বুর অবাক হয়ে বলল কেন?

–না। আমরা দাঁত দেখিয়ে মুখ হাঁ করে হেসেছি বলে হয়তো বিরক্তিতে ছিঃ ছি : করতে করতে চলে গেল।

গৈরিকা বলল, ভালো হচ্ছে না কিন্তু ওই।

–ওই যা।

বলল, ঐশিকা।

তারপর গৈরিকাকে শুনিয়েই বলল, মিস্টার ব্রহ্মকৃপা দাস ব্রাহ্ম।

–তিনি কে?

–দিদির হবু স্বামী। হবুই বা বলি কেন, বলি গবু। রেজিস্ট্রি তো হয়েই গেছে।

ওরা দুজনে হেঁটে পথে উঠে ব্যানার্জিসাহেবের সঙ্গে বাংলোতে পৌঁছোল। গৈরিকা এল পেছন পেছন। ঐশিকার ওপরে একটু বিরক্ত হয়েছে বলে মনে হল। সম্ভবত আনন্দের আতিশয্যে ঐশিকা একটু বাড়াবাড়িও করে ফেলেছিল। পরে দু-বোনে বুঝে নেবেখন।

ভাবল, কর্বুর।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, খাওয়া, ক-দিন জঙ্গল দেখা সব-ই মিলিয়ে-মিশিয়ে করতে হবে ততা! প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্মকে ওয়াটারটাইট কম্পার্টমেন্টে বদ্ধ করে রাখলে কী করে হবে। এটার সঙ্গে ওটা, ওটার সঙ্গে সেটা, তবে না মজা!

বলেই বললেন, তুমি কী বলো ভায়া কবু?

-একদম-ই ঠিক বলেছেন আপনি!

-দেখেছিস! দ্যাখ তোরা। তোরা তোদের বাড়াবাড়িতে আনন্দটাকেও

কর্তব্য করে তুলিস। এইখানেই আমার আপত্তি। নিয়মানুবর্তিতা খুব বড়োগুণ। কিন্তু আমেরিকান প্যাকেজ ট্যুর বেড়োতে-আসা ট্যুরিস্টরা যেমন বেড়ানো কাকে বলে তার কিছুমাত্রই জানে না, তোরাও তা জানিস না। আরে নিয়ম ভাঙাটাই তো হচ্ছে ছুটির মূলমন্ত্র। এই সরল সত্যটা বোঝে কজনে?

–বাঃ। ভারি চমৎকার করে বললেন কিন্তু আপনি। আমার মনের কথাটি বলেছেন। ডায়েরিতে লিখে রাখব।

.

০৮.

ওরা চানটান সেরে ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়েছিল কুমডি থেকে। টোয়েবু ফলস থলকোবাদ থেকে পাঁচ কিমি। আর থলকোবাদ কুমডি থেকে চল্লিশ কিমি। থলকোবাদ থেকে সিমলিপালেও যাওয়া যায়। হাটগামারিয়া তেতাল্লিশ কিমি থলকোবাদ থেকে।

ওরা মানে, ওরাই। রহমত এবং বিহারি জিপটা নিয়ে সোজা চলে যাবে থলকোবাদে। গিয়ে রান্নাবান্নার বন্দোবস্ত করবে।

থলকোবাদ বাংলোতে কুমডির চেয়েও বেশি অরণ্যপ্রেমী আসেন কারণ থলকোবাদের টাওয়ারটি ভালো। বাংলোটিও পাহাড়চুড়োয়। তবে বন্যপ্রাণী

দেখতে হলে সবচেয়ে সুবিধে প্রখর গ্রীষ্মে আসা। কষ্ট খুব-ই হয় তখন। অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাও থাকে কিন্তু তখন পর্ণমোচী বনের অধিকাংশ পাতা ঝরে যাওয়ায় নজর চলে বহুদূর অবধি। আর বন্যপ্রাণীরা যেখানে জল থাকে তার আশপাশেই থাকে তখন। জলপান করার জন্যে যেমন, তেমন গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যে জলে গা-ডুবিয়ে থাকার জন্যেও। বর্ষার পর থেকে জঙ্গলের মধ্যে অনেক জায়গাতেই প্রায় জল থাকে, তাই প্রাণীরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে।

সাড়ে এগারোটা বাজে, এমন সময়ে ওরা গিয়ে পৌঁছোল।

–এই আপনার টোয়েবু ফলস?

গৈরিকা বলল, ফলস-এর সামনে দাঁড়িয়ে।

-কেন? পছন্দ হল না।

–নাঃ ফলস দিলেন।

গৈরিকা হেসে বলল।

–এই দেখার জন্যে না এলেও হত। তার চেয়ে বনের মধ্যে কোথাও দাঁড়িয়ে বা বসে আপনার জ্ঞান অথবা গান শোনা যেত। তাতে আমাদের জ্ঞান বাড়ত। প্রাণ স্নিগ্ধ হত।

গৈরিকা বলল, সত্যি! আপনার গান তো শোনাই হল না। শোনান এক্ষুনি।

-লাঞ্চ-এর আগে হাতে অনেক-ই সময় আছে। এখন কবু যা দেখাতে নিয়ে এল তোদের আদর করে, তাই দেখ। গান বরং পরে শুনিস।

বলেই বললেন, যাই বলো কবু, ভদকা খাওয়ার এমন জায়গা আর হয় না। ওই–যা তো মা, গাড়ি থেকে ভদকার আর জলের বোতলটা নিয়ে আয়।

আমিই এনে দিচ্ছি।

কবু বলল।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, সেটা মন্দ নয়।

–ফার্স্ট ক্লাস। তোমার মতো যদি জামাই থাকত একটা আমার। সব দুঃখহরণ করতে পারত।

কবু ওঁর ভদকা আর জলের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে এল। বিহারি সব-ই বেতের বাক্সে প্যাক করে দিয়েছে।

-বা-ব্বা! ব্রহ্মকৃপা পেয়েছ, তাতেও তোমার দুঃখহরণ হচ্ছে না।

ঐশিকা বলল, রাগ দেখিয়ে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, শুধু ব্রহ্মকৃপাতে কি আমার মতো পাপী তরবে রে মা। যিশুখ্রিস্ট, মা কালী সকলের কৃপাই আমার দরকার। তাই তো এখন মা কালীর সেবায় লাগব।

-মানে?

–মানে ভদকা খাব।

–পৃথিবীর কোন কোন জলপ্রপাত দেখেছ তুমি কবু? স্টেটস আর কানাডার সীমান্তে নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখেছ?

কর্বুর বলল, আমি কখনো দেশের বাইরেই যাইনি। একবার শুধু বাংলাদেশে গেছিলাম। যদিও বাংলাদেশকে বিদেশ বলা যায় অবশ্য। আমার নিজের দেশ-ই এতবড়ো ও এত সুন্দর যে, আগে স্বদেশ-ই ভালো করে দেখি। তারপরে বিদেশে যাব।

–এটা তুমি ঠিক বললে না, হরিশরণ।

–কী বলছ বাবা কাকে? উনি তো কর্বুর।

-ইয়েস। ইয়েস। ভুল হয়ে গেছে। স্মিরনফ ভদকাটা বড় কড়া! শ্বশুরের নামও ভুলিয়ে দেয়। সরি, হরিশরণ, আই মিন কর্বুর। তারপর বললেন, ট্রাভেলিং ইজ এডুকেশন। নিজের দেশকে ভালোবাসতে হলে, নিজের

দেশের কীভাবে উপকার করা যায়, তা জানতে হলে বিদেশ অবশ্যই দেখা দরকার। না দেখলে, তুলনা করবে কী করে। বিদেশ না দেখলে নিজের দেশকেই পৃথিবী বলে ভুল করাও অসম্ভব নয়। সেইজন্যেই প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের পক্ষেই বিদেশ দেখাটা খুব জরুরি।

–যাব কখনো। সময় হয়নি। তাগিদও হয়নি।

–যেয়ো এখন। তাড়া কীসের? অঢেল সময় পড়ে আছে। তুমি তো ছেলেমানুষ!

–হ্যাঁ। কিণ্ডারগার্টেনের ছাত্র।

ঐশিকা বলল এবার।

কর্বুর তাকাল খুনশুটি করা ঐশিকার দিকে। মুখে কিছুই বলল না।

ঝরনার ঝরঝরানি শব্দ, হাওয়া-লাগা, গাছপালার ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে এসে পড়া শরতের সোনালি রোদের ঝিলিমিলির মধ্যে পনিটেইল করা ঐশিকাকে দারুণ দেখাচ্ছিল। কারও চুলের মধ্যে এতখানি যৌনতা থাকতে পারে তা আগে কখনো জানেনি কর্বুর। তার ওপর আতরের গন্ধ। ঝরনার স্রোতে ঝরাপাতা হয়ে খুশিতে ভেসে যেতে ইচ্ছে করছিল ওর।

গৈরিকা বলল, কুমড়ি দেখলাম, তারপর থলকোবাদে যাব। আর কোন

কোন বনবাংলো আছে সারাণ্ডাতে?

এমন সময় ঐশিকা আঙুল দিয়ে একটি ঝোঁপের দিকে দেখিয়ে কর্বুরকে বলল, ওগুলো কী ফুল স্যার?

-কোনগুলো? ওগুলো তো...

–না, না। ওগুলো নয়, বাঁ-দিকে, আরও বাঁ-দিকে দেখুন। আমার আঙুল দেখুন। আজকে ঐশিকা মরচে-রঙা জিনস পরেছে, গায়ে মরচে-রঙা শাল। মরচে-রঙা স্পোর্টস গেঞ্জির ওপরে। চুলটাকে পনিটেইল করেছে। ভাগ্যিস আজও চুল ছেড়ে দেয়নি। কাল সারারাত কর্বুর ঐশিকার চুলের মধ্যে, চুলের গন্ধে হাবুডুবু খেয়েছে। ঘুমোতে পারেনি একটুও।

আর গৈরিকা হালকা নীলরঙা শাড়ি পরেছে, নীল-রঙা শাল। দু-বোনের মধ্যে ঐশিকাই বেশি সুন্দরী। দু-জন সুস্নাতা যুবতীর শরীরের সাবানের, পারফিউমের আর আতরের গন্ধে ঝরঝরিয়ে পড়া জলের পাশের প্রজাতির আর কাচপোকা-ওড়া এই উজ্জ্বল সকাল সুগন্ধে যেন উদবেল হয়ে উঠেছে।

কর্বুর বলল, ওঃ। ওই ফুলগুলো! ওগুলোর নাম হেল।

-ওঃ হেল।

গৈরিকা বলল, কপট বিরক্তি ঝরিয়ে।

–এখানে কি হেভেনও আছে নাকি?

–না। হেভেন নেই। শুধুই হেল।

তারপর বলল, নামটা বোধ হয় মিথ্যে নয়, কারণ ওই গাছের ফল বেটে পাহাড়ি নদীতে আদিবাসীরা যখন দেয়, তখন নদীর সব মাছ মরে গিয়ে ভেসে ওঠে। তখন তাদের ধরতে ভারি সুবিধে হয় আদিবাসীদের। এই ফলগুলো বিষ। খেলে, মানুষও মরে যেতে পারে।

–বিষক্রিয়ায় যে মাছ মরে, তা খেয়ে মানুষের কিছু হয় না?

–না, হয় না। কেন হয় না, বলতে পারব না।

–আমি তোমার পাশের এই পাথরে একটু বসি হরিহরণ? পাইপটা একটু জম্পেশ করে

ধরাই। আমার তো বেশ দারুণ লাগছে জায়গাটা। এই জলপ্রপাত, এই রোদ, এই মিষ্টি শীত, এই রাশান ভদকা, আর তুমি এই হরিশরণ। দারুণ। আমি কিন্তু তোমাকে হরিশরণ বলেই ডাকব।

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বললেন, তোদের বুঝি ভালো লাগছে না?

পুষ্পবনে পুষ্প নাহিরে, পুষ্প আছে অন্তরে।

কর্বুর বলল।

–দেখেছ বাপি। যত ফুল সব উনি তোমার মধ্যে খুঁজে পেলেন।

গৈরিকা বলল।

-তা কী করা যাবে! ও নিজে গুণী তাই অন্য গুণীকে সহজে চিনল। তোদের মতো তো নয়। তা বলুন না বন-বাংলোর নামগুলো এবারে।

গৈরিকা আবার বলল।

–বলছি। তার আগে বলব, এর পরের বার এলে গুয়াতে ক-দিন থেকে যাবেন। কিরিবুরু থেকে নীচের সারাণ্ডা ভারি সুন্দর দেখায়। কিরিবুরুও সুন্দর জায়গা। সেখানে এবং মেঘাতিবুরুতে তো ভালো আরামপ্রদ গেস্ট হাউসও আছে। থলকোবাদের কাছ থেকে কারও নদী গিয়ে কোয়েলে মিশেছে। তবে এই কোয়েলে আর পালামৌর কোয়েলে অনেক তফাত। পালামৌর কোয়েল অনেক-ইবেশি সুন্দর।

-গেস্ট হাউস কাদের?

বোকারো স্টিল-এর। গেস্ট হাউসের কাছেই ভিউ পয়েন্ট আছে। সেখানে থেকে ইচ্ছে করলে সারাণ্ডার সাতশো পাহাড়কে আলাদা করে গোনা যায়,

যদি কারও ধৈর্য থাকে।

-আরও বনবাংলোর কথা বলুন। কোথায় কোথায় আছে?

সারাণ্ডা ফরেস্ট ডিভিশনে তিনটি রেঞ্জ আছে। কিরিবুরু, কয়না আর সামটা রেঞ্জ। এই কিরিবুরু রেঞ্জ-এর অধীনে পড়ে কুমডি, বরাইবুরু আর করমপদা। কয়না রেঞ্জ-এর অধীনে পড়ে পোঙ্গা, ছোটোনাগরা, অনুকুয়া, সালাই আর মনোহরপুর। এই মনোহরপুর ছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় জায়গা। বনবিভাগের একজন আমলার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনিই তাঁকে সারাণ্ডার অনেক জায়গা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেন।

–বিভূতিভূষণ তো সাধারণ মানুষ ছিলেন না আমাদের মতো যে, ওমলেট উইথ বেকন মাস্টার্ড দিয়ে খাওয়ার জন্যেই জঙ্গলে আসতেন। তিনি ছিলেন সাধক।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

–তা ঠিক।

কর্বুর বলল।

–এই গাছটি কী গাছ ভায়া?

–কোন গাছ?

–আরে আমি যার নীচে শিলাসনে বসে ভদকা খাচ্ছি আর পাইপ ফিল করছি।

–ও। এটা তো কদম গাছ।

ঐশিকা বলল, হোয়াট আ পিটি, বাপি! যদি বা জীবনের অনেক পথ হেঁটে কদমতলে এসে পৌঁছালে তাও রাধার বদলে কর্বুর সেন।

সকলেই ঐশিকার কথাতে একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সেই হাসির দমকে ঝরনার জল যেন আরও জোর পেয়ে এগিয়ে গেল।

–অন্য বাংলোগুলোর কথা তো বললেন না? বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ওঠাতে সব কিছু গোলমাল হয়ে গেল।

–হ্যাঁ। বলছি। সামটা রেঞ্জ-এর অধীনে আছে সেরাইকেলা, তিরিলপোসি, আর থলকোবাদ। থলকোবাদে তো আমরা যাচ্ছিই।

-এই রেঞ্জ ব্যাপারটা কী বলুন তো স্যার?

ঐশিকা বলল।

বনবিভাগের হায়ারার্কি জানলে পরে, বুঝতে সুবিধে হবে। সবচেয়ে ওপরে

বনমন্ত্রী, বনমন্ত্রীর পরে ফরেস্ট সেক্রেটারি, তাঁর নীচে প্রিন্সিপাল চিফ কনসার্ভেটর অফ ফরেস্টস, সংক্ষেপে পি.সি.এফ. এবং তাঁর অধীনে আবার চিফ কনসার্ভেটর। সি.এফ. তাঁর অধীনে আবার একাধিক কনসার্ভেটর।

একাধিক কেন?

–মানে, নানা বিভাগের একজন করে চিফ। ওয়াইল্ড লাইফ, সিলিভি কালচার, ফরেস্টস, গেম-পার্ক, প্ল্যানিং ইত্যাদি ইত্যাদি। তা ছাড়া অঞ্চল হিসেবেও আছে। যেমন, নর্থ বিহার, সাউথ বিহার ইত্যাদি ইত্যাদি। এক একজন চিফ কনসার্ভেটর-এর অধীনে থাকেন একাধিক কনসার্ভেটর। একজন কনসার্ভেটরের অধীনে থাকেন কয়েকজন ডি.এফ.ও. অর্থাৎ ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার। আবার এক একজন ডি.এফ.ও.-র অধীনে থাকেন কয়েকজন রেঞ্জার, এক একটি রেঞ্জ-এর দায়িত্বে।

–আর রেঞ্জারের নীচে কেউ থাকেন না?

–থাকেন বই কী! রেঞ্জারের নীচে ফরেস্টার। একাধিক-ই থাকেন। তাঁদের নীচে ফরেস্ট গার্ড।

বাবা। এ দেখি বন্যপ্রাণীর চেয়েও সংখ্যাতে আমলা বেশি।

গৈরিকা বলল।

-হ্যাঁ। সেইরকম-ই ব্যাপার।

হেসে বলল, কর্বুর।

–এখানে একরকমের ফুলে ফোটে তাদের নাম হুঁতিতি।

–কী বললেন? তাই? অদ্ভুত নাম তো!

-হ্যাঁ। শুধু নামেই নয়, চরিত্রেও অদ্ভুত। আট বছর বাদে ফোটে। পৃথিবীর খুব কম প্রাণী অথবা উদ্ভিদের গর্ভাবস্থা এতদীর্ঘ। যদি বা থেকেও থাকে, তবে তা আমার অজানা। আমি আর কতটুকুই বা জানি।

–বাবাঃ। গলা তো শুকিয়ে গেল আপনার। কফি খাবেন নাকি? এনেছি তো ফ্লাস্কে

করে।

ব্যানার্জিসাহেব বললেন, দে-দে। এনেছিস তো দিচ্ছিস না কেন?

–আপনার টোব্যাকোর গন্ধটা ভারি সুন্দর।

কর্বুর বলল, ব্যানার্জিসাহেবকে।

–গোল্ডব্লক। ইংলিশ টোব্যাকো। আমার বন্ধু রনাল্ড রায়ান পাঠায় কানাডা

থেকে, এর তার হাতে, নিয়মিত। ভেরি সুইট এবং সুইট স্মেলিং টোব্যাকো।

–ইচ্ছে আছে থলকোবাদে আজকের দিনটা আর রাতটা থেকে আপনাদের নিয়ে সালাই যাব। একটি নির্জন মালভূমির একেবারে ওপরে দু-কামরা আর একটি আউট হাউসের বাংলো। মালভূমিতে রাতে জিপ নিয়ে ঘুরলে, আশা করি অনেক জানোয়ার দেখাতে পারব।

–তা তো পারবে। এখন লাঞ্চের মেনুটা কী তা বলো তো দেখি।

-পোঁছোতে তো দেরি হবে। তাই বলছি পাতলা করে মুসুর ডালের খিচুড়ির সঙ্গে কড়কড়ে করে আলুভাজা আর বেগুনি।

–বাঃ। ফার্স্ট ক্লাস। ভদকার সঙ্গে যা জমবে না।

–কী কী জানোয়ার দেখতে পাব আমরা?

ঐশিকা শুধোল।

–হাতি তো এখানে যত্রতত্রই দেখা যায়। কাল রাতে হাতিটা এল না কেন জানি না। তবে একটা হাতিতে ইন্টারেস্টেড নই। একটা হাতি মানেই ঝামেলার ব্যাপার। লেপার্ড ওয়াইল্ড ডগস বা ভারতীয় ঢোল দেখা যায়।

কুকুরের নাম ঢোল?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

তাদের দলের সর্দারের কী নাম?

এবারে গৈরিকা জিজ্ঞেস করল।

-ঢোলগোবিন্দ।

কর্বুর বলল।

তারপর বলল, হ্যাঁ। বুনো-কুকুরের-ই নাম। লাল লাল দেখতে। দলে থাকে। দিশি কুকুরের চেয়ে বড়ো হয়। আবার অ্যালশেসিয়ানদের চেয়ে ছোটো হয়। এরা পনেরো মিনিটের মধ্যে বড়ো শম্বরকে শেষ করে কঙ্কালটি রেখে যাবে। এরা যে জঙ্গলে ঢোকে, সেই জঙ্গল থেকে বাঘও ভয়ে পালায়।

-তাই?

–হ্যাঁ।

–আর মানুষদের?

-ভরসার কথা এই যে, আজ অবধি মানুষদের কখনো আক্রমণ করেনি। যেদিন মানুষের ভয় এদের ভেঙে যাবে, সেদিন থেকে বনচারী মানুষের-ই

বড়ো বিপদ।

তারপর বলল, এত অল্প সময়ের জন্যে এলে কি বন দেখা যায়? কুমডির কাছেই বীরহোড়দের একটি বস্তি আছে। সেখানে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আপনাদের। এখনও আদিম আছে তারা। চাষবাস করে না। বনের ফলমূল কান্দা-গেঠি খেয়ে থাকে। মহুয়ার ফুল, ফল, শালেরও। উইপোকাকে ওরা বলে বানর-ডুমরি, ওদের ভাষাতে। উইপোকা খায় ওরা, মহুল-ফুলও, ভাল্লুকের সঙ্গে লড়াই করে। ভাল্লুকেরও তো ওসব খুবই প্রিয় খাদ্য। মহুয়ার মদকে ওরা বলে আরকি। আর হাঁড়িয়া বা পচাইকে বলে ভিয়েন।

শুনেছি, মহুয়া ডক্টরড করে খেলে দারুণ হয়। তবে তোমার সঙ্গে এসব নিয়ে আলোচনা করে লাভ কী? কুরুবককে বলব ভাইপো দেখে এলাম বটে তোমার। সেই সেযুগে ছিল যুধিষ্ঠির আর এযুগে কন্টুর। মাঝে ধু-ধু সমুদ্র। যদি বা কিছু থাকতেও পারত কর্বুর তা কর্পূর করে হাওয়া করে দিয়েছে।

–হাওয়া-করা আবার কী কথা বাপি?

গৈরিকা বলল।

-আরে, আমি মিস্ত্রি মানুষ। আমি ওইরকমভাবেই কথা বলি। আমি কি আর তোদের মতো সংস্কৃতিসম্পন্ন?

–কর্বুরও তো মিস্ত্রিই। এঞ্জিনিয়ার যদি মিস্ত্রি হন।

গৈরিকা বলল।

কর্বুরের সঙ্গে আমার তুলনা। সে তো লাখে এক। এমন একটি কোথাও খুঁজে পাবে। নাকো তুমি, সে যে মোদের কর্বুর গো, কবুবাবু তুমি।

কর্বুর হেসে ফেলল।

-আচ্ছা, সালাই কতদূর? থলকোবাদ থেকে?

ঐশিকা প্রশ্ন করল এবারে।

-চল্লিশ কিমি মতো হবে। তবে জঙ্গলের পথ তো। সময় লাগে যেতে।

তাহলে...বলেই, ভদকার গ্লাস বটমস-আপ করলেন।

ব্যানার্জিসাহেবের কথা শেষ হওয়ার আগেই উৎকর্ণ হয়ে কী যেন শুনল কর্বুর একমুহূর্ত। তারপর-ই স্বগতোক্তি করল, একটা মোটরসাইকেল আসছে।

–ডাকাত-টাকাত নয় তো?

গৈরিকা বলল উদবিগ্ন গলায়।

রেজিস্ট্রিটা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ওর বাঁচার শখটা হঠাৎ-ই তীব্র হয়েছে যেন। বুঝতে পারে গৈরিকা। আর নিজে যখন বোঝে, তখন অন্যেরাও বোঝে নিশ্চয়ই।

ঐশিকা বলল, তাতে কী হয়েছে? আমাদের লোকাল গার্ডিয়ানের কোমরে যন্ত্রও আছে।

-কী করে জানলে তুমি?

জিজ্ঞেস করল কর্বুর, ঐশিকাকে।

তুমি শুনে ব্যানার্জিসাহেব খুশি হলেন এবং খুশি যে হয়েছেন তা দেখবার জন্যে পূরিত গ্লাসটাতে বড়োচুমুক লাগালেন একটা।

-তুমি যখন ড্রাইভিং-সিট থেকে নামছিলে তখন দেখে নিয়েছি।

সেকথার উত্তর না দিয়ে কর্বুর বলল, তাই? তোমার চোখ তো খুব ভালো।

-সে বিষয়ে কি আপনার কোনো সন্দেহ আছে?

আমার নিজের গাড়িতে ড্রাইভিং সিট-এর পাশে দরজার সঙ্গেই লাগানো হোলস্টার আছে। সেখানেই পিস্তলটা থাকে, যখন-ই গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করি। তবে আজকালকার ডাকাতরা তো পিস্তল ব্যবহার করে না, তারা তো চাইনিজ এ. কে. ফর্টিসেভেন, ইজরায়েলি উজি, রাশিয়ান

কালানিশভ অটোম্যাটিক ওয়েপনস ব্যবহার করে।

দেখতে দেখতে ভটভট শব্দটা জোর হতে লাগল।

কর্বুর স্বগতোক্তি করল, সাইলেন্সরটা ফাটা আছে, তাই আওয়াজ এতজোর হচ্ছে।

নিস্তব্ধ শারদসকালের গভীর বনের মধ্যে সেই ফাটা-সাইলেন্সার লাগানো মোটর সাইকেলের শব্দ চতুর্দিকে ঝরনার মতো অনুরণিত হচ্ছিল।

তারপর-ই কর্বুর উঠে দাঁড়াল। আবারও স্বগতোক্তি করল, ফটকা নয়তো!

ফটকা?

ঐশিকা জিজ্ঞেস করল।

–সে কীরকম ডাকাত যে, নাম তার ফটকা?

গৈরিকা বলল, তা ছাড়া আমাদের কাছে আছেটা কী যে, ডাকাতি করতে আসবে?

–ওরা ক-জন আছে তা তো জানি না। আপনারা দুই বোনেই তো যথেষ্ট। আর কীসের দরকার তাদের।

বলেই বলল, ডাকাতের নাম ফটকা নয়। ভালো মানুষের নামও ফুচকা নয়। আমাদের বড়োবিলের অফিসের এরাগু বয়ের নাম হচ্ছে ফটকা। সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। তার মোটর সাইকেলের সাইলেন্সরটা দশমীর দিন-ই ফেটেছে যে, তা আমি জানি। সেইজন্যই ভাবলাম...

দেখতে দেখতে শব্দটা কাছে এসে গেল এবং দেখা গেল একজন গাঁট্টাগোট্টা বাঁটুল চালাচ্ছে মোটরসাইকেল আর আর একজন রোগা-প্যাংলা লম্বা পেছনে বসে। তার হাতে একটা তেল-পাকানো মোটা লাঠি।

নমস্তে ছোটোবাবু।

চালক বলল, বাইকটা লাগাতে লাগাতে।

-ক্যারে ফটকা। বাত ক্যা?

উদবিগ্ন গলাতে পাথর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, কর্বুর।

–ফ্যাক্স আয়া। বড়োবাবু বলিন কি আভভি লেতে যা না।

–কাঁহাসে আয়া? কলকাত্তাসে?

–নেহি বাবু। টাট্টাসে।

বলে, সে পকেট থেকে ফ্যাক্স মেসেজটা বের করতে করতে এগিয়ে

আসতে লাগল।

টোটালি আনকনসার্নড ব্যানার্জিসাহেব ফটকার সঙ্গীকে বললেন, লাঠি কাহে লেতে আয়া?

সে কাঁচুমাচু মুখ করে ওড়িয়াতে বলল, হাতি মারিবাকু পাঁই।

–বলে কী এ ছোকরা! লাঠি দিয়ে হাতি মারবে কী?

–রাস্তামে মিলাথা হুজৌর। এহি লাঠি দিখকেই তো ডরকে-মারে ভাগা জোর সে। ফটকা বলল।

–মিলা থা? হার্থি? কাঁহা মিলা থা?

–কুমডি বাংলো কি বগলহিমে।

কর্বুর ফটকার সঙ্গীর দিকে চেয়ে বলল, উও হ্যায় কৌন?

জামদা সে উসকো উঠাকে লায়া হ্যায় বাবু। পান-দুকানি কি ভাতিজা। জঙ্গলমে এবেলা আনেমে ডর লাগল থু।

-ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা?

–নমস্কার আইগাঁ। ম নাম্ব ক্রপাসিন্ধু।

–তম ঘর কউটি?

পানপোষ আইগাঁ।

ফটকার হাত থেকে ফ্যাক্সটা নিয়েই পড়ল কর্বুর মনে মনে। ব্যানার্জিসাহেবের নামেই ফ্যাক্স। জামশেদপুর থেকে তাঁর সেক্রেটারি এম. এস. মানসুখানি পাঠিয়েছে। ইয়োর ফাদার ইন-ল এক্সপায়ার্ড লাস্ট নাইট। প্লিজ প্রসিড টু ক্যালকাটা। বডি বিইং কেপ্ট ইন মচুরারি। উইল বি ক্রিমেটেড ওনলি আফটার ইয়োর অ্যারাইভাল। সলিসিটর্স ওলসো ডেজায়ার্স সো। হ্যাড ওলসো সিকন ষ্টু মিস্টার কে, সেন।

তারপরে পি. এস.প্লিজ টেক ইয়োর ডটার্স অ্যালাউড কনডোলেন্সেস-মীনা।

-কী ব্যাপার?

ব্যানার্জিসাহেব বললেন।

কর্বুরের কাছ থেকে উত্তর না পেয়ে উনি বললেন, নির্ঘাত সে বুড়ো টেঁসেছে। সারাটাজীবন আমাকে জ্বালিয়ে গেল মানুষটা। দেড় বছর পর চারটে দিনের জন্য এসেছি...! সত্যি!

গৈরিকা আর ঐশিকা একসঙ্গে বলে উঠল, কে? দাদু?

মনে তো হচ্ছে, তাই। কর্বুর ফ্যাক্স মেসেজটা ওঁকে দিল।

উনি ফ্যাক্সটা জোরে জোরে পড়লেন।

তারপর বললেন কর্বুরকে, তুমি তোমার ফটকাকে বলে যে, আমাকে এক ঝটকাতে থলকোবাদে পৌঁছে দেবে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে। তুমি, বুড়োর অগাধ সম্পত্তি যারা পাবে, তাদের কলকাতাতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করো।

-বুঝলাম না। আপনি যাবেন না?

কর্বুর বলল।

-নো। নেভার। যে শ্বশুর জীবনে জামাইকে জামাই-ষষ্ঠী পর্যন্ত খাওয়ালেন না একদিন, তাঁর মৃত্যু তো আমার কাছে আনন্দের ঘটনা। আমি থলকোবাদেই যাব। আই উইল ড্রাউন মাই সরো দেয়ার। বুলকু চাটুজ্যের মুখে তোমরা গিয়ে আগুন দাও গে যাও। আমার স্ত্রী-ই চলে গেছেন কবে। তার আবার ফাদার-ইন-ল। ওয়ান পাইস ফাদার-মাদার ছিল হে কবু। চক্ষুচর্মহীন।

ঐশিকা বলল, কী হচ্ছে বাবা! এঁরা কি বুঝবেন যে, এটা তোমার ঠাট্টা!

-ঠাট্টা! তোমরাও ঠাট্টা ভাবলে নাকি?

তারপর বললেন, কর্বুর আমার পুত্রসম। কিছুই মনে করবে না। আর, ফটকা আর কৃপাসিন্ধু তো বাংলাই বোঝে না। ভারি বয়ে গেল। তোরা কোটি কোটি টাকা পাবি। তোরা

তারপর বললেন, –ওরে ওই, কী বুঝলি?

–কী?

তোর দিদির বর ব্রহ্মকৃপার কপালটা তো দারুণ রে। এ তো জ্যাকপট পাওয়ার কপাল। বিয়ের রেজিস্ট্রি হল কী সঙ্গে সঙ্গে অমর বুড়ো পটল তুলল! আমার তো ভয় ছিল আরও বছর বিশেক চালিয়ে যাবে স্ট্রেইট-ব্যাটে ব্লক করে করে।

তারপর বললেন, এই যে বাবা কর্বুর। একটা ফ্যাক্স মেসেজ লিখে দিচ্ছি, আমার জামাই বাবাজীবন ব্রহ্মকৃপাকে কনগ্রাচুলেট করে। পাঠাবার বন্দোবস্ত অবশ্যই কোরো।

৯-১০. লক্ষ্মীপুজো

০৯.

আগামীকাল লক্ষ্মীপুজো। আজ-ই সকালে কর্বুরের কাকু কুরুবক, কাকি এবং কিরি পৌঁছেছে। বাগানের মধ্যে ঠাকুরদালান। দুর্গাপুজোর আগে থাকতেই ঝকঝক তকতক হয়েছে। পেতল । তামার সব জিনিস পালিশ করার জন্যে বাইরে থেকে এনে লোক লাগানো হয়েছে। বারান্দার কার্নিশে লাগানো আংটা থেকে ঝোলানো রট-আয়রনের ফ্রেম থেকে অর্কিড ও সিজন ফ্লাওয়ার ঝোলানো হয়েছে। পিদিমদানিতে রেড়ির তেল আর সলতে পড়েছে। শ্যাণ্ডেলিয়ার এর সব কটি বালব পরীক্ষা করে দেখে, খারাপ বালব বদল করা হয়েছে।

বাড়িতে দুর্গাপুজোই হয় না। অন্য সব পুজোই হয়, যথা–লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো, বিশ্বকর্মা পুজো হয় খাদানে খুব জাঁকজমক করে।

কালকে বড়োবিল বড়োজামদা থেকে অনেকেই আসবেন। জামশেদপুর থেকেও কাকার ঘনিষ্ঠরা আসবেন অনেকে। তাঁরা গেস্টকটেজ-এ থাকবেন। এবারে পুজো অক্টোবরের মাঝামাঝি পড়েছিল। তাই গরম একেবারেই নেই। এবারে লক্ষ্মীপুজো রবিবারে পড়েছে তাই আজ শনিবার বলে কাকুরা সকালেই এসে পড়তে পেরেছে, অন্যান্য বছর লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন রাতে আসে।

শিখীও এসেছে বড়োজামদা থেকে। জটাদা, পচাদা, গোয়েল সবাই আসবে কাল। লক্ষ্মীপুজোর ভোগ হয় টাটিঝারিয়াতে ভুনিখিচুড়ি, বাদাম, কিশমিশ, কড়াইশুটি দেওয়া, আর কড়াইশুটির চপ। আলু ও বেগুন ভাজা। যাঁরা ভাত খান না রাতে, তাঁদের জন্যে লুচি এবং ধোকা এবং ছানার তরকারি। মিষ্টি দু-তিনরকম তো থাকেই।

আজকের মতো কাজকর্ম সব সামলে নিয়েছেন মা-কাকিমারা কাজের লোকজনের সাহায্যে। প্রসাদের জোগাড় করতে হবে সকাল থেকে। বড়োবিলের বড়োজামদার অনেকে আসবেন, মেয়েরা। অপাদিও আসবেন। আজও এসেছেন অপাদি। সর্বগুণসম্পন্না মহিলা। স্বামীহারা হয়েছেন গতবছর। মা-কাকিমার বন্ধু বিশেষ। এখন ওরা কর্বুরের লাইব্রেরি-ঘরের সামনের বারান্দাতে বসে আছে। মা, বাবা, কাকু, কাকি, অপাদি, শিখী, কবু। কিরি, ফটকার সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছে বাংলার সামনের দিকে লনে, আলো জ্বেলে। এদিকের আলো সব নিভোনো। কাল কোজাগরি

পূর্ণিমা। শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদের আলোতে চরাচর ভেসে যাচ্ছে। আকাশময় তারারা উজ্জ্বল হয়েছে। এ বছর খুব বৃষ্টি হওয়াতে শরতের রূপ অনবদ্য হয়েছে। বাগান থেকে নানা ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে। তারসঙ্গে যুক্ত হয়েছে মা, কাকিমা, অপাদি ও শিখীর মাখা সুগন্ধ। মা-কাকিমার পাউডার বা সাবান বা পারফিউমের গন্ধ চেনে কর্বুর। চেনে অনাত্মীয়াদের সুগন্ধ। যেমন গৈরিকা, ঐশিকা, শিখী বা অপাদির। মেয়েরা চান করে উঠে পাটভাঙা শাড়ি পরলে তাঁদের কাছে গেলেই ভালো লাগায় মরে যায় কর্বুর সেই ছেলেবেলা থেকেই।

চাঁদের আলোতে দেখলে চেনা মানুষকেও অচেনা মনে হয়। যেমন অন্ধকারেও হয়। অসুন্দরকেও চাঁদের আলোতে সুন্দর বলে মনে হয়, অগায়ককে গায়ক বলে। মন্টিকাকা, করুণাজ্যাঠাও এসেছেন জেঠিমা ও কাকিমাদের নিয়ে।

বাবা বললেন, একটা গান শোনা তো কবু। অনেকদিন তোর গান শুনি না।

মা বললেন, কবু তো গাইবেই কিন্তু অপাকে তো পাওয়া যায় না। অপার গান-ই আগে শুনি। সেই লক্ষ্মীবন্দনার গানটা শোনাও তো অপা।

অপাদির অন্য দশজন মহিলার মতো গানের ব্যাপারে কোনো ন্যাকামি নেই। বলামাত্রই গান করেন উনি। অপাদি ধরে দিলেন, এসো সোনার

বরণ রানি গো, এসো শঙ্খকমল করে/ এসো মা লক্ষ্মী, বসো মা লক্ষ্মী, থাকো মা লক্ষ্মী ঘরে।

বড়ো ভালো গানটি। গান শেষ হতে না হতেই কোথা থেকে একটি লক্ষ্মীপেঁচা এসে বসল তো বসল বড়ো স্থলপদ্ম গাছটার-ই ওপর। একটা চাপা গুঞ্জন উঠল সমবেত পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ থেকে, পেঁচাটা উড়ে গেল।

করুণাজ্যাঠা বললেন, কত ষড়যন্ত্র করে আমার বাড়ির বাগানে একবারও একে আনতে পারলাম না আর দেখ গপা-আর কুরু তোদের বাগানেই সে উড়ে এল। দেবতারাও যদি তেলা মাথাতে তেল দেন তাহলে আমরা যাই কোথায়? আরও ধনাগম হবে অচিরে। অতিউত্তম।

সকলেই হেসে উঠলেন।

কবু চুপ করে রইল। কাকি একবার চাইল কর্বুর দিকে, অন্যদিকে চেয়ে থেকেও বুঝতে পারল কবু।

করুণাজেঠিমা বললেন, শিখী, তুই একটা নিধুবাবুর গান শোনা।

-গলাটা আজ ভালো নেই।

বলল, শিখী।

মা বললেন, জানি তো। তবু গা, দিদি বলছেন।

শিখী ধরল, কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে/আমি যাতনা বাঁধা সদা সে পড়িল সেই ফাঁসে।

কবু গান শুনতে শুনতে কুমডিতে চলে গেল মনে মনে। ঐশিকাকে দেখতে পেল কল্পনাতে তার সামনে বসে ওই গানটিই গাইছে। তফাতটা তখন-ই বুঝেছিল। তবে তফাতটা যে, এতখানি সে এখন বুঝল। ঐশিকার ক্লাস-ই আলাদা। সামাজিক, পারিবারিক পটভূমি তো একজন মানুষের জীবনে অনেকখানি। তা সকলে স্বীকার করুন আর নাই করুন। তারপরে যাকে বলে Schooling, তার ওপরেও অনেকখানি নির্ভর করে। ঐশিকা গানও গায় শিখীর চেয়ে অনেক-ই ভালো। তা ছাড়া, যে-কথাটা সে কারওকেই বলতে পারেনি কিন্তু নিজে একদিন অনুক্ষণ অনুভব করেছে তা হল, ঐশিকার কাছে গেলেই ও যেমন শারীরিক আকর্ষণ অনুভব করেছে, তেমন মহড়া দিতে দিতে শিখীর এত কাছে গতদেড়মাস ধরে থেকেও করেনি। ঠিক এইরকম শারীরিক অনুভূতি ওর জীবনে অন্য কোনো নারীর সম্বন্ধেই হয়নি।

গান শেষ হলে, সকলে নানা কথা বলছিলেন। কর্বুরের কানে কিছুই যাচ্ছিল না। ওর দু চোখের সামনে ঐশিকার খোলা চুলের সুগন্ধি মেঘ, ওর কানে তার বুদ্ধিদীপ্ত সরস কথোপকথন, ওর নাকে সেই ফিরদৌস আতরের গন্ধ।

বুলকু চাটুজ্যে অর্থাৎ ঐশিকাদের দাদু, মায়ের বাবা কী করতেন জানে না কর্বুর। সত্যিই তিনি কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি এক এক নাতনির জন্যে রেখে গেছেন কি না তাও জানে না, জানতে চায় না। তবে ঐশিকা গৈরিকার বাবা ব্যানার্জিসাহেব একজন গ্রেট লোক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কথায় কথায় তাঁর সেটা মন্দ হয় না বাক্যবন্ধটি ভোলবার নয়। মানুষটা, ছুটিতে এসে নিজেকে কী করে আনওয়াইন্ড করতে হয়, তা জানেন। আর মেয়েরা যদি রসবোধ পেয়ে থাকে, তো বাবার কাছ থেকেই পেয়েছে।

চলে যাওয়ার পর ওদের আর কোনো খবর পায়নি। কারওকে জিজ্ঞেস করতেও লজ্জা করেছে। ও তো খাদান থেকে ফিরেছে মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে। কাকু-কাকির সঙ্গে কথা হওয়ার তেমন সুযোগও হয়নি।

করুণা হঠাৎ বললেন, আরে বুলকু চাটুজ্যে চলে গেল। জানো গপা?

বাবা বললেন, কে বুলকু চাটুজ্যে?

আরে বি কে চ্যাটার্জি। কলিয়ারি কিং ছিলেন। তা ছাড়া, মস্ত বড়ড়া স্টিভেডর। কত শত কোটি টাকার মালিক তা ঈশ্বর-ই জানেন। কিন্তু সকালে তার নাম করলেই হাঁড়ি ফাটে এমন ই বদনাম ছিল তার।

বাবা হয়তো চিনতেন।

কর্বুর বাবা বললেন।

গর্জন কাকা তো অবশ্যই চিনতেন। মিত্র এস কের এস কে মিত্র, কোডারমার, ক্রিশ্চান মাইকা কোম্পানির রামকুমার আগরওয়ালা আর তার ভাইয়েরাও ভালো করে চিনতেন। তবে, মানুষটা অনেস্ট ওয়েতে পয়সা করেছিল। করলে কী হয়, ওয়ান-পাইস-ফাদার-মাদার। সারাজীবন সবাইকে টাইট করে দিতে দিতে কখন যে, প্যাঁচ-ই কেটে যায় তা তো বোঝা যায় না। তাকে টাইট দিয়েছিল তার একমাত্র মেয়ের জামাই।

তারপরেই কী মনে পড়তে বললেন, কুরুবক কোথায়? তুমি চেন না? শোনোনি বুলকু চাটুজ্যের কথা?

-না তো!

কর্বুর সব শুনেও চুপ করেছিল।

জেঠু বললেন, টাটাতে তোমার যে বস গো, সেই তো বুলকু চ্যাটার্জির জামাই।

-ব্যানার্জিসাহেব! না, না, তাঁর স্ত্রী তো কবেই চলে গেছেন!

-হ্যাঁ। সে তো জানিই। মেয়ে দুটিকেও হিরের টুকরো করে তুলেছে, বুলকু চাটুজ্যের কোনোরকম কথাই না শুনে। সে চেয়েছিল দুই সুন্দরী নাতনির

জন্যে দুটি ঘরজামাই নিয়ে আসে। দুটিকেই আঠারো-উনিশেই বিয়ে দিতে চেয়েছিল। যা রেখে যাবেন তা তো চারপুরুষ বসে খেলেও পাঁচপুরুষের জন্যেও থাকবে কিছু। কিন্তু ঘোলা বাঁড়ুজ্যে অন্য চরিত্রের মানুষ। সে তার শ্বশুরমশাইয়ের কোনো প্রভাব-ই মেয়েদের ওপরে পড়তে দেয়নি। তবে যাওয়া আসা ছিল। বুড়োর চোখের মণি ছিল ওই দুই নাতনি। নাতনিরাও দাদুকে ভালোই বাসত কিন্তু তাদের আপব্রিঙ্গিং নিজে হাতে করেছে। ঘোঁলা বাড়জ্যের মতো চরিত্র আমি বেশি দেখিনি।

কর্বুর জিজ্ঞেস করল ক্ষৌণিশ ব্যানার্জির ডাকনাম বুঝি ঘোলা?

–তা নইলে আর বলচি কার কথা। ডাঁটিয়াল।

তাঁর প্রয়োজন-ই বা কী? তাঁর টেক হোম পে কত জানেন করুণাদা? রুসি মোদীর সঙ্গে বনত না। সে চলে যাওয়াতে এখন ব্যানার্জিসাহেবকে আটকাবার কেউই নেই। তাঁর পয়সাই কে খায় তার ঠিক নেই! মেয়ে দুটিও তো হাইলি কোয়ালিফায়েড। তারাও বাবার পয়সার প্রত্যাশা করে না।

–তোমাদের কোনোই ধারণা নেই কুরু, বুলকু চ্যাটার্জি কী পরিমাণ ধনী।

মন্টিকাকা প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বললেন, ব্যাপারটা জমেছে ভালোই। লক্ষ্মীপুজোর রাতে লক্ষ্মীপেঁচা আর ধন-দৌলতের আলোচনাই তো সঠিক বিষয় আলোচনার। এদিকে চা-ও তো এসে গেল। কর্বুর গান কি আজ

শোনা হবে না?

মন্টিকাকার একটি কন্যা আছে, নিবেদিতা, সে মোটেই সুবিধের নয়। সুবিধের নয় মানে–চেহারা, ছবি ভালোই কিন্তু একেবারে পুলিশ সার্জেন্ট। কর্বুরের ওপরে মন্টিকাকার যে নজর আছে, তা সে অনেকদিন-ই আঁচ করেছে। তবে সুখের বিষয় এই যে, মা। মন্টিকাকিমাকে একেবারে পছন্দ করেন না। সেইটিই কর্বুরের রক্ষাকবচ।

কর্বুর বলল, আজ সকাল থেকেই আমার গলাতে ভীষণ ব্যথা। তা ছাড়া ইণ্ডিকার এ.সি. টাএত এফেক্টিভ, আগে বুঝতে পারিনি, গলা একেবারে ধরে গেছে। ধরে রয়েছে।

–তাহলে আর কী? চা খেয়ে আমরা একে একে উঠি। কালকে বাড়ির পুজো সেরে এখানে আসব খিচুড়ি খেতে।

নিশ্চয়ই আসবেন।

কর্বুরের মা বললেন, শর্বাণী আর মেয়েকেও নিয়ে আসবেন।

নিশ্চয়ই আনব।

মন্টিকাকা বললেন।

একে একে সবাই-ই উঠলেন। কর্বুরও উঠে সকলকে টাটিঝারিয়ার গেট

অবধি পৌঁছে দিল। কর্বুরের বাবা ছেলেবেলা থেকেই শিখিয়েছেন এটি। উনি বলতেন, কেউ কারও বাড়িতে খেতে আসেন না। একটু আদর-যত্ন, আসুন-বসুন, একটু আপ্যায়নের জন্যেই আসেন। প্রত্যেককে বাইরের গেট অবধি পৌঁছে দেবে।

কর্বুর শিখীকে বলল, তুমি যাবে কীসে? কাকাবাবু নিতে আসবেন?

-না। আমি অটোতে চলে যাব।

–রাতের বেলা অটোতে যাবে কী? চলো আমিই ছেড়ে দিয়ে আসছি।

পাশে দাঁড়ানো কাকি বলল, তোমার সঙ্গে আমার দরকার আছে কবু। তোমার কাকাকে বলো, নয়তো একজন ড্রাইভারকে বললা-না। সবাই তো গুলতানি করছে সারভেন্টস কোয়ার্টারে।

এমন সময়ে একটা লাল-রঙা মারুতি এসে দাঁড়াল গেট-এ।

কর্বুর বলল, আরে রহমত খাঁ। তোমার হাতে বাজবাহাদুরের রূপমতাঁকে এই রাতের বেলা ছেড়ে দেওয়া কি নিরাপদ হবে? আকাশে এমন চাঁদ, বাতাসে এমন গন্ধ।

–সেইজন্যেই তো হবে কবু দাদা।

গোয়েল বলল।

-তব ঠিক হ্যায়। সামহালকে লে যানা রূপমতীকো।

–বিলকুল। আপ বে-ফিক্কর রহিয়ে।

–আচ্ছা শিখী, আবার এসো। তোমার দেওয়া বইটা পড়েছি। খুব ভালো বই। আর আজ তো গানটি শুনলাম-ই। কী আর বলব! ধন্যবাদ দিয়ে তোমাকে ছোটো করব না।

–চলি কবুদা। একদিন সময় করে এসো-না আমাদের বাড়িতে। গানবাজনা হবে।

শিখী বলল।

–আমাকেও বলবে তো?

গোয়েল বলল।

–তোমাকে না বললে আমি যাবই না।

কর্বুর বলল।

শিখী কিছু না বলে, কর্বুরের খুলে দেওয়া দরজা দিয়ে সামনের বাঁ-দিকের সিট-এ গিয়ে বসল।

-চলো দাদা।

-হ্যাঁ। সামহালকে যা না।

সবাই চলে যাওয়ার পরে কর্বুর আর তার কাকি ফিরে আসছিল। ভারি ভালো লাগছে। এখন। সেই চন্দ্রাতপের নীচে এখন চাঁদের আলো আর ছায়ার সাদা-কালো বুটি-কাটা গালচে পাতা। একটি পিউ কাঁহা বাংলোর পেছনে চন্দ্রালোকিত প্রান্তরে পাগলের মতো ডাকতে ডাকতে চলে গেল।

কর্বুর জিজ্ঞেস করল, ওদের দাদুর কাজ কি হয়ে গেছে?

–হ্যাঁ কবেই তো হয়ে গেছে।

–ফিরে এসেছে ওরা জামশেদপুরে?

–হ্যাঁ। ফিরে, ঐশিকা তো চলেও গেছে দিল্লিতে। সত্যি! ওদের দাদু আর মরার সময় পেলেন না!

–দিল্লিতে কোনো টিভি কোম্পানিতে জয়েন করতে। ছ-মাস ট্রেনিং-এ থাকবে তারপর ভারতবর্ষের কোনো বড়োশহরে পোস্টিং হবে। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। ভারতবর্ষের বাইরেও পাঠাতে পারে।

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল কর্বুর। লক্ষ করল পদ্মা।

–আর গৈরিকা? সে কবে যাচ্ছে স্টেটস-এ?

–ঠিক জানি না। সম্ভবত সামনের মাসে।

–ওঁরা কী বললেন?

–কী সম্বন্ধে?

–আমার খিদমদগারিতে সন্তুষ্ট তো! কাকার মানহানি হয়নি তো?

–বাবা : মানহানি কী? কাকার প্রমোশন-ই হয়ে যাবে হয়তো। ব্যানার্জিসাহেব তো তোমার প্রশংসাতে পঞ্চমুখ। বারে বারে বলছেন জেম অফ আ বয়, গৈরিকাও যে কত প্রশংসা করল।

–আর অন্যজন?

–তাঁর মন ঠিক বুঝতে পারলাম না। তিনি তাঁর বাবার কথা আর দিদির কথা শুনে গেলেন। তোমার সম্বন্ধে অবশ্য বলেছেন শুধুমাত্র একটিই বাক্য।

-সেটা কী?

বলেছেন, আ ভেরি নাইস পার্সন।

–লিখে দিতে বললে না কেন কাকি? ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখতাম সার্টিফিকেটটি।

একটু রাগ-রাগ গলাতে বলল কর্বুর।

বাংলোর কাছে যখন পৌঁছেছে প্রায় ওরা, তখন বুকের ভেতর থেকে একটি খাম বার করে কাকি বলল, তিনি দিল্লি যাওয়ার আগে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন তোমাকে দিতে।

–খাম জুড়ে সেলোটেপ লাগিয়ে তার ওপরে আবার সই করেছেন যাতে কেউ খুলে না পড়তে পারে।

-কে খুলে পড়ত?

–আমিই পড়তে পারতাম। যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। আমিই আলাপ করালাম, এখন আমিই পর হয়ে গেলাম।

–চিঠিটা তুমিই রাখো। তুমি পড়ে, আমাকে দেবে মনে করলে দিয়ো।

–কী লিখেছে আগে দেখো। চিঠিটা তো বড়ো নয়। প্রেমপত্র হলে বড়ো হত। তবে আতর মাখা হাত বুলিয়েছে খামের ওপরে। আঃ কী সুন্দর গন্ধ। এত পাতলা চিঠি। মনে হয় ভদ্রতার চিঠিই হবে। ওদের ভদ্রতার তো কোনো তুলনা নেই।

–হ্যাঁ।

–বিশেষ করে ব্যানার্জিসাহেবের। হি ইজ আ ফাস্ট রেট জেন্টলম্যান। কলকাতা থেকেই। লিখেছিলেন আমাকে।

আমি যাই। স্নান করব কাকি।

কর্বুর বলল।

শোনো, খেতে আসতে দেরি কোরো না। কাল খুব সকালে উঠতে হবে আমার আর দিদির। অনেক-ই কাজ। পুজোর দিন।

তারপর বলল, দরজা বন্ধ করে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে তারপর চিঠিটা খুলে বিছানাতে শুয়ে পোড়ো। ইশ। ঐশিকাটা একটা থার্ডক্লাস মেয়ে। আর একটু বড়োচিঠি লিখতে পারল না।

কর্বুর বারান্দাতে উঠে তার ঘরের দিকে যেতে যেতে মনে মনে বলল, চিঠির ওজন আর চিঠির ভার তো কথা নয়। কী লিখেছে সে, দেখাই যাবে।

ঘরে গিয়ে চিঠিটাকে লেখার টেবিলের ওপরে রেখে ঘরের দরজা বন্ধ করে সে বাথরুমে গেল।

অনেক অনেকদিন পরে ঈষদুষ্ণ জলে শাওয়ারের নীচে দাঁড়িয়ে স্নান

করতে করতে, সাবান মাখতে মাখতে সে গুনগুনিয়ে গান গাইতে লাগল– কী করে কলঙ্কে যদি সে আমারে ভালোবাসে। তারপর আয়নার সামনে নিরাবরণ নিজেকে ভালো করে দেখল বহুদিন পর। নিজেকে দেখে ওর নিজেকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করল। মুখটা আয়নাতে অচেনা মনে হল। কে যেন উত্তেজনা মেশা লজ্জার আবির মাখিয়ে দিয়েছে তার মুখে। এ মুখকে সে আগে জানেনি। এ এক প্রেমিকের মুখ।

পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে, চুল আঁচড়ে, ব্রাইলক্রিম মেখে, ওডিকোলন গালে ঘাড়ে বুকে লাগিয়ে সত্যি সত্যিই বিছানাতে এসে শুয়ে, বুকের নীচে বালিশ দিয়ে চিঠিটা খুলল। হালকা নীল-রঙা প্যাডে বাঁ-দিকের ওপরে ইংরেজিতে ছাপা Oishika Banerjee... ঠিকানা নেই, ফোন নাম্বার নেই। তবে ডানদিকে তারিখ আছে, আর স্থান আছে। নীলডি, জামশেদপুর, বিহার।

স্যার

আমি ভালো চিঠি লিখতে পারি না। বাংলাতে তো পারিই না, যদিও সেটা গর্বের কথা নয়।

এইটুকু বলার জন্যেই এই চিঠি যে, কবু, তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে। সত্যি কথা বলতে কী, এত ভালো, এর আগে, আর কারওকেই লাগেনি।

পরিযায়ী পাখির-ই মতো হয়তো একবছর পরে আবার উড়ে যাব তোমার কাছে। আমার বাঁ-পায়ের মধ্যমাতে একটা রুপোর চুটকি পরিয়ে দেওয়া তোমার উচিত ছিল। অনেক পাখির মধ্যে আমাকে যদি তখন চিনতে না পারো।

তোমার সঙ্গে আমার অনেক-ই কথা ছিল। দাদু চলে গিয়েই সব গুবলেট হয়ে গেল। আর বাপি আর একজন ডিসটার্কিং এলিমেন্ট। অথচ বাপিই যে, আমাদের সব।

আমার দিল্লির ঠিকানা, ফোন নাম্বার, ফ্যাক্স নাম্বার সব দিলাম। আমার চিঠিটা যে, পেয়েছ সেটুকুই শুধু জানাবে Fax করে। তারপরে চিঠি লিখবে। চিঠির আজও কোনো বিকল্প নেই। স্যার। এই ফ্যাক্স আর ই-মেইল-এর দিনেও।

যদি আসতে পারো, তো কবে আসবে, কোথায় উঠবে তা রেসিডেন্স-এ ফোন করে জানাবে। আমাকে রোজ-ই সকাল আটটার মধ্যে করলে পাবে।

তোমার সঙ্গে এতকথা আছে যে, তা ফোনে বা একটামাত্র চিঠিতে বলা যাবে না। অথচ কথা ক-টি খুবই জরুরি। বেশিদিন অপেক্ষা করা যাবে না।

আমার সঙ্গে তোমারও যদি কোনো কথা না থাকে, তাহলে এসো না।

আসছ কী আসছ না, জানিয়ো। দেওয়ালির সময়ে এলে সময় দিতে পারব। ছুটি থাকবে দু-দিন। এলে খুশি হব।

ভালো থেকো।

Take care! Regards

ইতি-পরিযায়ী, ওই যা।

শ্রীকর্বুর সেন
টাটিঝারিয়া, চড়ুই-চড়াই,
বড়োবিল, ওড়িশা

.

১০.

রাতে খাবার টেবিলে ওরা সকলে খেতে বসেছিল। গর্জনবাবু ওরফে গপা, কর্বুরের বাবা, খেয়ে নিয়েছেন আগেই। মা আর কাকু পাশাপাশি বসেছেন। কর্বুর আর কাকি, অন্যদিকে পাশাপাশি।

ডালের বাটিটা নিজের দিকে টেনে কবু বলল, মা, আজ দিল্লি থেকে একটা জরুরি ফ্যাক্স এসেছে। আমাকে কালীপুজোর আগে একবার দিল্লি যেতে হবে। বুঝেছ?

-ওমা! তাই?

–হ্যাঁ।

-কী কাজে যাবি?

কুরুবক জিজ্ঞেস করল।

–এক্সপোর্ট পোমোশান কাউন্সিল-এর এম.ডি. ডেকেছেন। আমাদের কোম্পানিই হয়তো অ্যাওয়ার্ডটা পেতে পারে এবারে। গুজব শুনছিলাম। ঠিক নেই অবশ্য।

–বাঃ। তাই নাকি? সব-ই ভালো খবর। এবারে লক্ষ্মীপুজো তো একেবারে জমে গেল দেখছি।

পদ্মা কর্বুরের মুখের দিকে চাইল একবার। তারপর কর্বুরকে সার্ভিংস্পুন দিয়ে ডাল ঢেলে দিতে দিতে বলল, খবর যখন শুভ, তখন দেরি না করাই ভালো। শুভস্য শীঘ্রম।

বলেই, টেবিলের নীচে বাঁ-হাতটা নামিয়ে কর্বুরের ঊরুতে খুবজোর চিমটি কাটল একটা পদ্মা।

উঃ।

বলে উঠল কর্বর।

মা বললেন, কী হল?

-লঙ্কা! লঙ্কা।

বলল, কর্বুর।

-সত্যি! এতবার বলি এদের, ডালে শুকনো লঙ্কা না দিতে কথা কি শুনবে এরা! মিষ্টি কিছু খা একটা। সন্দেশ খাবি?

–সন্দেশের চেয়েও মিষ্টি তোমার কাছে কিছুই কি নেই দিদি?

–কী যে হেঁয়ালি হেঁয়ালি কথা বলিস তুই আজকাল পদ্মা, বুঝি না কিছুই।

–বুঝবে দিদি, বুঝবে। আমি সব-ই বুঝিয়ে দেব।

কুরুবক চকিতে একবার পদ্মার মুখে তাকাল।

এক নিঃশব্দ হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল।

কর্বুরের কাকি পদ্মা বলল, অ্যাওয়ার্ডটা কোম্পানি পেলে তো ভালোই। আমাদের কবুও একটা অ্যাওয়ার্ড পাবে, ইনডিভিজুয়াল পারফরমেন্সের জন্যে।

কর্বুর মা বললেন, তাই নাকি? ওঁকে বলব তো কথাটা কাল ভোরেই।

কবু কথা না বলে, মুখ নামিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে খেতে লাগল, এমনইভাবে, যেন জীবনে মুগের ডাল খায়নি কখনোই।

[এই উপন্যাসের সব চরিত্রই কাল্পনিক। উপন্যাসে উল্লিখিত কোনো চরিত্রের সঙ্গে বাস্তবের কোনো চরিত্রর কোনো মিল পরিলক্ষিত হলে তা সম্পূর্ণই দুর্ঘটনাপ্রসূত বলেই জানতে হবে।]— লেখক।

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

 করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

আরও বই

টেলি বই